সোভিয়েত সমাজের ইতিহাস

সোভিয়েত সমাজের ইতিহাস

লোকায়ত্ত রূপরেখা

প্রগতি প্রকাশন

অনুবাদ: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৫৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

সূচি

ভূমিকা ৭

প্রথম পরিচ্ছেদ
রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ৯
দ্বৈতক্ষমতা ১৪
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে গতিবেগ সঞ্চার ২৪
সশস্ত্র অভ্যুত্থান ৩৬
রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার উদ্‌ঘোষণা ৫০
সোভিয়েত ক্ষমতার বিজয়-অভিযান ৫৬
ব্রেস্ত্‌ শান্তিচুক্তি ৬১
প্রথম প্রথম বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলি ৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বৈদেশিক আক্রমণ-হস্তক্ষেপ এবং আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (১৯১৮—১৯২০)

আক্রমণ-হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের আরম্ভ ৭৯
আগুনের বেষ্টনীর ভিতরে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ৮৬
লাল ফৌজের নিষ্পত্তিমূলক জয়গুলি ১০৪
যুদ্ধকালীন কমিউনিজম ১২১
চূড়ান্ত মুক্তি ১২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি আর্থনীতিক পুনঃস্থাপন (১৯২১—১৯২৫)

কূটনীতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ১৩০
নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতিতে উত্তরণ ১৪২
অর্থনীতির সাফল্যমণ্ডিত পুনঃস্থাপন ১৫৮
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জন্যে লেনিনের পরিকল্পনা ১৬১
সামাজিক-রাজনীতিক আবহাওয়া ১৬৫
সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন ১৭০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থনীতি পুনর্গঠনে অগ্রগতি (১৯২৬—১৯২৮)

সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অবস্থান ১৯২৬—১৯৩২ . . . . . . ১৭৬
সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজনের সূত্রপাত ১৮৩
কৃষির যৌথকরণ ১৯৬
শিল্প এবং অন্তর্বাণিজ্য থেকে ব্যক্তিগত পুঁজি উৎখাত করার ব্যবস্থাবলি . . . ২০৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯২৮—১৯৩২)

পরিকল্পনা রচনা এবং গ্রহণ ২১৬
সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠল শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি ২২৪
যৌথকরণের জয়জয়কার ২৪০
কাজ আর জীবনযাত্রার অবস্থার রূপান্তর। বেকারি খতম ২৫৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর্থনীতিক পুনর্গঠন নিষ্পন্ন (১৯৩৩—১৯৩৭)

নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করার অভিযান। স্তাখানভ আন্দোলন ২৬৮
যৌথকৃত কৃষি মজবুত হল ২৮৫
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মস্ত অগ্রগতি ২৯২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ সমাধা

উত্তরণ কালপর্যায়ের সমীক্ষা ৩১৩
১৯৩৬ সালের সংবিধান ৩২৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৩৮—১৯৪১)

সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপ্রচেষ্টা ১৯৩৩—১৯৪১ . . . . ৩৩৬
তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরু ৩৪৬
সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন নতুন প্রজাতন্ত্র আর বিভাগের অন্তর্ভুক্তি ৩৫৬
প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি ৩৬৩

নবম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ (১৯৪১—১৯৪৫)

যুদ্ধের প্রথম মাসগুলি ৩৭২
মস্কোর লড়াই ৩৮২
স্তালিনগ্রাদের লড়াই ৩৯৩
ফ্রন্ট-লাইন ছাড়া যুদ্ধ ৪০৩
বহিরাক্রমণকারীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত হল ৪০৯
যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্ব ৪২৫

দশম পরিচ্ছেদ

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে অভিযান (১৯৪৬—১৯৫৮)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বুনিয়াদী পরিবর্তন ৪৩৬
আবার শান্তিকালীন নির্মাণকাজে ৪৪৬
সোভিয়েত সমাজ-জীবনে লেনিনীয় নিয়মাবলির অবিচলিত প্রতিপালন . . . ৪৮১
আর্থনীতিক অগ্রগতি। অহল্যাভূমি উন্নয়ন ৪৮৯

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্ণাঙ্গ পরিসরে কমিউনিজম গড়ার কালপর্যায় (১৯৫৯—১৯৭০)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির আরও সংহতি . . . ৫১১
সাতসালা পরিকল্পনা ৫১৮
সো. ই. ক. পা'র নতুন কর্মসূচি ৫২৬
সাতসালা পরিকল্পনা সংসাধন ৫৩৫
বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর ৫৭৪
নতুন নতুন লক্ষ্য ৬০০
উপসংহারের বদলে ৬৩১

ধারাবাহিক ঘটনা-বিবরণ ৬৩৪

ভূমিকা

অক্টোবর বিপ্লব থেকে শুরু করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের ৫০ বছরের বেশি কালের ইতিহাস নিয়ে এই বইখানি, — সে-ইতিহাস অসাধারণ জমকালো আর বৈচিত্র্যময়, বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় ঠাসা। এই বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-পথ ধরে এসেছে তার ফল সুবিদিত। অনগ্রসর, নিরক্ষর রাশিয়া একটা বিরাট সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হল — এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের চিরশত্রুরাও স্বীকার করে।

এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রয়েছে মহাবিপ্লবের ঘটনাবলি, আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী এবং সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের কঠিন এবং তীব্র সংগ্রাম; শতাব্দীর পর শতাব্দীর অনগ্রসরতার পরে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ায় সাফল্য; দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের (১৯৪১—১৯৪৫) প্রচণ্ড নাটকীয় ঘটনাবলি, যুদ্ধে-বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের মহতী কর্মকাণ্ড, এবং শেষে, পুরাদমে কমিউনিজম গড়া আরম্ভ হবার সঙ্গে ষষ্ঠ আর সপ্তম দশকে জমকালো আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি।

ঘটনাবলি যা বহুতর, উত্তেজনাময় এবং জটিল, তাতে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ইতিহাস-

রচয়িতাদের মহা মুশকিলেই পড়তে হয়। এই লেখকদের সেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে পুরোপুরিই। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁরা স্বীকার করছেন, বহু গুরুত্বসম্পন্ন এবং আগ্রহজনক ঘটনা-তথ্যাদি এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। পাঠকের সামনে ঘটনাবলির যথাসম্ভব ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরার জন্যে মূলত কালক্রমানুসারে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, কেবল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে মালমশলা প্রসঙ্গ অনুসারে একত্রে দেওয়া হয়েছে। এই লেখকেরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের যথার্থ স্রষ্টা হিসেবে জনগণের নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা, অর্জিত সাফল্যগুলির জন্যে আবশ্যক শর্ত হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং বিপ্লবের নেতা আর সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ. ই. লেনিনের ভূমিকা।

এই লেখকেরা আশা করেন, এই বইখানি পাঠককে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা মূলগত কিন্তু সাধারণ ধারণা দেবে এবং সোভিয়েত ইতিহাসবেত্তাদের প্রকাশিত অপেক্ষাকৃত আদ্যোপান্ত এবং বিস্তৃত রচনা সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাবে।

* * *

এই বইখানা লিখেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির তিন জন বিজ্ঞানকর্মী — ইউ. পলিয়াকভ (প্রথম থেকে তৃতীয় এবং নবম পরিচ্ছেদ), ভ. লেলচুক (চতুর্থ থেকে অষ্টম, দশম এবং একাদশ পরিচ্ছেদ) এবং আ. প্রতোপপভ (সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত অংশগুলি)। উপসংহার রচনা করেছেন ভ. লেলচুক এবং ইউ. পলিয়াকভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ

অর্ধ-শতকের বেশি কাল আগে অবধিও রাশিয়া ছিল একটা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অধীন; সম্রাট ২য় নিকোলাইকে তাঁর পেশা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি লেশমাত্র কৌতুকের রস ছাড়াই উত্তরে বলতে পারতেন: 'রাশিয়া ভূমির প্রভু'; তেমনি, সরকারী ঘোষণাগুলিতে তাঁর নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ করতে 'আমরা, ঈশ্বরের কৃপায়, সারা-রাশিয়ার সম্রাট...' কিংবা 'পিতৃভূমির কল্যাণের তত্ত্বাবধান করার জন্যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট আমরা সম্রাট...' দিয়ে কথারম্ভ হত হামেশা, সেটা ছিল রেওয়াজী,— ১৯১৭ সালের পরে যারা জন্মেছে তাদের পক্ষে এসব বুঝে ওঠা শক্ত।

কিন্তু, ছিল অমনটাই। বহু শতাব্দী যাবত রাশিয়া পড়ে ছিল জারের কুলমর্যাদার প্রতীক-চিহ্নে দুই-মাথাওয়ালা ঈগলটার ছায়ায়। বেঅনেট দিয়ে সুরক্ষিত, নিপীড়ন আর জুলুম-জবরদস্তির শক্তিশালী যন্ত্রে সজ্জিত এবং জনগণের যেকোন অসন্তোষের প্রকাশকে নির্মমভাবে দমনকারী এই রাজতন্ত্রকে অদম্যই মনে হত।

পুরুষানুক্রমে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সুসন্তানেরা জনগণকে নিপীড়নের জোয়াল থেকে মুক্ত করার আদর্শে আত্মনিয়োগ করে

আসছিলেন। কিন্তু, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে যখন অবতীর্ণ হল প্রলেতারিয়েত, একমাত্র তখনই জনগণ দেখতে পেল তাদের জয়ের পথে পরিচালিত করার শক্তিটিকে। রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত লড়াইয়ে নেমে বহু-সংখ্যক কৃষককে সমবেত করেছিল নিজের পক্ষে। রাশিয়ায় বিপ্লব ছিল ইতিহাসের ধারায় অবশ্যম্ভাবী। এই বিপ্লবের জয়ের জন্যে আবশ্যক সমস্ত পূর্বশর্তই বিশ শতকের শুরু নাগাত পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল — কেননা, শোষণকারী ব্যবস্থার বিশেষক দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলো বিশেষভাবে প্রকোপিত হয়ে উঠেছিল রাশিয়ায়।

পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশে রাশিয়া ছিল মাঝামাঝি স্তরে — তবে, সামন্ততন্ত্রের বেশ মোটারকমের অবশেষগুলোর সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের একটা অদ্ভুত জড়ানো-পাকানো অবস্থা ছিল। শিল্পের মোটামুটি দ্রুত প্রসার সত্ত্বেও দেশটি তখনও ছিল কৃষিপ্রধান। শ্রমিকদের উপর কদর্য শোষণ চলত, কাজের দিন ছিল ১০ ঘণ্টা কিংবা আরও বেশি, মজুরি ছিল যৎকিঞ্চিৎ। রাশিয়ার শিল্প তখন অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ছিল, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে তার একটা বিশেষত্ব ছিল শ্রমিকদের চড়া মাত্রায় কেন্দ্রীভূত অবস্থা (দেশের মোট শ্রম-বলের ৩৬ শতাংশের বেশি কাজ করত ১,০০০ কিংবা আরও বেশি শ্রমিকের কারখানাগুলোতে)।

অসম্ভব কঠোর অবস্থায় থাকত কৃষকেরা। সামন্ততন্ত্রের অবশেষ বজায় থাকার ফলে তারা ছিল ভূমি-ক্ষুধায় জর্জরিত: এক-কোটি পাঁচ লক্ষ কৃষক পরিবারের ভূমির পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ ভূস্বামীর ভূমির পরিমাণের সমান। এর দরুন গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন-শক্তিগুলোর বিকাশে বাধা পড়ত। কৃষি ছিল অনগ্রসর; চাষাবাদের উপকরণ ছিল আদিম ধরনের।

সামাজিক-আর্থনীতিক অনগ্রসরতা সবচেয়ে বেশি ছিল উপান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে, কোন কোন অঞ্চলে আদৌ কোন শিল্পই

ছিল না, সেগুলির দশা ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়ে, অন্যান্য অঞ্চল তখনও প্রকৃতপক্ষে ছিল বিকাশের উপজাতীয় পর্যায়ে।

মেহনতী জনগণের কোন অধিকারই ছিল না — এটা ছিল রাশিয়ার রাজনীতিক ব্যবস্থার একটা বিশেষক উপাদান। কোন রাজনীতিক স্বাধীনতা ছিল না বললেই হয়। প্রগতিশীল সংগঠনগুলির উপর চলত নির্মম নির্যাতন, জেলে কিংবা নির্বাসনে তিলে-তিলে শেষ হয়ে আসত হাজার-হাজার মুক্তিযোদ্ধার জীবন।

রুশ সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল অ-রুশ জাতিসত্তার মানুষ, তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা ছিল চূড়ান্ত মাত্রায় কঠোর। অ-রুশীদের বেশির ভাগের বাসভূমির দশা ছিল কার্যত ঔপনিবেশিক।

ভূমিদাসপ্রথার অবশেষগুলোর সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক নিপীড়ন মিলে রাশিয়ার মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয়েছিল অতি দুর্বিষহ অবস্থা। এর ফলে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল অতি প্রবল সব শক্তি, যেমনটা আগে আর কখনও কোন বিপ্লবে দেখা যায় নি। সামাজিক আর জাতিগত উৎপীড়নের ক্রিয়া-কেন্দ্র রাশিয়া হয়ে উঠেছিল সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দ্বন্দ্বগুলোর ক্রিয়া-কেন্দ্র এবং তার সবচেয়ে দুর্বল অংশ। তার ফলে বিশ শতকের গোড়ার দিকে সমগ্র কালপর্যায়ে রাশিয়া ছিল ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের ক্ষেত্র; বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রটা তখন গিয়ে পড়েছিল রাশিয়ায়। ১৯০৫—১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বৈপ্লবিক আন্দোলন কমে নি। আসছিল একটা নতুন জোয়ার।

১৯১৪ সালে ১লা অগস্ট তারিখে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল — আরম্ভ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী

বুর্জোয়াদের স্বার্থে বাধানো এই যুদ্ধ ছিল জনগণের পক্ষে বিজাতীয় এবং ঘৃণ্য। জারতান্ত্রিক রাজের অধঃপতিত অবস্থা এবং ভ্রষ্টতা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠল। ফ্রন্টে বিপর্যয়গুলো, লক্ষ-লক্ষ রুশ সৈন্যের নাহক জীবনহানি এবং দেশে সর্বাত্মক আর্থনীতিক বিশৃঙ্খলার ফলে জনগণের অসন্তোষ আর সক্রোধ ঘৃণা চরম সীমায় পেঁছে গেল। যে-বিপ্লবে শেষপর্যন্ত জার উচ্ছেদ হল সেটা আরম্ভ হল ১৯১৭ সালে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে।*

বহু বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তা বলেন, জার এবং তাঁর পারিষদবর্গের অসম্ভব রকমের অক্ষমতার ফলে বিপ্লব ঘটেছিল। তাঁরা বলেন, জার যদি আরও বিচক্ষণ হতেন, তাঁর জেনারেলরা যদি হত আরও কর্মক্ষম, আর মন্ত্রীরা যদি হত আরও কর্মতৎপর, যদি হাল ধরানো হত মিলিউকভ আর গুচকোভের মতো শাসকদের দিয়ে, তাহলে বিপ্লব ঘটত না।

সারা-রাশিয়ার শেষ সম্রাট ২য় নিকোলাই ছিলেন নির্গুণ আর মাথা-মোটা, সেটা অনস্বীকার্য। ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে পেত্রগ্রাদের গ্যারিসনের সেনাপতিকে 'আগামী কাল রাজধানীতে যাতে সমস্ত গোলযোগ বন্ধ হয়' তার ব্যবস্থা করতে হুকুম দিয়ে তিনি একেবারে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তাতেই বিপ্লব খতম হয়ে যাবে। দজ্জাল এবং বিকারগ্রস্ত জারিনা শ্রমিকদের বিক্ষোভপ্রদর্শনকে বলতেন গুণ্ডা আন্দোলন, তিনি সত্যিই ভেবেছিলেন, আবহাওয়াটা যথেষ্ট ঠাণ্ডা ছিল না বলেই বিপ্লবটা ঘটেছিল। কিন্তু, জনগণের ক্রোধের ঢেউ উঠেছিল বস্তুগতভাবে অধঃপতিত রমানভ বংশের বিরুদ্ধে

* ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগে রাশিয়ার পঞ্জি ইউরোপীয় এবং মার্কিন পঞ্জি থেকে ১৩ দিন পিছনে ছিল। কাজেই, পুরন পঞ্জি অনুসারে, বিপ্লব ঘটেছিল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে — তাই, সেটাকে বলা হয় ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। এই বইয়ে সমস্ত তারিখ দেওয়া হয়েছে নতুন পঞ্জি অনুসারে — কিন্তু, খুব গুরুত্বসম্পন্ন কোন কোন তারিখ দেওয়া হয়েছে উভয় পঞ্জি অনুসারে।

নয়, সেটা উঠেছিল বাতিল হয়ে-যাওয়া সমগ্র স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে। সেটাকে ঠেকিয়ে রাখতে কিংবা বন্ধ করতে পারত না কিছুই।

রাজধানীতে সবচেয়ে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান 'পুতিলোভেৎস' কারখানার একটা কর্মশালার যে-ধর্মঘট দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা কারখানায়, সেটা ছিল গরমকালে শুকনো বনে একটা আগুনের ফুলকি পড়ার মতো। সেই ধর্মঘট আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পেত্রগ্রাদে। ভোলিন্‌স্কি রেজিমেণ্টের সৈন্যরা যখন তাদের সেনাপতিদের হুকুম তামিল করতে নারাজ হয়ে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের এই কাজে প্রতিফলিত হয়েছিল যুদ্ধ আর তার উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের জমে ওঠা ঘৃণা। কাজেই, প্রেওব্রাঝেন্‌স্কি, লিথুয়ানীয় এবং অন্যান্য রেজিমেণ্টের সৈনিকেরাও যে ঐ একই পথ ধরেছিল, সেটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না। পেত্রগ্রাদের রাস্তায়-রাস্তায় এক হয়ে মিশেছিল দুটো ধারা: জারতন্ত্র আর বুর্জোয়াদের খতম করতে দৃঢ়সংকল্প শ্রমিকেরা, এবং সৈনিকেরা, যাদের বেশির ভাগই ছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং ভূমির জন্যে দাবিদার কৃষক।

বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্যুদ্বেগে। রাজধানীর প্রত্যেকটা কারখানাকে চেপে-ধরা ধর্মঘট শ্রমিক এবং সৈনিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হতে আরম্ভ করেছিল।

জারতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে মোটেই হাত গুটিয়ে বসে ছিল না। বিপ্লব দমন করার জন্যে তারা চেষ্টা করেছিল মরিয়া হয়ে। আন্দোলনকে নেতৃত্ববিহীন করার চেষ্টায় ওখ্‌রানা (জারতন্ত্রের গুপ্ত রাজনীতিক পুলিস) কমিউনিস্টদের (বলশেভিক) পেত্রগ্রাদ কমিটিকে গ্রেপ্তার করেছিল। জারের হুকুমে পেত্রগ্রাদ সামরিক এলাকার সেনাপতি জেনারেল খাবালোভ তাঁর সৈন্যদলগুলিকে নামিয়েছিলেন মিছিলকারীদের বিরুদ্ধে। ভিড়ের মধ্যে মেশিনগান

দেগেছিল অফিসারেরা আর সৈনিক-আরক্ষী এবং পর্নলিস ডিট্যাচমেণ্টগর্নলি ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফেলের গর্নলি চালিয়েছিল শ্রমিকদের উপর। পেত্রগ্রাদের রাস্তাগর্নলো রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এ সবই ছিল বৃথা। ১৯১৭ সালে ১২ই মার্চ দিনের শেষাশেষি পেত্রগ্রাদ এসে গেল জনগণের হাতে: স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ হল। সিংহাসনত্যাগের ঘোষণাপত্রে সই দিলেন সম্রাট ২য় নিকোলাই। পদদলিত এবং অধিকারবঞ্চিত রাশিয়ায় অবশেষে মর্নক্তির হাওয়া বইল।

তবে, দেশের সামনেকার জরর্নরী সমস্যাগর্নলো স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদেই মীমাংসা হয়ে গেল না। ১৯১৭ সালের ফেব্রর্নয়ারি বিপ্লবের শেষ নয়; সেটা হল শর্নর্ন। কিন্তু ফেব্রর্নয়ারি বিপ্লব না-হলে অক্টোবর বিপ্লব হত না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে সংগ্রামে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ছিল ইতিহাসের ধারায় একটা অপরিহার্য অন্তর্বর্তী পর্ব।

দ্বৈতক্ষমতা

একটা কারখানার সামনে বড় একটা চত্বর। কাজের সময়কার তেলচিটে জ্যাকেট আর টুপি-পরা শ্রমিকেরা জড়ো হয়ে আলাপ করছে, ঠাট্টা-তামাসা করছে, মার্চ মাসের নরম বরফ পায়ের তলায় চেপে দিচ্ছে মাটির সঙ্গে। কারখানার আপিস থেকে আনা একখানা টেবিল হল উপস্থিতমতো মঞ্চ। একজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সেই টেবিলখানার উপর। সে বলল: 'কমরেডসব, আমরা এখানে জড়ো হয়েছি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে আমাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করার জন্যে, সোভিয়েত হয়ে উঠবে আমাদের বৈপ্লবিক ক্ষমতা।'

১৯৯৭ সালের বসন্তকালে এমন দৃশ্য দেখা যেত দেশের প্রত্যেকটা কারখানায়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়ে এবং তার পরের দিনগুলোতে সর্বত্র গড়া হয়েছিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, আর সামরিক ইউনিট এবং নৌবাহিনীর জাহাজগুলিতে সংগঠিত হয়েছিল সব সৈনিক আর নাবিকদের কমিটি।

বেশির ভাগ শহরে এবং দেশের বহু জেলায় দেখা দিয়েছিল শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকদের নিয়ে গড়া সোভিয়েতগুলি।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঠিক পরে নিষ্পত্তিমূলক ক্ষমতা ছিল সোভিয়েতগুলির হাতে। জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সেগুলিকে সমর্থন করছিল; তাদের মদত দিচ্ছিল বিপ্লবী সৈনিক এবং নাবিকেরা, তাদের সশস্ত্র সহায় ছিল ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির উত্তেজনায় ঠাসা দিনগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকদের লালরক্ষীরা।

১৪ই মার্চ তারিখে পেত্রগ্রাদে শ্রমিক আর সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির প্রথম সম্মিলিত সভায় সৈনিক প্রতিনিধিরা সমষ্টিগতভাবে রচনা করেছিল একটা বৈপ্লবিক গ্যারিসন নির্দেশনামা। '১ নং নির্দেশ' হিসেবে বিখ্যাত এই দলিলে বলা হল, সমস্ত রাজনীতিক কার্যকরণে প্রত্যেকটা সামরিক ইউনিট সোভিয়েত এবং তার কমিটির অধীন, আর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিতে হবে কম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন কমিটিগুলির হাতে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে।

এইভাবে, সোভিয়েতগুলির প্রতিপত্তি ছিল বিপুল, তাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল প্রচুর এবং কার্যকর ক্ষমতা। সোভিয়েতগুলি ছিল শ্রমিক এবং কৃষকদের বৈপ্লবিক একনায়কত্বের যন্ত্র-সংস্থা।

কিন্তু, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে ছিল না। গঠিত হয়েছিল অন্য একটা, সরকারী ক্ষমতা, সেটা দেশে বিদ্যমান থেকে চালু ছিল। এটা ছিল অস্থায়ী সরকার, তার ছিল বহু স্থানীয়

সংস্থা। এটা গঠিত হয়েছিল এইভাবে: রাষ্ট্রীয় দুমা নামে পার্লামেণ্টের অনুরূপ একটা সংস্থা জারের রাশিয়ায় ছিল ১৯০৬ সাল থেকে, তার ছিল বিভিন্ন গণ্ডিবদ্ধ অধিকার। ১৯১২ সালে নির্বাচিত চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমায় ছিল প্রধানত দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর প্রতিনিধিরা। পাঁচ জন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি ছিলেন — ১৯১৪ সালে তাঁদের গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন ঘটল তখন দুমার সদস্যরা দাঁড় করালেন প্রথমে একটা অস্থায়ী কমিটি এবং তারপরে (১৫ই মার্চ তারিখে) একজন প্রকাণ্ড ভূস্বামী প্রিন্স ল্‌ভোভের নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার। সমস্ত মূল পদগুলিতে বসানো হয়েছিল দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টিগুলোর প্রতিনিধিদের, তাদের মধ্যে বড় বড় পুঁজিপতি — যেমন, গুচকোভ, কনোভালভ, তেরেশ্চেঙ্কো। অস্থায়ী সরকারটা কার্যত ছিল বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব। শেষ ফলে, একই সময়ে বিদ্যমান থেকে কাজ চালাতে থাকল দুটো একনায়কত্ব।

ইতিহাসে যত বিপ্লব জানা আছে সেগুলিতে বিভিন্ন একরূপ উপাদানের সঙ্গে থেকেছে স্থান, কাল এবং প্রত্যেকটা দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদানগুলি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বিশেষত্ব। দ্বৈতক্ষমতার উদ্ভব হল ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের একটা বিশেষত্ব।

জারতান্ত্রিক রাজ উচ্ছেদ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে আরম্ভ হয়ে গেল একটা তীব্র রাজনীতিক সংগ্রাম। বিভিন্ন পার্টি এবং সংগঠন তখন প্রকাশ্যে কাজ চালাতে পেরে নিজ নিজ অবস্থান মজবুত করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে মূল পার্টিগুলি ছিল কী কী?

নিয়মতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক পার্টি (কাদেতরা) অর্থপতি এবং শিল্পপতি বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। বুর্জোয়া

বুদ্ধিজীবিসমাজের উপরতলায় এবং ছাত্র তরুণসমাজ আর অফিসারদের একাংশে কাদেতরা প্রভাবশালী ছিল। কাদেত নেতাদের মধ্যে ছিলেন ইতিহাসের প্রফেসর মিলিউকভ, চিকিৎসক শিঙ্গারিওভ এবং প্রথম অস্থায়ী সরকারের প্রধান প্রিন্স ল্ভোভ।

কাদেতের ডাইনে ছিল মস্কোর মস্ত শিল্পপতি গুচকোভের নেতৃত্বে চালিত অক্টোবরিস্ট পার্টি। বুর্জোয়া-বনা ভূস্বামী এবং বড় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সপক্ষে ছিল এই অক্টোবরিস্টরা। কাদেতরাও এবং অক্টোবরিস্টরাও জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিল, তারা আট-ঘণ্টার কাজের দিন এবং কৃষকদের কাছে ভূমি হস্তান্তরের সক্রিয় বিরোধিতা করত।

খুবই সক্রিয় ছিল দুটো পেটি-বুর্জোয়া পার্টি — সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা (মেনশেভিকরা) এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা। মেনশেভিকদের সমর্থন করত বুদ্ধিজীবীদের একাংশ (আপিস কর্মচারীরা আর শিক্ষকেরা) এবং শ্রমিকদের একটা ক্ষুদ্রাংশ (মুখ্যত বিশেষ-সুবিধাভোগী উপরতলার শ্রমিকেরা)। মেনশেভিকদের ভিতরে ছিল প্লেখানভ, মার্তভ, দান্, চ্খেইদ্জে, সেরেতেলি এবং অন্যান্যের পরিচালিত বিভিন্ন গ্রুপ আর ধারা। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরাও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের সমর্থন পেত, কিন্তু তারা নিজেদের বলত 'কৃষকদের' পার্টি, তারা বিশেষত সক্রিয় ছিল গ্রামাঞ্চলে, সেখানে তাদের প্রধান সমর্থক ছিল গ্রামীণ বুর্জোয়ারা (কুলাকরা)। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পাঁচমিশালী অবস্থার দরুন তারা নানা গ্রুপ বেঁধেছিল, সেগুলি পরে বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্বতন্ত্র পার্টি গড়েছিল। দক্ষিণপন্থী এবং মধ্যবর্তীদের নেতা ছিলেন আভ্ক্সেন্তিয়েভ, চের্নোভ, গোৎস্ আর মাস্লভ। বামপন্থী অংশে ছিলেন স্পিরিদোনভা, কারেলিন এবং অন্যান্যেরা।

মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে জাহির করলেও আসলে তারা ছিল বুর্জোয়া

ক্ষমতার প্রধান অবলম্বন। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, তাদের বুঝিয়ে সমঝানো ছিল তাদের লক্ষ্য (তাই তাদের নাম হয়েছিল সমঝোতাওয়ালা)। তারা মনে করত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তারা বুর্জোয়া-পার্লামেণ্টারী ধারায় জাতীয় উন্নয়নের ওকালতি করত।

একমাত্র সংগতিপূর্ণ বৈপ্লবিক পার্টি ছিল কমিউনিস্টদের (বলশেভিকদের) পার্টি। ১৯১৭ সালে এর যথাবিধি নাম ছিল রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি (বলশেভিকরা), সংক্ষেপে রা. সো. ডে. শ্র. পা. (ব)। বলশেভিক পার্টি ঘোষণা করেছিল এইসব লক্ষ্য: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন করা; প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা; এবং কমিউনিস্ট সমাজের চূড়ান্ত জয়ের জন্যে সংগ্রাম। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি রা. সো. ডে. শ্র. পা. (ব) সমস্ত মেহনতী মানুষের স্বার্থের সপক্ষে এবং তার জন্যে লড়াই চালাত, কেননা শ্রমিক শ্রেণীই সমস্ত নিপীড়িত আর শোষিত মানুষের নেতা।

বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রী ভাগটা ছিল পাকাপোক্ত কারখানা শ্রমিকদের নিয়ে (১৯১৭ সালে পার্টির সদস্যশ্রেণীতে শতকরা ৬০ জন ছিল এমন শ্রমিক)। বৈপ্লবিক বুদ্ধিজীবিসমাজ এবং গরিব কৃষককুলের বহু প্রতিনিধিও পার্টিতে ছিল।

পার্টির সর্বজনীনভাবে মান্য নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন (উলিয়ানভ)।

ভলগার একটা ছোট শহর সিমবির্স্কের (এখন উলিয়ানভস্ক) এক শিক্ষকের ছেলে লেনিন তরুণ বয়সের গোড়া থেকেই মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্য-সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর উপর জার সরকারের নির্যাতন চলত প্রায়ই, তাঁর জীবনের বহু বছর কেটেছিল জেলে আর নির্বাসনে। লেনিন ছিলেন মহামতি তত্ত্ববিৎ, — মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশ ঘটিয়ে তিনি সেটাকে

প্রয়োগ করেছিলেন নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায়, যেটা দেখা দিয়েছিল পুঁজিতন্ত্র তার সমাপ্তি পর্ব সাম্রাজ্যবাদে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহিমময় মূলকৌশলবিজ্ঞানী। তত্ত্ববিৎ হিসেবে লেনিনের অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বিপুল কর্মশক্তি, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং কার্যক্ষেত্রের নেতার যথাযথতা, বিপ্লবীর তেজোগর্ভ আবেগ, আর মহান চিন্তাবীরের প্রজ্ঞা।

রাশিয়ার মেহনতী জনগণের মুক্তির জন্যে সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন লেনিন। ইতিহাসের একটা নিষ্পত্তিমূলক সন্ধিক্ষণে শ্রমিক শ্রেণী এবং সমস্ত নিপীড়িত তাঁর মধ্যে পেয়েছিল এক মহান নেতাকে।

পার্টির নেতাদের মধ্যে ছিলেন অভিজ্ঞ বিপ্লবীরা, তাঁরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বহু বছর যাবত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিলেন।

সবচেয়ে বিশিষ্ট একজন পার্টি নেতা ছিলেন ইয়াকভ স্ভের্দলভ, — লেনিন বলেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করতে এবং তার জয় নিশ্চিত করতে এই প্রলেতারীয় নেতার অবদান সর্বাধিক।

পোল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর বিশিষ্ট সুসন্তান ফেলিক্স দ্জেরজিন্স্কি বিপ্লবের একজন যথার্থ নাইট বলে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার কর্মযজ্ঞে নিয়োগ করেছিলেন নিজের সমগ্র আবেগ এবং বিশিষ্ট প্রতিভা।

পেত্রগ্রাদের শ্রমিকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন ছোট্ট ছুঁচল দাড়িওয়ালা, ইস্পাতের ফ্রেমের চশমা-পরা, সৌজন্যপূর্ণ হাবভাবের একটু বেঁটে একজন। তিনি হলেন মিখাইল কালিনিন, — ত্ভের গুবের্নিয়ার এই কৃষক পরে শ্রমিক এবং পেশাদার বিপ্লবী হয়ে সর্বদাই থাকতেন একেবারে জনগণের মাঝখানে।

১৯১৭ সালে ৩৪ বছর বয়সের আন্দ্রেই বুবনভ সেই তখনই ছিলেন একজন 'পুরন' কমিউনিস্ট, তিনি পার্টি সদস্য হয়েছিলেন তার ১৪ বছর আগে। ঐ বছরগুলিতে তিনি পার্টি কাজে আত্মনিয়োজিত ছিলেন ইভানভোভোজনেসেন্স্কে আর মস্কোয়, নিজ্নি নভগোরদে আর পিটার্সবুর্গে, সামারায় এবং অন্যান্য শহরে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে পার্টি নেতৃত্বে ক্রমাগত অধিকতর লক্ষণীয় ভূমিকায় এসেছিলেন ইয়োসিফ স্তালিন।

পার্টির দু'জন অক্লান্ত কর্মী ছিলেন তেজোগর্ভ বক্তা, অফুরন্ত কর্মশক্তিমান সের্গেই কিরভ এবং অতি চমৎকার সংগঠক ভালেরিয়ান কুইবিশেভ।

পাতলা সুন্দর মুখখানি, তার উপর কোঁকড়া-চুলওয়ালা জমকানো মাথা, এমনি একজন তরুণ বিপ্লবীর বিভিন্ন ফোটো থাকত জারের পুলিসের মহাফেজখানায় — ইনি হলেন গ্রিগোরি ওর্জোনিকিদ্জে (সের্গো), তিনি জেলখানা আর নির্বাসনের জীবনের ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্বন্ধে বিশ্বাসটিকে বজায় রেখেছিলেন; লড়াইয়ের আগুনে পোড় খেয়ে মজবুত হয়ে উঠেছিল এই বলশেভিকের ইচ্ছাশক্তি।

বিশিষ্ট পার্টি কর্মীদের মধ্যে ছিলেন নির্ভীক নারী বিপ্লবীরা — আলেক্সান্দ্রা কল্লন্তাই, নাদেজ্দা ক্রুপস্কায়া, রোজালিয়া জেম্লিয়াচ্কা, ইয়েলেনা স্তাসোভা এবং অন্যান্য।

জনস্বার্থের প্রবল প্রবক্তা এবং ট্র্যান্স-ককেশিয়ার শ্রমিকদের প্রিয় স্তেপান শাউমিয়ান; ধাতু-শ্রমিক এবং চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার সদস্য গ্রিগোরি পেত্রভ্স্কি; লেদ অপারেটর স্তানিস্লাভ কোসিওর; প্রাবন্ধিক মিখাইল ওলমিনস্কি; বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইতিহাসবেত্তা এবং অর্থনীতিবিদ ইভান স্কভর্ৎসভ-স্তেপানভ; প্রবীণ পার্টি কর্মী পিয়ৎর স্মিদোভিচ এবং ইয়েমেলিয়ান ইয়ারোস্লাভস্কি — এঁরা
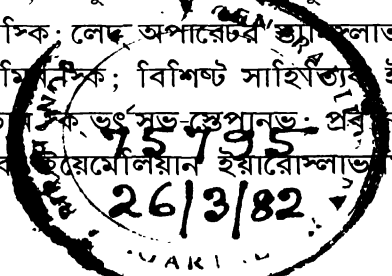
ছিলেন রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) প্রধান প্রধান সদস্যদের মধ্যে কয়েক জন মাত্র।

কিছু অতিশয়োক্তি হয়ে যেতে পারে এমন কোন দ্বিধা ছাড়াই বলা যায়, যুগের মহান চিন্তাবীর, চমৎকার সংগঠক এবং সাহসী আর দূরদর্শী মানুষের বিশিষ্টতমদের এমন চমৎকার সমাবেশ আগে আর কখনও কোন দেশে ঘটে নি।

রা. সো. ডে. শ্র. পা. (ব)-র নেতৃত্বে এমন কেউ-কেউও ছিলেন যাঁরা তখনই দোদুল্যমান হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগুরুর নির্দিষ্ট কর্মধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন — তাঁরা ছিলেন জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, রিকভ এবং অন্যান্য। তাঁরা পরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদের পরে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার পরবর্তী বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলিতে স্পষ্ট এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল। এই মতাবস্থান তুলে ধরা হয়েছিল লেনিনের বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিসে', সেটা ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে সারা-রাশিয়া পার্টি সম্মেলনে আদ্যোপান্ত আলোচিত এবং অনুমোদিত হয়েছিল।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবটাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করাই ছিল প্রধান মূলকৌশলগত করণীয় কাজ। কাজটা ছিল ষোল-আনাই বাস্তবতাসম্মত এবং সময়োচিত। মার্কসবাদকে বিকশিত করে তুলতে গিয়ে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে নিজস্ব তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দেখালেন, জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত পূর্বশর্তই সাম্রাজ্যবাদের যুগে দেখা দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ হল 'ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র', 'সাম্রাজ্যবাদ হল প্রলেতারিয়েতের সমাজ-বিপ্লবের প্রাক্কাল', তাই লিখলেন লেনিন। তিনি আরও দেখিয়ে

দিলেন যে, বিভিন্ন দেশের ক্রমবর্ধমান অসম আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক বিকাশের দরুন প্রথমে একটিমাত্র কিংবা কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয় খুবই সম্ভবপর। একটা দেশে যদি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেই দেশের প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা দখল এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ বিকশিত করাবার জন্যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং তা তার করাই চাই। এইভাবে ঐ প্রলেতারিয়েত সমস্ত দেশের বিপ্লবীদের মস্ত আনুকূল্য করবে।

ঘটনাবলির ধারা এমনই ছিল যাতে প্রথমে রাশিয়াই সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্ট করতে পারল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের জন্যে আবশ্যক সমস্ত অবস্থাই রাশিয়ায় ছিল। একমাত্র এইরকমের বিপ্লবই তখন দেশের জীবনের বুনিয়াদী দ্বন্দ্বগুলোর নিরসন করতে পারে। শ্রমিক শ্রেণী আর গরিব কৃষককুলকে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত করবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব; মেহনতী কৃষককে দেবে ভূমি আর মুক্তি; এই বিপ্লবের ফলে নিপীড়িত জাতিগুলি মুক্তি পাবে; জনগণের অতি ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ হবে। এইভাবে, রাশিয়ার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি।

অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে যথাযথ মূল্যায়ন করে কমিউনিস্ট পার্টি দেখাল সেটা পুঁজিতান্ত্রিক সরকার; যুদ্ধটা তখনও ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, এটা দেখিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যায্য এবং গণতন্ত্রসম্মত শান্তিস্থাপনের জন্যে আহ্বান জানাল।

আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মেহনতী জনগণের অবস্থার উন্নতি এবং শোষকদের অবস্থানগুলোকে দুর্বল করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি কতকগুলি ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরল। সেগুলির মধ্যে ছিল— বড় বড় জমিদারিগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে ভূমির রাষ্ট্রীয়করণ; সমস্ত ব্যাঙ্কে একটা রাষ্ট্রীয় (স্টেট) ব্যাঙ্কে এক করে তার উপর

শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন; উৎপাদন এবং খাদ্যাদি বণ্টনের উপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

দ্বৈতক্ষমতার বিশেষ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি স্লোগান তুলল: 'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!' পরিস্থিতিতে একটা জটিলতা ছিল: কতকগুলো কারণে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে প্রথম ক'মাসে বেশির ভাগ সোভিয়েতের পরিচালনায় ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর মেনশেভিকরা, তারা সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে দেবার বিরোধী ছিল এবং সমর্থন করল অস্থায়ী সরকারকে। তবু, সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলিতে দেবার দাবি নিয়ে বলশেভিকরা তখনও এগিয়ে চলল; তারা মনে করত, তার ফলে সৃষ্টি হবে একটা নতুন ধরনের রাষ্ট্র — সে-রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে। একমাত্র সোভিয়েতগুলির ভিত্তিতে গড়া সরকারই জনগণের দাবি মেটাতে পারত, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারত।

এটা ছিল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের কর্মসূচি, — রাশিয়ায় ঘটনাবলির বিশেষ-নির্দিষ্ট ধারায় সেটা সম্ভাবনীয় হয়ে উঠেছিল। অস্থায়ী সরকার ছিল দুর্বল; সোভিয়েতগুলির হাতে ছিল নিষ্পত্তিমূলক ক্ষমতা, সেগুলির প্রতি সমর্থন ছিল জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের। ক্ষমতাদখল করার উদ্ঘোষণাটাই শুধু তাদের করার ছিল; তাদের বিরোধিতা করার শক্তি ছিল না কারও। কাজেই, সেই সময়ে কমিউনিস্টরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান কিংবা অস্থায়ী সরকারের অবিলম্ব উচ্ছেদের জন্যে ডাক দেয় নি। সোভিয়েতগুলির সমর্থিত একটা সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্যে আহ্বান জানানো উচিত ছিল না। সোভিয়েতগুলির সেই সমর্থন প্রত্যাহার করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেওয়াটাই ছিল আবশ্যক।

সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা নিলে সেগুলির সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর মেনশেভিক নেতৃত্ব আর ছদ্মবেশ পরে

প্রতিশ্রুতির আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারত না। জনগণ সেক্ষেত্রে বলত: 'ক্ষমতা তো পেয়েছ, এবার প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করো।' কিন্তু, মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা জনগণকে শান্তি, ভূমি আর রুটি দিতে চায় নি, কাজ করার সময় এলে তাদের নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করতেই হত। জনগণ তখন মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের আসল ভূমিকার মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়ে যেত; জনগণ তখন মোহ ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিতভাবে বুঝত যে, জনগণের দাবিগুলো মেটাতে সক্ষম একমাত্র বলশেভিক পার্টিই। জনগণ তখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে, সোভিয়েতগুলির গণতান্ত্রিক সংগঠনের মারফত বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তুলে সোভিয়েত থেকে মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পদচ্যুত করে নেতৃত্ব তুলে দিত বলশেভিকদের হাতে। বিপ্লবের মূল স্লোগান হয়ে উঠেছিল: 'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!'

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে গতিবেগ সঞ্চার

১৯১৭ সালের বসন্তে আর গ্রীষ্মে রাশিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলন বেড়েছিল দ্রুত, সতেজে।

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে দেশের মেহনতী জনগণ লড়ছিল শান্তি, ভূমি, রুটি আর মুক্তির জন্যে। বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার জনগণের এইসব দাবি পূরণ করছিল না; তা পূরণ করার কোন অভিপ্রায়ও তাদের ছিল না, পূরণ করতে তারা ছিল অপারগ — কেননা, সে-সরকার প্রকাশ এবং রক্ষা করছিল জনগণের স্বার্থ নয়, বুর্জোয়া আর ভূস্বামীদের স্বার্থ।

যুদ্ধ চলতে থাকল। বিপ্লবের ফলগুলিকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার স্লোগান তুলল অস্থায়ী সরকার। কিন্তু, তার

ফলে সেটা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ হয়ে উঠল না; যুদ্ধটা তখনও রইল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যা চালানো হচ্ছিল ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের স্বার্থে এবং নতুন নতুন দেশ গ্রাস করার জন্যে, বিভিন্ন জাতিকে দাস বানাবার জন্যে। 'জয়যুক্ত পরিসমাপ্তি অবধি যুদ্ধ!', এই পুরন স্লোগান তুলে অস্থায়ী সরকার জনগণের আশা ধূলিসাৎ করে দিল।

জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল কৃষক — তারা জমিদারিগুলোকে তাদের হাতে দেবার দাবি তুলল। অস্থায়ী সরকার এমনসব দাবিতে কর্ণপাত করতে চাইল না — কেননা, কৃষককে ভূমি দিতে হলে তো সেটা ভূস্বামীদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হয়। তালুকগুলোর বেশির ভাগই তখন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাংকগুলোর কাছে বন্ধক ছিল — ফলে, কৃষককে ভূমি দিলে সেটা হত পুঁজিপতিদের উপর আঘাত। নতুন মন্ত্রীরা প্রকাশ করত ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদেরই ইচ্ছা — তাদের কী করে 'ব্যথা দিতে' পারত ঐ মন্ত্রীরা?

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করার জন্যে অস্থায়ী সরকার কিছুই করল না। আট-ঘণ্টার কাজের দিন, মজুরিবৃদ্ধি এবং কাজের অবস্থা উন্নত করায় তারা বাধা দিল। অন্যদিকে, বুর্জোয়াদের তারা দিল সমস্ত রকমের সমর্থন।

খাদ্য সংকট হল গভীরতর। শহরগুলোতে রুটির যোগান অনিয়মিত হয়ে পড়ল। খাদ্যসামগ্রীর দাম হতে থাকল আকাশচুম্বী।

জাতি-সংক্রান্ত সমস্যারও কোন সমাধান করা হচ্ছিল না। অ-রুশ জাতিগুলির কোটি কোটি মানুষের তখনও কোন অধিকার ছিল না। সরকার অনুসরণ করছিল মূলত জারতন্ত্রের ঔপনিবেশিক কর্মনীতিই, জারতান্ত্রিক নিপীড়নযন্ত্রটাকে তারা একেবারে অক্ষতই রেখেছিল।

বিপ্লব সমাধা করেছিল জনগণ — তাদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছিল। দেশের সামনেকার সমস্যাগুলোর সমাধান করছিল না বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যে-সরকার ক্ষমতায় এসেছিল সেটা ছিল মেহনতী জনগণের পক্ষে বিজাতীয়, সে-সরকার দেশকে নিয়ে যাচ্ছিল সামাজিক প্রগতির দিকে নয়, নিয়ে যাচ্ছিল যুদ্ধ, ধ্বংস আর ভুখার পথ ধরে অনিবার্য জাতীয় বিপর্যয়ের দিকে।

এর ফলে দেশের সর্বত্র জনগণ কর্মতৎপর হয়ে উঠল। ফ্রণ্টে, যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদভাগে, শিল্পকেন্দ্রগুলিতে আর দূরদূরান্তরের গ্রামগুলিতেও, রাজধানীতে আর সুদূর উপান্তগুলিতে — সর্বত্র বেড়ে উঠল বিপ্লব।

বিপদাশংকা প্রকাশ করে দেশের সমস্ত জায়গা থেকে অস্থায়ী সরকারের কাছে তার পেঁছিতে থাকল। তার আসতে থাকল বিভিন্ন জায়গা থেকে, কিন্তু সেগুলির মর্মবস্তু ছিল সব সময়ে একই: সেগুলিতে থাকত ভূমির জন্যে কৃষকদের লড়াইয়ের কথা, আর ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের কথা।

কুর্স্ক গুবের্নিয়ায় কৃষকেরা 'আক্রমণ চালাল' আলেক্সান্দ্রোভ্‌খা জমিদারিতে; রিয়াজান গুবের্নিয়ায় কৃষকেরা প্রিন্স ত্রুবেৎস্কোই'এর জমিদারি দখল করে সেটাকে নিজেরাই চালাতে থাকল; একটা জমিদারি পুড়িয়ে দেওয়া হল তুলা গুবের্নিয়ায়; অন্যান্য জায়গায় কৃষকেরা ভূস্বামীদের জমিতে নিজেরা চাষ দিল, তৃণভূমিগুলো থেকে ঘাস কেটে নিল, বনের গাছ কেটে নিল। এইরকমের সব খবর পেত্রগ্রাদে আসতে থাকল প্রতিদিন।

গণ-কৃষক আন্দোলন মার্চ মাসে আরম্ভ হয়ে প্রতিমাসেই বেড়ে চলেছিল। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে ৬৯টা গুবের্নিয়ার ৪৩টা পড়েছিল কৃষক অভ্যুত্থানের আবর্তে।

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আর কৃষকের ফৌজ ছিল বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটা সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন অংশ। সৈনিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ

অংশই ছিল কৃষককুলের মানুষ; তারা স্বভাবতই ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রামের প্রতি দরদী হয়ে ভূমি সমস্যার অবিলম্ব সমাধান দাবি করল।

যুদ্ধটা ছিল আত্মরক্ষামূলক, এমন যেকোন মোহ সৈনিকদের থেকে থাকলে, কঠোর বাস্তবতার মধ্যে সৈনিকেরা বাধ্য হয়ে তা বর্জন করল। তারা ক্রমেই আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারল এই যুদ্ধের আসল প্রকৃতিটা কী।

১৯১৭ সালে মে মাসে ফ্রন্টের সেনাপতিদের একটা বৈঠক হয়েছিল -- সেখানে তারা সর্বসম্মতিক্রমে বলেছিল, সৈনিকেরা *লড়তে চায় না, তারা ভাবে শুধু শান্তি আর জমির কথা।* তখনকার দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পরিচালক জেনারেল ব্রুসিলভ বলেছিলেন, তাঁর একটা রেজিমেণ্ট আক্রমণ চালাতে নারাজ হলে তিনি তাদের ভজাবার জন্যে বহু সময় ধরে কত চেষ্টা করেছিলেন, শেষে সৈনিকেরা জানিয়েছিল তিনি লিখিত জবাব পাবেন। কয়েক মিনিট পরেই তিনি একখানা প্লাকার্ডে লেখা দেখলেন: 'যেমন করে হোক শান্তি চাই। যুদ্ধ নিপাত যাক!'

ফৌজে বলশেভিকদের প্রভাব বাড়তে থাকল প্রতিদিনই। ১৯১৭ সালের জুন মাস নাগাত রা. সো. ডে. শ্র. পা. (ব)-তে যোগ দিয়েছিল ২৬,০০০ সৈনিক আর জুনিয়র অফিসার।

অ-রুশ জাতিগুলির মেহনতী জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতা চলছিল ইতোমধ্যে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা সেই ক্রিয়াকলাপকে নিজেদের মতলবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল, তা ঠিক। মেহনতী জনগণ এবং রুশী প্রলেতারিয়েতের মধ্যে আরও বেশি ঐক্য প্রতিহত করার জন্যে তারা জাতিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা জাতীয় সমতা আর মুক্তির প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানালেও, বিপ্লবকে ঘৃণা করে তারা রুশী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বাঁধতে

সচেষ্ট হয়েছিল। নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে কমিউনিস্টরা তাদের কাজ প্রবলতর করে তুলল, তাদের এক করতে থাকল আন্তর্জাতিকতার পতাকাতলে, তাদের সাহায্য করল রুশী আর স্থানীয় শোষকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের জাতীয় আর সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে। জাতিগুলির পৃথক হয়ে গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার অধিকারটাকে তুলে ধরল বলশেভিক পার্টি। এই অধিকার মেনে নেবার ফলে জাতিগুলির অনৈক্য ঘটল না — বরং তার উল্টো, তাদের সংহতি আরও জোরদার করার, তাদের মধ্যে গণতন্ত্রসম্মত আর স্বেচ্ছামূলক সম্প্রীতি স্থাপনের এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামে মেহনতী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে সেটা সহায়ক হল।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে নেতৃত্বের শক্তি ছিল রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত। শ্রমিকেরা জবরদস্ত ধর্মঘটের লড়াই চালাল পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে; সমস্ত রাজনীতিক কার্যকরণের সামনের সারিতে থাকত তারাই; নিজেদের বৈপ্লবিক আবেগ, কর্মশক্তি আর উদ্যম দিয়ে তারা কৃষক আর সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করল; আর নিজেদের সংগঠন আর সংসক্তি তারা বাড়িয়ে চলল অবিরাম।

১৯১৭ সালের মে মাসে ধর্মঘট চলল দেশের সর্বত্র: শ্রমিকেরা দাবি করল মজুরিবৃদ্ধি এবং কাজের উন্নততর অবস্থা। জুন মাসে ধর্মঘটের সংখ্যা আরও বাড়ল। ধর্মঘট করল ভলগার ধারে সর্মোভো কারখানার ২০, ০০০ শ্রমিক। তারপরে এল মস্কো আর মস্কো বিভাগের ধাতু-শ্রমিকদের ধর্মঘট। প্রচণ্ড-প্রচণ্ড শ্রেণীগত লড়াই বাধল দনেৎস অববাহিকায় আর বাকুতে; উরাল অঞ্চলে ধর্মঘট সংগ্রাম বাড়তে থাকল; ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তি নিয়ে সংগ্রামে যোগ দিল মস্কো আর পেত্রগ্রাদের রেল-শ্রমিকেরা।

বুর্জোয়ারা জবরদস্ত পাল্টা-প্রতিরোধ চালাল; তারা শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন অধিকার লঙ্ঘন করল, ক্রমাগত অধিকতর

আর্থনীতিক চাপ দিতে থাকল। প্রলেতারিয়েতকে লণ্ডভণ্ড করতে এবং তাদের বৈপ্লবিক সংকল্প দুর্বল করে ফেলতে তারা চেষ্টা করতে থাকল। ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে শ্রমিক মহল্লাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল অশুভ 'লকআউট' শব্দটা: পুঁজিপতিরা নিজেদের কারখানাগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের পথে দাঁড় করিয়ে দিতে আরম্ভ করল।

কারখানা বন্ধ হল মে মাসে ১০৮টা, জুন মাসে ১২৫টা, জুলাই মাসে ২০৬টা। বেকার হল পঁচানব্বই হাজার শ্রমিক। বুর্জোয়াদের মতলবটা প্রকাশ্যে এবং বিদ্বেষপরায়ণ রূঢ় রূপে প্রকাশ পেল বৃহৎ শিল্পপতি রিয়াবুশিন্স্কির একটা বিবৃতিতে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন, সময় আসবে যখন 'ভুখা আর দারিদ্র্য-দশার অস্থিসার হাতখানা জনগণবন্ধুদের, নানা কমিটি আর সোভিয়েতের সদস্যদের গলা টিপে ধরবে'।

এই অবস্থায় শ্রমিক আর পুঁজিপতিদের মধ্যে সংগ্রাম ক্রমাগত তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকল।

শ্রমিকরা লড়েছিল আর্থনীতিক ফ্রন্টেই শুধু নয়; তারা তুলেছিল বিভিন্ন রাজনীতিক দাবি, তারা সোভিয়েতগুলির কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করত, সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেবার স্লোগানটিকে তুলে ধরত।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন এবং সংহতি উন্নততর করতে তাৎপর্যসম্পন্ন সহায় হয়েছিল কারখানা কমিটিগুলির স্থাপনা। বিভিন্ন কলে-কারখানায় শ্রমিকদের নির্বাচিত এইসব কমিটি উৎপাদন এবং শ্রমিকদের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত দিকের ভার নিত। তারা সোভিয়েতগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করত, সরবরাহ সমস্যার বন্দোবস্ত করত, ৮-ঘণ্টার কাজের দিন চালু করার ব্যবস্থা করত এবং প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত।

কারখানাগুলোর চত্বরে, ফাঁকা ভূমিখণ্ডে আর চুপচাপ সব পাশ-রাস্তায় শোনা যেত সামরিক নির্দেশের আওয়াজ, আর শাদা পোশাক পরা দলে-দলে লোককে দেখা যেত রাইফেল এবং পিস্তল নিয়ে প্লেটুনের বিন্যাসে কুচকাওয়াজ করতে। এগুলি ছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়ে সংগঠিত লালরক্ষী ইউনিট — ঐ ছিল তাদের ট্রেনিং। ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে আর শরতে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল: শ্রমিক শ্রেণী অস্ত্র হাতে নিল, তারা সেগুলি ব্যবহার করতে শিখতে থাকল — সামনে যেসব নিষ্পত্তিমূলক লড়াই আসছিল তার প্রস্তুতি হিসেবে।

অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে জনগণের অসন্তোষ এবং ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে অনিবার্যভাবেই দেখা দিল একটার পরে একটা রাজনীতিক সংকট।

১লা মে (১৮ই এপ্রিল) তারিখে আরম্ভ হয়েছিল প্রথম রাজনীতিক সংকট, সেটাকে বলা হয় এপ্রিল সংকট, তখন পেত্রগ্রাদের শ্রমিক এবং সৈনিকেরা জানতে পেয়েছিল যে, চূড়ান্ত জয় অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সরকারের সংকল্প ঘোষণা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিউকভ একখানা নোটে সই দিয়েছিলেন। লাখ-খানেক শ্রমিক আর সৈনিক রাস্তায়-রাস্তায় বেরিয়ে মিলিউকভের পদত্যাগ দাবি করেছিল।

রাশিয়ার অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ মিছিল থেকেও অস্থায়ী সরকারের কর্মনীতিগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছিল জনগণের অসন্তোষ। তবে, এটাও ঠিক যে, সমস্যাটা যে অমুক কিংবা অমুক ব্যক্তির সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়, সেটা যে সরকারের শ্রেণী-চরিত্র নিয়েই, — যেসব সৈনিক মিলিউকভের পদত্যাগ দাবি করেছিল তাদের অনেকেই এটা বোঝে নি।

সেই সময়ে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সহজেই নিজের হাতে ক্ষমতা নিতে পারত। কিন্তু, মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি

নেতৃত্ব সে-সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে সরকারকে সমর্থন করার জন্যে তাতে নিজেদের প্রতিনিধিদের পাঠাল।

সরকার পুনর্গঠিত হল। প্রধানমন্ত্রী ল্ভোভের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে থাকলেন কয়েক জন মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি: সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি কেরেন্স্কি হলেন যুদ্ধ এবং নৌবাহিনীর মন্ত্রী; কৃষি-মন্ত্রী করা হল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি চের্নোভকে; মেনশেভিক স্কবেলেভ হলেন শ্রম-মন্ত্রী, কিন্তু, এইসব নতুন নিয়োগের ফলে বদলাল না কিছুই। মিলিউকভ এবং গুচকোভ বিদায় হলেন, কিন্তু সরকারের কর্মনীতি রয়ে গেল সেই একই। পুঁজিতন্ত্রী মন্ত্রীদের কর্মনীতি ধরল 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীরা।

বলশেভিকরা বলল: 'সংকটের কারণগুলো দূর হয় নি, এমনসব সংকটের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য।'*

দু'মাস কাটতে-না-কাটতেই দেখা দিল আরও একটা রাজনীতিক সংকট, সেটা আরও বড় এবং আরও বেশি বিপদসঙ্কুল।

১৮ই জুন তারিখে পেত্রগ্রাদে শ্রমিক আর সৈনিকদের একটা বিশাল মিছিল হল। তাতে অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ৫,০০,০০০ মানুষ। বৈপ্লবিক রাশিয়ার রাজধানী এমনটা আগে আর কখনও দেখে নি। শহরের সমস্ত মহল্লা থেকে সারি সারি মিছিলের মানুষ এসে মিশতে থাকল কেন্দ্রে, তার শেষ ছিল না, তাদের মাথার উপর উড়ছিল অসংখ্য লাল পতাকা, সেগুলিতে নানা বলশেভিক স্লোগান। এমনকি, মেনশেভিক সংবাদপত্র 'নভায়া জিজ্ন' ('নতুন জীবন') স্বীকার করেছিল: 'রবিবারের মিছিলে প্রকটিত হয়েছে পেত্রগ্রাদের প্রলেতারিয়েত এবং গ্যারিসনের মধ্যে ''বলশেভিকবাদের'' ষোল-আনা বিজয়।'

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি,** ২৪তম খণ্ড, ২১০ পৃঃ [এখানে এবং পরে খণ্ড আর পৃষ্ঠার সংখ্যা দেওয়া হল ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে — সম্পাঃ]।

পেত্রগ্রাদের শ্রমজীবী জনগণের সমর্থনে আবারও ঘটল মস্কো, কিয়েভ, ত্‌ভের, মিন্‌স্ক, ভরোনেজ, তম্‌স্ক এবং আরও অনেক শহরের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা।

জনগণের সমর্থন পেতে অপারগ হয়ে অস্থায়ী সরকার আবার গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হল। সবকিছু থেকেই দেখা যেতে থাকল, দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন বেড়েই চলছিল, জনগণের জরুরী দাবি ছিল বিভিন্ন মূলগত রাজনীতিক আর আর্থনীতিক পরিবর্তন। একমাত্র সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েই ঐসব পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল।

কিন্তু, সোভিয়েতগুলিকে অস্থায়ী সরকারের তাঁবে রাখার কর্মধারাই মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা চালাতে থাকল। প্রথম সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি চলেছিল প্রায় সারা জুন মাস ধরে। এই কংগ্রেসে এক হাজারের বেশি প্রতিনিধি ছিল দেশের শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক সোভিয়েতগুলির তরফে। এই কংগ্রেসের ক্ষমতা হাতে নেওয়া ঠেকাতে পারে, এমন কিছুই ছিল না। কিন্তু, এই কংগ্রেসে, যেমন বেশির ভাগ স্থানীয় সোভিয়েতে, প্রাধান্য ছিল মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের। ক্ষমতা-দখলের প্রস্তাবটিকে এই কংগ্রেস বাতিল করে দিল।

দ্বৈতক্ষমতায় যে-অস্থিত শক্তিসাম্য ঘটেছিল সেটা আর বেশি কাল চলা সম্ভব ছিল না। একটা নতুন বিস্ফোরণ ছিল অবশ্যম্ভাবী।

সেটা ঘটল ১৬ই — ১৭ই জুলাই, — পেত্রগ্রাদের শ্রমিক আর সৈনিকেরা রাস্তায় নেমে সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার দাবি জানাল। ১৭ই জুলাই মিছিলে শামিল হল পাঁচ লাখের বেশি শ্রমিক, সৈনিক আর নাবিক। মেহনতী মানুষের শান্তিপূর্ণ, সুসংগঠিত দলগুলি শহরের ভিতর দিয়ে চলল তাউরিদা প্রাসাদের

দিকে, সেখানে অবস্থিত ছিল শ্রমিক আর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।

কিন্তু, সরকার শান্তিপূর্ণ পরিণতি চায় নি। বৈপ্লবিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এবং ব্যাপক আক্রমণ চালাবার অজুহাত হিসেবে এই মিছিলটাকে ব্যবহার করতে মনস্থ করল। মন্ত্রীদের সঙ্গে ষোল-আনা একমত হয়ে কাজ করল মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতারা।

গুলির আওয়াজে সহসা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াটা: মিছিলের মানুষের উপর রাইফেল আর মেশিনগানের আগুন ঢালল ক্যাডেট আর কসাকেরা। সরকার সন্ধ্যা নাগাত মিছিলকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত সৈন্যদলগুলিকে নামাল, তাদের সঙ্গে কামানগুলো। শান্তিপূর্ণ মিছিলটি দমিত হল।

সাফল্যটাকে পোক্ত করার জন্যে প্রতিবিপ্লব তৎপর হয়ে উঠল। পেত্রগ্রাদের রাস্তায়-রাস্তায় আহতদের কাতরানি তখনও থামে নি — আরম্ভ হয়ে গেল প্রতিবৈপ্লবিক হানাদারি। প্রধান আঘাতটা চলল বলশেভিক পার্টির উপর। কেন্দ্রীয় বলশেভিক সংবাদপত্র 'প্রাভ্দার' সম্পাদকীয় দপ্তরে হানা পড়ল, তেমনি বহু বলশেভিক কমিটির এবং ট্রেড ইউনিয়নেরও উপর। জুলাইয়ের মিছিলে যেসব সামরিক ইউনিট শামিল হয়েছিল সেগুলিকে ভেঙে দেওয়া হল। সরকার ফ্রণ্টে মৃত্যুদণ্ড চালু করল।

লেনিন এবং অন্যান্য বলশেভিকদের গ্রেপ্তার এবং বিচার করার জন্যে সরকার একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল ২০এ জুলাই তারিখে। বিচারের আগেই লেনিনকে শেষ করে দেবার মতলব ছিল, তার দলিলী প্রমাণ আছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে লেনিন আত্মগোপন করলেন। গোপনে পেত্রগ্রাদ থেকে অনতিদূরে রাজ্লিভে গিয়ে তিনি একজন ঘেসুড়ে সেজে একখানা ছোট কুঁড়েয় ছিলেন প্রায় একমাস, কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন এবং তখনও বিপ্লবের তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক সমস্যাবলি নিয়ে কাজ করেছিলেন। পরে, শরৎকাল এলে লেনিন ফিনল্যান্ডে গিয়ে সেখানে ছিলেন অক্টোবর মাস অবধি।

বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে জুলাই ছিল সন্ধিক্ষণ। দ্বৈতক্ষমতা শেষ হল — তখন সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী অস্থায়ী সরকারের হাতে।

লেনিন লিখেছিলেন: 'জুলাইয়ের সন্ধিক্ষণটা হল বস্তুগত পরিস্থিতিতে একেবারে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন। রাষ্ট্রক্ষমতার অস্থিত অবস্থার অবসান ঘটেছে। নিষ্পত্তিমূলক মুহূর্তে ক্ষমতা চলে গেছে প্রতিবিপ্লবের হাতে।'*

'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই' স্লোগানটা অর্থহীন হয়ে পড়ল, সেটাকে প্রত্যাহার করা হল সাময়িকভাবে। কিন্তু অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, সোভিয়েতগুলি বলশেভিকদের হাতে এসে যাবার পরে, স্লোগানটা আবার উপযোগী হয়ে উঠেছিল। যেহেতু সরকার জনগণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পথ ধরল এবং সমস্ত ক্ষমতা নিল নিজের হাতে, তাই সে-সরকারকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অপসারণ করা আর সম্ভব ছিল না। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পর্বটা শেষ হয়ে গেল।

জুলাইয়ের ঘটনাবলি হল জনগণের জন্যে একটা মূল্যবান শিক্ষা। অস্থায়ী সরকারের আসল শ্রেণীগত মর্মটা যে কি ছিল, সেটাকে ঐ ঘটনাবলি প্রত্যয়জনকভাবে স্পষ্ট করে দিল। তখনও জনগণ-মনে বহু মোহ ছিল, — শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গোলাগুলি চালিয়ে অস্থায়ী সরকার সেই মোহগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। সমঝোতাওয়ালাদের — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের — চেহারাটাকে লোকে বেশ ভাল করে দেখে

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি,** ২৫তম খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ

নিতে পারল: সমঝোতাওয়ালারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সঙ্গে একজোট হয়ে গিয়েছিল।

জুলাই মাসে প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলো কৃতকার্য হয়ে মাঝপথে না- থামতে মনস্থ করল। ইতোমধ্যে অস্থায়ী সরকার পুনর্গঠিত হয়েছিল, তার প্রধান হয়েছিলেন কেরেন্স্কি — কিন্তু, বুর্জোয়ারা বুঝতে পারছিল, বৈপ্লবিক আন্দোলনকে রুখতে অস্থায়ী সরকার অপারগ। তখন, একটা নগ্ন প্রতিবৈপ্লবিক একনায়কত্ব কায়েম করার পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠল। সেটাকে ফতে করার জন্যে জেনারেল কর্নিলভকে মোড়ল করে একটা ব্যাপক চক্রান্ত ফাঁদা হল।

জুলাইয়ের ঘটনাবলির স্বল্পকাল পরেই সর্বোচ্চ প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত কর্নিলভ একটা বিদ্রোহের জন্যে প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি শুরু করলেন। এই চক্রান্তের পরিকল্পনাটা ছিল এই: হাতে-বাছা প্রতিবৈপ্লবিক ইউনিটগুলোকে পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা এবং, তারই সঙ্গে সঙ্গে, শহরের ভিতরে বিদ্রোহ লাগিয়ে দেওয়া, এইভাবে শহর দখল করে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিহিংসা অভিযান সংগঠিত করা। এই চক্রান্তে নেতৃত্বের ভূমিকায় কর্নিলভ আর তার জেনারেলদের সঙ্গে একত্রে ছিল কাদেত পার্টির নেতারা। তার উপর. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন আর ফ্রান্সের কূটনীতিক আর সামরিক প্রতিনিধিরাও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিল এই চক্রান্তে।

৭ই সেপ্টেম্বর কর্নিলভ জেনারেল ক্রিমভের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীকে পাঠাল পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে। তিন দিনের মধ্যে কর্নিলভের সৈন্যবাহিনী নগরীতে কাছিয়ে এল।

মহা বিপদ। কিন্তু, এই দিনগুলিতে নতুন শক্তি, কর্মোদ্যম আর উদ্যোগে প্রকটিত হল জনগণের বৈপ্লবিক মেজাজ। প্রতিবিপ্লবের পক্ষে যে গণ-সমর্থন ছিল না, সেটা স্বতঃপ্রতীয়মান হয়ে গেল। ঐ জেনারেলের হঠকারিতার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় এবং চূড়ান্ত

‘না’ জবাব দিয়ে জনগণ এই নতুন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল নির্ভীকভাবে।

কর্নিলভের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম পরিচালিত করল বলশেভিক পার্টি। পেত্রগ্রাদ রক্ষা করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল প্রায় ৬০,০০০ লালরক্ষী, সৈনিক আর নাবিক। বলশেভিকদের আহবানে রেল-শ্রমিকেরা রেল-লাইন তুলে ফেলল, খালি ওয়াগনগুলো দিয়ে রেলপথ জ্যাম করে দিল, ইঞ্জিনগুলোকে এদিকে-ওদিকে চালিয়ে নিয়ে গেল। ক্রিমভের বাহিনী এগোচ্ছিল মহা কষ্টে। পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে চালিত কসাক রেজিমেণ্টগুলোতে দেখা দিল বলশেভিক আলোড়কেরা। কর্নিলভের পরিকল্পনার আসল মতলব জানবার পরে কসাকেরা এগোতে নারাজ হয়ে অফিসারদের গ্রেপ্তার করল।

এক সপ্তাহের কম সময়েই বিদ্রোহটা একেবারে বিধ্বস্ত হল। পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে আগুয়ান সামরিক শক্তিটাকে পরাক্রমশালীই মনে হয়েছিল — সেটা খণ্ডচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জেনারেল ক্রিমভের কোন সৈন্যদল রইল না, তাঁর তখন গ্রেপ্তার হবার বিপদ, আত্মহত্যাই হল তাঁর একমাত্র পথ। বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে যেন সমাপ্তি-রেখা টেনে দিল পিস্তলের সেই গুলিটা। কর্নিলভের বিদ্রোহের আনুকূল্যে প্রতিবিপ্লব চূড়ান্ত জয়ের পথে একটা নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ করার আশা করেছিল। কিন্তু, সবকিছু হয়ে গেল ভিন্নমুখী: বিদ্রোহটা চূর্ণবিচূর্ণ হল, আগে পা বাড়াল বিপ্লব।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান

বিপ্লব কোন্ পথ ধরবে সেই নতুন অবস্থায়? ক্ষমতার জন্যে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম ধারণ করবে কোন্ রূপ?

জুলাইয়ের ঘটনাবলির পরে দ্বৈতক্ষমতা যখন শেষ হয়ে গেল,

আর রাষ্ট্রক্ষমতা পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত হল বুর্জোয়াদের হাতে, তখন এইসব প্রশ্নই এসে পড়ল কমিউনিস্ট পার্টির সামনে।

পরিস্থিতির গভীর এবং আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করে লেনিন 'রাজনীতিক পরিস্থিতি', 'তিনটে সংকট', 'স্লোগান সম্বন্ধে', 'বিপ্লবের শিক্ষাগুলি' এবং অন্যান্য রচনায় পার্টির নতুন কর্মকৌশল বিবৃত করলেন, সেটাকে সপ্রমাণ করলেন।

২৬এ জুলাই থেকে ৩রা অগস্ট রা. সো. ডে. শ্র. পা (ব)-র ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল আধা-আইনী অবস্থায়। দেশে পরিস্থিতির একটা স্পষ্ট মূল্যায়ন ক'রে এই কংগ্রেস সদ্য-গড়ে-ওঠা অবস্থায় পার্টির করণীয় কাজগুলি নির্দিষ্ট করে দিল।

বিপ্লব সমানে বেড়ে এগিয়ে চলল। ঐ কংগ্রেস ঘোষণা করল, বুর্জোয়াদের উসকানো সন্ত্রাসনে বৈপ্লবিক তরঙ্গ স্তব্ধ হবার নয়। ১৯১৭ সালে অগস্ট মাসে প্রকাশিত রা. সো. ডে. শ্র. পা-র ইস্তাহারে বলা হল: 'বিপ্লবের আন্তর্ভৌম শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জনগণের একেবারে ধিকিধিকি জ্বলন্ত অসন্তোষের আগুন বেড়ে উঠছে। কৃষকের চাই ভূমি, শ্রমিকের চাই রুটি, শান্তি চাই উভয়েরই।'

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় তো তখন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলল, বিপ্লবের 'শান্তিপূর্ণ বিকাশ এবং সোভিয়েতগুলির কাছে বিনা-যন্ত্রণায় ক্ষমতা হস্তান্তরণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে'। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের আধিপত্যকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করা আবশ্যিক হয়ে উঠল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান হল তখন পার্টির মূল কর্মধারা। কিন্তু, তাই বলে পার্টি তক্ষুণই অভ্যুত্থানের ডাক দিল না; কোন কোন আবশ্যক শর্ত তখনও ছিল না। অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুতি চালানো, সেটাকে কাছিয়ে আনা, সময় আসলে ষোল-আনা অস্ত্রসজ্জিত থাকা — এই হল তখন পার্টির কর্মধারা।

এপ্রিল সম্মেলন থেকে ষষ্ঠ কংগ্রেসের দিনের মধ্যে পার্টির সদস্যসংখ্যা হল তিনগুণ। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে সজ্জিত ২,৪০, ০০০ কমিউনিস্ট তখন নতুন তেজে বলীয়ান হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করতে এগিয়ে গেল, চলল বিপ্লবের জয় নিশ্চিত করতে।

...এল শরৎকাল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জয়ের পরে তখন কেটেছে আধা-বছর। কিন্তু জনগণের নসিবে এল আরও দুর্গতি। আরও বাড়ল আর্থনীতিক লন্ডভন্ড অবস্থা; শিল্পোৎপাদন সমানে পড়ে যেতে থাকল; ১৯১৭ সালের শরৎকালে রুবলের ক্রয়ক্ষমতা দাঁড়াল ১৯১৩ সালের সঙ্গে তুলনায় দশ-ভাগের এক-ভাগ, দেশ ছেয়ে গেল বাজে কাগজী মুদ্রায়; পরিবহনব্যবস্থা ভীষণ বিশৃঙ্খল; কাছিয়ে আসছিল দুর্ভিক্ষ। শহর আর শ্রমিক বসতিগুলিতে খাদ্যসামগ্রীর দোকানগুলোর সামনে বেড়ে উঠতে থাকল লম্বা লম্বা কিউ — যথেষ্ট ছিল না রুটি, চিনি এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। বেকারি বাড়ল।

যুদ্ধ চলতে থাকল আগেরই মতো। সৈনিকেরা প্রশ্ন তুলতে থাকল: 'তবে কি আরও একটা শীত কাটাতে হবে ট্রেঞ্চে?'

যুদ্ধ চালাবার জন্যে সরকার বৃটেন, ফ্রান্স আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন নতুন ঋণ সংগ্রহ করতে থাকল। এইসব ঋণ দেশের উপর আরও বেশি দাসত্ব চাপাল, দেশের সার্বভৌমত্ব ষোল-আনাই খোয়া যেতে বসল।

বুর্জোয়াদের আধিপত্য দেশকে জাতীয় সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে নিয়ে চলেছিল। এই অনর্থক যুদ্ধটা চালিয়ে যাবার দরুন দেশের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন সংগতি-সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, অর্থনীতি ভেঙে পড়ছিল, দেশ ক্রমেই আরও বেশি মাত্রায় হয়ে উঠছিল বৈদেশিক পুঁজির দাস — এই সবকিছুই ছিল আসন্ন বিপর্যয়ের প্রত্যয়জনক লক্ষণ।

১৯১৭ সালের শরৎকাল নাগাত রাশিয়ায় বৈপ্লবিক সংকট সুপরিণত হয়ে উঠল। ধর্মঘটের পর ধর্মঘট হতে থাকল: রেল-শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট, উরাল অঞ্চলে ১,০০,০০০ শ্রমিকের এবং ইভানভো-কিনেশ্‌মা এলাকার ৩, ০০, ০০০ টেক্সটাইল-শ্রমিকের ধর্মঘট, ছাপাখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট, মস্কোয় চামড়া-শ্রমিকদের, বাকুর তৈল-শ্রমিকদের, দনেৎস অববাহিকার খনি-শ্রমিকদের এবং অন্যান্য ধর্মঘট। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাসস্বরূপে বিরাট ঢেউগুলোর মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে এই ধর্মঘট সংগ্রাম যে-রূপ ধারণ করল তেমনটা আগে কখনও শোনাও যায় নি, সেটা পুঁজিতান্ত্রিক আধিপত্যের ভিত্তিমূলটাকেই কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তুলল। এইসব ধর্মঘটের সময়ে শ্রমিকেরা আরও বেশি ঘন ঘন এবং ক্রমবর্ধমান সংকল্প আর কার্যকর সংগঠন নিয়ে কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপনে হস্তক্ষেপ করেছিল, উৎপাদন আর বণ্টনের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে এবং, কাজেকাজেই, বিদ্যমান ভূমিস্বত্বব্যবস্থার সমর্থক আর কার্যক্ষেত্রে রক্ষক সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য গণ-সংগ্রামে পরিণত হল কৃষকদের আন্দোলন। আসলে দেশে চলছিল ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান। এর রাজনীতিক তাৎপর্য ছিল সুবিপুল। কৃষকপ্রধান দেশে কৃষক অভ্যুত্থান! এই একটা বাস্তব অবস্থাই জাতীয় সংকটের অস্তিত্বের যথেষ্ট সাক্ষ্য।

ইতোমধ্যে, ফৌজে বলশেভিক প্রভাব বাড়ছিল অসাধারণ দ্রুতগতিতে। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই প্রতিদিন আরও হাজার-হাজার সৈনিক পার্টিতে যোগ দিচ্ছিল, গোটা গোটা রেজিমেণ্টে আর ব্যাটালিয়নে গৃহীত হচ্ছিল বিভিন্ন বলশেভিক প্রস্তাব। বল্টিক নৌবহরের সমস্ত নাবিক এবং রিজার্ভ রেজিমেণ্টগুলির সৈনিকেরা ছিল বলশেভিকদের সমর্থনে, তেমনি উত্তর আর পশ্চিম ফ্রণ্টের বেশির ভাগ সৈনিক, এই দুটো ফ্রণ্ট দেশের মর্মকেন্দ্রের

সবচেয়ে কাছাকাছি বলে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন। তার উপর, দেশে গ্যারিসনগুলোর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও সমর্থন করছিল পার্টিকে। সোভিয়েতগুলির জীবনে নতুন অবস্থায় শুরু হল একটা নতুন অধ্যায়, তাতে বেড়ে উঠল তাদের ক্রিয়াকলাপ আর কর্মদক্ষতা। বলশেভিক মতাবস্থানেই এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করল সোভিয়েতগুলি।

সোভিয়েতগুলির ইতিহাসে এবং বিপ্লবের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন হয়ে উঠল ১৩ই সেপ্টেম্বর। শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত শেষে ক্ষমতার প্রশ্নে বলশেভিক প্রস্তাব গ্রহণ করল। পুরন সভাপতিমণ্ডলী পদত্যাগ করল, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের নেতৃত্বে এল বলশেভিকরা। ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কো সোভিয়েতেও গৃহীত হল একটা বলশেভিক প্রস্তাব। একটার পরে একটা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকেও আসতে থাকল অনুরূপ খবর। 'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!' এই বলশেভিক স্লোগানের পক্ষে ভোট দিয়ে দাঁড়াল সারা-রাশিয়ায় ২৫০টার বেশি সোভিয়েত। সোভিয়েতগুলির বলশেভিকীকরণ হয়ে গেল এভাবে। লেনিন যা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন — জনগণের মেজাজ ফুটিয়ে বেশির ভাগ সোভিয়েত মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কর্মনীতিগুলো প্রত্যাখ্যান ক'রে বলশেভিকদের অবস্থানে চলে এল।

'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই', এই স্লোগান আবার চালু হল, এখন তার অর্থ হল বলপূর্বক বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদ করার আহ্বান। ১৯১৭ সালের শরৎকাল নাগাত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত অবস্থা বিদ্যমান ছিল। নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করার জন্যে বলশেভিকদের নেতৃত্বে সংগ্রাম চালাতে জনগণ দৃঢ় এবং অটল আগ্রহ প্রকাশ করল।

মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ক্রমবর্ধমান

বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে গেল। ঐ দুটো পার্টিই পৃথক পৃথক গ্রুপ আর উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির বামপন্থী অংশটা একটা পৃথক পার্টি হয়ে দাঁড়াল।

তার উপর, প্রতিবিপ্লবের শিবিরে চরমপন্থীরা জনগণের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগে আক্রমণ চালাবার দাবি তুলল। বিপ্লবকে দুর্বল করে ফেলার জন্যে বুর্জোয়ারা রিগা ছেড়ে দিল জার্মানদের হাতে। প্রকাশ্যে জাতিদ্রোহী হয়ে তারা পেত্রগ্রাদেরও একই দশা করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি লাগাবার জন্যে বুর্জোয়ারা জার্মানির সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি করার কথা চিন্তা করছিল। তাছাড়া, কর্নিলভ ধরনের আর-একটা চক্রান্তের জন্যেও প্রস্তুত হচ্ছিল বুর্জোয়ারা: তারা আরও প্রবলভাবে বিভিন্ন 'দুর্ধর্ষ ব্যাটালিয়ন' গড়তে থাকল, যেসব সামরিক ইউনিটকে তখনও নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছিল সেগুলিকে জড়ো করতে থাকল, বিপ্লবী রেজিমেণ্টগুলিকে ভেঙে দেবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকল সর্বতোভাবে। কাজেই, অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে আর বেশি দেরি করা চলছিল না — কেননা, দেরি হলে বুর্জোয়ারা তাদের সমস্ত শক্তি সমবেত করে ফেলতে পারত, এমন কার্যকলাপ শুরু করতে পারত যাতে বিপ্লবের ব্যর্থতা অবধারিত হয়ে যেতে পারত।

নিষ্পত্তিমূলক মুহূর্ত তখন সমাগত। সশস্ত্র অভ্যুত্থান তখন অবিলম্ব করণীয় কাজ হয়ে উঠল।

২৩এ (১০ই) অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হল গোপনে পেত্রগ্রাদে। জুলাই মাসের পরে এই প্রথম বৈঠকে লেনিন উপস্থিত ছিলেন — তিনি তখন সবে ফিনল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসেছিলেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লেনিন ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির আরও ১১ জন সদস্য (বুবনভ, দ্জেরজিন্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, কল্লন্তাই, লোমভ, স্ভের্দলভ, সকোলনিকভ, স্তালিন, ত্রৎস্কি এবং উরিৎস্কি)।

লেনিনের বিবরণ শুনে কেন্দ্রীয় কমিটি যে-প্রস্তাব গ্রহণ করল তার একাংশে ছিল: 'কাজেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত পার্টি সংগঠনকে তদনুসারে চলতে এবং... এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত প্রয়োগীয় প্রশ্ন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিচ্ছে।'*

জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্য এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন; ঐ দু'জন বলেছিলেন, বিপ্লবের জয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি তখন সুপরিণত হয় নি, তখন ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়, আত্মরক্ষামূলক-বিলম্বের কর্মকৌশল অবলম্বন করা দরকার।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলল পুরাদমে। লেনিন একটা পরিকল্পনা রচনা করলেন — তাতে বিপ্লবী সৈনিক, নাবিক এবং সশস্ত্র শ্রমিকদের সমবেত কার্যকরণের ব্যবস্থা থাকল।

অভ্যুত্থানের জন্যে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটাবার জন্যে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত একটা সামরিক বৈপ্লবিক কমিটি গড়ল; আরও কয়েকটা শহরেও অনুরূপ কমিটি গড়া হল। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে এই কমিটিগুলি অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির সরাসরি ভার নিল।

কারখানায়-কারখানায় লালরক্ষীদল গড়ার কাজ চলল দ্রুত। পেত্রগ্রাদের কারখানাগুলো হয়ে উঠল সশস্ত্র শিবিরের মতো। লালরক্ষীরা অনেকে যন্ত্রে কাজ করত পাশে রাইফেল নিয়ে। কর্মশালাগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্র মেরামত করা এবং ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত রাখা হত। সামরিক ট্রেনিং চলত কারখানার চত্বরে।

অক্টোবর মাসে পেত্রগ্রাদে ট্রেনিং-পাওয়া এবং সশস্ত্র লালরক্ষী ছিল প্রায় ২৩,০০০ জন। পেত্রগ্রাদের লালরক্ষীরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লড়াইয়ে যোদ্ধা পাঠাতে পারত ৫০,০০০ জন।

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৬তম খণ্ড, ১৯০ পৃঃ

দেশের ৬২টা শহরে লালরক্ষীদলগুলিতে শ্রমিক ছিল মোট ২,০০,০০০ জন অবধি।

বল্টিক নৌবহরের জাহাজগুলিতেও বিদ্রোহের প্রবল প্রস্তুতি চলছিল। বড় বড় জাহাজে এবং ডাঙ্গার ইউনিটগুলিতে গড়া হয়েছিল বিভিন্ন স্থায়ী লড়িয়ে প্লেটুন, তারা ঠিক সময়ে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের বিপ্লবী রেজিমেণ্টগুলিও কাজের জন্যে তৈরি ছিল। কম্পানি এবং রেজিমেণ্ট কমিটিগুলির প্রতিনিধিরা অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছিল।

২৪এ অক্টোবর তারিখে পেত্রগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল উত্তর বিভাগের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস; নিষ্পত্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে জনগণের প্রস্তুত অবস্থার পুনর্ঘোষণা করেছিল এই কংগ্রেস। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দেশের সর্বত্র গুবের্নিয়ার এবং বিভাগীয় সোভিয়েত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুবেদী আবহমানযন্ত্রের মতো এইসব কংগ্রেসে প্রতিফলিত হয়েছিল অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিমূলক সংগ্রামের জন্যে জনগণের প্রস্তুত অবস্থা।

কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ ইতোমধ্যে এমন দুষ্কর্ম করলেন, যা পার্টির ইতিহাসে কখনও ঘটে নি: প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা।

৩১এ অক্টোবর তারিখে বামপন্থী মেনশেভিক 'নভায়া জিজ্ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হল কামেনেভের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বলশেভিক পার্টির সিদ্ধান্তের প্রতি নিজের এবং জিনোভিয়েভের বিরোধিতার কথা তিনি তাতে জানিয়ে দিলেন। এটা হল পুরাদস্তুর বেইমানি, — অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার উপর সেটা হল একটা প্রচণ্ড আঘাত। যাঁরা ছিলেন পার্টি নেতৃত্বের একটা অঙ্গ তাঁরা পার্টির গোপন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ

করলেন অ-পার্টি পত্রিকায়। সক্রোধ ঘৃণাভরে লেনিন লিখলেন: 'কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে তাঁদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের কথা বেইমানি করে ফাঁস করে দিয়েছেন রদ্‌জিয়াঙ্কো আর কেরেনস্কির কাছে...'*

বিপ্লবের ক্ষমতা এবং শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতার প্রতি আস্থার অভাব ফুটে উঠল কামেনেভ আর জিনোভিয়েভের আচরণে। কিন্তু, জনগণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল লেনিনের এবং পার্টির — পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে সেটাকে উচ্ছেদ করার জন্যে জনগণের প্রাণশক্তি আর প্রস্তুত অবস্থাটাকে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। নিঃসঙ্গ ঐ দু'জনের বেইমানি এবং আশঙ্কাপ্রবণতা সত্ত্বেও পার্টি জয় সম্বন্ধে অটল আস্থা নিয়ে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালিয়ে গেল।

বলশেভিক পার্টির সদস্যদের কাছে লেখা একখানা চিঠিতে লেনিন বললেন: 'কঠিন সময়। কঠিন করণীয় কাজ। নিদারুণ বেইমানি। তবু নিষ্পন্ন হবে করণীয় কাজ। শ্রমিকেরা সংহত হয়ে দাঁড়াবে, কৃষক বিদ্রোহ এবং ফ্রন্টে সৈনিকদের চূড়ান্ত অসহ্য অবস্থা ঠিক কাজ করবে! আমাদের শক্তি সংহত করতে হবে — প্রলেতারিয়েত জয়ী হবে!'**

পদ্‌ভইস্কি, আন্তোনভ-ওভসেয়েঙ্কো, চুদ্‌নোভস্কি এবং অন্যান্যের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত অভ্যুত্থানের ব্যবহারিক প্রস্তুতি ছিল বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন। কাজের সমগ্র ধারার উপর ছিল লেনিনের পরিচালনা, তিনি এই কাজের উপর সতর্ক নজর রেখেছিলেন।

২রা নভেম্বরের পরে সামরিক বৈপ্লবিক কমিটি বিপ্লবী সামরিক ইউনিটগুলির নেতা হিসেবে কমিসার নিয়োগ করতে

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি,** ২৬তম খণ্ড, ২২৫ পৃঃ

** ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি,** ২৬তম খণ্ড, ২১৯ পৃঃ

আরম্ভ করল। তিন দিনের মধ্যে সামরিক বৈপ্লবিক কমিটির কমিসার নিযুক্ত হল প্রায় ৩০০ জন। কমিসারদের সম্মতি ছাড়া কোন হুকুম তামিল করা যাবে না। ২,৫০,০০০ জন সৈনিকের পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের বিরাট শক্তি এল বৈপ্লবিক সদরঘাঁটির হাতে।

ঝড় উঠবে — তার জন্যে সবকিছু প্রস্তুত। ঝড় উঠবে — কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

উদ্যোগ নিজ হাতে পাবার আশায় অস্থায়ী সরকার বৈপ্লবিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে মনস্থ করল। ৬ই নভেম্বর (২৪এ অক্টোবর) রাত্রে সমস্ত সামরিক বিদ্যালয়কে আক্রমণ চালাবার জন্যে প্রস্তুত করতে সরকার হুকুম দিল। পেত্রগ্রাদ সামরিক এলাকার সেনাপতি পলকোভ্নিকভের হুকুম হল এলাকার সদরঘাঁটির অনুমতি ছাড়া কোন সামরিক ইউনিট ব্যারাক থেকে বের হতে পারবে না। সরকার অবস্থিত ছিল শীত প্রাসাদে — এই প্রাসাদের চারপাশে সামরিক পাহারা আরও শক্তিশালী এবং কড়া করা হল। নেভা নদীর পারাপারি পুলগুলোতে ক্যাডেট ডিট্যাচমেণ্টগুলোকে পাঠানো হল — তাদের উপর হুকুম হল পুলগুলিকে তুলে নিতে হবে,* যাতে শ্রমিক মহল্লাগুলি শহরের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

স্পষ্টতই প্রকাশ্য মোকাবিলার সময় এসে গেল। তখন আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করা চলে না। প্রতিবিপ্লব উদ্যোগী আক্রমণ-অভিযান শুরু করল, — সেই আক্রমণ প্রতিহত করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক আক্রমণ চালানো তখন অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় এবং পেত্রগ্রাদ কমিটির বৈঠক হল সকালে। তাতে স্থির হল, 'একটুকুও দেরি না-করে বিপ্লবের সমগ্র সংগঠিত শক্তি দিয়ে উদ্যোগী আক্রমণ-অভিযান চালানো আবশ্যক'।

* পেত্রগ্রাদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত গভীর নেভা নদীর পুলগুলোকে বড় বড় জাহাজ চলবার জন্যে তুলে রাখা যায়।

বৃহৎ নগরীর সর্বত্র বিপ্লবের শক্তিগুলি সক্রিয় হল। লেনিনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা কাজে চালু হয়ে গেল।

লালরক্ষীদের সমাবেশের জন্যে কারখানায়-কারখানায় সংকেত জানানো হল। কোন কোন ডিট্যাচমেণ্ট চলল স্মোল্‌নির* দিকে, অন্যান্য ডিট্যাচমেণ্ট বিভিন্ন আপিস দখল করতে আরম্ভ করল, আর চলল পুলগুলো আর রেল-স্টেশনগুলিতে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে স্মোল্‌নি। পেত্রগ্রাদ

স্মোল্‌নিতে পেত্রগ্রাদের একখানা মানচিত্রের উপর ঝুঁকে বসেছিলেন পদ্‌ভইস্কি, আন্তোনভ-ওভসেয়েঙ্কো আর চুদ্‌নোভস্কি, তাঁরা বিপ্লবী ডিট্যাচমেণ্টগুলির গতিবিধি নির্ধারণ এবং যাচাই করছিলেন। বিভিন্ন সেনাপতি, কমিসার এবং পার্টি সংগঠনের নেতাদের সামরিক কাজের ভার দিচ্ছিলেন সামরিক বৈপ্লবিক পার্টি

* স্মোল্‌নি ছিল অভিজাত পরিবারগুলোর মেয়েদের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান — স্মোল্‌নি ইনস্টিটিউট। অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময়ে সেটাকে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সদরঘাঁটি করা হয়েছিল।

কেন্দ্রের সদস্যরা — বুবনভ, দ্জেরজিনস্কি, স্ভের্দলভ, স্তালিন এবং উরিৎস্কি।

লেনিন তখনও কাজ চালাচ্ছিলেন একটা গোপন আস্তানা থেকে — তিনি ছিলেন সমগ্র নেতৃত্ব-সংস্থার প্রাণকেন্দ্র।

৬ই নভেম্বর সারা দিনে বিপ্লবী ডিট্যাচমেণ্টগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছিল সাফল্যসহকারে, পেত্রগ্রাদের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আর আপিস তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সামরিক বৈপ্লবিক কমিটির কোন কোন সদস্য দোদুল্যমান এবং অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি ত্রৎস্কি ৬ই নভেম্বর তারিখে বলেছিলেন, অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা অবিলম্ব কাজ নয়। সেই দিন সন্ধ্যায় লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের কাছে পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলেন, সরকারের উপর নিষ্পত্তিমূলক এবং দ্রুত আক্রমণ চালানো অবশ্যপ্রয়োজনীয়। 'যেমন করে হোক আজ সন্ধ্যায়ই, আজ রাত্রেই সরকারকে আমাদের গ্রেপ্তার করতে হবেই, তার আগে ক্যাডেটদের নিরস্ত্র করতে হবে (তারা প্রতিরোধ করলে তাদের পরাস্ত ক'রে), ইত্যাদি।

'আমরা কিছুতেই বিলম্ব করতে পারি নে! সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে!!

'সরকার টলটলায়মান। যেমন করে হোক তাকে **মারণ আঘাতটা হানতে** হবে।'*

সেদিন সন্ধ্যার পরে লেনিন গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে চললেন স্মোল্নিতে। পেত্রগ্রাদে শত্রুদের টহলদার চৌকিগুলোর ধার দিয়ে পথ ছিল বিপজ্জনক. সেই পথে গিয়ে তিনি বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সদরঘাঁটিতে পেঁছে নিজে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তখন ঘটনাস্রোত চলল আরও দ্রুতগতিতে। বিপ্লবী

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৬তম খণ্ড, ২৩৪—২৩৫ পৃঃ

ডিট্যাচমেণ্টগুলি চতুর্গুণ উৎসাহ নিয়ে নগরীর গুরুত্বসম্পন্ন কেন্দ্রগুলি দখল করে নিল। রাত্রে লালরক্ষীরা এবং বিপ্লবী নাবিক আর সৈনিকেরা *দখল করল রেল-স্টেশনগুলো, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, টেলিফোন স্টেশন, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং পেত্রগ্রাদ টেলিগ্রাফ স্টেশন।*

পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল সেই যে রাত্রে তার অনন্যসাধারণ ছবিখানি চিরকাল ইতিহাসে বজায় থাকবে। পেত্রগ্রাদের রাস্তায়-রাস্তায় কুয়াশা চিরে ছুটছিল একখানার পরে একখানা লালরক্ষী বোঝাই লরি। শরতের রাতের অন্ধকার ভেঙে চৌমাথাগুলোতে জ্বলছিল বিপ্লবী পাহারাদারদের অগ্নিকুণ্ডগুলো। মাঝে মাঝে গুলি-বিনিময় চলছিল, আর শোনা যাচ্ছিল নানা সংক্ষিপ্ত নির্দেশ। এখানে-ওখানে চাপা নীরবতা ভেঙে উঠছিল 'ভার্শাভিয়াঙ্কা' আর 'আন্তর্জাতিক' গানের সুর: বিপ্লবের সৈনিকেরা চূড়ান্ত আঘাত হানতে এগিয়ে যাচ্ছিল পুরন দুনিয়ার উপর।

নেভা নদীর উজানে ধীরে এগিয়ে এল ক্রুজার 'অরোরা'র লৌহ-বপুখানা। রাত ৩ঃ৩০ মিনিটে 'অরোরা' নঙর ফেলল শীত প্রাসাদের অনতিদূরে।

উজ্জ্বল আলোকিত স্মোল্‌নির সামনে জড়ো হয়েছিল হাজার-হাজার মানুষ। স্কয়্যারে আর চত্বরে সাঁজোয়া গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ছিল — মোটর চালু রেখে। একটা অগ্নিকুণ্ডের কাঁপা-কাঁপা আলোয় প্রহরীরা পাস পরীক্ষা করে দেখছিল। ঢুকবার মুখে ঢাকনা-খোলা মেশিনগানগুলো। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বার্তাবহদের পাঠানো হচ্ছিল অনবরত। বিভিন্ন রেজিমেণ্ট আর কারখানার প্রতিনিধিরা নির্দেশের জন্যে স্মোল্‌নিতে আসছিল সারা রাত ধরে। লালরক্ষীদের নতুন নতুন ডিট্যাচমেণ্ট এবং সৈনিকদের প্লেটুন আসছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামরিক কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।

এল ৭ই নভেম্বরের (২৫এ অক্টোবর) সেংতসেংতে ঠান্ডা সকাল। ততক্ষণে অভ্যুত্থানের সাফল্য একেবারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় গোটা পেত্রগ্রাদই তখন বিপ্লবীদের হাতে। অস্থায়ী সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল শুধু শীত প্রাসাদ, সেনানীমণ্ডলীর ভবন আর মারিন্‌স্কি প্রাসাদ। কিছু প্রতিবিপ্লবী শক্তি জড়ো করে তাদের পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে পাঠাবার আশায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি পেত্রগ্রাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের একটা বিশেষ বৈঠক বসল বিকেল ২ঃ৩৫ মিনিটে। বক্তৃতামঞ্চে উঠলেন লেনিন। হাওয়ায় ধ্বনিত হল এই কটি কথা:

'কমরেডসব, শ্রমিক আর কৃষকদের যে-বিপ্লবের কথা বলশেভিকরা বরাবর বলেছে, সেটা সমাধা হয়েছে।'*

তবে, অস্থায়ী সরকার তখনও ছিল শীত প্রাসাদে। ৫টা নাগাত বৈপ্লবিক শক্তিগুলি প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। শক্তিতে বিপ্লবের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল বিপুল। রক্তপাত এড়াবার আশায় সামরিক বৈপ্লবিক কমিটি অস্থায়ী সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে তাগিদ দিল দু'বার — সন্ধ্যা ৬টায় এবং ৮টায়, কিন্তু তার কোন উত্তর এল না। আক্রমণ শুরু করার জন্যে সামরিক বৈপ্লবিক কমিটি নির্দেশ দিল। 'অরোরা' থেকে এক-দফা ফাঁকা গোলাবর্ষণ আক্রমণ চালাবার সংকেত হবে বলে ব্যবস্থা ছিল।

রাত ১০টায় সেই গোলা চলল — তখন শীত প্রাসাদ দখল করা শুরু হল। সংক্ষিপ্ত গুলি-বিনিময়ের পরে আক্রমণকারীরা এগিয়ে গেল বন্যাস্রোতের মতো। তারা ইমারতে ঢুকে একটার পরে একটা সিঁড়ি, একটার পরে একটা কামরা, একটার পরে একটা হল্‌ নিয়ে গোটা প্রাসাদ দখল করে ফেলল। একটা কামরায় বসে ছিল অস্থায়ী সরকারের আতঙ্কিত সদস্যরা।

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৬তম খণ্ড, ২৩৯ পৃঃ
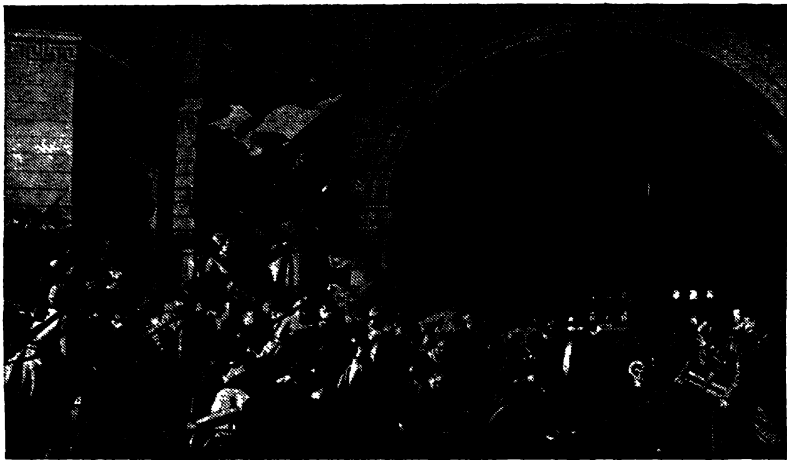
শীত প্রাসাদ দখল

একদল সৈনিক, নাবিক এবং লালরক্ষী সেই কামরার দরজার কাছে গেলে একজন ক্যাডেট তাদের পথ আটকে দাঁড়াল।

'এ হল সরকার,' সে বলল।

'আর এই হল বিপ্লব,' উত্তর দিল একজন নাবিক।

৮ই নভেম্বর রাত ২ঃ১০-এ মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হল, রাশিয়ার শেষ বুর্জোয়া সরকার শেষ হয়ে গেল।

পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমাধা হয়েছিল দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে। এটা ছিল প্রায় রক্তপাতশূন্য, মাত্র অল্প কয়েক ডজন লোক হতাহত হয়েছিল উভয় পক্ষে।

রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতার উদ্‌ঘোষণা

শীত প্রাসাদ দখলে অভ্যুত্থান চূড়ান্ত মাত্রায় পেঁছলে ৭ই নভেম্বর (২৫এ অক্টোবর) স্মোল্‌নিতে শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হল। ৬৫০ জন প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক

ছিল প্রায় ৪০০ জন। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের বেশ একটা গ্রুপ ছিল। কিন্তু সোভিয়েতগুলিতে প্রভাব হারিয়েছিল মেনশেভিক আর দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা, কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধি ছিল ৭০-৮০ জন। এরা কংগ্রেসের কাজ ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রতিনিধিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তাদের সমর্থন করে নি, তখন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এবং মেনশেভিক নেতারা (৫১ জন) কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের কাজ চলল। রাত ১২টায় মঞ্চে উঠলেন বিশিষ্ট বলশেভিক পার্টি নেতা আনাতোলি লুনাচার্স্কি, তাঁর হাতে লেনিনের লেখা কিছু কাগজ। 'শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের প্রতি!' লুনাচার্স্কি দলিলখানা পড়তে আরম্ভ করলে জমায়েত নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

'শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে, পেত্রগ্রাদে সংঘটিত শ্রমিক আর গ্যারিসনের জয়যুক্ত অভ্যুত্থানের সমর্থনে এই কংগ্রেস নিজ হাতে ক্ষমতা নিচ্ছে।

'অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।'*

এই সহজ-সরল কিন্তু গুরুগম্ভীর ক'টি কথার পরে প্রচণ্ড হাততালি পড়ল, তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল।

'এই কংগ্রেস অনুশাসন দিচ্ছে: স্থানিকভাবে সমস্ত ক্ষমতা যাবে শ্রমিক সৈনিক আর কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে...'** এইভাবে দলিলখানা পড়া চলল। সকাল ৫টায় এই আবেদনটাকে ভোটে দেওয়া হল। সবার হাত উঠে গেল, আবার হল্-ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল বিজয়োল্লাশধ্বনি। বিরুদ্ধে ভোট দিল মাত্র দু'জন।

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৬তম খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ

** ঐ

এইভাবে রাশিয়ায় উদ্‌ঘোষিত হল সোভিয়েত ক্ষমতা। এইভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়। এইভাবে অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদের নিষ্পত্তি হল, আর হাসিল হল পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

ঐ দিনই, ৮ই নভেম্বর, রাত ৯টায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল।

অক্টোবর বিপ্লব জয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিল শান্তির স্লোগান নিয়ে। সর্বজনের সর্বসম্মত দাবি ছিল 'যুদ্ধ শেষ করো!'

সোভিয়েত ক্ষমতার জয়ের ঘোষণা করছেন লেনিন

বলশেভিকরা তুলে ধরেছিল গণতন্ত্রসম্মত শান্তির দাবি: পরদেশী রাজ্যখন্ড-গ্রাস ছাড়া, এক-দেশের উপর অন্য দেশের দাসত্ব চাপানো ছাড়া এবং বিনা খেসারতে শান্তি। তাই, সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম

ডিক্রি হল শান্তির ডিক্রি। ঐ কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে শান্তির ডিক্রি পড়লেন লেনিন নিজেই। মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বিশিষ্ট একখানা দলিল হল এই শান্তির ডিক্রি।

'ন্যায্য, গণতন্ত্রসম্মত শান্তির জন্যে অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে সমস্ত যুধ্যমান জাতি এবং তাদের সরকারগুলির উদ্দেশে'* আহ্বান জানাল সোভিয়েত রাশিয়া।

এই ডিক্রিতে আরও বলা হল: 'বিজিত দুর্বল জাতিগুলিকে শক্তিশালী এবং ধনী জাতিগুলির মধ্যে কীভাবে ভাগাভাগি করা যায়, সেই প্রশ্ন নিয়ে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মানবজাতির বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অপরাধ বলে সরকার মনে করে...'**

ন্যায্য আর গণতন্ত্রসম্মত ভিত্তিতে সমস্ত যুধ্যমান শক্তির সঙ্গে শান্তিচুক্তি সই করার জন্যে সোভিয়েত সরকারের সংকল্প বিধিসম্মতভাবে ঘোষণা করা হল।

আগেকার সমস্ত গোপন চুক্তি নিঃশর্তে এবং অবিলম্বে বাতিল হয়ে গেল বলে ঘোষণা করা হল। পুরন রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির অবসান ঘটানো হল এইভাবে — সেটা নিষ্পত্তিমূলক এবং অপরিবর্তনীয়। অস্তিত্বের প্রথম দিনটি থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতা তুলে ধরল জাতিতে-জাতিতে শান্তি আর বন্ধুত্বের পতাকা, আরম্ভ করল যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম। বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ভাব-ধারণাটাকে তুলে ধরা হল এই ডিক্রিতে — এই ভাব-ধারণা হয়ে উঠল সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির একটা বুনিয়াদী নীতি।

শান্তির ডিক্রি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবার পরে লেনিন ঘোষণা করলেন ভূমির ডিক্রি। তার প্রথম দফাটিতে সংক্ষেপে,

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৬তম খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ

** ঐ, ২৫০ পৃঃ
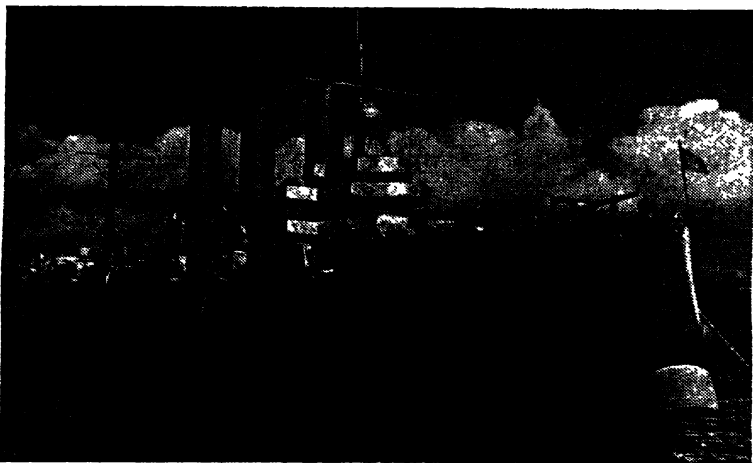
ক্রুজার 'অরোরা'

সহজভাবে, সজোরে বলা হল: 'ভূমিতে মালিকানা এই সঙ্গে সঙ্গেই কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই লোপ করা হল।'* পশু-সম্পদ আর সরঞ্জাম-উপকরণাদি, ঘর-বাড়ি এবং আনুষঙ্গিক সবকিছু সমেত সমস্ত জমিদারি, তালুক, আর সমস্ত মঠ আর গীর্জার ভূমি দেওয়া হল স্থানীয় ভূমি কমিটিগুলি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের জেলা সোভিয়েতগুলির হাতে। ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার বাতিল করে দেওয়া হল; সমস্ত ভূমির রাষ্ট্রীয়করণ হল।

কার্যক্ষেত্রে এইসবের অর্থটা দাঁড়াল কী?

কৃষকদের পাবার ব্যবস্থা হল — এবং তারা পেল — বিপুল পরিমাণ ভূমি: ১৫ কোটি দেসিয়াতিনা (১ দেসিয়াতিনা=২·৭ একর)। ভূমির খাজনা বাবত রাশি-রাশি টাকা (বছরে ৭০ কোটি

* ভ. ই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলি, ২৬তম খণ্ড, ২৫৮ পৃঃ

সোনার রুবল), এবং সমস্ত বকেয়া খাজনা (তার পরিমাণটা দাঁড়িয়েছিল ৩০০ কোটি রুবল) দেওয়া থেকে কৃষককুল রেহাই পেয়ে গেল। ভূস্বামীদের পশু-সম্পদ আর খামারের সরঞ্জাম কৃষকদের পাবার ব্যবস্থা হল — এবং তারা তা পেল।

২টার (ভোর-রাত্রি) সময়ে ভূমির ডিক্রিটিকে ভোটে দেওয়া হলে সেটা কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হল।

ঘণ্টার পরে ঘণ্টা দ্রুত কাজ চলল। দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে আসছিল। ভোর হয়-হয়। ৬২ জন বলশেভিক, ২৯ জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এবং অল্প কয়েক জন মেনশেভিক আর অ-পার্টি লোককে নিয়ে কংগ্রেসে নির্বাচিত হল সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। শ্রমিক এবং কৃষকদের সরকার — জনকমিসার পরিষদ — গড়ার বিষয়ে কংগ্রেসে ডিক্রি গৃহীত হবার সময়ে সকাল ৫টা বেজে গিয়েছিল। এই পরিষদে থাকলেন ১৫ জন — তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য — আর তার সভাপতি হলেন লেনিন।*

কংগ্রেসের কাজ শেষ হল ৫টা ১৫ মিনিটে। প্রতিনিধিরা একযোগে উঠে দাঁড়াল। হল্ ভরে উঠল 'আন্তর্জাতিক' গানের জমকালো সুরে।

* এই ডিক্রিটায় ছিল: 'জনকমিসার পরিষদ গঠিত হল নিম্নলিখিতরূপে:

'পরিষদের সভাপতি — ভ্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন); স্বরাষ্ট্রবিষয়ক জনকমিসার — আ. ই. রিকভ; কৃষি — ভ. প. মিলিউতিন; শ্রম — আ. গ. শ্লিয়াপনিকভ; ফৌজ আর নৌবাহিনীর বিষয় — ভ. আ. ওভসেয়েঙ্কো (আন্তোনভ), ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো এবং প ইয়ে. দিবেঙ্কোকে নিয়ে একটা কমিটি; বাণিজ্য এবং শিল্প — ভ. প. নোগিন; শিক্ষা — আ. ভ. লুনাচারস্কি; অর্থ — ই. ই. স্কভর্ৎসভ (স্তেপানভ); পররাষ্ট্রীয় বিষয় — ল. দ. ব্রনস্টেইন (ত্রৎস্কি); বিচার — গ. ই. ওপ্পোকভ (লোমভ); খাদ্য — ই. আ. তেওদরোভিচ; ডাক-তার — ন. প. আভিলভ (গ্লেবভ); জাতি-সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতি — ই. ভ. জুগাশভিলি (স্তালিন)।' (ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৬তম খণ্ড, ২৬২—২৬৩ পৃঃ)

সোভিয়েত ক্ষমতার বিজয়-অভিযান

রাশিয়া পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দেশ। পৃথিবীর স্থলভাগের ষষ্ঠাংশ রাশিয়ার রাজ্যক্ষেত্র ইউরোপ আর এশিয়ার সুবিশাল ভূখণ্ড জুড়ে — বল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, আর উত্তরী সাগরগুলি থেকে ককেশাস এবং পামিরের পর্বতশীর্ষগুলি অবধি। দেশের সর্বত্র সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক অবস্থা মোটেই একই রকমের ছিল না; শ্রেণী-শক্তিগুলির মধ্যে অনুপাত দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল। পেত্রগ্রাদে জয়ের পরে ক্ষমতা জনগণের হাতে এসে পড়বে আপনা থেকে এবং অবিলম্বে, এমনটা আশা করা যায় নি। দেশের সর্বত্র সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম করাটা ছিল একটা জটিল প্রক্রিয়া। ইউক্রেনে, ককেশাসে, সাইবেরিয়ায়, মধ্য এশিয়ায়, ভলগা অঞ্চলে এবং অন্যান্য এলাকায় সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা কায়েম করার সংগ্রাম বিকশিত হবার ধরন-ধারনগুলির মধ্যে বিশেষ-নির্দিষ্ট পার্থক্য ছিল।

কিন্তু, জটিলতা আর দুরূহতাগুলো সত্ত্বেও, দেশের সমস্ত অংশে সোভিয়েতগুলির বিজয় নিষ্পন্ন হয়েছিল অসাধারণ দ্রুতগতিতেই। সুবিশাল দেশের এক-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সোভিয়েত ক্ষমতার যথার্থ বিজয়-অভিযানই ঘটল। পশ্চিম সীমান্তগুলি থেকে সাইবেরিয়ায় আর সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে সর্বত্র শ্রমিক আর কৃষকদের ক্ষমতা কায়েম হয়ে গিয়েছিল ১৯১৮ সালের মার্চ মাস নাগাত — চার মাসের কম সময়ের মধ্যে।

এটা ঘটেছিল, তার কারণ, সমগ্রভাবেই দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপযোগী অবস্থা সুপরিণত হয়ে উঠেছিল; পুঁজির আধিপত্য উচ্ছেদ করা যে অবশ্যকরণীয়, এই ভাব-ধারণাটা সর্বত্র জনগণের বিস্তৃত অংশের মধ্যে সর্বব্যাপী হয়ে পড়েছিল।

খুব বেশি জায়গায়ই সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা এসেছিল শান্তিপূর্ণভাবে। জনগণের পক্ষে শক্তির বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে প্রতিবিপ্লবের বিনা-সংগ্রামে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অবস্থাটা এমনই ছিল বেশির ভাগ বড় শিল্পকেন্দ্র এবং মধ্য রাশিয়া, ভলগা অঞ্চল, উরাল অঞ্চল আর সাইবেরিয়ায় বেশির ভাগ মাঝারি আর ছোট শহরেও।

কতকগুলি অ-রুশ অঞ্চলে সোভিয়েতগুলির ক্ষমতার জন্যে শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের সংগ্রামে জয় ঘটেছিল সশস্ত্র সংঘাত ছাড়াই।

এস্তোনীয় সামরিক বৈপ্লবিক কমিটির ডাকে এস্তোনিয়ার মেহনতী জনগণ তাদের দেশের সর্বত্র সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম করেছিল। লাতভিয়ায় জার্মান সশস্ত্র শক্তির দখলের বাইরেকার অংশটায় সোভিয়েতগুলির জয় ব্যাহত করতে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো অপারগ হয়েছিল। ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায়ই বেলোরুশিয়ায় ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল মিন্‌স্ক সোভিয়েত। বাকুতে পরিস্থিতিটা ছিল জটিল আর কঠিন, কিন্তু সেখানে সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বলশেভিকরা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। মধ্য এশিয়ায় আশখাবাদ, সমরখন্দ এবং ফেরগানার মতো বড় বড় শহরে মেহনতী জনগণের জয় হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সহজ।

কিন্তু, কতকগুলো জায়গায় প্রতিবিপ্লব হিংস্র প্রতিরোধ খাড়া করে বাধিয়েছিল সশস্ত্র সংঘাত। তুর্কিস্তানে রাজধানী তাশখন্দের রাস্তায়-রাস্তায় শ্রমিক এবং সৈনিকেরা শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল চার দিন ধরে। ইরকুৎস্কে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্যে ন'দিনের লড়াইয়ে তিন-শ'র বেশি লালরক্ষী প্রাণ হারায়।

প্রচণ্ড সশস্ত্র সংগ্রাম ঘটেছিল মস্কোয় — এখানে প্রতিবিপ্লবের ২০ হাজারের বেশ বড় একটা বাহিনী ছিল — তারা ছিল সব সশস্ত্র এবং ভাল তালিম-পাওয়া সৈনিক, অফিসার, সামরিক

বিদ্যালয় আর সামরিক আকাদমিগুলোর ক্যাডেটরা এবং বুর্জোয়া পরিবারগুলোর ছাত্র-দঙ্গলগুলো।

মস্কোয় প্রতিবিপ্লব সংগ্রামের অতি চরম সব উপায় প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে নি — এমনকি, ব্যাপকভাবে বধ পর্যন্ত করেছিল। ১০ই নভেম্বর সকালে ক্রেমলিন দখল করে ক্যাডেটরা বৈপ্লবিক ৫৬তম রেজিমেণ্টের নিরস্ত্র সৈনিকদের সারবন্দি করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অস্ত্রাগারের সামনে। হঠাৎ একটা হুকুম উচ্চারিত হল, আর ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলিতে ঐ সৈন্যদের দেহগুলি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কুড়ি লক্ষ মানুষের এই প্রকাণ্ড নগরীর বিভিন্ন অংশে তীব্র লড়াই চলেছিল। প্রতিবিপ্লবকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মস্কোয় সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম করতে লেগেছিল ছ'দিন।

প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে সংগ্রাম ব্যাপক রূপধারণ করেছিল ওরেনবুর্গ গুবের্নিয়ায়। ওরেনবুর্গ কসাকদের আতামান দুতোভ যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে। সোভিয়েত সরকার পেত্রগ্রাদ, মস্কো এবং ভলগা অঞ্চল থেকে নাবিক আর লালরক্ষীদের বিভিন্ন ডিট্যাচমেণ্ট পাঠিয়েছিল দুতোভের বিরুদ্ধে। পার্টির যেসব সদস্য অস্ত্রধারণ করতে পারে এমন সবাইকে জড়ো করেছিল উরাল অঞ্চলের বলশেভিকরা। বরফে-ঢাকা রাস্তাগুলো ধরে প্রচণ্ড হিমের সময়ে সোভিয়েত ডিট্যাচমেণ্টগুলি গিয়েছিল ওরেনবুর্গের কাছে। ১৯১৮ সালে জানুয়ারি মাসে কতকগুলি প্রচণ্ড লড়াইয়ের পরে পরাস্ত হয়েছিল দুতোভের সশস্ত্র শক্তি।

দন নদী বরাবর প্রতিবিপ্লব ছিল আরও বেশি বিপজ্জনক। দন কসাকদের আতামান কালেদিন সোভিয়েত সরকারকে না-মেনে মস্কো এবং পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়েছিল প্রতিবিপ্লবের প্রবল শক্তি। অর্থ আর সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে কালেদিনকে দ্রুত সরবরাহ করেছিল

আঁতাঁতের* প্রতিনিধিরা। রস্তভ, তাগান্‌রগ এবং আজোভ দখল করে কালেদিনের সামরিক শক্তি আক্রমণ চালিয়েছিল দনেৎস অববাহিকায়। কিন্তু, এখানেও শত্রু-শক্তি বিপ্লবের অগ্রাভিযানকে রোধ করতে পারল না।

লেনিনের নির্দেশে বিভিন্ন লালরক্ষী ডিট্যাচমেণ্ট এবং বৈপ্লবিক সামরিক ইউনিট পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণে। এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল দনেৎস অববাহিকার খনি-শ্রমিকেরা এবং তাগান্‌রগ আর রস্তভের শ্রমিকেরা। এই আতামানের বিদ্রোহ পদদলিত করার জন্যে গরিব কসাক এবং মেহনতী কৃষকেরাও অস্ত্রধারণ করেছিল। ১৯১৮ সালে জানুয়ারি মাসে ফ্রণ্ট-লাইনে অনুষ্ঠিত কসাক কংগ্রেসে গঠিত হল দন কসাক সামরিক বৈপ্লবিক কমিটি, তার প্রধান হলেন ফিয়দর পোদ্‌তেলকভ এবং মিখাইল ক্রিভোশ্‌লিকভ। কালেদিন এবং তাঁর অনুগামীদের পক্ষে অবস্থাটা হয়ে উঠল অসম্ভব, কালেদিনকে নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করতে হল।

ইউক্রেনের শ্রমিক এবং কৃষকেরা কঠোর লড়াই চালিয়েছিল প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে। লুগান্‌স্ক, ক্রামাতোর্স্ক, মাকেয়েভ্‌কা এবং খেরসনের মতো বহু শিল্পকেন্দ্রে সোভিয়েতগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল খুবই শান্তিপূর্ণভাবে। ডিসেম্বর মাসে খারকভে সোভিয়েত ক্ষমতা সংহত হয়েছিল। কিন্তু ইউক্রেনের কতকগুলি অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা সোভিয়েত ক্ষমতার জয়ের পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করেছিল, তারা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে গড়েছিল নিজেদের প্রতিবিপ্লবী সংগঠন — তথাকথিত কেন্দ্রীয় রাদা। ১১ই নভেম্বর তারিখে

* ১৯০৭ সালে বৃটেন, ফ্রান্স এবং জারতান্ত্রিক রাশিয়াকে নিয়ে গড়া একটা সাম্রাজ্যবাদী জোটের নাম আঁতাঁত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানি আর তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুধ্যমান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জাপান সমেত) সমস্ত দেশের সাধারণ নাম হয়েছিল আঁতাঁত।

‘আর্সেনাল’ কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্বে কিয়েভের মেহনতী জনগণ বিদ্রোহ ক’রে তিন দিনের লড়াইয়ের পরে অস্থায়ী সরকারের শক্তিগুলোকে পরাস্ত করেছিল, তখন রাদা তার শক্তিগুলোর সাহায্যে নগরীতে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কেন্দ্রগুলোকে দখল করে নিয়েছিল। রাদা সারা ইউক্রেনে তার সার্বভৌমত্ব এবং রাশিয়ার সোভিয়েত সরকারের প্রতি অবাধ্যতা ঘোষণা করেছিল।

কেন্দ্রীয় রাদার প্রতিবিপ্লবী প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়ার জঘন্যতম শক্তিগুলোর সঙ্গে তার যোগসাজশটা ঢাকা ছিল তার মুক্তি, গণতন্ত্র আর ইউক্রেনীয় স্বাধীনতার স্লোগানগুলো দিয়ে। নিজের দুর্বলতা বুঝে এবং জন-সমর্থন নেই দেখে রাদা আবেদন জানিয়েছিল আঁতাঁতের সরকারগুলোর কাছে। তারা রাদাকে সহায়তা দিতে দ্বিধা করে নি।

রাদার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইউক্রেনের মেহনতী জনগণ। খারকভে ইউক্রেনের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেস বসল ২৪এ ডিসেম্বর তারিখে। তার পরদিন —২৫এ ডিসেম্বর — ইউক্রেনে সোভিয়েত ক্ষমতার উদ্‌ঘোষণা হল।

ইউক্রেনের সোভিয়েত সরকার গড়া হল। এই সরকারের অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন সের্গেয়েভ (আর্তিয়ম), বোশ্‌, কোৎসিউবিন্‌স্কি, জাতোন্‌স্কি এবং স্ক্রিপ্‌নিক। সোভিয়েত সরকারের আহ্বানে ইউক্রেনের সর্বত্র মেহনতী জনগণ কেন্দ্রীয় রাদার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

কিয়েভে লড়াই চলেছিল কয়েক দিন ধরে, সেখানে বিপ্লবী শ্রমিকেরা ঘটিয়েছিল আর-একটা অভ্যুত্থান। বিভিন্ন সোভিয়েত সামরিক ইউনিট কিয়েভের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে শ্রমিকদের শক্তি বাড়িয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কিয়েভ মুক্ত হয়েছিল এবং সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম হয়েছিল প্রায় সমগ্র ইউক্রেনে।

এইভাবে, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসের শুরু নাগাত সোভিয়েতগুলি জয়লাভ করেছিল রাশিয়ার প্রায় সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রেই। বুর্জোয়া ক্ষমতা ছিল জার্মান আর অস্ট্রীয় সশস্ত্র শক্তির দখল করা এলাকাগুলিতে (লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়ার একাংশ, পশ্চিম বেলোরুশিয়ার একাংশ এবং পশ্চিম ইউক্রেনে), জর্জিয়ায়, আর্মেনিয়ায় এবং দেশের কোন কোন উপান্তবর্তী অঞ্চলে।

ব্রেস্ত্ শান্তিচুক্তি

যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসাটা ছিল নবীন প্রজাতন্ত্রের সামনে সবচেয়ে জরুরী এবং অগ্রাধিকার-পাওয়া একটা করণীয় কাজ। কিন্তু সেটা তো একতরফাভাবে করা যায় না — সেজন্যে শান্তি-সন্ধিচুক্তি সই করার দরকার ছিল। যুধ্যমান সমস্ত দেশের সঙ্গে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করে দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে একটা ডিক্রি পাস করা হয়েছিল। সেটাই ছিল পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্রসম্মত শান্তির জন্যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অবিরাম অভিযানের শুরু।

জার্মানির বিরুদ্ধে যুধ্যমান ফ্রান্স, বৃটেন, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের সরকারগুলির সঙ্গে শান্তির আলাপ-আলোচনা শুরু করার জন্যে সোভিয়েত সরকার ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে তাদের কাছে সরকারী প্রস্তাব তুলেছিল বারবার। প্রতিবারই সোভিয়েত সরকার বলেছিল, নিজ শর্তগুলিকে সে চূড়ান্ত বলে মনে করে না — সে অন্যান্য দেশের প্রস্তাবিত শর্তাদি নিয়েও আলোচনা করতে প্রস্তুত।

আঁতাঁতের সরকারগুলি এইসব আহবানের কোনটাতে উত্তর দিল না। সেই অবস্থায় সোভিয়েত সরকার জার্মানি এবং তার মিত্রদের সঙ্গে আপস-আলোচনা আরম্ভ করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে

(১৯১৭ সালে ডিসেম্বর মাসে) একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের বিশেষ দাবি অনুসারে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটা ধারায় জার্মানির সশস্ত্র শক্তি পূব থেকে পশ্চিম ফ্রণ্টে স্থানান্তরিত করা মানা ছিল।

২২এ ডিসেম্বর তারিখে বেলোরুশিয়ার ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক নামে ছোট শহরে একটা শান্তি সম্মেলন আরম্ভ হয়েছিল। এই সম্মেলনে কাইজার জার্মানির উদ্দেশ্য কোনক্রমেই গণতন্ত্রসম্মত এবং ন্যায্য শান্তি স্থাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়ার একাংশ এবং বেলোরুশিয়ার একাংশ জার্মানিকে ছেড়ে দিতে হবে বলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা দাবি করেছিল। এগুলি ছিল নগ্ন নির্লজ্জ পররাজ্যগ্রাসী দাবি। কিন্তু, সোভিয়েত সরকারকে তাতে রাজী হতে হয়েছিল। এইসব অসম্ভব কঠোর শর্তেও শান্তিচুক্তি সই করার ফলে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র পেয়েছিল বড় প্রয়োজনীয় দম ফেলার ফুরসত। যুদ্ধে-জর্জরিত মানুষের শান্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল আকুল। পুরন জারতান্ত্রিক ফৌজ খণ্ডবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল মূলত, সেটা যুদ্ধ চালাবার অবস্থায় ছিল না। লাল ফৌজ তখন সবে গড়ে উঠছিল, সেটা ছিল সংখ্যায় ক্ষুদ্র, ট্রেনিংয়ে খাটো। কাজেই, যথাসম্ভব শীঘ্র শান্তির সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের জন্যে লেনিন তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু, এই বিষয়ে পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে মতদ্বৈধতা ছিল। বুখারিনের নেতৃত্বে 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' একটা গ্রুপ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিল — তারা বলেছিল, সেটা হবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার 'বৈপ্লবিক' যুদ্ধ। শান্তির সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের বিরুদ্ধে তর্ক তুলে ত্রৎস্কি 'না যুদ্ধ, না শান্তির' সূত্র তুলে ধরেছিলেন।

তবে, স্ভের্দলভ, সের্গেয়েভ (আর্তিয়ম), স্তালিন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যের সমর্থনে লেনিন যুদ্ধ শেষ করে দেবার জন্যে প্রবল প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খুলে দেখিয়ে

দিলেন, বুখারিনের আর ত্রৎস্কির কর্মধারা হঠকারী, মূলতই ভ্রান্ত, চূড়ান্ত মাত্রায় হানিকর — তার পরিণতিতে আসতে পারে শুধু সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিনাশ।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ইতোমধ্যে তাদের চাপ বাড়িয়ে চলছিল। কাইজার ভিলহেল্মের হুকুম অনুসারে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯১৮ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দাবি করলেন, সোভিয়েত রাশিয়াকে জার্মান শর্তগুলি গ্রহণ করতে হবে অবিলম্বে। ব্রেস্ত্'এর আপস-আলোচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সভাপতি ছিলেন ত্রৎস্কি — তিনি লেনিনের প্রত্যক্ষ নির্দেশের বিরোধিতা করে শান্তিচুক্তিতে সই দিতে নারাজ হলেন। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দরকার ছিল ঠিক এটাই। সোভিয়েত ক্ষমতা উচ্ছেদ করার মতলবে জার্মান হাই কম্যান্ড আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি শুরু করে দিল অবিলম্বে। রিগা উপসাগর থেকে ডানিউব নদীর মোহনা অবধি সমগ্র ফ্রন্ট বরাবর লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে,— রাশিয়ার অবস্থানগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাল ৭,০০,০০০ জার্মান আর অস্ট্রীয় সৈনিক। শত্রুর শ্রেষ্ঠতর শক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ দাঁড় করাতে না-পেরে পুরন জারতান্ত্রিক ফৌজের অবশেষগুলো পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করল। পেত্রগ্রাদ, মস্কো এবং কিয়েভের বিরুদ্ধে এগোতে থাকল জার্মান ডিভিশনগুলো।

জার্মান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের কাছে আহ্বান জানাল। ২২এ ফেব্রুয়ারি ভোরে মস্কো, পেত্রগ্রাদ, ত্ভের, ইয়ারোস্লাভ্ল, খারকভ এবং অন্যান্য শহরে শ্রমিক মহল্লাগুলির মানুষ জেগে উঠল শিঙার বিপদ-সংকেতে আর সাইরেনের চিৎকারে। শ্রমিকেরা ছুটে গেল নিজ নিজ কল-কারখানায়। সেখানে দেয়ালে-দেয়ালে সাঁটা খবরের কাগজগুলোর কাছে কাছে তারা জড়ো হল রাস্তার ক্ষীণ আলোয়। সারা-পৃষ্ঠা জুড়ে শিরোনাম ছিল 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি

বিপন্ন!' আর তার নিচে ছিল সোভিয়েত সরকারের একটা ডিক্রি—লেনিনের লেখা। তার গোড়ায় ছিল: 'সমস্ত দেশের পুঁজিপতিদের দেওয়া কাজের ভার প্রতিপালনের জন্যে জার্মান সমরবাদ চাইছে **রুশী আর ইউক্রেনীয় কৃষকদের গলা টিপে মারতে, ভূস্বামীদের ভূমি ফিরিয়ে দিতে, কল-কারখানা ব্যাঙ্কারদের হাতে এবং ক্ষমতা রাজতন্ত্রের হাতে ফিরিয়ে দিতে।**'*

সর্বত্র কারখানায়-কারখানায় কর্মশালাগুলোতে সংক্ষিপ্ত সভা হল। প্রত্যেকটা সভায় ডাক দেওয়া হল: 'বিপ্লব রক্ষার জন্যে সবকিছু! হাতে নাও অস্ত্র!' লাল ফৌজের স্বেচ্ছাসৈনিক হবার জন্যে নাম লেখাবার টেবিলগুলোতে একের পরে এক গিয়ে শ্রমিকেরা তালিকায় নাম দিয়ে নিজ নিজ সমাবেশকেন্দ্রে চলে গেল। লাল ফৌজে স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে নাম লেখাল পেত্রগ্রাদে প্রায় ৪০,০০০ আর মস্কোয় ৬০ হাজারের বেশি মানুষ।

ফেব্রুয়ারি মাসের সেই শীতার্ত দিনগুলিতে নবীন লাল ফৌজের ডিট্যাচমেণ্টগুলি পেত্রগ্রাদে আসার বিভিন্ন দূর-দূর প্রবেশপথে আগুয়ান জার্মান ডিভিশনগুলোকে রুখে দিল।

জার্মান আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সেই প্রথম-প্রথম লড়াইগুলিতে লাল ফৌজের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। তখন থেকে ২৩এ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

ইতোমধ্যে, 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' এবং ত্রৎস্কিপন্থীদের বাধা অতিক্রম করে লেনিন জার্মানদের সঙ্গে শান্তির সন্ধিচুক্তির জন্যে জোর তাগাদা দিলেন। এমন একটা সন্ধিচুক্তি সই করার জন্যে জনকমিসার পরিষদ জার্মান সরকারের কাছে বেতারে একটা প্রস্তাব পাঠাল। জার্মান জেনারেলেরা ততক্ষণে বুঝেছিল, আগে তাদের

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৭তম খণ্ড, ৩০ পৃঃ

যা হিসেব ছিল সেইভাবে এক-ঘায়ে সোভিয়েত ক্ষমতাকে কুপোকাত করতে তারা পারবে না। তারা দেখল, লাল ফৌজের পিছনে রয়েছে লক্ষ-লক্ষ শ্রমিক আর কৃষক, তারা সোভিয়েত ক্ষমতার সমর্থনে শেষপর্যন্ত লড়ে যেতে প্রস্তুত। ফলে, শান্তিচুক্তি সই করতে জার্মান সরকার রাজী হল, কিন্তু তার শর্তগুলো হল আগেকার চেয়েও কঠোর: সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে ছেড়ে দিতে হল গোটা বল্টিক অঞ্চল, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, তাছাড়া দেবার শর্ত থাকল বিপুল পরিমাণ খেসারত। এসব শর্ত ছিল অসম্ভব রকমের কঠোর এবং অবমাননাকর। কিন্তু, অন্য কোন পথ ছিল না; সোভিয়েত ক্ষমতাকে বাঁচাবার জন্যে শান্তি দরকার ছিল যেকোন শর্তে।

১৯১৮ সালে ৩রা মার্চ তারিখে ব্রেস্তে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল* জার্মানি এবং তার মিত্রদের সঙ্গে শান্তির সন্ধিচুক্তিতে সই দিল, তার নাম হল ব্রেস্ত্'এর শান্তিচুক্তি। 'বামপন্থী কমিউনিস্ট' এবং বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের বাধা সত্ত্বেও, ১৪ই মার্চ তারিখে চতুর্থ সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে ঐ সন্ধিচুক্তি অনুসমর্থিত হল।**

এই সন্ধিচুক্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু যা সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন এবং সবচেয়ে বুনিয়াদী সেটাকে সোভিয়েত জনগণ বজায় রাখল এই সন্ধিচুক্তি করে — সেটা হল সোভিয়েত ক্ষমতা। জার্মান বেঅনেট দিয়ে সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা উচ্ছেদ করার অপচেষ্টা ব্যর্থ হল।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র দম ফেলার ফুরসত পেল। হতাশ হয়ে না-প'ড়ে সোভিয়েত ক্ষমতা সংহত করার কাজে লেগে যাওয়া, নতুন

* নতুন সোভিয়েত প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল গেওর্গি চিচেরিন, লেভ কারাখান, গ্রিগোরি পেত্রভ্স্কি এবং গ্রিগোরি সকোলনিকভকে নিয়ে।

** চতুর্থ সোভিয়েত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল মস্কোয়। তার আগে সোভিয়েত সরকার পেত্রগ্রাদ থেকে উঠে এসেছিল মস্কোয়। ১৯১৮ সালের মার্চ মাস থেকে মস্কো হল রাজধানী।

সমাজ গড়া এবং শত্রুর যেকোন নতুন আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে এমন পরাক্রমশালী ফৌজ গড়ার কাজে লেগে যাওয়াই হল তখন সমস্যাটা। ব্রেস্ত শান্তিচুক্তির কঠোরতা সম্বন্ধে প্রকৃত কথাটা স্পষ্ট করে এবং প্রকাশ্যে জনগণকে জানিয়ে দিয়ে লেনিন চূড়ান্ত জয় সম্বন্ধে অটল আস্থা প্রকাশ করলেন। বাধা-বিপত্তি এবং পশ্চাদপসরণের সময়ে ভগ্নমনা হয়ে না-পড়তে পার্টিকে পরামর্শ দিয়ে তিনি কাজে হাত লাগাবার জন্যে সমস্ত মেহনতী মানুষের উদ্দেশে আহবান জানালেন। তিনি লিখলেন: '...সবচেয়ে অননুজ্ঞেয় হল হতাশা। শান্তির শর্তগুলো এত কঠোর যা বরদাস্ত করা যায় না। তবু, ইতিহাস তার ন্যায্য প্রাপ্য পাবে...

'আসুন, আমরা কাজ করি সংগঠিত করার জন্যে, সংগঠিত করার জন্যে, আবারও, সংগঠিত করার জন্যে! যাবতীয় ক্লেশ সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ আমাদেরই।'*

প্রথম প্রথম বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলি

'আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই প্রথম দিনটিতে অভিনন্দন জানাই!' —১৯১৭ সালে ৮ই নভেম্বর সকালে এই ব'লে লেনিন তাঁর কমরেডদের অভিবাদন জানিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হল — তখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ আরম্ভ করার পালা, পুরন কাঠামটাকে টেনে নামিয়ে দিয়ে নতুন কাঠাম গড়ার সময়।

রাষ্ট্রের প্রশাসনব্যবস্থা সংগঠিত করা, নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করা ছিল প্রথম কাজ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে তোলা পুরন রাষ্ট্রযন্ত্রটা ছিল শোষকদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে তাদের পরিকল্পিত। এমন রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিপ্লবের কাজে লাগানো

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৭তম খণ্ড, ৫২ পৃঃ

যায় না, সেটা ছিল স্পষ্ট। যা লেনিন লিখেছিলেন, যন্ত্রটাকে **'চূর্ণবিচূর্ণ করার', 'ভেঙে ফেলার'** দরকার ছিল, আর তার জায়গায় গড়া দরকার ছিল নতুন রাষ্ট্র — শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্র, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে রাষ্ট্র।

চূড়ান্ত মাত্রায় জটিল এই করণীয় কাজ সমাধা করা যেতে পারত কেবল রাষ্ট্র গড়ার কাজে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে, জনগণের সৃজনশীলতা এবং উদ্যমের ভিতর দিয়ে।

জনগণের বৈপ্লবিক সৃজনশীলতা সৃষ্টি করেছিল সোভিয়েতগুলিকে, সেগুলি তখন বিপ্লবের ফলে হয়ে উঠল কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থা। ১৯১৮ সালের বসন্তকাল নাগাত সারা দেশে বেশির ভাগ শ্রমিক আর সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি মিলে এক হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় বুর্জোয়া সরকারী সংস্থাগুলোকে — শহরের দুমা আর জেম্‌স্ত্‌ভোগুলোকে — সর্বত্র চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, প্রদেশগুলিতে ক্ষমতার একমাত্র সংস্থা থাকছিল সোভিয়েতগুলি।

সোভিয়েতগুলিতে মূর্ত হল প্রকৃত সোভিয়েত গণতন্ত্র; জনগণের সঙ্গে সোভিয়েতগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

'পদচ্যুত করার অধিকার সম্বন্ধে' ১৯১৭ সালে ২১এ নভেম্বর তারিখে লেনিনের সই করা সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ডিক্রিতে শ্রমজীবী জনগণকে এই অধিকার দেওয়া হল যে, যেসব প্রতিনিধি জনগণের আস্থাভাজন নয় বলে বিবেচিত হবে তাদের পদচ্যুত করা যাবে, তাতে কড়ার থাকল যে, ভোটদাতাদের অর্ধেকের বেশির দাবি হলে সোভিয়েত পুনর্নির্বাচিত হবে।

গ্রাম্য এবং শহরের সোভিয়েতগুলির নির্বাচন হতে থাকল নিয়মিতভাবে, তেমনি, বিভাগীয়, গুবের্নিয়া, জেলা এবং অন্যান্য স্থানীয় সোভিয়েতের কংগ্রেসও নিয়মিতভাবে হতে থাকল।

বিপ্লবের ঠিক পরেই পেত্রগ্রাদে কাজ আরম্ভ করল ক্ষমতার দুটো কেন্দ্রীয় সংস্থা — সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি (ভ. ৎস. ই. ক) এবং জনকমিসার পরিষদ (সোভ্‌নার্‌কম)। এই সংস্থাদুটির কোন আগে-তৈরি যন্ত্র ছিল না; সবকিছু আরম্ভ করতে হয়েছিল গোড়া থেকে।

জনকমিসারেরা পুরন মন্ত্রকগুলোতে গিয়ে সেখানকার কর্মকর্তাদের, বিশেষত উপরওয়ালা কর্মকর্তাদের বৈর মনোভাবের সম্মুখীন হলেন, তারা জনকমিসারদের নির্দেশ মানতে নারাজ হল, কাজ এড়িয়ে যেতে থাকল কিংবা তালগোল পাকিয়ে দিতে থাকল।

বুর্জোয়ারা মনে করেছিল, প্রলেতারিয়েতের তো নিজস্ব তালিম-দেওয়া কর্মিদল নেই — তারা পুরন যন্ত্র এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের ছাড়া শাসন চালাতে পারবে না। বিপ্লবের শত্রুরা হিসেব কষছিল যে, দেশটা অসাড় হয়ে পড়বে, তখন শ্রমজীবী জনগণ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

অন্তর্ঘাতকেরা কাজ চালাতে থাকল ভরসা ক'রে, তারা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে বৈষয়িক সাহায্য পেতে থাকল। প্রতিবিপ্লবীরা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে চার কোটি রুবল হাতিয়ে নিতে পেরেছিল, এই টাকা তারা দিচ্ছিল তাদের সঙ্গে সহযোগী সরকারী কর্মকর্তাদের। ব্যাঙ্কিং এবং শিল্পক্ষেত্রের চাঁইরা, যেমন রিয়াবুশিন্‌স্কি, অন্তর্ঘাতকদের যোগান দেবার জন্যে মোটা-মোটা টাকা বরাদ্দ করল। প্রতিবিপ্লবীরা সরকারী কর্মকর্তাদের কয়েক মাসের মাইনে অগ্রিম দিতে থাকল — তাতে শর্ত শুধু একটা: তারা বাড়িতে বসে থাকবে, কাজ করতে নারাজ হবে।

কিন্তু, প্রতিবিপ্লবীদের আশার ব্যর্থতা ছিল অবধারিত। দেশের নতুন কর্তারা — কল-কারখানা, যুদ্ধজাহাজ আর ফৌজী ইউনিটগুলির সব সাধারণ মানুষ — রাষ্ট্র-তরীখানিকে চালাতে এগিয়ে এল।

পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত জনকমিসারিয়েতে কাজ করতে এল বল্টিক নৌবহরের নাবিকেরা এবং পেত্রগ্রাদের 'সিমেন্স-শুক্কের্ত' কারখানার শ্রমিকেরা; স্বরাষ্ট্র-সংক্রান্ত জনকমিসারিয়েতের যন্ত্রটাকে গড়ার কাজে অংশগ্রহণ করল পুতিলোভ কারখানার শ্রমিকেরা; যোগাযোগ-সংক্রান্ত জনকমিসারিয়েতটিকে সংগঠিত করা হল পেত্রগ্রাদ এবং মস্কোর রেল-শ্রমিকদের সক্রিয় সাহায্যে।

এইসব শ্রমিক এবং নাবিক বিপুল বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়েছিল — কেননা, তাদের তেমন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু, এই কষ্টসাধ্য কাজে তাদের সহায় হয়েছিল তাদের বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং পার্টির করণীয় কাজ সমাধা করার জন্যে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ।

অন্তর্ঘাতী কল-কৌশলে কোন কাজ হল না দেখে মন্ত্রকগুলির আগেকার কর্মচারীরা কাজে ফিরতে আরম্ভ করল। জনকমিসারিয়েতগুলির কাজ চলতে থাকল আরও স্বচ্ছন্দে।

পুরন পুলিস যন্ত্রটাকে নষ্ট করে দিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়ল প্রলেতারীয় মিলিশিয়া, — জনগণের অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিল এই মিলিশিয়া। শোষকদের স্বার্থের পাহারাদার পুরন বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের আদালতী ব্যবস্থাটাকেও নাকচ করে তার জায়গায় বসানো হল নতুন জন-আদালত — এই আদালত জনগণের স্বার্থের রক্ষক।

প্রতিবিপ্লবের সহিংস প্রতিরোধের পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের দরকার ছিল একটা সতর্ক প্রহরারত এবং কার্যকর প্রতিরক্ষা সংস্থা। ১৯১৭ সালে ২০এ ডিসেম্বর জনকমিসার পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে গড়া হল 'প্রতিবিপ্লব এবং অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে বিশেষ সারা-রাশিয়া কমিশন' (চেকা), তার সভাপতি হলেন ফেলিক্স দ্জেরঝিন্স্কি। চেকা হয়ে উঠল বিপ্লবের খড়্গ, আর বুর্জোয়াদের যম। শ্রমজীবী জনগণের সমর্থনে

সোভিয়েত চেকা শত্রুর ষড়যন্ত্রগুলোর উপর নজর রাখতে এবং প্রতিবিপ্লবের উপর জোরালো জোরালো আঘাত হানতে পেরেছিল।

বিভিন্ন পরাক্রমশালী শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না নিজস্ব সশস্ত্র শক্তি ছাড়া। লেনিন বলেছিলেন: 'যে-বিপ্লব আত্মরক্ষা করতে পারে না তার কোন মূল্য নেই।'* শোষকদের গড়া পুরন ফৌজ শ্রমিক এবং কৃষকদের পক্ষে কাজের ছিল না। দরকার ছিল একেবারে নতুন ভিত্তিতে গড়া নতুন ফৌজ। কাজেই, ১৯১৮ সালে ১৫ই জানুয়ারি তারিখে জনকমিসার পরিষদের একটা ডিক্রি প্রকাশিত হল শ্রমিক-কৃষকের লাল ফৌজ গড়ার বিষয়ে।

ঐতিহাসিক কৃতিত্বপূর্ণ কর্ম নিষ্পন্ন করল প্রলেতারিয়েত: প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা নিল নিজ হাতে। কিন্তু, বিপ্লব সংহত করা এবং নতুন সমাজ গড়ার করণীয় কাজের ক্ষেত্রে সেটা হল প্রথম ধাপ মাত্র। অর্থনীতিক্ষেত্রে বিভিন্ন মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন অবস্থান তখনও ছিল পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে — তারা ছিল কল-কারখানাগুলো এবং বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মালিক। বুর্জোয়াদের আর্থনীতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া এবং জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবস্থানগুলো হাতে নেবার দরকার ছিল।

১৯১৭ সালে ১৪ই নভেম্বর সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পাস করল 'শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত প্রবিধান'। সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চালু হল উৎপাদন আর বণ্টনের উপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ। কারখানা কমিটি ইত্যাদি বিভিন্ন নির্বাচিত সংগঠনের মারফত এই নিয়ন্ত্রণ খাটাত শ্রমিকেরা নিজেরাই। এর ফলে জনগণের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ এবং উদ্যম বিকশিত হল।

জাতীয় অর্থনীতি নিয়মনের জন্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন নিজস্ব সংস্থা গড়া হল। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'জাতীয়

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৮তম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ

অর্থনীতির উচ্চ পরিষদ’ স্থাপিত হল জনকমিসার পরিষদের অধীনে। তারপরে গড়া হতে থাকল বিভিন্ন বিভাগীয়, গুবের্নিয়া এবং জেলা আর্থনীতিক পরিষদ।

জাতীয় অর্থনীতির সঞ্জীবনী নার্ভ হল আর্থ ব্যবস্থা। সেই সময়ে দেশে অর্থের প্রচলন এবং ক্রেডিটের ব্যবস্থাদি তাৎপর্যসম্পন্ন মাত্রায় নির্ভর করছিল ব্যাংকগুলির ক্রিয়াকলাপের উপর, আর বুর্জোয়াদের হাতে যেসব নিয়ামক অবস্থান ছিল তার একটা ছিল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। সোভিয়েত ক্ষমতা বলিষ্ঠভাবে এবং নিষ্পত্তিমূলক উপায়ে ব্যাংকগুলিকে হাতে নিল। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং রাজস্ব দপ্তরে কর্মকর্তাদের অন্তর্ঘাত দমন করা হল: অন্তর্ঘাতকদের বরখাস্ত করা হল, বেশি উগ্র অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হল। বিপ্লবের প্রতি অনুরক্ত অর্থ-সংক্রান্ত কর্মীরা কল-কারখানা আর বিভিন্ন সামরিক ইউনিট থেকে এসে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে কাজ করল। এর পরে বেসরকারী ব্যাংকগুলির রাষ্ট্রীয়করণ হল।

উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম এবং ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের আর্থনীতিক অবস্থান ক্রমাগত সুস্থিত হয়ে উঠতে থাকল। তবে, পুঁজিপতিরা তখন শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তখনও ছিল কল-কারখানার মালিক। কিন্তু সেটা বেশি দিন নয়। ১৯১৭ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয়করণ আরম্ভ হল।

...প্রথম যে-প্রতিষ্ঠানটির রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল সেটা হল ভ্লাদিমির গুবের্নিয়ার লিকিনো গ্রামের একটা বড় কারখানা। ১৯১৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এই কারখানার মালিক স্মির্নভ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল, তার ফলে ৪,০০০ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছিল। কারখানাটা অচল হয়ে রইল, শেষে ৩০এ নভেম্বর লেনিনের সই করা একটা ডিক্রিতে কারখানাটাকে রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হল।

এর পরে উরাল অঞ্চলে, পেত্রগ্রাদে এবং অন্যান্য অঞ্চলে আর শহরে বহু কল-কারখানা হল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ১৯১৮ সালের জুন মাস নাগাত পাঁচ-শ'র বেশি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল; ২৮এ জুন তারিখে জনকমিসার পরিষদের একটা ডিক্রি জারি করা হয়েছিল সমস্ত মূল শিল্পশাখার বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে। বহির্বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াও চালু হয়েছিল ১৯১৮ সালের বসন্তকালে।

এইভাবে পুঁজিপতিদের রাজনীতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল শুধু তাই নয়, তাদের আর্থনীতিক কর্তৃত্বও ঘুচিয়ে দেওয়া হল। তবে, দখলচ্যুতকারীদের দখলচ্যুত করা, মনিবদের খেদিয়ে দেওয়া এবং তাদের ব্যাঙ্ক আর কল-কারখানাগুলো কেড়ে নেওয়াটা হল বিষয়টার আধখানা মাত্র। অর্থনীতির ব্যবস্থাপন এবং জনগণের জন্যে আর জনগণের নিজেদের দ্বারা উৎপাদন আর বণ্টন সংগঠিত করতে শেখা তখন আবশ্যক হয়ে পড়ল।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ার পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধানের উপায়-উপকরণ তুলে ধরা হয়েছিল, — লেনিনের কতকগুলি রচনায়, প্রধানত 'সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য' প্রবন্ধে (১৯১৮ সালের বসন্তকালে প্রকাশিত) ছিল এই পরিকল্পনা।

তখন রাশিয়া ছিল প্রধানত ছোট কৃষকের দেশ, তাতে — লেনিন বলেছিলেন — ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদনের প্রাধান্য ছিল, সেটা ছিল পুঁজিতন্ত্রের বজায় থাকা এবং পুনঃপ্রবর্তনের একটা ভিত্তি। এই পেটি-বুর্জোয়া ধারাটা ছিল সোভিয়েত ক্ষমতা এবং সমাজতন্ত্রের প্রধান বিপদ, — অর্থনীতিক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্ভাব্য সর্বতোভাবে মজবুত করে তুলে সেটাকে অতিক্রম করতে হত। কিন্তু, আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের বিদ্যাটাকে আয়ত্ত না-করে সেটা করা যায় না। লেনিন লিখলেন: '...শ্রমিক শ্রেণী যখন শেখে কী করে অর্থনীতি চালাতে হয়, আর শ্রমজীবী জনগণের কর্তৃত্ব যখন

পোক্ত হয়ে কায়েম হয়, একমাত্র তখনই সমাজতন্ত্র দানা বেঁধে উঠতে এবং সংহত হতে পারে। সেটা ছাড়া সমাজতন্ত্র নিছক জাগরস্বপ্ন।'*

ব্যবস্থাপনের সুদক্ষ বন্দোবস্তের বিশদ নির্দেশপঞ্জি বিবৃত করলেন লেনিন। জনগণকে তিনি বললেন, আর্থিক বিষয়াবলিতে যথাযথ এবং সৎ হতে হবে, অর্থনীতি চালাবার ব্যাপারে মিতব্যয়ী হতে হবে, নিষ্ক্রিয়তা দূর করতে হবে, শ্রমে-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে কড়াকড়িভাবে। উৎপাদন এবং বণ্টনের হিসাবরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করা ছিল বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। ব্যবস্থাপন সংগঠিত করাটা ছিল জটিল এবং অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কেননা পুঁজিতন্ত্রের আমলে শ্রমজীবীরা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং করণকৌশল অর্জন করার কোন সুযোগ পায় নি। তবু, শ্রমিক শ্রেণী এইসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে আরম্ভ করল। উৎপাদন ধাপে-ধাপে উপযুক্ত রূপ ধারণ করল, — একটা নতুন, সচেতন এবং কমরেডীয় ধরনের শ্রম-শৃঙ্খলা গড়ে উঠে মজবুত হয়ে উঠল।

বিপ্লবের খরস্রোত বইল বিশাল দেশ জুড়ে, সেটা প্রবেশ করল সমাজদেহের প্রতিটি রন্ধ্রে, পুরন আর সেকেলে সবকিছু ভেসে গেল সেই স্রোতে।

১৯১৭ সালের ২৪এ নভেম্বর তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং জনকমিসার পরিষদের জারি করা একটা ডিক্রিতে জনসাধারণের সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ এবং সমস্ত রকমের বিশেষ সামাজিক সুবিধা আর বাধানিষেধ লোপ করা হল। সমস্ত রকমের খেতাব এবং পদবিও লোপ করা হল।

গ্রামাঞ্চলে চলছিল একটা বিপুল রূপান্তর। ভূমির ডিক্রি অনুসারে কৃষকেরা বড় বড় জমিদারি-তালুকদারিগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে ভূমি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল।

---

* ভ. ই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলি, ২৮তম খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ

১৯১৮ সালের বসন্তকাল নাগাত ভূস্বামী শ্রেণী মূলত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভূমি, পশু-সম্পদ এবং সরঞ্জামাদি চলে গিয়েছিল কৃষকদের হাতে।

এইভাবে ইতিহাসে সেই প্রথম গোটা শোষক শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গেল — বিলুপ্ত হল বৈপ্লবিক উপায়ে। এটা হল বিপ্লবের সবচেয়ে বড় একটা সাধন। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-শক্তিগুলির বিন্যাসে বিভিন্ন মূলগত পরিবর্তন ঘটেছিল। কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে বঞ্চিত স্তরটা — ভূস্বামীর ভূমিতে খাটা খেত-মজুর — আর রইল না। গরিবদের বেশ একটা অংশ ভূমি পেয়ে হয়ে দাঁড়াল মাঝারি কৃষক।

তবে, ভূস্বামীর সম্পত্তির অধিকার লোপ পাওয়ায় শুধু তারই ফলে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অসমতা দূর হয়ে গেল না। ভূমি বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে গ্রামীণ ধনিকেরা — কুলাকেরা — উচ্ছেদ-করা জমিদারদের ভূমির বেশ একটা অংশ গ্রাস করেছিল, তারা আশা করেছিল এইভাবে তারা নিজেদের অবস্থা মজবুত করে গরিব কৃষকদের উপর শোষণ বাড়াতে পারবে। স্বভাবতই, মেহনতী কৃষকেরা প্রচন্ড প্রতিরোধ চালিয়েছিল এর বিরুদ্ধে। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংগ্রাম বেড়ে উঠে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত প্রলক্ষণ নিয়ে দেখা দিল — এটা হল কুলাকদের বিরুদ্ধে গরিব কৃষককুলের বিপ্লব।

অতীতের নিকৃষ্টতম একটা অবশেষকে বিপ্লব বিনষ্ট করে দিল — সেটা হল পুরুষ এবং নারীর মধ্যে অসমতা। 'বিধানিক বিবাহ, সন্তান এবং রেজিস্ট্রারের দপ্তর সম্বন্ধে' ১৯১৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখের ডিক্রিতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকারের ব্যবস্থা করা হল।

সোভিয়েত রাষ্ট্র অর্থোডক্স চার্চের সমস্ত বিশেষ অধিকার লোপ করল, রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে এবং গির্জা থেকে বিদ্যালয়কে পৃথক

করে দিল, এইভাবে জাতীয় শিক্ষার উপর থেকে গির্জার প্রভাব দূর করে দিল। পূর্ণাঙ্গ বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হল। 'যেকোন ধর্মমত ব্যক্ত করার এবং আদৌ কোন ধর্মমত ব্যক্ত না-করার জন্যে প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার' সম্বন্ধে একটা অনুশাসন জারি হল।

রাশিয়ার জাতিগুলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল যে-শিকল দিয়ে সেটা বৈপ্লবিক ঝঞ্চায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। 'রাশিয়ার জাতিগুলির অধিকার-সংক্রান্ত ঘোষণা'র চারটে সংক্ষিপ্ত দফায় মূর্ত হল জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাতে উদ্‌ঘোষিত হল রাশিয়ার জাতিগুলির সমতা এবং সার্বভৌমত্ব; পৃথক হয়ে গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার অধিকার সমেত জাতিগুলির অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার; যেকোন এবং যাবতীয় জাতীয় এবং জাতীয়-ধর্মীয় বাধানিষেধ প্রত্যাহার; এবং রাশিয়ার রাজ্যক্ষেত্রের অধিবাসী অ-রুশ সংখ্যালঘু এবং নৃকুলগত জনসমষ্টির অবাধ বিকাশ।

রাশিয়া আর শাসক এবং নিপীড়িত জাতিতে বিভক্ত রইল না। দেশের বড়-ছোট সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হল। জাতীয় অঞ্চলগুলির শ্রমজীবীদের রাজনীতিক চেতনা এবং ক্রিয়াকলাপ দ্রুত বেড়ে চলল। সোভিয়েত ক্ষমতার শক্তি বাড়িয়ে তারা নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা সৃষ্টি করল। অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি অনুসারে সমস্ত জাতি সোভিয়েত রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে যাবার সুযোগ পেল। এই সুযোগ নিয়েছিল ফিনল্যান্ড, যা আগে ছিল রাশিয়ার অঙ্গ, সোভিয়েত সরকার সঙ্গে সঙ্গেই ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু, দেশের অন্যান্য সমস্ত জাতি নিজ নিজ সোভিয়েত রাষ্ট্রসত্তা কায়েম করার সঙ্গে সঙ্গে রুশ জাতির সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করে তুলল। তারা বুঝল,

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং রুশ জাতি আর তার শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব খুলে দেয় জাতীয় নবজীবনের পথ —আগে-নিপীড়িত জাতিগুলির রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির পথ।

নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিধিমতো নাম হল রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (রু. সো. ফে. স. প্র.)। ১৯১৮ সালে ১০ই জুলাই পঞ্চম সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল।

রু. সো. ফে. স. প্র-র রাষ্ট্রীয় প্রতীক-চিহ্ন ছিল — উদীয়মান সূর্যের রশ্মির লাল পটভূমিতে শস্যমঞ্জরি দিয়ে ঘেরা সোনালী কাস্তে আর হাতুড়ি, তার উপরে খোদিত — 'রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র', আর নিচে — 'সমস্ত দেশের শ্রমিক এক হও!'

কাস্তে আর হাতুড়ি এবং শস্যমঞ্জরিই শান্তি এবং সৃজনশীল শ্রমের একমাত্র প্রতীক ছিল না; রু. সো. ফে. স. প্র-র সমগ্র সংবিধান — পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের এই সংবিধান — জাতিতে-জাতিতে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের ভাব-ধারণায় ভরপুর ছিল।

১৭টা অনুচ্ছেদ এবং ৯০টা ধারার এই সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছিল বিপ্লবের রাজনীতিক এবং সামাজিক-আর্থনীতিক সাধনগুলি, লিপিবদ্ধ হয়েছিল নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যগুলি, কেন্দ্রে এবং স্থানিকভাবে সোভিয়েত ক্ষমতার গঠন সূত্রবদ্ধ হয়েছিল এবং স্থাপিত হয়েছিল গণতন্ত্রসম্মত নির্বাচনী ব্যবস্থা। জাতি, ধর্ম কিংবা নিবেশ নির্বিশেষে প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটি নাগরিক ১৮ বছর বয়স হলে ভোটাধিকারী হবে বলে ব্যবস্থা হল।

বিপ্লবের জয়ের ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আপনা থেকে স্থাপিত হয়ে যায় নি। শোষক শ্রেণীগুলোকে এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণের উদ্ভবের কারণগুলোকে সম্পূর্ণত দূর করার জন্যে বছরের পর বছরের তীব্র সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। হিংস্র প্রতিরোধ চালিয়েছিল শোষকেরা। সে-অবস্থায় সংবিধানে শোষকদের অধিকার সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। বিনা-শ্রমে পাওয়া আয়ে যাদের চলে তাদের, মুনাফা করার উদ্দেশ্যে যারা মজুরি দিয়ে লোক খাটায় তাদের, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের এবং অন্যান্য শোষকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় নি। তবে, এমনসব লোক ছিল জনসংখ্যার নগণ্য অংশ মাত্র, ঐসব ব্যবস্থাও ছিল সাময়িক। সোভিয়েত জনগণ সমাজতন্ত্র গড়ায় সাফল্যের পথ তৈরি করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরণকালের সমস্ত বাধা-নিষেধ অপসারিত করা হয়েছিল।

* * *

রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব কীভাবে ঘটেছিল, প্রথম-প্রথম বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলি কীভাবে সাধিত হয়েছিল, সেটা এযাবত বিবৃত করা হয়েছে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে মহাবিপ্লব বলা হয় সঙ্গত কারণেই। এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের পরিসর ছিল অভূতপূর্ব, এর আগে যত বিপ্লব মানবজাতির জানা ছিল সেগুলি থেকে এ বিপ্লব মূলনীতির দিক দিয়ে পৃথক — তাই এটা মহাবিপ্লব। ইতিহাসে এই প্রথম বিপ্লব শোষকদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করল, তাদের আর্থনীতিক ক্ষমতার ভিত্তি ধূলিসাৎ করে দিল, রাষ্ট্রের শীর্ষে স্থাপন করল শ্রমজীবী জনগণকে, উৎপাদনের উপকরণগুলিকে করে দিল সমগ্র জনগণের সম্পত্তি। সৃষ্টি হল একটা নতুন ধরনের রাষ্ট্র — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আর উদ্ভূত হল এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র —

শ্রমজীবী জনগণের জন্যে গণতন্ত্র। মানুষের উপর মানুষের শোষণের পূর্ণ বিলুপ্তি এবং সামাজিক অবিচার থেকে মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার সূচনা করল এই বিপ্লব। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের জয় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ফ্রণ্টে ভাঙন ধরাল; দেখা দিল সোভিয়েত শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র — সে-রাষ্ট্র হল বিশ্ব-বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা গড়-প্রাকার। এ বিপ্লব মানবজাতির ইতিহাসে সূচনা করল এক নতুন যুগের — পুঁজিতন্ত্রের পতন এবং সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের বিজয়-সমারোহের যুগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক আক্রমণ-হস্তক্ষেপ এবং আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১৯১৮—১৯২০

আক্রমণ-হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের আরম্ভ

রাশিয়ার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থনে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। কিন্তু, যেসব সমষ্টি আগে ক্ষমতায় ছিল, এবং বিশেষ অধিকারাদি ভোগ করত, তারা জয়যুক্ত বিপ্লবের বিরুদ্ধে জেদী সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল। এদের মধ্যে অবশ্যই ছিল ভূস্বামীরা, যারা তাদের ভূমি হারিয়েছিল, ছিল পুঁজিপতিরা, যাদের কল-কারখানাগুলোর রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছিল, ছিল ব্যাঙ্কাররা, ইত্যাদি। ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আমলাবর্গ আর অফিসারদের — তাদের বেশ একটা অংশও দাঁড়িয়েছিল জনগণের ক্ষমতার বিরুদ্ধে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জারতন্ত্র একটা বিশেষ ধরনের বিশেষ-সুবিধাভোগী সামরিক ক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল — সেটা ছিল কসাক সৈন্যদলগুলো। সংখ্যায় বেশই গুরুত্বসম্পন্ন এইসব সৈন্যদল ছড়ানো ছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে (দন এলাকায়, উত্তর ককেশাসে, দক্ষিণ উরাল অঞ্চলে, এবং সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে)। কসাকদের মধ্যে একটা স্পষ্ট স্তরভেদ ঘটে গিয়েছিল — মেহনতী কসাকরা এসে গিয়েছিল বিপ্লবের পক্ষে। তবে, কসাক চাঁইরা গোড়ায় কসাক সৈন্যদলগুলোর একটা অংশকে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে পেরেছিল।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে কার্যকরণ চালিয়েছিল উপরতলার যাজকসম্প্রদায়ও — অর্থোডক্স, ক্যাথলিক এবং মোসলেম, তাছাড়া, প্রাচ্যের উপান্তবর্তী জাতীয় অঞ্চলগুলির সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক মহলগুলো। গ্রামীণ বুর্জোয়ারা — কুলাকরা — তো প্রকাশ্য সোভিয়েতবিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলই।

ক্ষমতা দখল করার জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর আগেকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, একথা মনে রেখে প্রতিবিপ্লব নিশ্চিতই ছিল যে, আগেপিছে তাইই ঘটবে আবারও। প্রতিবিপ্লব এবং তার সশস্ত্র শক্তি (যার নাম হয়েছিল 'শ্বেতরক্ষী') বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সহায়-সমর্থন ব্যাপক পরিসরে পাবে বলে ভরসা করেছিল, পরবর্তী ঘটনাবলিতে দেখা গিয়েছিল তাদের এই হিসেবটার বনিয়াদ পাকা-পোক্তই ছিল বটে।

এইভাবে, বিপ্লবের বিরোধী শক্তি ছিল বেশ মোটারকমই। তার উপর, অনেকে, বিশেষত বুদ্ধিজীবিসমাজের অনেকে বিপ্লবের শত্রু না-হলেও দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিল, দেশে সংঘটিত বৈপ্লবিক রূপান্তরগুলির বিপুল জোয়ার দেখে তারা বিহ্বল এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের একেবারে প্রথম দিনগুলি থেকেই, নবীন প্রজাতন্ত্রের শত্রুরা আর্থনীতিক অন্তর্ঘাত এবং রাজনীতিক সংগ্রাম চালানো ছাড়াও, সোভিয়েত ক্ষমতা উচ্ছেদ করে পুরন হালচাল আবার কায়েম করার জন্যে ক্রমাগত হিংস্রতর সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল।

সোভিয়েত ক্ষমতা উদ্‌ঘোষণার পরে দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে হর্ষধ্বনি থামতে-না-থামতেই পেত্রগ্রাদের প্রবেশপথগুলোতে কামানগর্জন শোনা গেল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি পেত্রগ্রাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা বিদ্রোহ সংগঠিত

করেছিলেন: জেনারেল ক্রাস্‌নভের সঙ্গে মিলে কতকগুলো সামরিক ইউনিট জড়ো করে তিনি জয়যুক্ত শ্রমিক এবং কৃষকদের 'ঠাণ্ডা করতে' নেমেছিলেন। কেরেনস্কি-ক্রাস্‌নভের সৈন্যদলগুলো পেত্রগ্রাদের নিকট-প্রবেশপথগুলোতে পৌঁছেছিল, কিন্তু ১২ই নভেম্বর তারিখে বিপ্লবী শ্রমিক, নাবিক আর সৈনিকেরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে হটিয়ে দিয়েছিল। কেরেনস্কি পালিয়েছিলেন; ক্রাস্‌নভ বন্দী হবার পরে তিনি সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে আর লড়বেন না বলে 'আত্মসম্মানের দোহাই পেড়ে প্রতিশ্রুতি' দেওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে বুর্জোয়ারা বহুসংখ্যক গুপ্ত সংগঠন গড়েছিল — এইগুলির মারফত তারা চক্রান্ত ফাঁদত, বিদ্রোহ অন্তর্ঘাত আর সন্ত্রাসনের কার্যকলাপ সংগঠিত করত এবং সোভিয়েতবিরোধী প্রচার অভিযান চালাত। সামরিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রচেষ্টায় নিজস্ব সশস্ত্র শক্তি গড়ে তুলছিল প্রতিবিপ্লব। উত্তর ককেশাসে সোভিয়েতবিরোধী অফিসারেরা গড়ছিল তথাকথিত স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী, তার নেতৃত্বে ছিল পুরন জারতন্ত্রী জেনারেলেরা — আলেক্সেয়েভ, কর্নিলভ, দেনিকিন। কসাক অঞ্চলগুলিতেও গড়া হচ্ছিল বিভিন্ন সোভিয়েতবিরোধী ডিট্যাচমেণ্ট।

গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেবার জন্যে প্রতিবিপ্লবীদের প্রথম চেষ্টাগুলোর দ্রুত পরাজয় (পেত্রগ্রাদের কাছে কেরেনস্কি-ক্রাস্‌নভের পরাজয়, দক্ষিণ উরালে দুতোভের পরাজয় এবং দন নদীর ধারে কালেদিনের পরাজয়) থেকে সম্পূর্ণতই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সোভিয়েত ক্ষমতাকে সমর্থন করছিল, আর প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলোর উপর সোভিয়েত ক্ষমতার শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অপরিমেয়।

তবু, সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল না — বরং তার উল্টো,

মাসের পর মাস কাটতে সেটা পরিধিতে আর তীব্রতায় বেড়ে উঠল। এর ব্যাখ্যা মেলে শুধু একটা অবস্থা থেকে: সেটা হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সোভিয়েতবিরোধী আক্রমণ-হস্তক্ষেপ।

আঁতাঁতের সৈন্যদলগুলোকে সোভিয়েত রাশিয়ায় পাঠাবার কারণ হিসেবে সরকারীভাবে বলা হত, সেটা ছিল জার্মান সম্প্রসারণ রুখবার জন্যে। এ ব্যাখ্যা পরীক্ষায় টেকে না। রাশিয়ায় যখন আঁতাঁতের সৈন্যদল প্রথম নেমেছিল তখনও জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, তা ঠিক। কিন্তু, আসলে, আক্রমণ-হস্তক্ষেপ তাৎপর্যসম্পন্ন আকার ধারণ করেছিল জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে।

এই আক্রমণ-হস্তক্ষেপের আসল প্রকৃতিটা স্পষ্ট: এটা ছিল পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিত্ত-সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর আন্তর্জাতিক আক্রমণ-অভিযান। উইনস্টন চার্চিল একাধিক বার স্বীকার করেছিলেন, 'এটাকে জন্মক্ষণে টুঁটি টিপে মারাই' ছিল তাঁর লক্ষ্য। পৃথিবীর সর্বত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রসার সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলোকে মহা আতঙ্কিত করে তুলেছিল, তারা রাশিয়ার স্থাপন করা দৃষ্টান্তটিকে বিশেষভাবে বিপজ্জনক মনে করেছিল।

অক্টোবর বিপ্লব পশ্চিমী পুঁজিপতিদের তাদের রাশিয়ার কল-কারখানা, কনসেশন আর বিনিয়োজিত পুঁজি থেকে বঞ্চিত করেছিল, এটার ভূমিকাও খাটো ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের আরও আশা ছিল, আক্রমণ-হস্তক্ষেপ চালিয়ে রাশিয়াকে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলা যাবে, তার কোন কোন অংশকে উপনিবেশে পরিণত করা যাবে।

আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি আর দায়-দায়িত্ব সরাসরি লঙ্ঘন করে রুমানিয়া রাজ্য ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বেসারাবিয়া

দখল করে নিল। এর পরে বৃটিশ, জাপানী এবং মার্কিন আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী বাহিনীগুলো নামল সোভিয়েত উত্তরে (মুরমান্স্কে আর আর্খাঙ্গেল্স্কে) এবং সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে (ভ্লাদিভস্তকে)।
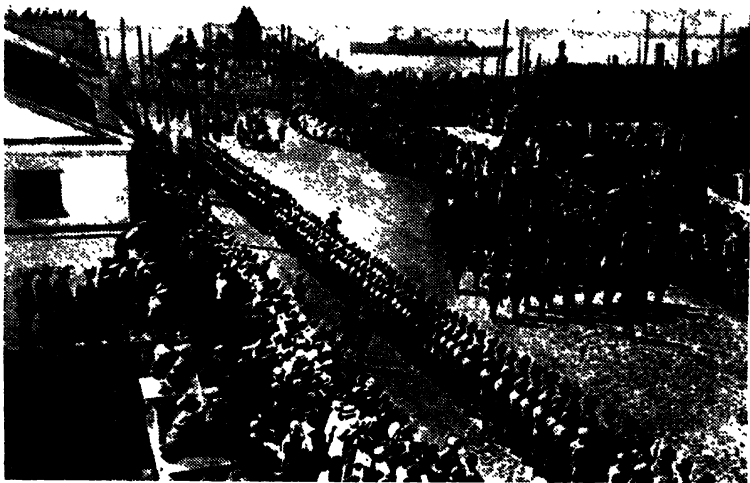
আর্খাঙ্গেল্স্কে বৃটিশ সৈন্যের অবতরণ। ১৯১৮

১৯১৮ সালে মে মাসের শেষের দিকে মধ্য ভলগা আর সাইবেরিয়ায় চেকোস্লোভাক সৈন্যদলে একটা বিদ্রোহ শুরু হল। চেক এবং স্লোভাকদের নিয়ে গড়া এই সৈন্যদল অস্ট্রীয় বাহিনীতে থেকে লড়েছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রুশীদের হাতে বন্দী হয়েছিল — তারা তখন সোভিয়েত সরকারের অনুমতি পেয়ে সাইবেরিয়া এবং সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপে ফিরছিল। কিন্তু, ইং-ফরাসী-মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ঐ সৈন্যদলের প্রতিক্রিয়াশীল পরিচালকদের মারফত সেটাকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে

সংগ্রামে ব্যবহার করতে পেরেছিল। রেলপথের মেইন লাইন বরাবর ছড়ানো এই সৈন্যদলের ৬০,০০০ ভালভাবে অস্ত্রসজ্জিত সৈনিক ভলগা অঞ্চলে এবং সাইবেরিয়ায় কতকগুলো শহর দখল করেছিল।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় অভিযান চালিয়েছিল আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা। ইরান থেকে এসে বৃটিশ ফৌজ ক্যাস্পিয়ান অঞ্চল দখল করেছিল।

গ্রাস-করা অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা কায়েম করেছিল ঔপনিবেশিক, সন্ত্রাসনের রাজত্ব। কমিউনিস্ট এবং সোভিয়েত আর ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীদের গ্রেপ্তার করে বন্দিশিবিরে রাখা হয়েছিল — তাঁদের অনেককে বধ করা হয়েছিল। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে সোভিয়েত ক্ষমতার নেতা ২৬ জন কমিসারকে বিনা-তদন্তে, বিনা-বিচারে বধ করা হল তার একটা সুবিদিত ঘটনা। ইংরেজরা এই বাকুর কমিসারদের আটক করে ক্যাস্পিয়ান অঞ্চলের মরুভূমিতে নিয়ে গুলি করে মেরেছিল —

বাকুর ২৬ জন কমিসারকে গুলি করে বধ করার দৃশ্য

এই কমিসারদের মধ্যে ছিলেন মেশাদি আজিজবেকভ, প্রকোফি জাপারিদজে, ইভান মালিগিন, ইভান ফিওলেতভ, স্তেপান শাউমিয়ান এবং অন্যান্য বিখ্যাত জননেতা।

সোভিয়েতবিরোধী আক্রমণ-হস্তক্ষেপে অংশগ্রহণ করেছিল ইউরোপ, আমেরিকা আর এশিয়ার মোট ১৪টা দেশ, তাতে মূল ভূমিকায় ছিল সবচেয়ে বড় পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলি — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স এবং জাপান। অক্টোবর বিপ্লবের পরের বছরটায় একদিকে আঁতাঁত এবং অন্যদিকে জার্মানি আর তার মিত্রদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল বলে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া তখনও বিভক্ত থাকার দরুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর একজোট হওয়া কিছুটা শক্ত ছিল। কিন্তু, সেই অবস্থার মধ্যেও ঐ যুধ্যমান পক্ষদুটো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মূলত যুক্ত কার্যকরণই চালিয়েছিল।

রাশিয়ার বিস্তৃত রাজ্যক্ষেত্রে জার্মান এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় দখলটা ইং-ফরাসী-জাপানী-মার্কিন আক্রমণ-হস্তক্ষেপের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে এসেছিল। আগে কখনও কোনো দেশের উপর এমন বিপুল এবং কেন্দ্রীভূত আক্রমণ হয় নি।

রাশিয়া এবং বহির্জগতের মধ্যে স্থলপথে এবং সমুদ্রপথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবরোধের মধ্যেই পড়েছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা শ্বেতরক্ষী প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে সরাসরি মৈত্রী স্থাপন করেছিল। অর্থ আর অস্ত্রশস্ত্রের মদত দিয়ে আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে যুক্ত কার্যকরণ চালিয়েছিল। আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের সরাসরি সমর্থন পেয়ে আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লব তার কার্যকলাপ প্রবলতর করে তোলার সুযোগ পেয়েছিল।

আগুনের বেষ্টনীর ভিতরে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র

ব্রেস্ত শান্তিচুক্তির ফলে যে-সংক্ষিপ্ত দম ফেলার ফুরসত পাওয়া গিয়েছিল সেটা ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি নাগাত শেষ হয়ে গেল। বৈদেশিক আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী এবং আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল সোভিয়েত ভূমি। সামরিক সমস্যাই তখন হয়ে দাঁড়াল বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন, বুনিয়াদী সমস্যা। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে সোভিয়েত ক্ষমতা বিপ্লবের আদর্শ রক্ষা করতে সমর্থ হবে কিনা, তারই উপর তখন রাশিয়ার জাতিগুলির ভাগ্য নির্ভর করছিল।

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে সমগ্র সোভিয়েত দেশ সাম্রাজ্যবাদের উসকানো যুদ্ধের আগুনে ছেয়ে গিয়েছিল। উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে এবং পশ্চিমে প্রচণ্ড লড়াই চলল আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে।

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে 'স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী' উত্তর ককেশাসের বেশ একটা অংশ দখল করল। জেনারেলদ্বয় ক্রাস্‌নভ আর মামোন্তভ একটা কসাক বিদ্রোহ ঘটিয়ে দন অঞ্চল দখল করে সারিৎসিন (এখন ভলগোগ্রাদ) এবং ভরোনেজের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাল।

চেকোস্লোভাক বিদ্রোহীরা এবং শ্বেতরক্ষীরা দখল করল সারা সাইবেরিয়া এবং ভলগা বরাবর কতকগুলি শহর — সামারা (এখন কুইবিশেভ), সিম্‌বির্স্ক (এখন উলিয়ানভ্‌স্ক) এবং কাজান। আতামান দুতোভের শ্বেত কসাক ডিট্যাচমেণ্টগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠে ১৯১৮ সালে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে দখল করল ওরেনবুর্গ। সোভিয়েত তুর্কিস্তান এইভাবে দেশের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

প্রচণ্ড লড়াই চলল উরাল অঞ্চলে। সেই এলাকায় প্রতিরোধের সোভিয়েত কেন্দ্র ইয়েকাতেরিনবুর্গের (এখন স্ভের্দলভ্স্ক) প্রবেশপথগুলোতে লড়াই চলেছিল সারা জুলাই মাস ধরে। আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা আর শ্বেতরক্ষীরা জানত প্রাক্তন জার নিকোলাই রমানভকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল ইয়েকাতেরিনবুর্গে, তারা আশা করেছিল তাঁকে মুক্ত করে নেবে, যাতে তাঁকে কেন্দ্র করে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোকে জড়ো করা যায়। উরাল বিভাগীয় সোভিয়েতের ডিক্রি অনুসারে ১৯১৮ সালে ১৭ই জুলাই তারিখে নিকোলাই রমানভকে গুলি করে মারা হয়েছিল। শ্বেতরক্ষীরা ঐ শহর দখল করেছিল তার এক সপ্তাহ পরে।

আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী এবং শ্বেতরক্ষীদের দখল-করা অঞ্চলগুলিতে (আর্খাঙ্গেলস্ক, সামারা, ওম্স্ক, ট্র্যান্স-ক্যাস্পিয়ান অঞ্চল এবং অন্যান্য জায়গায়) স্থাপন করা হয়েছিল বিভিন্ন সোভিয়েতবিরোধী, প্রতিবিপ্লবী 'সরকার', সেগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল মেনশেভিকরা আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা। এইসব সরকার প্রথমে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক স্লোগান ব্যবহার করেছিল ব্যাপকভাবে. তবে, বাস্তবে তারা তাদের সমস্ত কাজেই চলছিল বুর্জোয়া, ভূস্বামী আর বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের মর্জিমাফিক, আর প্রস্তুত করছিল নগ্ন সামরিক একনায়কত্বের পথ।

বহু ফ্রন্টের আগুনের বেষ্টনীতে ঘেরাও হয়ে পড়ল নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। সোভিয়েতগুলির লাল পতাকা তখন উড্ডীন ছিল শুধু মধ্য রাশিয়ার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যক্ষেত্রে।

অধিকন্তু, দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল কুলাক বিদ্রোহের ঢেউ, কতকগুলি অঞ্চলে (ভলগা অঞ্চলে আর সাইবেরিয়ায়) মাঝারি কৃষকেরা একটা দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সমর্থন করল।

কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হল সোভিয়েত রাষ্ট্র। ১৯১৮ সালে জুলাই মাসে লেনিন বললেন: ‘বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম সমাজতান্ত্রিক ডিট্যাচমেণ্ট হবার সর্বোচ্চ সম্মান আর সর্বোচ্চ দুরূহতা পড়েছে আমাদের উপর।’*

আক্রমণ-হস্তক্ষেপ এবং জার্মান দখলের দরুন খাদ্য, কাঁচামাল এবং জালানি উৎপাদনের বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চল থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। মস্কো, পেত্রগ্রাদ এবং অন্যান্য শহরে শ্রমিকদের রেশনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল অনশনের মাত্রায়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের তখন ছিল না দনেৎস অববাহিকার কয়লা, ক্রিভয় রোগ্-এর লৌহ-আকরিক, বাকুর তৈল, তুর্কিস্তানের তুলো। কাঁচামাল আর জালানির অভাবে কারখানার পর কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। ১৯১৮ সালে গ্রীষ্মকালের শেষাশেষি অচল হয়ে গিয়েছিল শিল্পায়তনগুলির প্রায় ৪০ শতাংশ।

‘বিনাশ কিংবা জয়!’ এই স্লোগান তুলে লড়ল সোভিয়েত জনগণ। ১৯১৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে একটা সম্মিলিত সামরিক শিবির বলে ঘোষণা করল সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। কমিটির ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের সিদ্ধান্তে ছিল: ‘সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতা আর সহায়সম্পদ ব্যবহৃত হবে উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পবিত্র আদর্শের সেবায়।’

শ্বেতরক্ষী এবং আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের সমস্ত সহায়-সম্পদ সমবেত করার কাজ সমন্বিত করার জন্যে শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিল ১৯১৮ সালের ৩০এ নভেম্বর।

সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তি গড়ার কাজটা ছিল অতি দুরূহ এবং জটিল ব্যাপার। লাল ফৌজকে গড়া হয়েছিল শ্রেণীগত ফৌজ

* ভ. ই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলি, ২৭তম খণ্ড, ৫৪৩ পৃঃ

হিসেবে — শ্রমিক আর শ্রমজীবী কৃষকদের ফৌজ হিসেবে; এই ফৌজের মেরুদণ্ড ছিল রুশী প্রলেতারিয়েত, তারা এসেছিল মস্কো, পেত্রগ্রাদ, ত্ভের, ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, নিজ্নি নভগোরদ, তুলার শিল্পকেন্দ্রগুলি থেকে, উরাল অঞ্চল থেকে। বহু প্রতিভাশালী এবং সাহসী সামরিক নেতা এসেছিলেন শ্রমজীবী জনগণের ভিতর থেকে। যুদ্ধের আগুনের ভিতর দিয়ে এসে দাঁড়ালেন এমনসব সেনাপতি: ভাসিলি ব্লিউখের, সেমিয়ন বুদিওনি, ক্লিমেন্ত ভরোশিলভ, সের্গেই লাজো, গ্রিগোরি কতোভ্স্কি, আলেক্সান্দর পার্খোমেঙ্কো, ইয়ান ফাব্রিৎসিউস, ইভান ফেদ্কো, মিখাইল ফ্রুঞ্জে, ভাসিলি চাপায়েভ, নিকোলাই শ্চোর্স, ইওনা ইয়াকির এবং অন্যান্য।

শ্রমিক এবং কৃষকদের ভিতর থেকে নতুন নতুন নেতৃস্থানীয় সামরিক কর্মী ট্রেনিং দেবার জন্যে অনেককিছু করার সঙ্গে সঙ্গে, জারতান্ত্রিক ফৌজে যারা কাজ করেছিল তাদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ সামরিক বিশেষজ্ঞদেরও সংগ্রহ করেছিল সোভিয়েত সরকার। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রজাতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর পক্ষ ধরলেও, পুরন অফিসারবাহিনীর প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন অংশটা সোভিয়েত ক্ষমতার জন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করেছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত: সের্গেই কামেনেভ — ইনি গৃহযুদ্ধের সময়ে হয়েছিলেন সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তির প্রধান সেনাপতি; বরিস শাপশনিকভ — ইনি ঐ বছরগুলিতে একটা ফিলড স্টাফের যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে প্রধান ছিলেন এবং পরে হয়েছিলেন সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক; আলেক্সান্দর ইয়েগোরভ এবং মিখাইল তুখাচেভ্স্কি — এঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টের পরিচালক ছিলেন এবং পরে হয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল; বিশিষ্ট সামরিক ইঞ্জিনিয়র দ্মিত্রি কার্বিশেভ — ইনি ১৯১৮—১৯২০ সালে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রক্ষায় সক্রিয়ভাবে

অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময়ে বীরের মৃত্যুবরণ করা অবধি প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

সৈন্যসমাবেশ করিয়ে লাল ফৌজের ইউনিটগুলি গড়ার জন্যে দেশের সর্বত্র জালের মতো বিস্তৃতভাবে স্থাপন করা হয়েছিল বহু আঞ্চলিক, গুবের্নিয়ার, জেলা এবং অন্যান্য স্থানীয় সামরিক কমিসারিয়েত। ১৯১৮ সালে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদ গঠিত হবার পরে সমস্ত ফ্রন্ট এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হয়েছিল, আর ঐ 'পরিষদ' কাজ করত সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে। কেন্দ্রীয় কমিটির একটা বিশেষ নির্দেশপত্রে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছিল, সামরিক বিভাগের কর্মনীতি 'কেন্দ্রীয় কমিটি মারফত প্রচারিত পার্টির সাধারণ নির্দেশাবলিকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে এবং সরাসরি এই কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়'।

ফ্রন্টগুলি এবং বাহিনীগুলির সৈন্যদলগুলিকে পরিচালিত করার জন্যে স্থাপিত হয়েছিল একটা একীভূত কাঠাম। প্রত্যেকটা ফ্রন্টের (কিংবা বাহিনীর) নেতৃত্বে গড়া হয়েছিল ফ্রন্টের (কিংবা বাহিনীর) সেনাপতি এবং দু'জন রাজনীতিক কমিসারকে নিয়ে বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদ।

লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিল হাজার-হাজার কমিউনিস্ট। ফ্রন্টে যাবার জন্যে সমাবেশ-করা কমিউনিস্টদের প্রতি উপদেশ ছিল: 'কমিউনিস্ট খেতাবটা দায়িত্ব চাপায় বহু, কিন্তু বিশেষ সুযোগ দেয় শুধু একটা — সেটা হল বিপ্লবের জন্যে লড়তে প্রথম জন হওয়া।'

লাল ফৌজকে নিয়মিত, উঁচু-মাত্রায় সুশৃংখল ফৌজ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে কঠোরভাবে কাজ করবার ভিতরে কমিউনিস্টরা ঢিলেমির বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম চালিয়েছিল। সেরা সেরা

মানুষ, যারা বৈপ্লবিক সংগ্রামে সবচেয়ে সম্যক পোড়-খাওয়া, তাদের করা হয়েছিল সামরিক কমিসার। ফৌজের শক্তি বাড়াতে এবং তার লড়িয়ে ক্ষমতা উন্নীত করার জন্যে, লাল ফৌজের সৈনিকদের রাজনীতিক তালিম দেবার কাজে এবং প্রাক্তন জারতান্ত্রিক ফৌজের সামরিক বিশেষজ্ঞদের ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট কমিসারদের ভূমিকা ছিল বিরাট।

পার্টি আর সোভিয়েত সরকারের বিপুল কাজের ফলে লাল ফৌজ গড়ে তোলার কাজটা চলেছিল সাফল্যের সঙ্গে। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে আর শরতে লাল ফৌজের সৈন্যশ্রেণীতে যোগ দিয়েছিল আট লক্ষ জনের বেশি।

সর্বজনীন সামরিক ট্রেনিং চালু করাটা ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সামরিক ক্ষমতা বাড়াবার একটা গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান। প্রজাতন্ত্রে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের সমস্ত নাগরিক আবশ্যিক সামরিক ট্রেনিং নিয়েছিল।

ইউরোপ আর এশিয়ার জাতিগুলির বহুমানুষও লাল ফৌজের সৈন্যশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে লড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধবন্দী, রুশ রাজ্যক্ষেত্রে কর্মরত বিদেশী শ্রমিক এবং দেশান্তরীদের নিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসৈনিক ডিট্যাচমেণ্ট গড়া হয়েছিল, সেগুলি লাল ফৌজেরই অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মহাবল, এবং রাশিয়ার শ্রমিক আর কৃষকেরা সমগ্র মানবজাতির জন্যে সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করছে এই উপলব্ধি বিভিন্ন দেশের অযুত-অযুত মানুষকে করে তুলেছিল রাশিয়ায় বিপ্লবের সৈনিক।

হাঙ্গেরীয়, চেক, পোল্, সার্বীয়, চীনা, কোরীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মানুষ সোভিয়েত ক্ষমতার জন্যে লড়েছিল রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। রুশী, ইউক্রেনী এবং বেলোরুশী সৈনিকদের সঙ্গে ছাউনির জীবনের যাবতীয় ক্লেশ আর দুর্দশার শরিক হয়ে

তারা তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল একই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে।

নবীন লাল ফৌজ তার প্রথম প্রথম বিজয়-সাফল্যগুলি লাভ করেছিল ১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম আর শরতের প্রচন্ড লড়াইগুলোতে।

সারা গ্রীষ্মকালে জেদী লড়াই চলেছিল মধ্য ভলগা অঞ্চলে, সেখান থেকে চেকোস্লোভাক আর শ্বেতরক্ষী ইউনিটগুলো জোর করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল দেশের মধ্য অঞ্চলগুলিতে। এই অঞ্চলের লড়াইটা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে চূড়ান্ত তাৎপর্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল।

১৯১৮ সালে অগস্ট মাসে লেনিন কাজানে প্রধান সেনাপতির সদরঘাঁটির কাছে লিখেছিলেন: '**সমগ্র** বিপ্লবের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে **একখানা** তাসের উপর: কাজান-উরাল-সামারা ফ্রণ্টে চেকোস্লোভাকদের বিরুদ্ধে দ্রুত জয়।'*

সোভিয়েত সরকারের গড়া পূর্ব ফ্রণ্ট ছিল পাঁচটা বাহিনী নিয়ে, এইসব বাহিনী গড়া হয়েছিল অতীব স্বল্প সময়ের মধ্যে। সেনাপতি, কমিসার, সাধারণ সৈনিক এবং প্রচারক হিসেবে কাজ করার জন্যে বহু কমিউনিস্টকে পাঠানো হয়েছিল পূর্ব ফ্রণ্টে। ১৯১৮ সালের শেষাশেষি এই ফ্রণ্টের বাহিনীগুলিতে সক্রিয় কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫,০০০।

গড়া হয়েছিল ভলগা সামরিক নৌবহর। নিজ্‌নি নভগোরদ (এখন গোর্কি) এবং ভলগা অঞ্চলের অন্যান্য শহরের শ্রমিকেরা বাষ্পীয় পোত আর বজরাগুলোকে অস্ত্রসজ্জিত করেছিল, আর মারিন্‌স্কায়া খাল-ব্যবস্থা দিয়ে বল্টিক সাগর থেকে আনানো হয়েছিল টর্পেডো-তরী।

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৪৪তম খন্ড, ১২২ পৃঃ

১৯১৮ সালের শরৎকালে পূর্ব ফ্রন্টের বাহিনীগুলি বড়রকমের বিভিন্ন জয়লাভ করেছিল। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে লাল ফৌজের ইউনিটগুলি ভলগা নদী বরাবর অবস্থিত সবচেয়ে বড় শহরগুলির একটা কাজান মুক্ত করেছিল; অক্টোবর মাসে তারা ঢুকেছিল সামারায়। দেশের সঞ্জীবনী ধমনী এই রুশী মহানদীর জন্যে লড়াইগুলির পর্যালোচনা করে লেনিন লিখেছিলেন: 'সামারা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভলগা মুক্ত।'

দন, দক্ষিণ ভলগা এবং উত্তর ককেশাসের অঞ্চলগুলি জুড়ে দক্ষিণ ফ্রন্টের সংগ্রাম ছিল ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালের, বিশেষত শরৎকালের সামরিক ঘটনাবলির মধ্যে বড়রকমের তাৎপর্য-সম্পন্ন। ভরোনেজ, সারিৎসিন এবং উত্তর ককেশাস অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত পাঁচটা বাহিনী নিয়ে এই ফ্রন্টে সোভিয়েত শক্তির সংগ্রাম চলেছিল দন আর কুবানের প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি, দেনিকিনের 'স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী' এবং উত্তর ককেশাসের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের গড়া ইউনিটগুলোর বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ ফ্রন্টের সারিৎসিন বিভাগে প্রচণ্ড লড়াই বেধেছিল গ্রীষ্মে আর শরতে। ১৯১৮ সালে শ্বেতরক্ষী সৈন্যদলগুলো সারিৎসিনের কাছাকাছি এসে পড়েছিল দু'বার (অগস্ট-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে); দু'বারই শহরের প্রবেশপথগুলিতে রক্তাক্ত এবং দুর্দান্ত লড়াই চলেছিল, সংখ্যায় ঢের বেশি হওয়া সত্ত্বেও ক্রাস্‌নভের ইউনিটগুলোকে দু'বারই প্রচণ্ড মার দিয়ে দন নদীর ওপারে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সারিৎসিন রক্ষার লড়াইয়ে নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন ভরোশিলভ, মিনিন এবং স্তালিন।

১৯১৮ সালের শরৎকালে উত্তরে আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের অগ্রগতি রুখে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম প্রথম সোভিয়েত পোস্টারগ্নলির একখানাতে জিজ্ঞাসা: 'আপনি স্বেচ্ছাসৈনিক হয়েছেন?'

শত্র্কে প্রতিহত করার জন্যে দেশের সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটাবার মধ্যে সোভিয়েত সরকার আভ্যন্তরিক ফ্রন্টে বৈপ্লবিক শৃঙখলা স্থাপনের জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। ঐ সময়ে প্রতিবিপ্লবের শ্বেত সন্ত্রাস চলেছিল বিস্তীর্ণ পরিসরে, সেটা বিভিন্ন চরম র্প ধারণ করেছিল। পেত্রগ্রাদে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কর্মী

ভ. ভলোদার্স্কি এবং ম. উরিৎস্কি'কে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করেছিল।

দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা লেনিনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল ১৯১৮ সালে ৩০এ অগস্ট তারিখে। মস্কোর একটা কারখানায় একটা সভার সময়ে কাপ্লান নামে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি দুটো বিষাক্ত বুলেট ছুঁড়ে লেনিনকে গুরুতরভাবে আহত করেছিল।

প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলো বিভিন্ন বিদ্রোহ আর অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাচ্ছিল সমানে; ১৯১৮ সালে শুধু জুলাই মাসেই প্রতিবৈপ্লবিক বিদ্রোহ ঘটেছিল মস্কোয়, ইয়ারোস্লাভ্লে, রিবিন্স্কে এবং আরও কতকগুলি শহরে। প্রাক্তন জারতান্ত্রিক অফিসার মুরাভিওভও একটা বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল — এই মুরাভিওভ ছিল পূর্ব ফ্রন্টে সোভিয়েত সামরিক শক্তির সেনাপতি। এইসব বিদ্রোহের প্রত্যেকটার মধ্যে তারা কমিউনিস্ট এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের খুন করেছিল। ইয়ারোস্লাভ্লে প্রতিবিপ্লবীরা হত্যা করেছিল গুবের্নিয়ার নির্বাহী কমিটির সভাপতি স. নাখিমসন্'কে এবং আরও শত-শত কমিউনিস্ট, সোভিয়েত দপ্তরের কর্মী এবং কারখানার শ্রমিককে।

এই কার্যকলাপ পরিচালনা করত আঁতাঁতের অনুচরেরা, তারা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল সরকারী কূটনীতিক প্রতিনিধি। প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিস, ফরাসী রাষ্ট্রদূত নুল্যান্স, মস্কোয় মার্কিন কন্সাল পুল, এবং বৃটিশ কূটনীতিক প্রতিনিধি লক্হার্ট। তখনকার বিভিন্ন দলিলপত্রে, ১৯২২ সালে বিচারের সময়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতাদের সাক্ষ্যে, ১৯২৪ সালে একটা বিচারে শ্বেতরক্ষী গুপ্ত সংগঠনের অন্যতম নেতা সাভিনকভের সাক্ষ্যে এবং

বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্মৃতিকথায় তাদের অংশগ্রহণের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

শত্রুদের প্রতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের আচরণ গোড়ায় ছিল নরম। অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের একজনকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় নি। জেনারেল ক্রাস্‌নভকে বন্দী করার পরে তাঁর 'আত্মসম্মানের দোহাই পেড়ে প্রতিশ্রুতি' অনুসারে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যা আগেই বলা হয়েছে (ঐ প্রতিশ্রুতি তিনি লঙ্ঘন করেছিলেন অবিলম্বেই)।

তবে, নৃশংস শ্বেত সন্ত্রাসের দরুন সোভিয়েত রাষ্ট্র কঠোর পাল্টা-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা ছিল জীবন-মরণ সংগ্রাম, তাতে শত্রু কোন দুষ্কর্মে দ্বিধা করে নি, তখন প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি একটুও সদয় হলে সেটা হত বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সমস্ত প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ নিষ্পত্তিমূলকভাবে এবং নির্মমভাবে দমন করা — শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস চালানোই ছিল তখন প্রলেতারিয়েতের পবিত্র কর্তব্য।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের নিগ্রহ-সংস্থা — ফেলিক্স দ্‌জেরজিন্‌স্কিকে প্রধান হিসেবে রেখে গড়া 'প্রতিবিপ্লব আর অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে বিশেষ সারা-রাশিয়া কমিশন' (চেকা) তার ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তুলল সোভিয়েত সরকারের নির্দেশ অনুসারে। প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলো, সন্ত্রাসবাদী আর ষড়যন্ত্রকারীদের উপর প্রচণ্ড প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় সহায়তায় চেকা শত্রুর ডজন-ডজন ষড়যন্ত্র বের করে ফেলল, বহু গুপ্ত সংগঠন ভেঙে দিল, ধরে ফেলল শত-শত রাষ্ট্রদ্রোহী, অন্তর্ঘাতক আর গুপ্তচরদের। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যখন পড়ে গিয়েছিল মারাত্মক বিপদের মধ্যে সেই সময়ে এই লাল সন্ত্রাস সোভিয়েতবিরোধী গুপ্ত সংগঠনের কার্যকলাপ বেশ ভালরকম মাত্রায়ই স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

ব্যবস্থাটা ছিল কঠোর, নিরুপায় অবস্থায় অবলম্বন-করা, কিন্তু অপরিহার্য।

লাল ফৌজের রসদাদি এবং সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদন এবং সেগুলি পেঁছে দেবার কাজ সংগঠিত করা ছিল সবচেয়ে আগে করার একটা কাজ। শ্বেতরক্ষী আর আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদ ইত্যাদি পেত ইউরোপীয় আর মার্কিন যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের কারখানাগুলো থেকে। জারের ফৌজের অবশিষ্ট যুদ্ধোপকরণ লাল ফৌজ গোড়ায় কাজে লাগিয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল স্বল্প। ফ্রণ্টের চাহিদা মেটাবার জন্যে যথাসম্ভব দ্রুত উৎপাদনের বন্দোবস্ত করার দরকার ছিল। শিল্পকে যুদ্ধের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার প্রক্রিয়াটা আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে।

প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত উৎপাদন সংগঠিত করতে হয়েছিল চূড়ান্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে। শত্রুর অবরোধের দরুন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাঁচামাল আর জালানির ঘাটতি ছিল প্রচণ্ড, তাছাড়া, বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের রাশিয়া থেকে পাওয়া পরিবহনব্যবস্থাটাও ছিল অত্যন্ত খারাপ অবস্থায়, শিল্প ছিল ক্ষয়ে-যাওয়া দশায়। কিন্তু, লাল ফৌজের জয়ের উপকরণ তৈরি করার কাজ হাতে নিল শ্রমিকেরা, তখন তাদের ইচ্ছাশক্তিকে কাবু করতে পারল না কোনকিছুই। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আবেদন প্রচার করা হল: 'লেদ্ আর ড্রিল, হাতুড়ি আর উখা হাতে নাও, কমরেডসব! পিতৃভূমি যে বিপন্ন!' সে-ডাকে সাড়া দিল অযুত-অযুত শ্রমিক। মস্কো, পেত্রগ্রাদ, কলোম্না, ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, ত্ভের এবং নিজ্নি নভগোরদের কারখানাগুলিতে সর্বোচ্চ মাত্রায় দ্রুতগতিতে কাজ চলতে থাকল সারা দিন-রাত। ফলে ১৯১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে লাল ফৌজ পেয়েছিল দু'হাজারের বেশি চল-কামান, প্রায় পঁচিশ লক্ষ গোলা, নয় লক্ষর বেশি রাইফেল, আট হাজার

মেশিনগান, ৫০ কোটির বেশি কার্তুজ এবং প্রায় দশ লক্ষ হাতবোমা।

সোভিয়েত ক্ষমতার সামনে আর-একটা গ্রুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে তার অবস্থান মজবুত করা। অস্ত্রশস্ত্র এবং ভুখা দিয়ে সোভিয়েত ক্ষমতার টুঁটি টিপে মারতে চেষ্টা করছিল কুলাকেরা — তাদের চূর্ণ করার দরকার ছিল; গরিব কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং মাঝারি কৃষকদের সমর্থন নিশ্চিত করার দরকার ছিল — এইভাবে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষককুলের মৈত্রী মজবুত হয়। রুটির জন্যে সংগ্রাম এবং খাদ্য সরবরাহ সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল এই কাজটা।

মেহনতী কৃষক এবং কুলাকদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছিল পুরাদমে। আগে যা ছিল ভূস্বামীদের সেইসব ভূমি, সরঞ্জাম আর মজুদ বীজ আত্মসাৎ করতে এবং গরিব কৃষকদের আরও দমন করতে সচেষ্ট ছিল কুলাকেরা। কিন্তু, কুলাকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের শোষণের প্রবণতার বিরুদ্ধে মেহনতী কৃষকেরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাজার-হাজার শহরে আর গ্রামে চলেছিল তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম, সেটা প্রায়ই সশস্ত্র মোকাবিলা হয়ে দাঁড়াত।

তবে, গরিব কৃষকেরা তখনও সুসংগঠিত ছিল না, লক্ষ্য আর করণীয় কাজগুলি সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। ১৯১৮ সালে ১১ই জুন তারিখে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একটা ডিক্রিতে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ‘গরিব কৃষক কমিটি’ গড়ার ব্যবস্থা হল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এইসব কমিটি গড়ে উঠল সর্বত্র — প্রত্যেকটা এলাকায়, প্রত্যেকটা গ্রামে। প্রাক্তন ভূস্বামীদের ভূমি মেহনতী কৃষকদের মধ্যে নতুন করে বিলি করতে এইসব কমিটি আনুকূল্য করল, — এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কুলাকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল ১২০ কোটি একর ভূমি। সদ্য-পাওয়া ভূমির উন্নয়নের জন্যে গরিব কৃষক কমিটিগুলি গরিব

কৃষকদের দিল বীজ আর চাষের সরঞ্জাম, দিল পশু, আর লাল ফৌজের সৈনিকদের পরিবারের দেখাশুনা করতে থাকল। কুলাকদের সঙ্গে গরিব কৃষকদের সংগ্রামে শহরের শ্রমিকেরাও সাহায্য করল। কল-কারখানাগুলিতে বিশেষ বিশেষ শ্রমিকদল গড়ে পাঠানো হত গ্রামাঞ্চলে — সেখানে তারা শস্য-প্রদানে কুলাকদের উসকানো অন্তর্ঘাত বন্ধ করত, গরিব কৃষকদের এক হতে সাহায্য করত এবং গ্রামগুলিতে সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থাগুলিকে মজবুত করে তুলত।

গ্রামাঞ্চলে প্রলেতারিয়েতের অভিযান এবং গরিব কৃষক কমিটিগুলির স্থাপনা গ্রামাঞ্চলে এবং সারা দেশেই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সংহত করতে সহায়ক হল। কুলাকদের শায়েস্তা করা এবং সোভিয়েত ক্ষমতার সংহতি মাঝারি কৃষকদের সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে টানতে খুবই কাজের হয়েছিল। মাঝারি কৃষকেরা দেখল প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সমগ্র শ্রমজীবী জনগণেরই স্বার্থে প্রকৃত জনপ্রিয় কর্মনীতি অনুসরণ করছে, তখন তারা সোভিয়েত ক্ষমতাকে সক্রিয় সমর্থন দিতে আরম্ভ করল।

এই সময়ে মাঝারি কৃষকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, কেননা লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষক ভূমি, পশু আর সরঞ্জাম পেয়ে আর্থনীতিক অবস্থার দিক থেকে মাঝারি কৃষকের পর্যায়ে উন্নীত হল। আগে সংখ্যায় বেশি ছিল গরিব কৃষক, কিন্তু এখন সংখ্যাধিক্য হল (মোটামুটি ৬০ শতাংশ) মাঝারি কৃষকদের।

বিপ্লবের ঠিক পরেকার সময়ে কৃষকদের মাঝারি স্তরটা রাজনীতিক দোদুল্যমানতা দেখিয়েছিল, কিন্তু ১৯১৮ সালের শেষাশেষি তারা শ্রমিক শ্রেণী এবং সোভিয়েত ক্ষমতাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে আরম্ভ করেছিল।

সোভিয়েত ক্ষমতা তখন মাঝারি কৃষকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে কর্মনীতি অনুসরণ করতে পারছিল। ১৯১৮

সালের শেষের দিকে লেনিনের রচিত এই কর্মনীতি কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে (মার্চ ১৯১৯) অনুমোদিত এবং গৃহীত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার শ্রেণীগত কর্মনীতির ত্রিবিধ সূত্র ছিল — গ্রামের গরিবদের উপর নির্ভর করা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী, আর গ্রামীণ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গৃহযুদ্ধে জয় এবং পরবর্তী শান্তিপূর্ণ নির্মাণকাজে সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা শর্ত হয়ে উঠেছিল কৃষককুলের বেশির ভাগের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য।

* * *

১৯১৮ সালের শেষাশেষি সোভিয়েত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থা অনেকটা বদলে গিয়েছিল। জার্মানি আর তার মিত্রদের পরাজয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। ১১ই নভেম্বর তারিখে জার্মানি আর আঁতাঁতের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

বিপ্লব ঘটল জার্মানিতে আর অস্ট্রো-হাঙ্গেরিতে। হয়েনৎসলার্ন এবং হাপ্‌স্‌বুর্গদের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটল।

জার্মানি আর অস্ট্রো-হাঙ্গেরির পরাজয় এবং এইসব দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের যথেষ্ট ক্রিয়া ঘটেছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবস্থার উপর। ইউরোপের অন্যান্য দেশের উপর এইসব ঘটনার বৈপ্লবিকীকরণের প্রভাব ছিল, এইভাবে সেটা সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা মজবুত করেছিল।

জার্মানির পরাজয়ের পরে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সেই বিকট ব্রেস্ত্‌ শান্তিচুক্তিটাকে বাতিল করে দিতে পারল। ১৩ই নভেম্বর তারিখে লেনিন এবং স্‌ভের্দলভের সই করা সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একটা ডিক্রিতে চুক্তিটাকে বাতিল এবং অপ্রয়োজ্য বলে ঘোষণা করা হল।

জার্মানির দখল থেকে এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, বেলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন এবং ট্র্যান্স-ককেশিয়াকে মুক্ত করার কাজ

আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৮ সালের শরৎকালে। দখল-করা অঞ্চলগুলিতে জনগণের মুক্তি-আন্দোলন চলে আসছিল জার্মান আক্রমণ-হস্তক্ষেপের শুরু থেকেই, ব্রেস্ত্ শান্তিচুক্তি বাতিল হয়ে যাবার পরে এই মুক্তি-আন্দোলন রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপক সমর্থন পেল। শ্রমজীবী জনগণ দখলদার জার্মান ফৌজকে খেদিয়ে দিয়ে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে নিজ নিজ দেশে সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম করল।

জার্মান সৈনিকেরা ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল, তারা তাদের অফিসারদের হুকুম তামিল করতে নারাজ হচ্ছিল এবং ভাই-ভাই হয়ে উঠছিল লাল ফৌজের সৈনিক আর শ্রমিকদের সঙ্গে।

১৯১৮ সালের শেষের দিকে স্থাপিত হয়েছিল এস্তল্যান্ড শ্রমজীবী কমিউন — সোভিয়েত এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্র। ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ক্ষমতার উদ্‌ঘোষণা হয়েছিল লাতভিয়ায় এবং লিথুয়ানিয়ায়। সোভিয়েত রাশিয়া সোভিয়েত বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। ১৯১৯ সালে ১লা জানুয়ারি অস্থায়ী সোভিয়েত সরকার স্থাপিত হয়েছিল বেলোরুশিয়ায়।

এইসব প্রজাতন্ত্রে নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট সব ব্যক্তি — যেমন, লিথুয়ানিয়ার প্রথম সোভিয়েত সরকারের সভাপতি ভ. মিৎস্‌কিয়াভিচ্যুস্-কাপ্‌সুকাস, লাতভিয়ার জনকমিসার পরিষদের প্রধান প. স্তুচ্‌কা, বেলোরুশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আ. মিয়াস্‌নিক এস্তোনিয়ায় বলশেভিকদের নেতা ভ. কিঙ্গিসেপ।

প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছিল ইউক্রেনে। ১৯১৮ সালে সেখানকার রাজনীতিক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। পাঠকের মনে পড়বে,

১৯১৭ সালের শেষের দিকে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে গড়া কেন্দ্রীয় রাদা কিয়েভে ক্ষমতা হস্তগত করেছিল। শ্রমিক এবং কৃষকদের একটা অভ্যুত্থানে রাদা উচ্ছেদ হলে, রাদার প্রতিনিধি যারা আগে আঁতাঁতের মুখ চাইত তারা জার্মানির সঙ্গে একটা রফা করেছিল। কিন্তু, জার্মান ফৌজ ইউক্রেন দখল করার পরে রাদাকে ভাগিয়ে দিয়ে স্করোপাদ্স্কি নামে একজন রাজতন্ত্রীকে বসিয়েছিল গদিতে — তাকে খেতাব দেওয়া হয়েছিল 'ইউক্রেনের গেৎমান'। জার্মানির পরাজয়ের পরে পেটি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলো আবার দেখা দিল, তারা স্করোপাদ্স্কিকে ক্ষমতাচ্যুত করে গড়ল তথাকথিত 'ডিরেক্টরি', তার প্রধান হল স. পেৎলিউরা আর ভ. ভিন্নিচেঙ্কো। তখন জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইউক্রেনের মেহনতী জনগণ আবার দাঁড়িয়ে গেল। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে স্থাপিত হল ইউক্রেনের সোভিয়েত সরকার — এই সরকারে ছিলেন ফিয়দর আর্তিয়ম, ক্লিমেন্ত ভরোশিলভ, ভ. জাতোন্স্কি, ইম্মানুইল ক্ভিরিং, ইউ. কোৎসিউবিন্স্কি এবং অন্যান্য। ১৯১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনীয় সোভিয়েত রেজিমেণ্টগুলি কিয়েভ মুক্ত করেছিল।

জার্মানির পরাজয়ের নেতিবাচক ফলাফলও ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে: আঁতাঁতের রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ-হস্তক্ষেপ প্রবলতর করতে পারল।

১৯১৮ সালে ১৬ই নভেম্বর রাত্রে দার্দানেলিস আর বসফোরাস দিয়ে বৃটিশ আর ফরাসী যুদ্ধজাহাজ ঢুকল কৃষ্ণ সাগরে, সেইসব যুদ্ধজাহাজের পিছনে এল সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাগুলি বোঝাই সব জাহাজ। বিভিন্ন রণতরীর প্রহরায় ফরাসী আর গ্রীক সৈন্য নামল ওদেসায়। শত্রুরা আরও দখল করল সেভাস্তপোল এবং কৃষ্ণ সাগরের অন্যান্য শহর, দখল করল

ট্র্যান্স-ককেশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন কেন্দ্র — বাকু, ত্বিলিসি, বাতুমি। প্রধান ভূমিকায় ছিল ইউক্রেনে ফরাসীরা, আর ট্র্যান্স-ককেশিয়ায় ইংরেজরা। আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা উত্তরে এবং দূর প্রাচ্যে সৈন্য-সাহায্য পেল।

শত্রুরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ বাড়িয়ে তুলল। তার উপর, রুশী শ্বেতরক্ষীরা তখন পেতে থাকল আরও বেশি অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলি। বিশেষত সাইবেরিয়ায় আর উত্তর ককেশাসে প্রতিবিপ্লবী বাহিনীগুলো দ্রুত বেড়ে উঠে বেশ তাৎপর্যসম্পন্ন শক্তি হয়ে উঠল। গৃহযুদ্ধ প্রচণ্ড এবং দীর্ঘস্থায়ী হবার সমস্ত লক্ষণই দেখা দিতে থাকল।

ইতোমধ্যে, মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি 'সরকারগুলোর' জায়গায় বসানো হতে থাকল নগ্ন সামরিক একনায়কত্ব, এগুলি আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরিক বুর্জোয়াদের মর্জিমাফিক কাজ করতে পারত আরও সরাসরি। পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলো নিজেদের 'গণতন্ত্রী' এবং 'সমাজতন্ত্রী' বলে জাহির করত, আর বলত তারা নাকি দক্ষিণ এবং বাম উভয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল একটা 'মধ্যবর্তী' কিংবা 'তৃতীয়' শক্তি, যদিও কার্যক্ষেত্রে তারা ছিল ষোল-আনাই পুরাদস্তুর প্রতিবিপ্লবের শিবিরে, তারা জেনারেল আর অ্যাডমিরালদের একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল। ওম্স্কে জারতন্ত্রী অ্যাডমিরাল কলচাকের সামরিক একনায়কত্ব কায়েম হয়েছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি-কাদেত ডিরেক্টরির জায়গায়; কলচাককে বলা হয়েছিল রাশিয়ার 'সর্বময় শাসক'। দক্ষিণ রাশিয়ায় জেনারেল দেনিকিন হয়েছিলেন তাঁর সহকারী এবং কার্যত একনায়ক। উত্তরে আর্খাঙ্গেলস্কে জেনারেল মিলারের সামরিক একনায়কত্ব কায়েম হয়েছিল।

১৯১৮ সালের শেষের দিক থেকে ১৯২০ সালের শেষের দিক অবধি সময়ে দেশে বিরাট পরিসরে লড়াই চলেছিল প্রায় অবিরাম। আঘাত আর পালটা-আঘাতগুলোর অভিমুখ বদলেছিল, বড়রকমের যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কখনও এক-ফ্রণ্টে, কখনও অন্য ফ্রণ্টে, কিন্তু লড়াইয়ের প্রচণ্ডতা কখনও কমে নি।

তুলার কমিউনিস্ট শ্রমিকদের ফ্রণ্টে যাত্রা

১৯১৮ সালের শেষ আর ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন লড়াইগুলো হয়েছিল দক্ষিণে। ১৯১৯ সালের বসন্তকালে কতকগুলো দুর্দান্ত লড়াইয়ের পরে সোভিয়েত সামরিক শক্তি ক্রাস্‌নভের শ্বেত কসাক রেজিমেণ্টগুলোকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করে দন অঞ্চলটিকে মুক্ত করল। দক্ষিণ ইউক্রেনেও লাল ফৌজ এবং পার্টিজান সৈন্যদলগুলি আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের কয়েক বার পরাস্ত করেছিল।

ইতোমধ্যে, ক্রমেই বেশি গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল পূর্ব ফ্রণ্ট। শীতকালে সেখানে কয়েকটা বড়রকমের লড়াই হয়েছিল, কিন্তু নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৯ সালে বসন্তকালের গোড়ার দিকে। মার্চ মাসের শুরুতেও কঠোর হিমের দরুন উরাল অঞ্চলে মহা মহা নদীগুলি বরফে জমাট-বাঁধা ছিল। ১৯১৯ সালে ৪ঠা মার্চ তারিখে প্রথম প্রথম শ্বেতরক্ষী ডিট্যাচমেণ্টগুলো পের্মের দক্ষিণে কামা নদী পার হয়ে পশ্চিম দিকে এগোতে আরম্ভ করেছিল। অন্যান্য শ্বেতরক্ষী ইউনিটও আক্রমণ শুরু করেছিল। উত্তর উরাল অঞ্চলের গহন বনভূমি থেকে ভলগার দক্ষিণ স্তেপভূমি অবধি প্রসারিত ১,২০০ মাইলের পূর্ব ফ্রণ্ট সর্বত্র সক্রিয় হয়ে উঠল। ১৯১৯ সালের বসন্তকালে এটাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড়রকমের ফ্রণ্ট।

সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ চালাচ্ছিল অ্যাডমিরাল কলচাকের প্রায় চার-লাখ সৈনিক আর অফিসারের বিশাল বাহিনী। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা কলচাককে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি আর কাপড়-জামার যোগান দিয়েছিল দরাজ হাতে। ১৯১৯ সালে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এসেছিল ৪,০০,০০০টা রাইফেল, ১,০০০ মেশিনগান, কামান, কার্তুজ, গোলা, জামা-কাপড় এবং আরও অনেককিছু।

চার্চিলের একটা বিবৃতি অনুসারে, ইংরেজরা সাইবেরিয়ায় সামরিক মাল পাঠিয়েছিল ১,০০,০০০ টন। ফ্রান্স পাঠিয়েছিল ১,৭০০টা মেশিনগান, ৪০০টা কামান, ৩০খানা বিমান। ১০০টা মেশিনগান, ৭০,০০০টা রাইফেল আর ১,২০,০০০ প্রস্থ পোশাক এসেছিল জাপান থেকে।

কলচাকের যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহই প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত করেছিল বিদেশী জেনারেলেরা। ১৯১৯ সালে জানুয়ারি মাসে সই-করা একটা চুক্তি অনুসারে ব্যবস্থা ছিল কলচাককে তার

যুদ্ধবিগ্রহ সমন্বিত করতে হবে পূর্ব রাশিয়ায় আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী সামরিক শক্তির প্রধান সেনাপতি, ফরাসী জেনারেল জাঁনে-র সঙ্গে। ১৯১৮ সালে পরদেশ থেকে কলচাককে সাইবেরিয়ায় আনা হয়েছিল বৃটিশ জেনারেল নক্স-এর ট্রেনে, এই নক্স ছিল কলচাকের সামরিক শক্তির গতিবিধি আর সরবরাহ-সংক্রান্ত কাজের প্রধান।

কলচাকের সামরিক শক্তি গোড়ায় কয়েকটা তাৎপর্যসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসের সাফল্য পেয়েছিল। ১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব ফ্রণ্টে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। বসন্তকালের আক্রমণ-অভিযানে কলচাকের সামরিক শক্তি দখল করে নিয়েছিল ১,১৬,০০০ বর্গমাইল আয়তনের রাজ্যক্ষেত্র — ইতালির আয়তনের সমান। শ্বেতরক্ষীরা এগিয়ে আসছিল ভলগায়, — তাদের আগুয়ান ডিট্যাচমেণ্টগুলো তখন ছিল কাজান, সিম্‌বিস্‌র্ক আর সামারা থেকে মাত্র ৫০-৬০ মাইল দূরে। কমিউনিস্ট পার্টি তখন স্লোগান তুলেছিল: 'কলচাকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে সবকিছু!'

১২ই এপ্রিল তারিখের 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত হয়েছিল 'পূর্ব ফ্রণ্টে পরিস্থিতি সমন্ধে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিস'; লেনিনের লেখা এই থিসিসে বলা হয়েছিল: 'পূর্ব ফ্রণ্টে কলচাকের জয়গুলো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করছে। কলচাককে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে সর্বোচ্চ মাত্রায়।'*

'দেশের সক্রিয় প্রতিরক্ষায় শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপকতর অংশকে শামিল করবার জন্যে'** সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে সমস্ত পার্টি

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৯তম খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ
** ঐ

সংগঠনকে নির্দেশ দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি।

যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হল তার ফলে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যেমন, তুলায় গোলাগুলির উৎপাদন ১৯১৯ সালের মে মাসে পেঁছে গিয়েছিল ১৯১৬ সালের মাত্রায়,জুলাই মাসে সে-মাত্রাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পেত্রগ্রাদে ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে চালু ছিল ২৬৪টা কল-কারখানা, তার ৯০ শতাংশ কাজ করছিল শুধু রণাঙ্গনের চাহিদা মেটাবার জন্যে। কামানশ্রেণী, বারুদ, গোলা, পাদুকা, পোশাক, ইত্যাদি উৎপাদন করে পেত্রগ্রাদের শ্রমিকেরা প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যসম্পন্ন অবদান রেখেছিল।

শ্রম দিয়ে লাল ফৌজকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্যে শ্রমিকদের কামনার সবচেয়ে লক্ষণীয় অভিব্যক্তি ছিল ১৯১৯ সালে এপ্রিল-মে মাসে উদ্ভূত 'কমিউনিস্ট শনিবার' (সুবোৎনিক)। ১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে মস্কোর উপান্তে অবস্থিত একটা ডিপো — মস্কো-কাজান রেলপথের সোর্তিরোভচ্নায়া স্টেশনের কমিউনিস্ট সেল্-এর বৈঠক বসেছিল প্রজাতন্ত্রের সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে। কলচাক তখন দ্রুত আসছিল ভলগার দিকে। শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ের জন্যে চালাতে হবে সমস্ত প্রচেষ্টা, এই মর্মে সবাই একমত হয়ে এই কমিউনিস্ট রেল-শ্রমিকেরা ঐ সেলের সভাপতি ধাতু-শ্রমিক ই. বুরাকভের প্রস্তাব গ্রহণ করে স্থির করল, ১২ই এপ্রিল তারা দিনের কাজের শেষে থেকে অতিরিক্ত ইঞ্জিন মেরামতের বন্দোবস্ত করবে।

১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় কাজ আরম্ভ করল ১৩ জন কমিউনিস্ট এবং দু'জন দরদী। একটুও না-থেমে সারা রাত ধরে কাজ করে তারা তিনখানা ইঞ্জিন মেরামত করে ফেলল।

সোর্তিরোভচ্নায়া স্টেশনের শ্রমিকদের উদ্যমের কথা জেনে গোটা মস্কো- কাজান রেলওয়ে এলাকার সমস্ত কমিউনিস্ট শ্রমিক

গণ-পরিসরে সুবোৎনিক সংগঠিত করতে মনস্থ করল। একটা পার্টি বৈঠকের কার্যবিবরণীতে এই সিদ্ধান্তে দেখতে পাওয়া যায়: 'বিপ্লবে অর্জিত সাফল্যগুলির জন্যে কমিউনিস্টরা স্বাস্থ্য কিংবা জীবন কিছুই দিতে কসুর করতে পারে না, কাজেই, এই কাজ করতে হবে বিনা পারিশ্রমিকে। সারা এলাকায় **কমিউনিস্ট শনিবার** চালু করতে হবে এবং কলচাকের বিরুদ্ধে ষোল-আনা জয় অবধি চালিয়ে যেতে হবে।'*

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম গণ-সুবোৎনিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে ১০ই মে তারিখে, তাতে অংশগ্রহণ করেছিল ২০৫ জন কমিউনিস্ট। সেদিন শ্রমিকেরা মেরামত করেছিল চারখানা ইঞ্জিন আর ১৬খানা ওয়াগন, এবং প্রায় ১৫০টন মাল খালাস করেছিল। সেদিন শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি হয়েছিল সাধারণত যা হত তার চেয়ে আড়াই-গুণ বেশি।

প্রথম প্রথম কমিউনিস্ট সুবোৎনিকগুলিকে লেনিন বলেছিলেন 'বৃহৎ সূচনা'। লেনিন লিখেছিলেন, কমিউনিস্ট সুবোৎনিক হল 'একটা নতুন বিপ্লবের সূচনা, যা বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার চেয়ে আরও কঠিন, আরও মূর্ত-নির্দিষ্ট, আরও মূলগত এবং আরও নিষ্পত্তিমূলক — কেননা, এটা হল আমাদের নিজেদের রক্ষণশীলতা, নিয়মনিষ্ঠার অভাব, পেটি-বুর্জোয়া অহমিকার উপর একটা জয়, অভিশপ্ত পুঁজিতন্ত্র থেকে শ্রমিক আর কৃষকদের মধ্যে রেখে-যাওয়া বিভিন্ন অভ্যাসের উপর একটা জয়। যখন **এই** জয় সংহত হবে একমাত্র তখনই সৃষ্টি হবে নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা; তখন এবং একমাত্র তখনই পুঁজিতন্ত্রে পূর্বানুবৃত্তি অসম্ভব হয়ে যাবে, কমিউনিজম হয়ে উঠবে যথার্থই অজেয়।'**

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৯তম খণ্ড, ৪১২ পৃঃ

** ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৯তম খণ্ড, ৪১১—৪১২ পৃঃ

সুবোৎনিক জিনিসটা লোকের মনে ধরল, অচিরেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র সুবোৎনিক অনুষ্ঠিত হতে থাকল। কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অ-পার্টি শ্রমিকরাও তাতে যোগ দিল, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকল।

সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্ভাব্য সর্বতোভাবে পূর্ব ফ্রন্টকে শক্তিশালী করে তুলল। লাল ফৌজে সামরিক কাজের জন্যে তলব করা হল মস্কো, পেত্রগ্রাদ এবং ন'টা মধ্য গুবের্নিয়া থেকে নতুন নতুন দলে দলে মেহনতীদের। বহু শ্রমিক আর মেহনতী কৃষক গিয়ে পূর্ব ফ্রন্টের সোভিয়েত বাহিনীগুলিতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল। সবচেয়ে নিষ্ঠাবান এবং নিঃস্বার্থ কর্মীদের নিয়ে পূর্ব ফ্রন্টের শক্তি বাড়াবার জন্যে পার্টি, কমসোমল এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সদস্যদের ব্যাপক সমাবেশের ব্যবস্থা করা হল: এই ফ্রন্টের বাহিনীগুলিতে যোগ দিতে গেল ১৫,০০০ কমিউনিস্ট, ৩,০০০ কমসোমল সদস্য এবং ২৫,০০০ ট্রেড-ইউনিয়ন সদস্য।

১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয়ার্ধে লাল ফৌজ কলচাকের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত আঘাতের জন্যে প্রস্তুত হল। মিখাইল ফ্রুঞ্জে এবং ভালেরিয়ান কুইবিশেভের নেতৃত্বে পূর্ব ফ্রন্টের দক্ষিণ ভাগ এপ্রিল মাসের শেষের দিনগুলিতে একটা পালটা-আক্রমণ চালাল। প্রচণ্ড লড়াই চলল ভলগা পারের স্তেপভূমিতে, দক্ষিণ উরালের পাদপাহাড়ে এবং বুগুরুস্লান, বুগুল্‌মা, বেলেবেই আর উফার কাছে। কলচাকের সেরা সেরা সৈন্যদলগুলো চূর্ণ হল।

কলচাকের পরাজয় ঘটাতে একটা মস্ত ভূমিকায় ছিল ভাসিলি চাপায়েভের পরিচালিত ২৫তম ডিভিশন, চাপায়েভ হয়ে উঠেছিলেন গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়কদের একজন। ২৫তম ডিভিশনের কমিসার ছিলেন দ্‌মিত্রি ফুরমানভ, তিনি পরে হয়েছিলেন একজন বিশিষ্ট লেখক। দক্ষিণ ভাগে প্রধান

আঘাতকারী শক্তি হিসেবে চাপায়েভের ডিভিশনটি লড়ে এগিয়েছিল ২২০ মাইলের বরাবর।

কলচাকের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের আক্রমণ-অভিযানের প্রবলতম পর্যায়ে প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক সামরিক কমিটির তখনকার সভাপতি ত্রৎস্কি প্রস্তাব করেছিলেন উরাল অঞ্চলে বেলায়া নদী বরাবর থেমে গিয়ে কলচাকের সৈন্যদের তাড়া করা বন্ধ করে লাল ফৌজের সৈন্যদলগুলিকে দক্ষিণে আর পশ্চিমে নতুন করে ছড়িয়ে দিতে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিল, কেননা সেক্ষেত্রে কল-কারখানা আর রেলপথজালি সমেত উরাল অঞ্চল কলচাকের হাতে থেকে যেত এবং আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের সাহায্যে কলচাকের সামরিক শক্তি আবার গড়ে তোলা সম্ভব হত। কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দিল, আক্রমণ-অভিযান চালিয়ে যেতে হবে এবং কলচাককে খেদিয়ে দিতে হবে উরাল পর্বতমালার ওধারে সাইবেরীয় স্তেপভূমিতে।

কলচাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলল নতুন উদ্যমে। ১৯১৯ সালে জুন-জুলাই মাসে সোভিয়েত সামরিক শক্তি মুক্ত করল উরাল অঞ্চলের মূল কেন্দ্রগুলি — পের্‌ম, ইয়েকাতেরিনবুর্গ আর চেলিয়াবিন্‌স্ক আর অগস্ট মাস নাগাত পেঁছে গেল তবোল নদীতে। কলচাকের বাহিনীগুলোর অবশিষ্টাংশ পিছিয়ে গেল পুব দিকে। কলচাকের পশ্চাদভাগে গড়ে উঠেছিল শক্তিশালী পার্টিজান আন্দোলন — সেটা লাল ফৌজের সহায়ক হল। বলশেভিকদের নেতৃত্বে সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যের শ্রমিক আর কৃষকেরা বহুতর পার্টিজান দল গড়েছিল, — অসম্পূর্ণ তথ্য অনুসারে সেগুলিতে লোক ছিল ১,৪৫,০০০ জন।

লাল ফৌজ আর পার্টিজানরা কলচাকের বাহিনীগুলোর উপর আঘাতের পর আঘাত হেনেছিল। ১৯১৯ সালের শেষাশেষি কলচাকের সামরিক শক্তি একেবারে ষোল-আনা পরাস্ত-পর্যুদস্ত

হয়েছিল। কলচাককে গ্রেপ্তার করে বৈপ্লবিক কমিটির দণ্ডাদেশ অনুসারে ইরকুৎস্কে গুলি করা হয়েছিল।

ইতোমধ্যে, আঁতাঁতের কর্মনীতিতে কোন কোন পরিবর্তন ঘটেছিল। জার্মানির পরাজয়ের ঠিক পরেই, ১৯১৮ সালের শেষের দিকে এবং ১৯১৯ সালের বসন্তকালে আঁতাঁতের আক্রমণ-হস্তক্ষেপ হয়ে উঠল নগ্ন। এই কর্মনীতি ব্যর্থ হল। আঁতাঁত যেসব সৈন্য নামিয়েছিল তারা বৈপ্লবিক ভাব-ধারণার প্রভাবে পড়েছিল; উত্তরে আর দূর প্রাচ্যে মার্কিন আর বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ ফুটছিল টগবগিয়ে; ওদেসায় ফরাসী নাবিকদের একটা অভ্যুত্থান হয়েছিল। আগেকার নগ্ন আক্রমণ-হস্তক্ষেপের কর্মনীতি আঁতাঁতের পক্ষে কিছুটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে মেহনতীরা বহু জনসভা করছিল, ধর্মঘট করছিল, তারা স্লোগান তুলেছিল: 'আক্রমণ-হস্তক্ষেপ বন্ধ করো! সোভিয়েত রাশিয়া থেকে হাত গুটাও!'

১৯১৯ সালে এবং ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার কতকগুলি অঞ্চল থেকে আঁতাঁত সৈন্য অপসারিত করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা হল আঁতাঁতের বিরুদ্ধে একটা তাৎপর্যসম্পন্ন জয়। লেনিন বলেছিলেন: 'আমরা তাদের সৈন্য থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিলাম।'* কিন্তু, আক্রমণ-হস্তক্ষেপ থামল না। জাপানী ফৌজের বড় বড় সৈন্যদল তখনও রয়ে গেল দূর প্রাচ্যে, শ্বেতরক্ষী বাহিনীগুলোর জন্যে আঁতাঁতের অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাগুলির যোগান আরও বেড়ে গেল।

১৯১৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ ফ্রন্ট হয়ে উঠল যুদ্ধবিগ্রহের বড়রকমের কেন্দ্র। দেশের মর্মকেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকল দেনিকিনের বাহিনী। পশ্চিমী শক্তিগুলির দেওয়া অর্থে অস্ত্র

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩০তম খণ্ড, ২১৯ পৃঃ

এবং অন্যান্য উপকরণে সজ্জিত দেনিকিনের বাহিনী সম্বন্ধে উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন: 'এটা আমার বাহিনী!'

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাত দেনিকিনের বাহিনী দখল করতে পেরেছিল গোটা কুবান, তেরেক আর দন এলাকা, ক্রিমিয়া এবং নীপার নদীর পূবে ইউক্রেনের একাংশ, তখন লড়াই চলছিল দনেৎস অববাহিকার জন্যে। নীপার থেকে ভলগা অবধি বিস্তৃত দেনিকিনের ফ্রন্ট দিন-পর-দিন আরও এগোচ্ছিল উত্তরে। দেনিকিনের এক 'মস্কো নির্দেশনামা' ঘোষিত হল, তাতে প্রকাশ্যে বিবৃত হল মস্কো দখল করার অভিসন্ধি। ঐ ফ্রন্টের কেন্দ্রে থেকে খারকভ-কুর্স্ক-ওরেল-তুলা-মস্কো লাইন বরাবর এগোচ্ছিল দেনিকিনের সেরা সেরা ডিভিশন — প্রধানত প্রতিবিপ্লবী অফিসারদলগুলো নিয়ে গড়া 'স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী'। দেনিকিনের সামরিক শক্তির কেন্দ্রী অংশ এই ডিভিশনগুলো ছিল একটা কার্যকর শক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স থেকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, পোশাক-পরিচ্ছদ আর অর্থের সঞ্জীবনী সাহায্য পেয়ে দেনিকিনের পক্ষে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাত বিভিন্ন তাৎপর্যসম্পন্ন সুবিধালাভ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯১৯ সালে অক্টোবরের গোড়ায় দেনিকিনের ফৌজ ভরোনেজ আর ওরেল দখল করে ঢুকেছিল তুলা গুবের্নিয়ায়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজধানী মস্কো সরাসরি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শত্রুরা যত আক্রমণ চালিয়েছিল সেগুলির মধ্যে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল এইটে।

এর আগে, ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটা প্লেনারী বৈঠকে পার্টির সংগঠনগুলির কাছে লেনিনের লেখা একখানা চিঠি অনুমোদিত হয়েছিল; 'দেনিকিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বশক্তি!'-শীর্ষক এই চিঠিতে

বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছিল, সেটা ছিল বিপ্লবের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ মুহূর্ত, তাতে দেনিকিনকে পরাস্ত করার জঙ্গী এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরা হয়েছিল। 'প্রথমত এবং সর্বোপরি সমস্ত কমিউনিস্ট, তাদের সঙ্গে সমস্ত দরদী, সমস্ত সৎ শ্রমিক আর কৃষক, সমস্ত সোভিয়েত কর্মকর্তাকে **একাট্টা হতে হবে সৈনিকদের মতো, সরাসরি যুদ্ধের করণীয় কাজগুলিতে** কেন্দ্রীভূত করতে হবে **সর্বোচ্চ মাত্রায় তাদের কাজ,** তাদের প্রচেষ্টা এবং তাদের গরজ... সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র শত্রুর অবরোধে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে হতে হবে একটা **অখণ্ড সামরিক শিবির** — সেটা কথায় নয়, কাজে।'*

চূড়ান্ত বিপজ্জনক এই মুহূর্তে সোভিয়েত রাষ্ট্র রক্ষা হতে পারত একমাত্র সমগ্র জনগণ এবং পার্টির সর্বশক্তি নিয়োগেই। সেই রকমের প্রচেষ্টার জন্যেই লেনিন আহ্বান জানালেন।

লেনিনের রচিত এই কর্মসূচির ভিত্তিতে সৈন্যসমাবেশ চলল পুরাদমে। অতিরিক্ত সৈন্যদলগুলি নিয়ে সৈন্যবাহী ট্রেনগুলো চলল দক্ষিণ ফ্রন্টে, আর, যেমন বরাবর, সবার আগে চলল কমিউনিস্টরা আর কমসোমল সদস্যরা। কমিউনিস্টদের আর কমসোমল সদস্যদের আরও সমাবেশ করানো হল। ১৯১৯ সালের শরৎকালে ফ্রন্টে পেঁাছেছিল ১৫,০০০ কমিউনিস্ট এবং ১০,০০০ কমসোমল সদস্য। সেই দিনগুলিতে কমসোমলের বিভিন্ন এলাকা কমিটির আপিসের দরজায় লেখা দেখা যেত: 'এলাকা কমিটি বন্ধ। সবাই চলে গেছে ফ্রন্টে।'

পশ্চাদভাগে সংগঠনগুলির কাজ যুদ্ধের অবস্থায় দাঁড় করানো হল: প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক সংগঠনগুলির কাজ কমিয়ে কিংবা একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হল। এইভাবে ছাড়া-পাওয়া সব লোক গেল ফৌজে।

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি,** ২৯তম খণ্ড, ৪৩৭ পৃঃ

দক্ষিণ ফ্রন্টে নেতৃত্ব শক্তিশালী করা হল। দক্ষিণ ফ্রন্টের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন ইয়েগোরভ; স্তালিন নিযুক্ত হলেন বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের সদস্য; ১৪শ বাহিনীর বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের সদস্য করে ওর্জোনিকিদ্‌জেকে পাঠানো হল; আর ভরোশিলভ এবং শচাদেঙ্কো হলেন প্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের সদস্য — তখন বুদিওনির পরিচালনাধীনে গড়া এই বাহিনীটি দেনিকিনের পরাজয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

'স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর' বিরুদ্ধে প্রধান আঘাতটা করা হবে ওরেল-ক্রোমি অঞ্চলে, তারপরে খারকভ আর দনেৎস্‌ অববাহিকার ভিতর দিয়ে রস্তভের দিকে এগোতে হবে — এই মর্মে একটা পরিকল্পনা রচনা করা হল।

একটা লেটিশ ডিভিশন, একটা লাল কসাক ব্রিগেড এবং অন্যান্য ইউনিট নিয়ে গড়া হল একটা বিশেষ আঘাত-হানা সৈন্যদল। লেটিশ ডিভিশনটি লড়াইয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সুখ্যাতি পেয়েছিল — এটিকে পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ফ্রন্টে বদলি করা হয়েছিল লেনিনের নিজের নির্দেশ অনুসারে।

ওরেল থেকে ভরোনেজ অবধি প্রায় ১৯০ মাইলের ফ্রন্ট বরাবর লাল ফৌজ একটা নিষ্পত্তিমূলক আক্রমণ-অভিযান চালাল। ভরোনেজের কাছে শ্বেতরক্ষী জেনারেলদের শকুরো আর মামোন্তভের সৈনদলগুলোকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করল বুদিওনির অশ্বারোহী বাহিনী। ভরোনেজে একটা গুপ্ত কমিউনিস্ট সংগঠনের পরিচালিত শ্রমিকদের সাহায্যে এইসব লাল অশ্বারোহী সৈন্য শহরটিকে দখল করে নিল ২৪এ অক্টোবর তারিখে। ওরেল-ক্রোমি অঞ্চলে কতকগুলো প্রচণ্ড লড়াইয়ের পরে দেনিকিনের 'স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী' চূর্ণবিচূর্ণ হল।

পশ্চাদপসরণকারী শত্রুকে তাড়া করে গিয়ে সোভিয়েত ডিভিশনগুলি দনেৎস অববাহিকা মুক্ত করল এবং ১৯২০ সালে জানুয়ারি মাসে পেঁছিল আজোভ সাগরের তীরে। রস্তভ মুক্ত করে লাল ফৌজের ইউনিটগুলি প্রবেশ করল উত্তর ককেশাসে। নিজ সৈন্যসামন্তদের পরিত্যাগ করে দেনিকিন রাশিয়া থেকে পলায়ন করেছিলেন। দেনিকিনের বাহিনীর শুধু একটা নগণ্য অংশ কোনমতে হঠে গিয়েছিল ক্রিমিয়ায়। উত্তর ককেশাস মুক্ত করার পরে সোভিয়েত সৈন্যরা গেল ট্র্যান্স-ককেশিয়ায়।

১৯১৯ সালে পেত্রগ্রাদের কাছে যেসব লড়াই হয়েছিল সেগুলিও তাৎপর্যসম্পন্ন। জেনারেল ইউদেনিচের শ্বেতরক্ষী সৈনিকেরা এই শহরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল দু'বার। প্রথম আক্রমণ চলেছিল ১৯১৯ সালে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে। ঐ একই সময়ে উপকূলবর্তী ক্রাস্নায়া গোর্কা আর সেরায়া লোশাদ্ দুর্গে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ঘটেছিল।

প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ফাঁদা হয়েছিল খাস শহরেই। পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল। পেত্রগ্রাদে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে সাড়া দিয়ে পেত্রগ্রাদের শ্রমিকেরা কারখানাগুলিতে কাজ প্রবলতর করে নিজেদের সেরা সেরা প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছিল ফ্রণ্টে শক্তি বাড়াবার জন্যে। পেত্রগ্রাদের প্রায় ১৩,০০০ শ্রমিক ত্বরিত পাঠ্যক্রমে সামরিক ট্রেনিং নিয়ে নগরীরক্ষক ৭ম বাহিনীর রেজিমেণ্টগুলির হ্রাসপ্রাপ্ত সৈন্যশ্রেণীতে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করেছিল।

১৩ই জুন তারিখে বল্টিক নৌবহরের রণতরী 'আন্দ্রেই পের্ভোজ্ভান্নি' আর 'পেত্রপাভ্লভ্স্ক' সাগরে বেরিয়ে গিয়ে বিদ্রোহী ক্রাস্নায়া গোর্কা দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল। এরপর ঐ দুর্গের উপর আক্রমণ চলল স্থলপথেও। ১৬ই জুন রাত্রে

লাল ফৌজ ঐ দুর্গ দখল করে নিল। বিদ্রোহী সেরায়া লোশাদ্ দুর্গ আত্মসমর্পণ করেছিল তার কয়েক ঘণ্টা পরে।

পেত্রগ্রাদের কাছাকাছি এলাকায় পরিস্থিতি মূলগতভাবেই বদলে গেল। ইউদেনিচের সামরিক শক্তি প্রতিহত হল জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে।

তবে, বাইরে থেকে সহায়তা-পাওয়া ইউদেনিচের আক্রমণ আবার আরম্ভ হল শরৎকাল নাগাত। ১৯১৯ সালে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি শ্বেতরক্ষী সৈন্যদলগুলি পথ করে এসে পেত্রগ্রাদের শহরতলিতে পেঁছেছিল। শহরের কমিউনিস্টরা প্রায় সবাই চলে গিয়েছিল ফ্রণ্টে। পেত্রগ্রাদ রক্ষার জন্যে অস্ত্রধারণ করেছিল ১৬ বছরের বেশি বয়সের সমস্ত কমসোমল সদস্য।

পেত্রগ্রাদের দক্ষিণ উপান্ত আগলাবার শেষ স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক পুলকভো টিলায় প্রচণ্ড লড়াই চলল পাঁচ-দিন পাঁচ-রাত্রি ধরে। ইউদেনিচ চূর্ণ হল — এবার নিঃশেষে। তার বাহিনীর ছিন্নভিন্ন অবশেষগুলো পালিয়ে গেল এস্তোনিয়ায়।

কলচাক, দেনিকিন আর ইউদেনিচের বিরুদ্ধে জয়গুলির পরে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সংক্ষিপ্ত দম ফেলার ফুরসত পেয়েছিল — প্রায় তিন মাস। ১৯২০ সালের বসন্তকালে নতুন প্রাবল্যের সঙ্গে আবার যুদ্ধবিগ্রহ লেগে গেল। পোল্যাণ্ডে ক্ষমতায় ছিল একটা বুর্জোয়া-ভূস্বামী জাতীয়তাবাদী জোট — পোল্যাণ্ড তখন আক্রমণ চালাল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তার উপর, দেনিকিনের বাহিনীর অবশেষগুলোকে ক্রিমিয়ায় জড়ো করেছিল 'কালা ব্যারন' জেনারেল ভ্রাঙ্গেল — সেই সৈন্যদলগুলোকেও আবার সক্রিয় করে তোলা হচ্ছিল।

পোলীয় ফৌজকে দরাজ-হাতে অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম আর অর্থ দিয়েছিল আঁতাঁতের সামরিক মহলগুলি, তারা নিজেদের উপদেষ্টাদেরও পাঠিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপে

থেকে-যাওয়া মার্কিন মজুদগুলো থেকেও পোলীয় ফৌজ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ পেয়েছিল। পোলীয় সামরিক শক্তির যুদ্ধবিগ্রহ আর রণনীতি সংক্রান্ত নেতৃত্বে একটা নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকায় ছিল ফরাসী সামরিক মিশন।

শান্তিপূর্ণ কর্মনীতিতে নিষ্ঠাবান সোভিয়েত সরকার পোল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তির জন্যে আপস-আলোচনা আরম্ভ করার প্রস্তাব করেছিল বারবার। সোভিয়েত সরকার যথাবিধি ঘোষণা করেছিল, সে পোলীয় প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিঃশর্তে এবং পোল্যান্ড আর সোভিয়েত রাশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে যাতে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেটাই কাম্য। সোভিয়েত সরকার বলেছিল, সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বানচাল করছিল আঁতাঁতের সাম্রাজ্যবাদীরা — কেবল তারাই রাশিয়া আর পোল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধে আগ্রহান্বিত। শান্তির সন্ধানে সোভিয়েত রাষ্ট্র রাজ্যক্ষেত্রের প্রশ্নে কয়েকটা আপস-প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু, সোভিয়েত সরকারের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন পোল্যাণ্ডে যিনি ছিলেন কার্যত রাষ্ট্রপ্রধান — পিলসুদ্স্কি।

১৯২০ সালে ২৫এ এপ্রিল পোল্যাণ্ডের শ্বেত সৈন্যরা ইউক্রেনে আক্রমণ-অভিযান চালাল। মে মাসে তারা ইউক্রেনের গভীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে কিয়েভ দখল করল ৬ই মে তারিখে।

এরপরে এল ভ্রাঙ্গেলের আক্রমণ। দন, ইউক্রেন আর কুবানের বিভিন্ন অঞ্চলকে বিপন্ন করল ভ্রাঙ্গেলের সৈন্যরা। ইং-ফরাসী-মার্কিন খরচায় ভ্রাঙ্গেলের ফৌজ সজ্জিত এবং সংগঠিত হয়েছিল কলচাক, দেনিকিন আর ইউদেনিচের ফৌজগুলোর চেয়ে আরও বেশি মাত্রায়।

আবার সঙ্গিন হয়ে উঠল সামরিক পরিস্থিতি। ফ্রণ্টের জন্যে সমস্ত প্রচেষ্টার সমাবেশ ঘটাতে হল আবারও। ১৯২০ সালে

পোলীয় আর ভ্রাঙ্গেলের ফ্রণ্টে ২৫,০০০ কমিউনিস্টকে পাঠানো হল। প্রায় ৬০০ মাইল পার হয়ে প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী এল উত্তর ককেশাস থেকে দক্ষিণ ফ্রণ্টে। আর পূব থেকে এল সবচেয়ে সেরা একটা ডিভিশন — সেটা চাপায়েভের।

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বিস্তৃত হল দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে (ইউক্রেনের রাজ্যক্ষেত্রে) এবং পশ্চিম অভিমুখে (বেলোরুশিয়ার রাজ্যক্ষেত্রে)। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে (ফ্রণ্টের অধিনায়ক —ইয়েগোরভ, বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের সদস্য — স্তালিন) একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বুদিওনি এবং ভরোশিলভের পরিচালিত প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী। ১৯২০ সালে ৫ই জুন এই বাহিনী শত্রুর ফ্রণ্ট ভেঙে বেরিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হল। অগস্ট মাসের মাঝামাঝি পশ্চিম ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় শহর ল্ভোভে পেঁছে শহরটিকে সবলে দখল করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হল।

৪ঠা জুলাই ভোরে আক্রমণ আরম্ভ করল পশ্চিম ফ্রণ্টের সৈন্যরা (ফ্রণ্টের অধিনায়ক — তুখাচেভ্স্কি, বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের সদস্য — উন্শ্লিখ্ৎ)। পশ্চিম ফ্রণ্টের সৈন্যদলগুলি বেলোরুশিয়া মুক্ত করে ওয়ারস'র কাছে গিয়ে ভিস্টুলা নদী বরাবর শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালাল। কিন্তু, সোভিয়েত বাহিনীগুলি ভিস্টুলা নদীর ধারে জয়লাভ করতে পারল না — তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হল।

১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে রিগায় পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পাদিত হল একটা প্রাথমিক শান্তি সন্ধিচুক্তি। নীপারের পশ্চিমে ইউক্রেন এবং বেলোরুশিয়া সম্বন্ধে পোলীয় শাসক মহলগুলির দাবি ছাড়তে হল। কিন্তু, গ্যালিসিয়া (পশ্চিম ইউক্রেন) এবং বেলোরুশিয়ার পশ্চিমাংশ পোল্যাণ্ড হাতে রাখতে পারল।

ইতোমধ্যে, দক্ষিণে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল ভ্রাঙ্গেলের বিরুদ্ধে। গোড়ায়, ভ্রাঙ্গেলের ফৌজ একেবারে দনেৎস অববাহিকা অবধি

পৌঁছে কয়লা উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন এই অঞ্চলটিকে ভীষণ বিপন্ন করে তুলেছিল।

১৯২০ সালের অক্টোবর মাসের শেষে দক্ষিণ ফ্রণ্টের সোভিয়েত সৈন্যদলগুলি (ফ্রণ্টের অধিনায়ক — ফ্রুঞ্জে, বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের সদস্য — গুসেভ এবং বেলা কুন্) ভ্রাঙ্গেলের উপর একগুচ্ছ পরাজয় চাপিয়ে তাকে দক্ষিণ ইউক্রেন থেকে খেদিয়ে দিল। ভ্রাঙ্গেলের ফৌজ হঠে গেল ক্রিমিয়ায়।

তখন সোভিয়েত সৈন্যদলগুলির শেষ প্রচেষ্টাটা বাকি ছিল — সেটা হল ক্রিমিয়ায় যাবার পথ আগলানো দুর্গশ্রেণী দখল করে ভ্রাঙ্গেলের ফৌজকে খতম করা। কাজটা সহজ ছিল না। ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করছে দীর্ঘ, সংকীর্ণ পেরেকপ আর চঙ্গার যোজক এবং আরাবাৎ উদ্গত ভূমি। বিশ্বযুদ্ধে পাওয়া অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় এইসব যোজকে শক্তিশালী আত্মরক্ষার দুর্গশ্রেণী গড়া হয়েছিল।

লাল ফৌজের পথরোধ করে ছিল ঘন ঘন সারি সারি কাঁটাতারের বেড়া, গড়খাই, বাঁধ আর পরিখা। সেই এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি ছিল শক্তিশালী কামানশ্রেণীর পাল্লার মধ্যে। শত্রু ভেবেছিল, ক্রিমিয়ায় পৌঁছবার পথগুলো অপ্রবেশ্য।

ভ্রাঙ্গেলের ইউনিটগুলোকে ক্রিমিয়ায় চূর্ণবিচূর্ণ করার একটা পরিকল্পনা রচনা করলেন মিখাইল ফ্রুঞ্জে। স্থির হল, পেরেকপ আর চঙ্গারের সুরক্ষিত কেন্দ্রগুলোতে সামনাসামনি আক্রমণ চালানো হবে, আর একই সঙ্গে, পেরেকপ আর চঙ্গার যোজকের মাঝামাঝি সিভাশের — পচা সাগরের — হ্রদ-আর-জলা ভাগটাকে পার হতে হবে হেঁটে, শত্রুর ধারণা ছিল সেটা অসম্ভব।

১৯২০ সালে ৭ই-৮ই নভেম্বর রাত্রে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকীতে, সোভিয়েত সৈন্যদলগুলি আক্রমণ শুরু করল, — সিভাশের জলা আর লবণহ্রদগুলোর ভিতর

দিয়ে লাল ফৌজের রেজিমেণ্টগর্লি এগোল সেই শরতের রাতের অন্ধকারের মধ্যে। জলার কাদায় ঘোড়া আর কামান আটকে-আটকে যাচ্ছিল; হিমশীতল হাওয়া বইছিল — সৈনিকদের ভিজে কাপড়-জামা যাচ্ছিল জমাট বেঁধে। মাঝরাতে লাল ফৌজের আগর্য়ান ইউনিটগর্লি শ্বেতরক্ষীদের সর্রক্ষিত কেন্দ্রগর্লিতে পেঁাছে গেল। শত্রর মহাঝঞ্ঝার মতো গোলাগর্লি উপেক্ষা করে, প্রায় ষোল-আনাই কমিউনিস্টদের নিয়ে গড়া ঝটিতি-আক্রমণের সৈন্যদলটি ধেয়ে এগিয়ে গেল। শ্বেতরক্ষী ইউনিটগর্লোকে পিছনে হঠিয়ে দিয়ে সোভিয়েত সৈনিকেরা ক্রিমিয়ার উপকূলে নিজেদের অবস্থান কায়েম করে দাঁড়াল।

পেরেকপ ঘাঁটিতে ঝটিতি-আক্রমণ শর্র হয়েছিল ৮ই নভেম্বর। শত্রর মহাঝঞ্ঝার মতো গোলাবর্ষণের মধ্যে ৫১তম পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটগর্লি সেই দর্ভেদ্য তুর্কী দর্গপ্রাকারের উপর আক্রমণ চালাল কয়েক ঘণ্টা ধরে। পেরেকপ ঘাঁটি দখল হল। এরপরে চঙ্গার যোজকে শত্রর অবস্থানগর্লোও ভেদ করা হল। সেই ভাঙনের ভিতর দিয়ে ধেয়ে এগিয়ে গেল প্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর রেজিমেণ্টগর্লি।

ভ্রাঙ্গেলের ফৌজের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। ঐ ফৌজের অবশেষগর্লোকে তড়িঘড়ি বৃটিশ আর ফরাসী জাহাজে বোঝাই করে ক্রিমিয়া থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। এই জয় উদ্‌যাপিত হয়েছিল সারা দেশে। সোভিয়েত জনগণের জয়ের বিবরণের উপর 'প্রাভ্‌দা'য় শিরোনামা ছিল: 'নিঃস্বার্থ সাহসিকতা আর বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা দিয়ে বিপ্লবের গৌরবোজ্জ্বল সর্সন্তানেরা ভ্রাঙ্গেলকে পরাস্ত-পর্যর্দস্ত করেছে। শ্রমের মহান ফৌজ, লাল ফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!'

প্রতিরক্ষার জন্যে দেশের সমস্ত সহায়-সম্পদের সমাবেশ ঘটাবার জন্যে সোভিয়েত সরকার ১৯১৮—১৯২০ সালের সমগ্র কালপর্যায়ে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছিল, সেগুলি সাধারণভাবে 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজম' বলে পরিচিত।

১৯১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়ে এই বিশেষ কর্মনীতি দানা বেঁধে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে। এটা ছিল সাময়িক ব্যবস্থা, গৃহযুদ্ধের দরুন, চূড়ান্ত কঠিন সামরিক পরিস্থিতির দরুন এটা আবশ্যক হয়েছিল। প্রতিরক্ষাব্যবস্থাটাকে সুষ্ঠু সুদক্ষ করে তুলতে গিয়ে, প্রথমত জারতান্ত্রিক এবং তারপরে অস্থায়ী সরকারের কর্মনীতির পরিণতি আর্থনীতিক ভাঙাচোরা অবস্থাটাকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অতিক্রম করতে হয়েছিল, এবং শত্রুপরিবেষ্টিত, বাইরের আর্থনীতিক সাহায্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দেশে অর্থনীতিকে চালু অবস্থায় আনতে হয়েছিল।

যুদ্ধকালীন কমিউনিজম ছিল বুর্জোয়াদের বেপরোয়া প্রতিরোধের একটা জবাব, — সংগ্রামের অতি সুতীব্র সব রূপ ব্যবহার করতে প্রলেতারিয়েতকে বাধ্য করেছিল বুর্জোয়ারা।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে, 'পুরনর যথাসম্ভব কম ভেঙে', 'তখন বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে'* যতখানি সম্ভব মানিয়ে নিয়ে 'নতুন সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত ক্রমান্বয়িক উত্তরণের'** পরিকল্পনা করেছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক পুঁজির সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পেরে রুশী বুর্জোয়ারা কোন আপস করতে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রবিধান আর নিয়ন্ত্রণের অধীন হতে রাজী ছিল না; তার বদলে তারা বাধিয়েছিল অতি

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩৩তম খণ্ড, ৯১ পৃঃ

** ঐ, ৮৯ পৃঃ

হিংস্র যুদ্ধ, যা সোভিয়েত ক্ষমতার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল। লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিপতিদের এইসব কার্যকলাপ সোভিয়েত জনগণকে জড়িয়ে ফেলেছিল 'একটা প্রচণ্ড এবং অদম্য কঠোর সংগ্রামে, — আমরা প্রথমে যা মনস্থ করেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি পরিসরে পুরন সম্পর্কগুলোকে বিনষ্ট করতে সেটা আমাদের বাধ্য করেছিল।'*

বৃহদায়তনের শিল্প ছাড়াও, মাঝারি এবং ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোরও রাষ্ট্রীয়করণ হল। সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী রাষ্ট্রের হাতে জড়ো করে ফৌজে এবং গ্রামাঞ্চলে যোগান দিতে পারার জন্যে এটা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়।

শস্যে একচেটিয়া চালু হল, শস্যের ব্যক্তিগত কেনা-বেচা নিষিদ্ধ হল। এর পরে, ১৯১৯ সালে ১১ই জানুয়ারি চালু হল উদ্বৃত্ত শস্য এবং পশুখাদ্যের অধিগ্রহণ (রিকুইজিশনিং)। (পরে অন্যান্য ধরনের কৃষিজাতদ্রব্যকেও অধিগ্রহণের আওতায় নেওয়া হয়েছিল।) এইভাবে, কৃষকেরা তাদের সমস্ত উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্য রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে বাধ্য ছিল। পৃথক পৃথক কৃষকের ভোগ-ব্যবহার আর পরের বছরে বোনার জন্যে প্রয়োজনীয় শস্যের পরিমাণ এবং তার পশুগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় পশুখাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা। তার উপর যে-পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত সেটা দিতে হত রাষ্ট্রকে। কোন্ গুবের্নিয়া কত শস্য দেবে সেটা ফসল তোলার অবস্থা অনুসারে স্থির করা হত। তখন সেই পরিমাণটাকে ভাগ-ভাগ করে ধার্য করা হত বিভিন্ন অঞ্চল, জেলা, গ্রাম এবং পৃথক পৃথক খামারের উপর। পরিকল্পনা পরিপূরণ করা ছিল বাধ্যতামূলক।

লেনিনের নির্ধারিত একটা শ্রেণীগত নীতির বনিয়াদে এই অধিগ্রহণ চালানো হয়েছিল, নীতিটা ছিল এই: গরিব

---

* ঐ, ৯১ পৃঃ

কৃষকের দিতে হবে না কিছুই, মাঝারি কৃষকের দিতে হবে পরিমিত পরিমাণে, আর বেশ মোটা পরিমাণে দেবে ধনী কৃষক। শ্রম তলবের ব্যবস্থা চালু করে কাজ করা সমস্ত শ্রেণীর পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। বুর্জোয়াদের কায়িক শ্রম করতে বাধ্য করা হয়েছিল — 'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না' এই নীতিটিকে এইভাবে কার্যে পরিণত করা হয়েছিল।

অর্থনীতির 'নিয়ন্ত্রক অবস্থানগুলি' হাতে জড়ো করে সোভিয়েত রাষ্ট্র দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন পরিচালনা করতে এগোল। কাঁচামাল, জালানি, খাদ্যসামগ্রী এবং শিল্পজাতদ্রব্যের বণ্টনের উপর কড়াকড়ি কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা বলবৎ করা হল। আর্থনীতিক সহায়-সম্বলের নিদারুণ ঘাটতি ছিল, — সেগুলি যাতে প্রতিরক্ষার চাহিদা অনুযায়ী উপায়ে ব্যবহৃত হয়, সেটা নিশ্চিত হল অতি কঠোর কেন্দ্রীকরণের ফলে।

শ্রেণী হিসেবে ভূস্বামীদের লোপ করা, মেহনতী কৃষককুলকে ভূমি দেওয়া এবং অসহ্য খাজনা আর কর থেকে এই কৃষকদের রেহাই দেওয়ার ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্র এইসব কৃষকের সমর্থন পেল, ঐসব ব্যবস্থা শ্রমিক এবং কৃষকের সামরিক-রাজনীতিক মৈত্রী সংহত করে তুলতে সহায়ক হল।

অধিগ্রহণ এবং তজ্জনিত কষ্ট মেহনতী কৃষকেরা মেনেছিল, কেননা তারা বেশ ভালভাবেই বুঝেছিল, ভূস্বামী আর কুলাকদের হাত থেকে তাদের রক্ষক হল সোভিয়েত ক্ষমতা। কৃষকেরা বুঝল, বিপ্লবের ফলে পাওয়া ভূমি বজায় রাখতে হলে, এবং ভূস্বামী আর কুলাকদের মোকাবিলা করতে হলে কৃষকের স্বার্থের রক্ষক সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সর্বপ্রযত্নে সমর্থন করা দরকার। যুদ্ধ, অবরোধ এবং আর্থনীতিক বিশৃঙ্খলার কঠিন অবস্থার মধ্যে এইসব যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের ব্যবস্থা ছিল প্রতিরক্ষার জন্যে দেশের সমস্ত সহায়-সম্বলের সমাবেশ নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়।

ভ্রাঙ্গেলের ফৌজের চূড়ান্ত পরাজয় এবং ক্রিমিয়ার মুক্তি প্রধান শত্রু-শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের জয় সূচিত করল। কিন্তু, তখনও দেশের কয়েকটা অংশে লড়াই চলছিল। এইসব লড়াই বিশেষভাবে দীর্ঘ এবং বিলম্বিত হয়েছিল ককেশাসে, সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে এবং মধ্য এশিয়ায়। এইসব সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে সৈন্য পাঠানো এবং সেখানকার প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোকে অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদের যোগান দেওয়া পররাষ্ট্রগুলির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। স্থানীয় বুর্জোয়া এবং ভূস্বামী মহলগুলো জনসংখ্যার কোন কোন অংশে কিছুকাল যাবত জাতীয়তাবাদী মনোভাব চাঙ্গা করে রাখতে পেরেছিল, এটার গুরুত্বও খুব কম ছিল না। তবে, এইসব অঞ্চলেও শেষপর্যন্ত জয়ী হল জনগণ।

খিভা, বোখারা, আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মেহনতী জনগণ জয়যুক্ত হয়েছিল ১৯২০ সালে। ১৯১৮ সালে বাকু কমিউনের পতনের পরে আজারবাইজানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী 'মুস্‌সাভাৎ' ('সাম্য') পার্টির হাতে। আজারবাইজানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মেহনতী জনগণ অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি আরম্ভ করল।

১৯২০ সালে ২৭এ এপ্রিল ভোরে বাকুর শ্রমিকদের ডিট্যাচমেণ্টগুলি শহরের বিভিন্ন ব্যারাক, জাহাজঘাট আর রেল-স্টেশনে অভিযান চালাল। এরপরে শহরের অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বসম্পন্ন কেন্দ্রও দখল হল। সেই রাত্রে ক্ষমতা হাতে নিল আজারবাইজানীয় সামরিক বৈপ্লবিক কমিটি — আজারবাইজান হল একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। নারিমান নারিমানোভ হলেন বৈপ্লবিক কমিটির প্রধান।

ঐ সময়ে ভীষণ সংগ্রাম চলছিল আর্মেনিয়ায়। সেখানে ক্ষমতা ছিল বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী 'দাশ্‌নাক্‌ৎসিউটিউন' ('সংঘ') পার্টির হাতে, এই পার্টিটা আর্মেনিয়াকে সর্বনাশের কিনারে নিয়ে ফেলেছিল। আরমানী শ্রমিক আর কৃষকেরা দাশ্‌নাক্‌দের (বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের) ক্ষমতা মেনে নিতে রাজী হল না। দেশের বিভিন্ন অংশে অভ্যুত্থান ঘটতে থাকল। দিলিজান এলাকায় বিদ্রোহীদের সামরিক বৈপ্লবিক কমিটি ১৯২০ সালে ২৯এ নভেম্বর তারিখে আর্মেনিয়াকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করল। এই বৈপ্লবিক কমিটির সভাপতি ছিলেন স. কাসিয়ান — তিনি পার্টি সদস্য ছিলেন ১৯০৪ সাল থেকে। তার কয়েক দিন পরে আর্মেনিয়ার রাজধানী এরেভানকে মুক্ত করেছিল বিদ্রোহী জনগণ।

আর্মেনিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা কায়েম হবার পরে ককেশাসে প্রতিবিপ্লবের মজবুত ঘাঁটি অবশিষ্ট ছিল আর একটামাত্র — মেনশেভিক জর্জিয়া। জর্জীয় মেনশেভিকরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী এবং গণতন্ত্রী বলে জাহির করত, কিন্তু কোন সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের কথা তারা ভাবেও নি।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জর্জিয়ার জনগণ বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহের পরিচালক বৈপ্লবিক কমিটির সদস্যদের মধ্যে কয়েক জন অভিজ্ঞ বলশেভিক ছিলেন — তাঁদের মধ্যে মাত্র চারজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল: ফিলিপ মাহারাদ্‌জে (সভাপতি), মামিয়া ওরাখেলাশ্‌ভিলি, মিখাইল স্‌খাকায়া, শাল্‌ভা এলিয়াভা। ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিপ্লবের লাল ঝাণ্ডা উড়েছিল তিফলিসে (ত্‌বিলিসিতে)।

জয়যুক্ত বিপ্লবের শেষ অঙ্কটিতে এসেছিল মধ্য এশিয়ার জাতিগুলিও। ১৯২০ সালে তুর্কিস্তান সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পাশাপাশি ছিল দুটো স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র: খিভার খান-

শাসিত রাজ্য এবং বোখারার আমির-শাসিত রাজ্য। রাজতন্ত্রের অধীন উজবেক, তাজিক এবং তুর্কমেনরা নিপীড়িত হচ্ছিল খান আর আমিরের পাশব জুলুমে। বোখারায় আর খিভায় কালগতি যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এই দুটি রাষ্ট্রে সুদূর মধ্যযুগের মতো দশায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। কোন বিদ্যালয় কিংবা হাসপাতাল ছিল না, কৃষক আর কুটির শিল্পীদের অসহ্য কর দিতে বাধ্য করা হত। গরিবেরা এইসব কর দিতে অপারগ হলে তাদের ছেলে-মেয়েদের প্রায়ই ক্রীতদাস হিসেবে পাকড়ে নিয়ে যাওয়া হত। অতি লঘু অপরাধের জন্যেও প্রকাশ্যে লোকের শিরশ্ছেদ করা হত, কিংবা তাদের আটকে রাখা হত কাঁকড়াবিছে-ভরা ভয়ংকর অন্ধকূপে। ঐ খান আর আমির সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি চালিয়েছিল; বোখারায় এবং খিভায় বৃটিশ রাইফেল, মেশিনগান আর কার্তুজ এসেছিল সারি সারি উটের পিঠে করে মরুভূমির ভিতর দিয়ে, পর্বতের উপর দিয়ে।

কিন্তু, এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত জুলুমবাজ রাজ ভেসে গিয়েছিল জনগণের ক্রোধের দাপটে। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে খিভায় জন-বিপ্লবের ফলে কায়েম হল সোভিয়েত ক্ষমতা, আর ১৯২০ সালের অগস্ট মাসের শেষের দিকে বোখারার মেহনতী জনগণও বিদ্রোহ করল। লাল ফৌজের বিভিন্ন ইউনিটের সাহায্যে বিদ্রোহীরা আমিরের সৈন্যদলগুলোকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল। তার মানে তখন সারা মধ্য এশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়া শুরু করার অবস্থা সৃষ্টি হল।

আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী বাহিনীগুলোর দাঁড়াবার শেষ জায়গাটা ছিল সোভিয়েত দূর প্রাচ্য, সেখানে তখনও জাপানী আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা আর শ্বেতরক্ষীরা কোট বজায় রেখেছিল। এইসব বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করেছিল পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্টগুলি। ১৯২০ সালে এই অঞ্চলের মেহনতী জনগণ

স্থাপন করেছিল দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্র, আর পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্টগুলিকে মিলিয়ে গড়া হয়েছিল বিপ্লবী জন-ফৌজ।

ভাসিলি ব্লিউখের পরিচালিত এই ফৌজ আক্রমণ-অভিযান শুরু করেছিল ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে। খাবারভ্স্ক থেকে অনতিদূরে ভলোচায়েভ্কা গ্রামের কাছে শ্বেতরক্ষীরা ছিল মজবুত সুরক্ষিত অবস্থানে। ইয়ুন-কোরান পাহাড়ে পাতা ছিল তাদের কামানশ্রেণী আর মেশিনগানগুলো; বরফে-ঢাকা একটা প্রশস্ত ময়দান ছিল এই পাহাড়টা থেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। এই পাহাড়ে পেঁছবার পথগুলো ছিল গভীর সব পরিখা, বরফে-ঢাকা ঢালু আর অজস্র কাঁটাতারের বেষ্টনীর একটা গোলকধাঁধার মতো।

১৯২২ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারি ব্লিউখেরের সৈনিকেরা শ্বেতরক্ষীদের অবস্থানের উপর আক্রমণ শুরু করেছিল। ৬নং পদাতিক রেজিমেণ্টের একটা কম্পানি কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু তাদের শেষ সৈনিকটি অবধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।এইসব ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও বিপ্লবী সৈনিকেরা পিছু হটল না। তারা বরফের উপর সটান পড়ে থেকে সাহায্য আসার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। কনকনে ঠাণ্ডা আর দুরন্ত হিমঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে সৈনিকেরা তাদের অবস্থানে অটল হয়ে থাকল — যদিও, উপযুক্ত গরম জামা-কাপড় ছিল না তাদের বেশির ভাগেরই। নিষ্পত্তিমূলক মুহূর্তটা এল ১২ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায়, তখন কামান থেকে গোলাবর্ষণের পরে পাহাড়টা দখল করার জন্যে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করা হল। লড়াই চলেছিল তিন ঘণ্টা ধরে; কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে ঢুকে প’ড়ে সৈনিকেরা বেঅনেট লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভলোচায়েভ্কা দখল করার পরে বিপ্লবী সৈনিকেরা পলায়মান শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে। ১৯২২ সালে ২৫এ অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে বিপ্লবী জন-ফৌজ ঢুকেছিল

ভাগ্নাদিভস্তকে, সেই হল বৈদেশিক আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর প্রতিবৈপ্লবিক বাহিনীগুলো থেকে দেশের চূড়ান্ত মুক্তি।

* * *

অক্টোবর বিপ্লবে অর্জিত বস্তুগুলি রক্ষা করা এবং সমাজতান্ত্রিক স্বদেশভূমির মুক্তি আর স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে রাশিয়ার জাতিগুলির সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল তিন বছর ধরে। অজস্র রক্ত ঝরানো এই ভয়ানক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র একেবারে সম্পূর্ণত জয়যুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল। আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের সাজসজ্জা আর সরবরাহের বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা পরাস্ত-পর্যুদস্ত হল। সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্যে স্থানীয় প্রতিবৈপ্লবিক শক্তিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর যুক্ত চেষ্টা সম্পূর্ণত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল।

সোভিয়েত রাষ্ট্র জয়যুক্ত হল তার কারণ, আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম ছিল একটা নতুন, প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার সংগ্রাম — যে-সমাজব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী আর সেকেলে শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের ফলে। নতুন জীবনযাত্রাপ্রণালী গড়তে আগ্রহান্বিত লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষ সমবেত হয়েছিল প্রলেতারিয়েত আর তার সর্বাগ্রভাগ কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে; তারা প্রদর্শন করেছিল অফুরন্ত সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ আর কর্মোদ্যম। বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মেহনতী জনগণ বিপুল ত্যাগস্বীকার এবং কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল, তারা নিঃস্বার্থ সাহসিকতা দেখিয়েছিল যেমন লড়াইয়ে, তেমনি বেসামরিক যুদ্ধপ্রচেষ্টায়ও। কমিউনিস্ট পার্টি নির্ভুল কর্মনীতি অনুসরণ করেছিল শুধু তাই নয় — এই কর্মনীতিকে জনগণ

সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিল — কমিউনিস্ট পার্টি আরও হয়ে উঠেছিল জনগণের প্রতিরক্ষাপ্রচেষ্টার প্রধান চালিকাশক্তি এবং সংগঠক: সঠিক খাতে জনগণের কর্মোদ্যম পরিচালিত করতে, দেশকে সশস্ত্র শিবিরে রূপান্তরিত করতে, প্রতিরক্ষার জন্যে সমস্ত প্রাপ্তব্য শক্তি ইত্যাদি সমবেত করতে এবং শ্রমিক-কৃষকের ফৌজ গড়ে তুলতে পার্টি সক্ষম হয়েছিল।

সমাজতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্র, এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম সামরিক সংঘাতে নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জয়যুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীর সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, বল আর জীবনীশক্তির প্রমাণ দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি। আর্থনীতিক পুনঃস্থাপন ১৯২১—১৯২৫

কূটনীতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান

অস্ত্রবলে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অপচেষ্টার কর্মনীতির দেউলিয়াপনা প্রতিপন্ন হল আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের পরাজয়-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে। শান্তিপূর্ণ কাজে নামার সুযোগ জিতে নিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। ষোল-আনা ন্যায্যতই লেনিন তখন দৃঢ়োক্তি করেছিলেন: '...দম ফেলার ফুরসতের চেয়ে বেশিকিছুই আমরা পেয়েছি: আমরা প্রবেশ করেছি এক নতুন কালপর্যায়ে, তাতে আমরা পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রজালির মধ্যে আমাদের বুনিয়াদী আন্তর্জাতিক অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করেছি।'*

পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নেতাদের মনঃপূত হোক না-হোক, একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে হল বাধ্য হয়ে। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম পরিত্যক্ত না-হলেও, নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে থাকল।

এক্ষেত্রে বড়রকমের বিভিন্ন সাফল্য ঘটেছিল ১৯২১ সালেই। সেই বছর মার্চ মাসে লণ্ডনে একটা ইং-সোভিয়েত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিটির তাৎপর্য শুধু আর্থনীতিক

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩১তম খণ্ড, ৪১২ পৃঃ

নয়, রাজনীতিকও ছিল, কেননা সোভিয়েত সরকারের প্রতি বৃটেনের স্বীকৃতিই এতে কার্যত সূচিত হল। তখনকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড-জর্জ কমন্স-সভায় পরোক্ষে তারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

এরপরে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল জার্মানি, ইতালি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া এবং আরও কতকগুলি দেশের সঙ্গে।

১৯২১ সালের বসন্তকালে তুরস্ক, ইরান এবং আফগানিস্তানের সঙ্গেও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এইসব সন্ধিচুক্তির জন্যে আগে প্রাথমিক কাজ চালানো হয়েছিল, — সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতির মধ্যে মৌলিক নীতিগত পার্থক্য প্রকটিত হল এগুলিতে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি প্রাচ্যের দেশগুলিকে দেখে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্র হিসেবে। একটি বৃহৎ শক্তি এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এগুলি হল সর্বপ্রথম সন্ধিচুক্তি, যার বনিয়াদ হল পূর্ণ সমতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদার নীতি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির আরও নতুন নতুন সাফল্য ঘটেছিল তার পরের বছর। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করল সেই প্রথম — জেনোয়ায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার অংশগ্রহণে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ১৯২২ সালে ৬ই জানুয়ারি কান্'এ আঁতাঁতের সর্বোচ্চ পরিষদের বৈঠকে। পশ্চিমে অনেকে হিসেব করেছিল, ঐ সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের আসতে দিয়ে তারা কূটনীতিক চাপের মারফত সোভিয়েত রাশিয়ার উপর বড় বড় আর্থনীতিক দাবি চাপাতে পারবে। কান্'এ গৃহীত প্রস্তাবে সেটা প্রতিপন্ন হয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার উপর আগেই বাঁধাধরা শর্ত দেবার মতলবে ফরাসী সরকার এই

মর্মে একটা বিশেষ বিবৃতি দিয়েছিল যে, 'সোভিয়েত কিংবা অন্য কোন সরকার যদি তার উত্তরে কিংবা সরকারী বিবৃতিতে জানায় যে, আগে ৬ই জানুয়ারি রচিত সিদ্ধান্ত (কান্'এ আঁতাঁতের সর্বোচ্চ পরিষদের বৈঠকে — সম্পাঃ) সে একেবারে ষোল-আনাই গ্রহণ করছে না, তাহলে ফরাসী সরকার জেনোয়া সম্মেলনে প্রতিনিধিদল পাঠাতে সক্ষম হবে না।' এটা ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের উপর চাপ দেবার প্রকাশ্য অপচেষ্টা। সোভিয়েত রাশিয়াকে বাদ দিয়ে একটা প্রস্তুতিমূলক সম্মেলন বসাবার জন্যেও ফ্রান্স ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, যাতে জেনোয়া সম্মেলনে যে-প্রস্তাব গৃহীত হবে তার মর্মবস্তু নিয়ে আগেই নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে রাখতে পারে।

১৯২২ সালে ১৫ই মার্চ তারিখের একখানা নোট্'এ সোভিয়েত সরকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সামনে আগে গৃহীত সিদ্ধান্ত হিসেবে একটা নিষ্পন্ন ব্যাপার হাজির করার জন্যে জেনোয়া সম্মেলনের সংগঠকদের অপচেষ্টার নিন্দা করল।

জেনোয়ায় প্রতিনিধিদল পাঠাবার আমন্ত্রণ সোভিয়েত সরকার পেয়েছিল ১৯২২ সালে ৭ই জানুয়ারি, আর তার পরদিনই ঘোষণা করেছিল যে, ঐ সম্মেলনের কাজে অংশগ্রহণ করতে সোভিয়েত সরকার রাজী।

জেনোয়া সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল যে-মতাবস্থানে দাঁড়াবে সেজন্যে একটা সুদৃঢ় কার্যকরণসূচি লেনিন তুলে ধরেছিলেন কতকগুলি বক্তৃতায় এবং নিবন্ধে। এই কার্যকরণসূচির প্রধান দফাগুলি ছিল এই: সোভিয়েত রাশিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তাদের যেসব প্রস্তাব শান্তির স্বার্থের পরিপন্থী নয় সেগুলি সমর্থন করতে প্রস্তুত; সোভিয়েত রাশিয়া সমস্ত দেশের মধ্যে কূটনীতিক আর আর্থনীতিক সহযাগিতার সর্বতোমুখী বিকাশের পক্ষপাতী। পররাষ্ট্রকে

ইচ্ছামতো আদেশ-নির্দেশ দেওয়া এবং একতরফা সন্ধিচুক্তি চাপিয়ে দেবার যাবতীয় চেষ্টারও সোভিয়েত রাষ্ট্র বিরোধিতা করেছিল। মজবুত আর সুস্থিত শান্তি এবং আর্থনীতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র আর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল জেনোয়ায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রধান কর্তব্য।

১৩শ শতকে তৈরি পালাজ্জো দি সান্-জর্জো'তে দুটো বিরাট হল্ঘরের একটায় আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের আবহাওয়ায় ১০ই এপ্রিল তারিখে জেনোয়া সম্মেলনের উদ্বোধন হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এবং নানা বিশেষজ্ঞরাসমেত দু'হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল এই শহরটিতে।

সোভিয়েত প্রতিনিধির বক্তৃতার জন্যে সবাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে ছিল। শান্তি সংহত করার জন্যে সোভিয়েত সরকারের বিস্তৃত কর্মসূচি তুলে ধরে গেওর্গি চিচেরিন বলেছিলেন, পারস্পরিক সুবিধা এবং সমতার ভিত্তিতে সমস্ত দেশের সঙ্গে আর্থনীতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সোভিয়েত সরকার ইচ্ছুক। বিষাক্ত গ্যাস এবং অসামরিক জনসংখ্যার বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা সমেত সর্বজনীন অস্ত্রহ্রাসেরও একটা প্রস্তাব তুলেছিলেন সোভিয়েত প্রতিনিধি। এমন অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাব তোলা হল এই প্রথম। এই সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি পরে বলেছিলেন: 'চিচেরিনের বক্তৃতার ক্রিয়া হয়েছিল এমনই প্রবল যে, কূটনীতিক আদবকায়দার সমস্ত বাধ-বন্ধ ঠেলে রেখে তোলা প্রচণ্ড করতালিধ্বনি ছিল অমন সমৃদ্ধ ভাষণে অতি স্বাভাবিক সাড়াই...'

চিচেরিনের বক্তৃতা এবং তার উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক মহলগুলিতে আন্তরিক অনুমোদন পেয়েছিল। সম্মেলন চলতে থাকবার সময়ে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল

বেশকিছুসংখ্যক তারবার্তা এবং চিঠি পেয়েছিল, সেগুলিতে প্রতিনিধিদলের কাজের অনুমোদন এবং প্রশংসা জানানো হয়েছিল। তবে, এইসব প্রস্তাবের প্রতি সম্মেলনে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিনিধিদের মনোভাব ছিল ভিন্ন রকমের। সর্বজনীন ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবটিকে কোন আলোচনা ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

রাপাল্লো'তে সোভিয়েত-জার্মান সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার চাঞ্চল্যকর সংবাদ পেঁছলে ১৮ই এপ্রিল তারিখে জেনোয়া সম্মেলনের সব চারটে কমিশনেরই বৈঠক ভেঙে গিয়েছিল। বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা যখন সমাজতান্ত্রিক শক্তিটির উপর তাদের নানা শর্ত চাপাবার জন্যে বিভিন্ন কমিশনে সচেষ্ট ছিল তখন সমাজতান্ত্রিক দেশটির প্রতিনিধিরা সোভিয়েত-জার্মান সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের জন্যে জার্মান সরকারের সঙ্গে আপস-আলোচনা চালাচ্ছিলেন, সে-সম্বন্ধে কাজ আগেই আরম্ভ হয়েছিল বার্লিনে। এই আপস-আলোচনার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৬ই এপ্রিল। সেদিন স্বাক্ষরিত সোভিয়েত-জার্মান সন্ধিচুক্তিতে এইসব বিষয় ছিল: দুই দেশের মধ্যে অবিলম্বে কূটনীতিক সম্পর্ক এবং কনসালীয় প্রতিনিধিত্ব পুনঃস্থাপন করা, যুদ্ধকালীন ঋণগুলির দাবি পরিত্যাগ করা, সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রাক্তন জার্মান সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ জার্মানি কর্তৃক মেনে নেওয়া — 'অবশ্য যদি রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সরকার অন্যান্য সরকারের অনুরূপ দাবি না-মেটায়'।

রাপাল্লো সন্ধিচুক্তি হল সোভিয়েত কূটনীতির প্রথম বড়রকমের জয়। সেই প্রথম একটা প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করল, সেটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির স্থান আরও সংহত হবার পথ করে দিল।

জেনোয়া সম্মেলনে অনেক প্রতিনিধিই সোভিয়েত-জার্মান সন্ধিচুক্তির বিরোধিতা করেছিল প্রকাশ্যে। ফরাসী প্রতিনিধিদল তো ঐ সন্ধিচুক্তি বাতিল করে দেবারই জন্যে জিদ ধরেছিল। প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডার পরে পশ্চিমী দেশগুলির প্রতিনিধিরা জার্মানির প্রতিনিধিকে রাজনীতিক সাবকমিশন থেকে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল — জার্মানি আগেই রাশিয়ার সঙ্গে আপস করল বলে।

সম্মেলনে পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিরা হিসেব করছিল যে, তারা সোভিয়েত সরকারকে জার সরকার আর অস্থায়ী সরকারের ঋণগুলো মেনে নেওয়াতে এবং তথাকথিত রুশী ঋণ কমিশন বসাতে রাজী করাতে পারবে। সোভিয়েত সরকার যে-দায়দায়িত্ব গ্রহণ করত তা সোভিয়েত সরকারের কার্যে পরিণত করা নিয়ন্ত্রণ করত ঐ কমিশন — অর্থাৎ কিনা, নতুন-প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারত সেই কমিশন। বিপ্লবের সময়ে বাজেয়াপ্ত করা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেগুলির প্রাক্তন বৈদেশিক মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলেও পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়কদের মনে আশা ছিল।

কিন্তু, যা আশা করা গিয়েছিল তাইই ঘটল: সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উপর না-গ্রহণযোগ্য শর্ত চাপাবার জন্যে পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। যেসব প্রস্তাবের মতলব ছিল দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, যেগুলি সমতার নীতিভিত্তিক নয়, এমন সমস্ত প্রস্তাব সোভিয়েত প্রতিনিধিদল প্রত্যাখ্যান করল। জার সরকার আর অস্থায়ী সরকারের ঋণগুলো সোভিয়েত রাশিয়াকে পরিশোধ করতে বলার দাবিটা যে যুক্তিহীন সেটা সোভিয়েত প্রতিনিধিরা দেখিয়ে দিল। জার সরকার আর অস্থায়ী সরকার তো প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা

এবং যুদ্ধ চালাবার জন্যেই ঐসব ঋণ নিয়েছিল। রাশিয়া যখন আঁতাঁতের পক্ষে লড়ছিল তখন লক্ষ লক্ষ রুশী মারা গিয়েছিল, আর আঁতাঁতের দেশগুলি পরে নতুন নতুন রাজ্যক্ষেত্র পেয়েছিল এবং জার্মানি থেকে পেয়েছিল মোটা-রকমের খেসারত। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ-হস্তক্ষেপের ফলে এই সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩,৯০০ কোটি সোনার রুবল। তবুও তারা টাকা দাবি করে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে! এইসব দাবি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল স্বভাবতই। এরই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশে সোভিয়েত সরকার বলেছিল, পাওনাদার দেশগুলি যদি যুদ্ধকালীন ঋণগুলো নাকচ করে দেয় এবং যদি রাশিয়াকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেই শর্তে যুদ্ধের আগেকার ঋণের প্রশ্নটা সোভিয়েত সরকার বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত।

তবে, পশ্চিমী শক্তিগুলি সমতার ভিত্তিতে মিটমাটের কথা শুনতেও নারাজ ছিল বলে জেনোয়া সম্মেলন ততক্ষণে কার্যত ভেঙেই গিয়েছিল। এই প্রশ্নে বিশেষ গোঁ-ধরা মতাবস্থান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের — তারা রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যেকোন আপস-আলোচনার বিরোধিতা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে নি, ইতালিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে পাঠিয়েছিল শুধু পর্যবেক্ষক হিসেবে। এরই সঙ্গে সঙ্গে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে একটাকিছু মিটমাট করে ফেলতে পারে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনোয়া সম্মেলনটাকে ভেঙে দেবার জন্যে অস্বাভাবিক রকম উগ্র চেষ্টা করেছিল।

১৯২২ সালে ১১ই মে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সম্মেলনে বিশেষজ্ঞদের স্তরে আলোচনা আবার আরম্ভ করার প্রস্তাব তুলেছিল। এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পরে স্থির হয়েছিল, জুন মাসে

একটা আর্থনীতিক সম্মেলন বসানো হবে, — জেনোয়ায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলি নিয়ে সেখানে আরও বিশদভাবে আলোচনা হবে। এইভাবে এল একটা নতুন সম্মেলন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা — সেটা হেগ্'এ।

হেগ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ বছরই জুন এবং জুলাই মাসে, কিন্তু সেটাও হল নিষ্ফল। সেটা শুধু দেখিয়ে দিল যে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি তখনও আশা করছিল যে, তারা সোভিয়েত রাশিয়ার উপর দুঃসহ আর্থনীতিক শর্ত চাপিয়ে দিতে, বিপ্লবের সময়ে রাষ্ট্রীয়কৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেগুলির প্রাক্তন বৈদেশিক মালিকদের হাতে ফেরত দেওয়াতে এবং আবার পুঁজিতান্ত্রিক চালচলন প্রবর্তন করাতে পারবে। মতলব হাসিল করতে অপারগ হয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলি সম্মেলনটাকে শেষ করে দিল তড়িঘড়ি। সম্মেলনের ফলাফল থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বহু রাজনীতিক তখনও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্থনীতিক অবরোধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিল।

তবে, জেনোয়া আর হেগ্ সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের ক্রিয়াকলাপ, তারা যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল এবং শেষে রাপাল্লোতে জার্মানির সঙ্গে স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি — এসবের প্রবল ক্রিয়া ঘটেছিল রাজনীতিক্ষেত্রে। সহযোগিতার জন্যে কামনা প্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্পষ্ট করে দিল যে, নিজের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ সে হতে দেবে না।

জেনোয়া কিংবা হেগ্ সম্মেলনে কোন ফল না-ফললেও, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যে তাতে আমন্ত্রিত হল এবং সোভিয়েত প্রতিনিধিদল তার কাজে অংশগ্রহণ করল, এতেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির কূটনীতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান সূচিত হল।

এই দুটো সম্মেলনের পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা প্রবলতর হতে থাকল। শান্তি আর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংহত করার জন্যে সোভিয়েত কূটনীতিকদের প্রচেষ্টা আর অজ্ঞাত রইল না। সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের মুক্তি প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন: '...তাদের সামরিক শক্তি সত্ত্বেও জাপানীরা বলেছিল তারা ঘরে যাবে এবং সে-প্রতিশ্রুতি তারা পালন করেছে; এজন্যে আমাদের কূটনীতিরও কৃতিত্ব আছে।'*

আনুপাতিক নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশে মস্কোয় একটা সম্মেলন বসাবার জন্যে সোভিয়েত সরকার ১৯২২ সালের জুন মাসে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া এবং পোল্যান্ডের সরকারগুলির কাছে প্রস্তাব তুলেছিল। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে এমন একটা সম্মেলন মস্কোয় অনুষ্ঠিতও হয়েছিল, সেখানে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সৈন্যবাহিনীগুলি হ্রাস করার পরিমাণ সম্বন্ধে সোভিয়েত প্রতিনিধিরা মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলেছিল। সেখানে হাজির বুর্জোয়া মহলগুলির মতাবস্থানের দরুন এই মস্কো সম্মেলনে কোন নির্দিষ্ট ফল না-হলেও, এমন সম্মেলন যে অনুষ্ঠিত হল, এটাই একটা ইতিবাচক ঘটন, কেননা সোভিয়েত জনগন যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং অস্ত্রসজ্জা-হ্রাসের মতো গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যা নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছতে আন্তরিকভাবে আগ্রহশীল, সেটা সাধারণভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ দেখল।

ইতোমধ্যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির উপর আঘাত করা এবং দেশটির আন্তর্জাতিক মর্যাদার বৃদ্ধি থামিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির একটা সম্মিলিত সোভিয়েতবিরোধী ফ্রন্ট গড়ার জন্যে প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলো আর-একটা চেষ্টা চালাল।

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩৩তম খণ্ড, ৩৯০—৩৯১ পৃঃ

১৯২৩ সালে ৮ই মে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন সোভিয়েত সরকারের কাছে একখানা চরমপত্র পাঠিয়েছিলেন, — সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক আর রাজনীতিক সংহতিসাধন ক্ষুণ্ন করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। দেশটির আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের একটা স্থূল অপচেষ্টা ছিল এই চরমপত্র। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত সরকার তার জবাবে একটা স্পষ্ট ধমকানি দিয়েছিল অবিলম্বে — ১১ই মে তারিখে।

তবে, কার্জনের চরমপত্রখানা কোনক্রমেই একটা বিচ্ছিন্ন সোভিয়েতবিরোধী প্ররোচনার কাজ ছিল না, এটা ছিল বরং একটা গোটা গুচ্ছের একটা অঙ্গ। ১৯২৩ সালে ১০ই মে লোজানে একজন শ্বেতরক্ষীর হাতে নিহত হলেন ভাৎস্লাভ ভরোভ্স্কি নামে একজন সোভিয়েত কূটনীতিক।

তবে, কার্জনের নোট্ বা ঐ সন্ত্রাসবাদী কাজ, কিংবা প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ফাঁদা অন্যান্য প্ররোচনা — কিছুই সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক মর্যাদার সংহতিসাধন এবং তার প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি ঠেকাতে পারল না। সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে, তার সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে পশ্চিমের সর্বত্র আন্দোলন সর্বক্ষণ প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকল। এমনকি ফ্রান্সেও এই আন্দোলন বেড়ে উঠছিল ব্যাপক পরিসরে— যদিও, সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুদের মধ্যে এই দেশটির বুর্জোয়া মহলগুলির অবস্থান ছিল চরম দক্ষিণে। ফরাসী র‍্যাডিকাল সমাজতন্ত্রী পল পেনলেভে যে ঐ সময়ে বলেছিলেন, ‘এই সন্ধিক্ষণে যেকোন মন্ত্রিসভা সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হবে না, সেটা ক্ষমতায় টিকতে পারবে না,’ এটা কিছু অকারণে নয়।

১৯২৩ সালে ব্রিটেনে পার্লামেন্টের নির্বাচনে লেবর পার্টির *নির্বাচনী ইস্তাহারে একটা স্লোগান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের* সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। এমনকি উদারনীতিক পার্টির নেতারাও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন কিছু অতিরিক্ত ভোট পাবার আশায়, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টা ১৯২৩ সালের শেষাশেষি ব্রিটেনে খুবই জনপ্রিয় একটা দাবি হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশের সর্বত্র শ্রমিকেরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেবার দাবি তুলছিল।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটেনে সেই প্রথম লেবর সরকার গঠনের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে আপস-আলোচনার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। ঐ বছর ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ম্যাক্‌ডোনাল্ড সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে একখানা নোট্‌ পাঠিয়েছিল মস্কোয় ব্রিটিশ সরকারী এজেণ্ট হজ্‌সন মারফত, এই নোট্‌-এ গ্রেট ব্রিটেন জানিয়েছিল সে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিল। তার পরদিন দ্বিতীয় সারা-ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত একটা বিশেষ প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারের এই উদ্যোগের প্রতি সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ব্রিটেনের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্কের স্থাপন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ঘটনা। ব্রিটেনের উদ্যোগ অনুসরণ করে ঐ বছরই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল আরও কয়েকটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশ — ইতালি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, গ্রীস, সুইডেন, মেক্সিকো, ডেনমার্ক এবং হেজাজ। ১৯২৪ সালের মে মাসে চীনের সঙ্গেও কূটনীতিক

সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সন্ধিচুক্তিতে চীন প্রজাতন্ত্রের *সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদার ব্যবস্থা ছিল, — চীনে জারের রাশিয়ার* যতসব বিশেষ সুযোগসুবিধা ছিল সেগুলি লোপ করতে সেটা সহায়ক হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্কস্থাপনও হল একটা গুরুত্বসম্পন্ন অগ্রপদক্ষেপ। ১৯২৪ সালের মে মাসে পার্লামেণ্টের নির্বাচনের পরে পুয়ান্‌কারে সরকারের পতন ঘটল আর তার জায়গায় এল বুর্জোয়া গণতন্ত্রী এদুয়ার্দ এরিও'র নেতৃত্বে নতুন সরকার, এরিও ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। দুই দেশের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে।

১৯২৪ সালটা সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বছর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রইল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্কের পাশাপাশি আর্থনীতিক যোগাযোগও গড়ে উঠতে থাকল। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় এবং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিল — অস্ট্রিয়ায় (ভিয়েনা), জার্মানিতে (কালান, লাইপজিগ, ফ্রাঙ্কফুর্ট) এবং ফিনল্যাণ্ডে (হেলসিঙ্কি)।

১৯২৫ সালে ২০এ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক এবং কনসালীয় প্রতিনিধিত্ব স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯২৫ সালের আরম্ভ নাগাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সমস্ত প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। জার সরকার এবং অস্থায়ী সরকারের ঋণগুলো বাতিল করার এবং বৈদেশিক নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণের ডিক্রি রদ করতে হবে — এই ছিল সোভিয়েত

ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে মার্কিন শাসক মহলগুলির তোলা শর্ত — তার কম নয়! সেই ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চার্লস ইভান্স হিউজেস এটা বলেছিলেন প্রকাশ্যেই। কাণ্ডজ্ঞানের ধার না-ধেরে এবং তাদের নিজেদেরই দেশের আর্থনীতিক স্বার্থ উপেক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে নারাজ হল, অধিকন্তু, বিদেশেও সক্রিয় সোভিয়েতবিরোধী কর্মনীতি চালাতে থাকল।

১৯২১—১৯২৫ সালের কালপর্যায়ে বহু বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও এই সময়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় বড় সাফল্য লাভ করেছিল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যা তার অর্থনীতির পুনঃস্থাপনের অনুকূল।

নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতিতে উত্তরণ

যুদ্ধের দীর্ঘ মাসগুলোতে সোভিয়েত ভূমিতে লোকে খবরের কাগজখানা খুলে প্রথমেই দেখত ফ্রণ্টের অবস্থা সম্বন্ধে সর্বশেষ বিবরণটা কোথায়। কিন্তু, সেই ভয়ানক যুদ্ধ শেষে শেষ হল। প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক সামরিক পরিষদের রণক্ষেত্রের সদরঘাঁটির শেষ বিবরণ খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২০ সালে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে। তখনও কোন কোন উপান্তবর্তী এলাকায় — যেমন, প্রজাতন্ত্রের দূর প্রাচ্যে — এখানে-ওখানে কিছু কিছু লড়াই চলছিল বটে, সেটা চলেছিল একেবারে ১৯২২ সাল অবধি, কিন্তু শত্রুর প্রধান শক্তিগুলো ১৯২০ সালের শেষাশেষি পরাস্ত হয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের জীবনে তখন আরম্ভ হল প্রথম শান্তিকাল।

তখন দেশের অবস্থা ছিল অতি সংকঠিন। লড়াই বন্ধ হবার ঠিক পরেই সোভিয়েত ভূমির অবস্থাটা যা ছিল সেটার বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন: 'সর্বনাশা ধ্বংস, অভাব, নিঃস্বতা।'*

তখন সাত বছরের যুদ্ধ গেছে দেশের উপর দিয়ে — প্রথমে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি আর তুরস্কের বিরুদ্ধে, আর তারপরে আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে। দেশের তিন-চতুর্থাংশ গিয়েছিল বিদেশী সৈন্য কিংবা শ্বেতরক্ষীদের দখলে। পশ্চাদপসরণের পথে শত্রু মতলব করেই কল-কারখানা আর পুল ধ্বংস করেছিল, পশুপালগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, খাদ্য আর কাঁচামাল লুটে নিয়েছিল; খনিগুলোকে তারা জলে ভরে দিয়েছিল, যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে ফেলেছিল। ফার্নেসগুলো পড়ে ছিল অকেজো হয়ে, দেশের বেশির ভাগ কল-কারখানার জীবনের সাড়া ছিল না।

যুদ্ধের ঐ বছরগুলোতে নিহত কিংবা পঙ্গু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে দুই কোটির বেশি লোক মারা গিয়েছিল, বিকলাঙ্গ হয়েছিল ১৬ থেকে ৪৯ বছর বয়সের ৪,৪০০,০০০ নর-নারী। লক্ষ লক্ষ ছোট ছেলে-মেয়ে হয়েছিল অনাথ এবং গৃহহীন।

১৯২০ সালে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৯১৩ সালের পরিমাণের সাত ভাগের এক-ভাগ, বৃহদায়তনের উৎপাদনের বেলায় অংকটা ছিল প্রায় আট ভাগের এক ভাগ।

পরিবহন-জালির দশাও ছিল নিদারুণ: রেল-ইঞ্জিনগুলোর বেশির ভাগেরই মেরামত দরকার ছিল, কোটি কোটি স্লিপার পচে গিয়েছিল, শত শত মাইল রেল-লাইন বদলাবার দরকার ছিল,

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩২তম খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ

হাজার হাজার পুল ছিল ভগ্নদশায়। ১৯২০ সালে রেলপথগুলিতে মালবহনের ক্ষমতা ছিল যুদ্ধের আগেকার পরিমাণের এক-পঞ্চমাংশ। দেশের বিভিন্ন অংশ এবং গ্রামাঞ্চল আর শিল্পকেন্দ্রের মধ্যেকার আর্থনীতিক যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ইতোমধ্যে, কৃষিক্ষেত্রে আবাদ-করা জমির পরিমাণ ভীষণ কমে গিয়েছিল, ফলন কমে গিয়েছিল বিপর্যয়কর মাত্রায়, পশুসংখ্যাহ্রাস পেয়েছিল ভীষণভাবে। ১৯২০ সালে মোট কৃষি উৎপাদন হয়েছিল যুদ্ধপূর্ব পরিমাণের ৬৭ শতাংশ।

অবর্ণনীয় দুঃখ- দুর্দশায় জর্জরিত মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। কয়েক বছর ধরে চলেছিল অর্ধাহারের অবস্থা, তখনও রুটির রেশন ছিল কড়াকড়ি। শ্রমিক এবং কর্মচারীদের রেশনে মাংস আর মাখন জুটত ক্বচিৎ-কদাচিৎ, চিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা বিলাস-সামগ্রী। শারীরিক নিঃশেষিত অবস্থা আর অপুষ্টির দরুন নানা মহামারী ছড়িয়ে পড়ছিল; ১৯২০ সালে টাইফাসে আক্রান্ত হয়েছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ জনের বেশি। জামা-কাপড়, জুতো আর ওষুধ ছিল অত্যন্ত কম।

যুদ্ধের বছরগুলিতে এইসব দুর্দশার প্রধান বোঝাটা চেপেছিল শ্রমিক শ্রেণীর উপর, শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল, তার অর্থ হল, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের শ্রেণীগত ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অবর্ণনীয় দুর্দশা আর অভাব-অনটনে জর্জরিত হয়েছিল কৃষককুলও — তারা যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের ব্যবস্থাবলিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। কৃষকেরা উদ্বৃত্ত শস্য অধিগ্রহণ তুলে দেওয়াতে চাইছিল, তারা উদ্বৃত্ত উৎপাদ ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অধিকারটা ফিরে চাইছিল।

প্রতিবিপ্লবীরা আর শ্বেতরক্ষীরা তখনও সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করে নি — তারা কৃষকদের অসন্তোষটাকে

কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিল সর্বতোভাবে। কতকগুলো অঞ্চলে কুলাকদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাতে মাঝারি কৃষকদের কোন কোন অংশও যোগ দিয়েছিল।

১৯২১ সালে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে পেত্রগ্রাদের কাছে ক্রনশ্তাদৎ নৌ-দুর্গে একটা সোভিয়েতবিরোধী বিদ্রোহ ঘটেছিল। সেটাকে পরিচালিত করেছিল শ্বেতরক্ষীরা। তবে, এবার তারা স্বরূপ গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিল, তারা বলেছিল তাদের প্রতিবাদটা সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে নয়, শস্য অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, তারা বলেছিল, 'পার্টির চেয়ে বরং সোভিয়েতের ক্ষমতাই' তারা সমর্থন করে। এই বাকচাতুরি দিয়ে তারা গ্যারিসনের নাবিকদের বেশ-একটা অংশকে নিজেদের পক্ষে টানতে পেরেছিল, এই নাবিকদের মধ্যে বহু কৃষক ছিল, তাদের নৌবাহিনীতে ভরতি করা হয়েছিল সবেমাত্র।

বিদ্রোহটাকে দমন করা হয়েছিল, কিন্তু এটা ছিল একটা ভীষণ হুঁশিয়ারি। এতে বিভিন্ন রাজনীতিক সমস্যার সঙ্গে কষে জটপাকানো দেখা গেল বিভিন্ন আর্থনীতিক সমস্যাকে। লেনিন তখন লিখেছিলেন: '১৯২১ সালের বসন্তকালে অর্থনীতি রূপান্তরিত হল রাজনীতিতে: ক্রনশ্তাদ্ৎ।'*

অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা এবং শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার উন্নতি করাবার জন্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ছিল তখনকার জরুরী কাজ। এই বুনিয়াদী লক্ষ্যটা ছিল জীবন-মরণ সমস্যা। এই লক্ষ্যসাধনের জন্যে প্রজাতন্ত্রের আর্থনীতিক কর্মনীতিতে একটা বড়রকমের পরিবর্তন ঘটানো অত্যাবশ্যক ছিল। যুদ্ধের বছরগুলিতে যুদ্ধকালীন কমিউনিজমই ছিল একমাত্র নির্ভুল সমাধান, কিন্তু নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্যে সেটা আর যথেষ্ট ছিল না।

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩২তম খণ্ড, ৩২৭ পৃঃ

* * *

লেনিনের কাজের কামরার বাইরে বহু লোক জড়ো হয়েছিল, তারা অনেক সময় ধরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। এটা অত্যন্ত অ-সচরাচরের দৃশ্য, কেননা লেনিন লোকের সঙ্গে দেখা করতেন আগে স্থির-করা ব্যবস্থা অনুসারে। তারা সবাই ভাবছিল, অত্যন্ত জরুরী কোন রাজকার্য কিংবা খুবই বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি জনকমিসারদের পরিষদের সভাপতির বিলম্ব হবার কারণ। লেনিনের সময় এত দেদার যিনি পাচ্ছেন, তিনি কে হতে পারেন?

শেষে লেনিনের কাজের কামরার দরজা খুলল — বেরিয়ে এল লাপতি জুতো আর ভেড়ার চামড়ার কোট পরা এক দাড়িওয়ালা কৃষক: অপেক্ষাকৃত গরিব কৃষকেরা যেমন, ঠিক তাদেরই একজন, তখন সোভিয়েত রাশিয়ায় অমন গরিব কৃষক ছিল লক্ষ লক্ষ।

যারা বাইরে জড়ো হয়েছিল তাদের সবার উদ্দেশে লেনিন বললেন: 'আপনাদের অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি বলে মাফ করবেন। তামবভের এই কৃষক এতসব আগ্রহজনক কথা বলছিলেন যে আমার সময়ের খেয়াল ছিল না একেবারেই।'

আমেরিকার একজন লেখক আলবার্ট রিস উইলিয়মস এই যে-ঘটনের বিবরণ দিয়েছেন, এটা ছিল লেনিনের পক্ষে খুবই টিপিকাল। তিনি সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের মতামত শুনতেন দরদের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে তিনি দেখা করতেন প্রায়ই, তাদের কাছে পরামর্শ চাইতেন; তাদের প্রয়োজন আর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন।

১৯২০ সালের শেষের দিকে এবং ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে লেনিন বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতেন আরও বেশি ঘন ঘন — আলোচনা করতেন মস্কো গুবের্নিয়া এবং তামবভ আর ভ্লাদিমির এলাকার কৃষকদের সঙ্গে।

পরিস্থিতির বিশদ বিশ্লেষণ করার পরে এবং বহুবিধ প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনায় রেখে লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি একটা নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতিতে (ন. আ. ক) উত্তরণের পরিকল্পনা রচনা করল। এই পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যাতে যুদ্ধ এবং তজ্জনিত আর্থনীতিক ভগ্নদশা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলো অতিক্রম করা যায় এবং যথাসম্ভব দ্রুত জাতীয় অর্থনীতি পুনঃস্থাপন করা যায়। তবে, লেনিনের পরিকল্পনা শুধু স্বল্পমেয়াদী সমস্যাবলিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন কর্মকৌশলগত বিবেচনা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল বিভিন্ন মূলকৌশলগত বিবেচনার সঙ্গে। নতুন শান্তিকালীন অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ চালানো হবে কীভাবে? দেশের দুটো প্রধান শ্রেণীর মধ্যে — শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে — ইতিবাচক এবং সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত্তিটা হবে কী? তাদের মধ্যেকার মৈত্রী সংহত করা যাবে কীভাবে? — এই মৈত্রী ছিল সোভিয়েত সমাজের সাফল্যমণ্ডিত অগ্রগতির নিশ্চায়ক। এই সমস্ত প্রশ্নের একমাত্র নির্ভুল উত্তর তুলে ধরার কাজ ছিল লেনিনের এবং পার্টির।

মেহনতী কৃষকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণী সমাজতন্ত্র গড়বে, এটা ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন: এটা আরও বিশেষভাবে গুরুত্বসম্পন্ন ছিল রাশিয়ায়, যে-দেশে জনসংখ্যার বেশির ভাগ ছিল কৃষক। মোট ১৩ কোটি মানুষের ১০ কোটি বাস করত গ্রামাঞ্চলে।

কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছোট ছোট ব্যক্তিগত জোতে কাজ করত: ঐ সময়ে যৌথখামার ছিল খুবই অল্প কয়েকটা। সমাজে কৃষকের অবস্থাটা ছিল উভবলী: একদিকে, শিল্পশ্রমিকের মতো সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার্জন করত, আর অন্যদিকে, সে ছিল মালিক — সম্পত্তি বাড়াতে সচেষ্ট।

উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে ছোট কৃষকের পণ্য-কৃষি যতদিন বজায় ছিল ততদিন পুঁজিতন্ত্রের *পুনরুত্থান সম্ভব ছিল। এই শ্রেণীর ভিতরে দেখা দিয়েছিল পৃথক* একটা মধ্যবিত্ত স্তর — কুলাক'রা, তারা খেত-মজুর খাটাত।

বড় বড় বারোয়ারী খামার গড়ে এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণ দূর ক'রে কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাবার কাজ হাতে নিল কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু, এটা তো রাতারাতি করে ফেলার কাজ নয়, — কৃষককে নতুন করে শেখাবার দিক থেকে এতে দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য প্রস্তুতির দরকার ছিল, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হবার আগে এটা মনস্থ করা যেত না। সেই পর্বে কৃষককুলের সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন ছিল সর্বোপরি — তাতে সব সময়ে ক্ষুদ্রায়তনের কৃষিখামারের অস্তিত্বের কথা মনে রাখা দরকার ছিল, তখন এই রকমের কৃষিকাজেরই প্রাধান্য ছিল।

যুদ্ধের সময়ে শহর আর গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হত যুদ্ধের পরিস্থিতি দিয়ে। চারদিক থেকে শত্রু-পরিবেষ্টিত নবীন প্রজাতন্ত্রটির অস্তিত্বই তখন ছিল বিপন্ন। ঐ শত্রুদের দমন করার জন্যে কৃষক তখন বিরাট ত্যাগস্বীকার করতে এবং অজস্র দুর্দশা সইতে প্রস্তুত ছিল: কৃষককে এবং অক্টোবর বিপ্লবের ফলে পাওয়া ভূমি রক্ষা করছিল শ্রমিক শ্রেণী এবং ফৌজ — তাদের জন্যে সমস্ত উদ্বৃত্ত শস্য অধিগ্রহণটাকে কৃষক মেনে নিয়েছিল। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষককুলের সামরিক-রাজনীতিক সংঘ।

কিন্তু, শান্তিকালীন অবস্থায় ভূস্বামী শ্রেণীর ফিরে আসার কোন বাস্তব আশঙ্কা ছিল না, তখন কৃষকেরা ঐসব ত্যাগস্বীকার করতে আর রাজী হল না। উদ্বৃত্ত কৃষিজাতদ্রব্য নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার স্বাধীনতা তারা তখন চাইছিল। এইভাবে দেখা

দিয়েছিল একটা নতুন কর্তব্য: শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে একটা নতুন রূপের সম্পর্ক — আর্থনীতিক সংঘ — স্থাপনের কর্তব্য। *শহর এবং গ্রামের মধ্যে একটা আর্থনীতিক সংযোগ সংহত করার* দরকার ছিল, — শিল্পজাতদ্রব্য আর কৃষিজাতদ্রব্যের এমন ধরনের বিনিময়ব্যবস্থা দরকার ছিল যাতে কেবল শ্রমিক নয়, কৃষকও সন্তুষ্ট হয়।

এই লক্ষ্য মনে রেখেই লেনিন শস্য অধিগ্রহণের জায়গায় খাদ্য-কর চালু করার প্রস্তাব তুললেন। এর অর্থ ছিল, কৃষক উদ্বৃত্ত কৃষিজাতদ্রব্যের একাংশ বাজারে বিক্রি ক'রে যে-পয়সা পাবে তা দিয়ে তার প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারবে। লেনিন বিবেচনা করলেন, কৃষকের জন্যে একটা প্রবর্তনা দরকার: 'ছোট খামারী যতদিন ছোট খামারী থাকবে ততদিন তার দরকার একটা উৎসাহ, একটা প্রেরণা, একটা প্রবর্তনা, যা তার আর্থনীতিক ভিত্তির, অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ছোট খামারের অনুযায়ী হয়।'* শস্য অধিগ্রহণের জায়গায় খাদ্য-কর চালু হলে কৃষক পেল এই চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন প্রবর্তনা। এতে করে কৃষক আরও বেশি খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করবে, তার ফলে কৃষির পুনঃস্থাপনা এবং অগ্রগতি হবে আরও দ্রুত। অধিকন্তু, এই অগ্রগতি শিল্পের অগ্রগতিরও সহায়ক।

কিন্তু, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের এই সুযোগের মধ্যে একটা গুরুতর বিপদের বীজ ছিল — সেটা হল কিছু পরিমাণে পুঁজিতন্ত্রের পুনরুত্থান এবং কুলাক আর ব্যক্তিগত কারবারিদের ক্ষমতাবৃদ্ধি। শহরেও এবং গ্রামাঞ্চলেও পুঁজিপতিরা তাদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক অবস্থান সংহত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে পারত এবং প্রকৃতপক্ষে তা করেছিলও বটে। সেই সংগ্রাম থেকে জয়যুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে কে, এটাই ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্ন।

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩২তম খণ্ড, ২১৯ পৃঃ

দেশে-বিদেশে বুর্জোয়া ভাবাদর্শওয়ালারা এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে কিছু অব্যবস্থিতচিত্ত লোক বলতে আরম্ভ করেছিল যে, ন. আ. ক-র অর্থ হল পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ বর্জন, ইত্যাদি। কিন্তু, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, তত্ত্বগতভাবেও এইসব জল্পনাকল্পনার কোন ভিত্তি প্রতিপন্ন হয় নি। পুঁজিপতিদের ক্রিয়াকলাপে কোন সাময়িক, গণ্ডিবদ্ধ সুযোগ দেওয়া হলেও সেটা কোনক্রমেই পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন বুঝায় না। পুঁজিপতিরা শর্তনির্দেশকারী বিজয়ী হিসেবে সামনে আসতে পারে নি। পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব ছিল এবং রইল সোভিয়েত রাষ্ট্রেরই। রাজনীতিক ক্ষমতা আর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক অবস্থানগুলি, দুইই রইল সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে। অর্থনীতির নিচতলগুলিতে উদ্ভূত বিভিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক ধরনধারনকে গণ্ডিবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম ছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

সমাজকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তিশালী আর্থনীতিক চালক উপকরণ — ভূমি, কল-কারখানা, পরিবহন আর রাষ্ট্রীয় আর্থব্যবস্থা — থাকল সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে। এইসব উপকরণ হাতে থাকায় এই নবীন রাষ্ট্র পুঁজিতন্ত্রের মোকাবিলা করতে এবং শেষপর্যন্ত তার উচ্ছেদ আর বিলুপ্তি নিশ্চিত করতে কৃতকার্য হয়েছিল।

ন. আ. ক পরিকল্পিত হয়েছিল বিস্তৃত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। পুঁজিতন্ত্রকে এইসব সাময়িক রেয়াত দেওয়াতে প্রতিফলিত পশ্চাদপসরণটুকু ছিল ঐ কর্মনীতির একটা অংশমাত্র। এই সাময়িক পশ্চাদপসরণ এবং বিভিন্ন শক্তির পুনর্বিন্যাসের পরে সমাজতন্ত্রীদের একটা সর্বতোমুখী উদ্যোগী অভিযান চালিয়ে শিল্পে, বাণিজ্যে এবং কৃষিতে রুশী পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক লড়াই লাগাবার ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ন. আ.

ক-র প্রথম বছরগুলিতেই লেনিন রচনা করেছিলেন **সমবায় পরিকল্পনা**, তাতে কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা ছিল।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমগ্র পর্বটির প্রয়োজনের উপযোগী করেই রচিত হয়েছিল ন. আ. ক। ন. আ. ক-র রচয়িতারা *প্রলেতারীয় বিপ্লবের পরবর্তী কালে বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তি-অনুপাত এবং ছোট কৃষি উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যগুলির* নির্ভুল মূল্যায়ন করেছিলেন, এবং তার ভিত্তিতে বেছে নিয়েছিলেন সমাজতন্ত্র গড়ার জন্যে অপরিহার্য শর্তগুলি।

বিদ্যমান পুঁজিতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কার্যকর সংগ্রাম চালাবার জন্যে কমিউনিস্টদের নির্ভুলভাবে আর সুদক্ষভাবে অর্থনীতি সংগঠিত করতে এবং ব্যবসায়িক লেন-দেন চালাতে শিখতে হয়েছিল। বিশেষত ভারি শিল্পের পুনঃস্থাপন এবং বিকাশ ছিল একটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন এবং সুকঠিন কাজ — এটা ছাড়া সমাজতন্ত্রের বিজয়ের কথা ভাবাও ছিল অসম্ভব।

১৯২০ সালে লেনিনের কথা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছিল রাশিয়ার বিদ্যুৎসজ্জার পরিকল্পনা (গোয়েল্‌রো)। ১০ থেকে ১৫ বছর মেয়াদের এই পরিকল্পনায় মোট পনর লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতার ৩০টা বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা ছিল। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য সাধিত হবার পরে রাশিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ১৯১৩ সালের পরিমাণের দশগুণ বেশি হবার কথা ছিল। বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণই শুধু নয়, দেশের অর্থনীতির সমস্ত শাখার সম্প্রসারণ এবং উন্নতিসাধনেরও ব্যবস্থা ছিল গোয়েল্‌রো পরিকল্পনায়, কেননা শিল্প আর কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্য ছিল এতে। ঐ একই কালপর্যায়ে মোট শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য তাতে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

লেনিনের উদ্যোগে রচিত বিদ্যুৎসজ্জার পরিকল্পনাটিকে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয়েছিল ১৯২০ সালে ডিসেম্বর

মাসে অনুষ্ঠিত অষ্টম সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেসে। এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান কর্তব্যগুলিকে কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের কাছে বিবৃত করেছিলেন গ্লেব্ ক্রজিজানভ্স্কি, — তিনি বলেছিলেন ভবিষ্যতের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির কথা, বিদ্যুতে চালিত বিভিন্ন কারখানার কথা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বলশই থিয়েটারের মঞ্চে বিশেষভাবে স্থাপিত একটা প্রকান্ড মানচিত্রে জ্বলে উঠছিল একটার পর একটা বিভিন্ন রঙের বাতি। হল্-ঘরে তাপনের ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে বসা প্রতিনিধিরা সেই ডজন-ডজন বাতির আলোয় ঝলমলে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ, শক্তিশালী, সুখী রাশিয়ার চিত্রখানি।

১৯২১ সালে মার্চ মাসে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর দশম কংগ্রেসে অধিগ্রহণের জায়গায় খাদ্য-কর চালু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবটি হল যুদ্ধকালীন কমিউনিজম থেকে নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতিতে উত্তরণের সূচনা। এইভাবে রচিত হল শান্তিকালীন অবস্থায় কাজের একটা মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা — সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ ত্বরিত করার পরিকল্পনা।

তবে, এই সৃজনশীল কর্মসূচি রূপায়িত করার আগে অন্যান্য সমস্যা অতিক্রম করার দরকার ছিল। ১৯২১ সালে নিদারুণ খরা হয়েছিল: এপ্রিল মাসেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আগুনে তাপ, জুন মাসের গড় তাপমাত্রার কাছাকাছি। সারা মে মাস ধরে এবং জুন মাসেও আবহাওয়া ছিল অস্বাভাবিক রকম শুকনো ও উত্তপ্ত। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আর বিবরণে প্রতিদিনই আরও বেশি উদ্বেগের কারণ পাওয়া যেত।

দেশের উপর নেমে এল অপরিমেয় পরিসরের এক নতুন সর্বনাশা দুর্যোগ। সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত প্রধান কৃষি এলাকা

পড়ল নিদারুণ খরার কবলে। ভলগা অঞ্চলে এবং পূর্ব ইউক্রেন, উত্তর ককেশাস, উরাল অঞ্চল, কাজাখস্তান আর মধ্য রাশিয়ার বিভিন্ন অংশে ফসল নষ্ট হয়ে গেল। শস্যহানির এলাকাগুলি ছিল মোটামুটি তিন কোটি মানুষের বাসভূমি। ফসল খারাপ হবার ফলে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অমন ব্যাপক পরিসরে, তার কারণ ছিল অতি অস্বাভাবিক আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থাই শুধু নয়, তার আরও কারণ ছিল এই যে, যেসব এলাকা খরার কবলে পড়েছিল সেগুলি শ্বেতরক্ষী আর আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল আগেই। এইসব এলাকায়ই চলেছিল গৃহযুদ্ধ, ফ্রন্ট-লাইন গিয়েছিল এইসব এলাকার ভিতর দিয়ে।

যুদ্ধের দরুন সারা দেশেই যে-ব্যাপক আর্থনীতিক বিশৃঙখলা আর গণ-পরিসরে নিঃস্বতা দেখা দিয়েছিল তার পরিণতিগুলোর গুরুত্বও কম ছিল না। শ্রমবল ছিল কম, গাড়ি-লাঙল টানার পশু,

ভুখা শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ। সামারা। ১৯২১

খামারের সরঞ্জাম আর বীজের ঘাটতি ছিল, বীজ ছিল নিরেস, বড় প্রয়োজনীয় সার ছিল অতি দুষ্প্রাপ্য — সব মিলিয়ে যা অবস্থা দাঁড়াল তাতে অমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে এঁটে-ওঠা কৃষকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খরাক্লিষ্ট এলাকাগুলোতে মানুষের যা দুর্দশা ঘটল সেটা কল্পনাতীত। বহু এলাকায় কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল অনশনে।

ফলে, কৃষিকে আবার দাঁড় করানোর কাজটা গোড়ায় যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশি জটিল ছিল। উপোসী কৃষকদের যথাসময়ে উদ্ধার করা এবং খরাক্লিষ্ট এলাকাগুলিতে খাদ্য আর বীজ-শস্য পেঁৗছে দেওয়াই ছিল প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কাজ। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল সমগ্র জনগণ। 'রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত নাগরিকের প্রতি' আবেদনে সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতিমণ্ডলী 'এই অভিযানের জন্যে সমস্ত শক্তি সমাবেশের' আহ্বান জানাল। গণ-পরিসরে এই অনশনের মধ্যে ত্রাণকার্য সংগঠিত করেছিল 'উপোসীদের সাহায্যের জন্যে কেন্দ্রীয় কমিশন', এর প্রধান হলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি মিখাইল কালিনিন।

খরাক্লিষ্ট এলাকাগুলিতে খাদ্য আর অর্থ পাঠানো হয়েছিল দেশের সমস্ত জায়গা থেকে। শুধু স্বেচ্ছামূলক চাঁদা থেকে উঠেছিল প্রায় ১,৭৬,০০০ টন খাদ্য এবং বেশ মোটা পরিমাণ অর্থ। রাষ্ট্র থেকে অনশনক্লিষ্ট এলাকাগুলোতে পাঠানো হয়েছিল হাজার হাজার টন রুটি, আলু এবং অন্যান্য খাদ্য, তাছাড়া, পশুসম্পদ রক্ষা করার জন্যে পশুখাদ্য; ১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষের জন্যে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল ৩০,০০০টা।

বিস্তর সাহায্য এসেছিল বিদেশ থেকেও। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং আরও কয়েকটি দেশের

মেহনতী জনগণ ভলগা অঞ্চলের উপোসী কৃষকদের জন্যে খাদ্য, ওষুধ এবং কাপড়-জামার জন্যে অর্থসংগ্রহ করেছিল। তারা স্থাপন করেছিল 'সোভিয়েত রাশিয়ায় উপোসী সহায় সংগঠন কমিটি' ('মেজ্‌রাব্‌পম্‌')। সোভিয়েত জনগণ প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতাসহকারে এই ভ্রাত্রোচিত সহায়তা সাদরে গ্রহণ করেছিল। ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নবম সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস বলেছিল, 'ইউরোপ আর আমেরিকার শ্রমিকদের কড়া-পড়া হাতে করে এগিয়ে-ধরা ভ্রাত্রোচিত সমর্থনকে রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ বিশেষ মূল্যবান মনে করে। কংগ্রেস এই সমর্থনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক সংহতির প্রকাশ।'

রাশিয়ার উপোসী মানুষের জন্যে রেড ক্রস এবং কোয়েকার্স'দের মতো বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানও সাহায্য পাঠিয়েছিল। নরওয়ের বিখ্যাত মেরু আবিষ্কার-অভিযাত্রী ফ্রিতিয়ফ নান্‌সেন 'রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষত্রাণ কমিটি' স্থাপন করেছিলেন, এই কমিটি পরে মোটামুটি ৮০,০০০ টন খাদ্য পাঠিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাঁকে মস্কো নগরী সোভিয়েতের অনরারি সদস্য করা হয়েছিল।

'মার্কিন রিলিফ সংস্থা' নামে একটি মার্কিন দাতব্য সংগঠনও রাশিয়ায় বেশকিছু পরিমাণ খাদ্য পাঠিয়েছিল। তবে, এই সংগঠনটি টিনবন্দি খাদ্য আর ময়দা নিছক পরহিতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নি, তারা সেটাকে ব্যবহার করেছিল সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবেও। এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিলি করার ভারপ্রাপ্ত সংস্থায় প্রতিবিপ্লবীদের ঢুকিয়েছিল, ঐ লোকগুলি সোভিয়েতবিরোধী কার্যকলাপ চালাবার জন্যে যেকোন সুযোগ যথাসাধ্য কাজে লাগিয়েছিল।

১৯২১ সালে গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে খরাপ্রপীড়িত

এলাকাগুলিতে শীতকালীন বোনার জন্যে বীজ সরবরাহ করার কাজের সম্মুখীন হল সোভিয়েত দেশ। কিন্তু, রাষ্ট্রের হাতে জমানো বীজ-শস্য ছিল না, বাধ্য হয়ে ভলগার গ্রামগুলিতে পাঠাতে হয়েছিল নতুন ফসলেরই শস্য।

'কৃষক কমরেডসব! খাদ্য-কর দিয়ে দিন, ভলগা অঞ্চলের বীজ-না-বোনা খেতগুলো অপেক্ষা করছে! বীজ পাঠাতে দেরি হলে তার অর্থ হবে সর্বনাশ আর মৃত্যু!' — 'প্রাভদা'র অগস্ট মাসের একটা সংখ্যায় পৃষ্ঠা-জুড়ে এই শিরোনাম ছাপা হয়েছিল। সেই বিশেষ কালপর্যায়টায় আবহাওয়া কীভাবে উত্তেজনায় ঠাসা ছিল সেটা স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল এই আবেদনে।

২,২৪,০০০ টন বীজ-শস্য খরাক্লিষ্ট এলাকাগুলিতে পেঁাছেছিল যথাসময়ে। কৃষকেরা এইভাবে পেয়েছিল চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন কার্যকর সাহায্য, শীতের ফসল সাধারণত যত এলাকায় হত তার বারো-আনি রকম এলাকায় তারা রোয়া-বোনা করতে পেরেছিল।

তবে, তাই বলে খারাপ ফসলের পরিণতিগুলো অতিক্রম করার প্রচেষ্টার ঢিলা দেবার উপায় ছিল না। বসন্তের রোয়া-বোনার জন্যে বীজ-শস্যের যোগান দেওয়াটা ছিল তার পরবর্তী কাজ। এই সর্বাত্মক অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল: খরাক্লিষ্ট গুবের্নিয়াগুলির কৃষকেরা বসন্তের রোয়া-বোনার জন্যে বীজ-শস্য পেয়েছিল ৬,৫৬,০০০ টন।

১৯২২ সালে বসন্তের রোয়া-বোনা চলেছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আবহাওয়ায়, বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে। এইসব গ্রামাঞ্চল থেকে পাওয়া বহু বিবরণে দেখা গেল খেতে-খামারে কৃষকেরা কী অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, বীজ পাঠাবার জন্যে তারা কত কৃতজ্ঞ, আর কত দ্রুত এবং সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল রোয়া-বোনার কাজ।

যুদ্ধ আর নিঃস্বতার হানিকর পরিণতিগুলো আরও প্রকোপিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ফসল-কমতির দরুন — তার গভীর ক্ষতের দাগ রয়ে গিয়েছিল অনিবার্যভাবেই। তখন ঘোড়া আর বলদের ঘাটতি ছিল প্রচণ্ড, খামারের সরঞ্জামগুলোর অভাব রাতারাতি পূরণের উপায় ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, বীজ সরবরাহ করে রাষ্ট্র কৃষককে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন সাহায্য দিয়েছিল — তবু স্বভাবতই, কৃষকের ষোল-আনা প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সেটা যথেষ্ট ছিল না। তার ফলে আবাদী জমির মোট আয়তন ১৯২২ সালে হয়েছিল আরও কম।

১৯২২ সালে ফসলতোলার সময় এলে নতুন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনবার সময়ে ভয়ে লোকের বুক দুর দুর করত। তবে, সে-ভয় ছিল অমূলক। ১৯২২ সালটা ছিল সুবছর, শস্য ফসলের মোট পরিমাণ হয়েছিল ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টনের বেশি, অর্থাৎ, আগেকার দু'বছরের ফসলের চেয়ে বেশি।

১৯২২ সালে শীতকালের রোয়া-বোনার সময়ে আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছিল সারা দেশে, এটা হল সোভিয়েত কৃষির মোড় ঘোরার সূচনা। তখন থেকে পুনঃস্থাপনের কাজ এগিয়েছিল সমানে এবং সাফল্যের সঙ্গে, তখন সবচেয়ে কঠিন লড়াইটায় জয় হয়ে গিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষবিরোধী অভিযানটা ছিল বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং সোভিয়েত জন-সংস্থার বিপুল পরিসরে সুসংগঠিত ত্রাণকার্যের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনশনে মৃত্যু থেকে এবং রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের বড় বড় অঞ্চলকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা গিয়েছিল।

মনে হতেই পারে, অভূতপূর্ব দৈন্যদশা এবং পরিবহন ও শিল্পের ভগ্নদশার দরুন কৃষিক্ষেত্রে উদ্ধারকার্যের কোন উপায়

ছিল না। কিন্তু, প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত সহায়-সম্বলের সমাবেশ ঘটাতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য সাধনের জন্যে সেগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার সুসমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করতে সোভিয়েত সরকার সক্ষম হয়েছিল।

সোভিয়েত রাষ্ট্রকে তখন অবধি সবচেয়ে কঠিন যত বাধা পার হতে হয়েছিল তারই একটা সমগ্র জনগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অতিক্রান্ত হল।

অর্থনীতির সাফল্যমণ্ডিত পুনঃস্থাপন

নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতির সুফলগুলি ক্রমাগত স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিতে থাকল অচিরেই। আবাদী জমির পরিমাণের অব্যাহত বৃদ্ধি আরম্ভ হয়েছিল ১৯২৩ সালে। এই বছর বিভিন্ন শস্যের চাষ হয়েছিল মোট ২২ কোটি ৬৫ লক্ষ একরে, অর্থাৎ, আগেকার বছরের সঙ্গে তুলনায় ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ একর বেশি জমিতে। পরের দু'বছর ১৯২৪ আর ১৯২৫ সাল দুয়েতেই তা বেড়েছিল আরও ১ কোটি ৪৮ লক্ষ একর। ১৯২৫ সাল নাগাত যুদ্ধপূর্ব পরিমাণটা আবার ফিরে এসেছিল।

সমস্ত প্রধান ফসলই আরও বেশি বেশি ফলেছিল, ১৯২৫ সাল নাগাত তুলো আর চিনি-বীটের মোট ফসলের পরিমাণ পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় যুদ্ধপূর্ব মাত্রায়। আলু লাগানো এবং ফলনের পরিমাণও সমানে বেড়েছিল:১৯২৫ সালেই এই ফসলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধপূর্ব মাত্রার উপর ৫0 শতাংশ বেশি। সূর্যমুখীর ফলন হয়েছিল আরও ভাল।

পশুপালনেও উন্নতি হচ্ছিল খুবই দ্রুত, ১৯২৫ সাল নাগাত আগেকার ক'বছরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করা হয়েছিল।

এইভাবে, বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও, কৃষির পুনঃস্থাপন নিষ্পন্ন হয়ে এসেছিল ১৯২৫ সাল নাগাত। তখনও বিস্তর অসামঞ্জস্য দূর করতে বাকি ছিল, কোন কোন শাখা অনগ্রসর ছিল — তবুও, প্রধান লক্ষ্যগুলি সাধিত হয়ে গিয়েছিল।

শিল্প পুনঃস্থাপনের কাজেও সার্থক অগ্রগতি ঘটছিল। ১৯২১—১৯২২ সালেই কাপড়, জুতো, দেশলাই, সাবান, কাগজ এবং সর্বসাধারণের ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছিল। কয়লা উৎপাদনের অংকও বেড়েছিল — বিশেষত প্রধান কয়লা-খনিকেন্দ্র দনেৎস্ অববাহিকায়। যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে — যেমন, তৈল তোলায় (বাকু তৈলক্ষেত্র) এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে।

পরিবহনজালিও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল শিগগিরই। ১৯২২ সালের শেষাশেষি রেলপথগুলিতে প্রধান মেরামতের সমস্ত কাজ সমাধা হয়েছিল, আবার খোলা হয়েছিল সমস্ত লাইন।

যেমন গৃহযুদ্ধের সময়ে, তেমনি এই বছরগুলিতেও শ্রমিক শ্রেণী বিরাট ত্যাগস্বীকারের পরিচয় দেয়। আবারও দেশের সর্বত্র তারা কাজ থেকে অবসরের দিনগুলিতে স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করত — জালানি প্রস্তুত করত, সরঞ্জাম মেরামত করত, ইত্যাদি।

শ্রমিকদের মধ্য থেকে অনেকে শিল্পে নতুন নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। ১৯২১ সালে প্রথম প্রথম ঝটিকা-শ্রমিকদলগুলি দেখা দিয়েছিল দনেৎস অববাহিকা, উরাল অঞ্চল, পেত্রগ্রাদ, তুলা এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের বিভিন্ন কারখানায়। এইসব কর্মিদলের শ্রমিকেরা বিশেষ উঁচু মাত্রার উৎপাদনে হার হাসিল করত, উৎপাদনে উৎকর্ষসাধনের নানা উপায় প্রস্তাব করত ইত্যাদি। তৃতীয় দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এটা হয়ে উঠেছিল

গণ-আন্দোলন, এতে অংশ নিতে আরম্ভ করেছিল বেশির ভাগ শ্রমিক।

কারখানাগুলিতে প্রথম প্রথম উৎপাদন বৈঠকগুলি হয়েছিল ১৯২১—১৯২২ সালে, এইসব বৈঠকে শ্রমিকেরা উৎপাদন-সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় সিদ্ধান্ত নিত, বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করত, শ্রম-সংগঠন উন্নততর করার নতুন নতুন উপায়াদি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করত। ১৯২৫ সালের শেষাশেষি শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৈঠক হয়ে উঠেছিল একটা নিয়মিত রেওয়াজ।

ঐ সময়ে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যায় দ্রুত বেড়ে উঠছিল — তার আংশিক কারণ হল, খাদ্য যখন অত দুষ্প্রাপ্য ছিল তখন যেসব শ্রমিক গ্রামে কাজ করতে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসছিল, তাছাড়া, শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল নতুন পুরুষ-পর্যায়ের তরুণেরা এবং আগেকার অনেক কৃষক।

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে মুদ্রা সংস্কারের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হয়েছিল এবং আর্থ ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল মজবুত আর সুস্থিত। শিল্পের পুনঃস্থাপন মোটের উপর সমাধা হয়ে গিয়েছিল ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে। বৃহদায়তন শিল্পে মোট উৎপাদন ১৯১৩ সালের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল (১০৮%), কোন কোন শাখায় সেটা হয়েছিল আগের বছরেই (টার্বাইন, বয়লার এবং মেশিনটুল উৎপাদন)। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনেও অগ্রগতি ঘটছিল লাফিয়ে লাফিয়ে: গোয়েল্‌রো পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কোন কোন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ তখন চলছিল, — কাশিরা আর পেত্রগ্রাদ বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছিল ১৯২২ সালে, ১৯২৪—১৯২৫ সালে চালু হয়েছিল কিজেলভ, নিজ্‌নি নভগোরদ আর শাতুরা বিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রথম বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল ১৯২৬ সালে ভল্‌খভে।

তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে নাগাল ধরতে তখনও বাকি ছিল অনেকটা — যেমন, ১৯২৬ সালে ঢালাই লোহা বিগলনের পরিমাণ ছিল ১৯২০ সালের অঙ্কটার চেয়ে ১৯-গুণ বেশি, কিন্তু সেটা ছিল যুদ্ধপূর্ব মাত্রার মাত্র ৫২ শতাংশ।

যুদ্ধের বছরগুলিতে অমন প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল যে-অর্থনীতির সেটা আশ্চর্য রকম কম সময়ের মধ্যেই মোটের উপর আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল — নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও। সোভিয়েত জনগণের এই বিপুল কৃতিত্বের জন্যে দেশ তখন বিকাশের নতুন পর্বে উত্তরণের সুযোগ পেল।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জন্যে লেনিনের পরিকল্পনা

গৃহযুদ্ধের অল্পকাল পরেই লেনিন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের একটা পরিকল্পনা রচনার কাজ শেষ করেছিলেন, এটা ছিল বৈপ্লবিক মার্কসীয় তত্ত্বের একটা সৃজনশীল অনুবৃত্তি, এতে বিপ্লবের, প্রথম প্রথম প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরগুলির এবং নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ছিল। ১৯২২ সালের শেষ এবং ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে লেখা লেনিনের রচনাগুলিতে পাওয়া যায় সমাজতন্ত্রের জয় নিশ্চিত করার সংগ্রামের সুসংগত এবং সুস্পষ্ট কর্মসূচি।

সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার জন্যে লেনিনের পরিকল্পনার তিনটি প্রধান অঙ্গ-উপাদান হল — শিল্পযোজন, কৃষি যৌথকরণ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের মজবুত এবং নির্ভরযোগ্য বৈষয়িক এবং টেকনিকাল বনিয়াদ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর সেজন্যে দরকার শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন — বিশেষত ভারি শিল্পের।

এইজন্যেই লেনিন শিল্পোন্নয়ন এবং নতুন নতুন কল-কারখানা আর বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার জরুরী প্রয়োজনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। রাশিয়ার মতো অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশে এই কর্তব্যটা ছিল কঠিন এবং জটিল। খুব কড়াকড়ি মিতব্যয়ী হবার জন্যে এবং এইভাবে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ শিল্পের পুনঃস্থাপন আর সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করার জন্যে লেনিন আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কৃষি সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল যে, কৃষকদের যৌথখামারী হতে সোভিয়েত রাষ্ট্র উৎসাহিত করবে ক্রমে ক্রমে, আর যেসব কৃষক গোড়ায় একেবারে সবচেয়ে সহজ-সরল রূপের সমবায় (বেচা আর ক্রেডিট ব্যবস্থা, সরঞ্জাম ভাগে ব্যবহার করা, ইত্যাদির জন্যে) ধরবে তারা শিগগিরই নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যৌথকরণের সুবিধা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে, তারা বুঝবে শুধু একটা ছোট জোত নিয়ে কোন কৃষক স্বাধীনভাবে নিজের খরচা পোষাতে পারে না কখনও — কিন্তু, একসঙ্গে জুটলে কৃষকেরা যৌথখামারে দ্রুত সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে। সমবায়ের নিম্নতর বা সহজ-সরলতর রূপগুলো থেকে বিভিন্ন উচ্চতর রূপে উত্তরণ সহজ করার পরিকল্পনা রচিত হল, — উচ্চতর রূপ হল উৎপাদন-সমবায়, তাতে ভূমির মালিকানা এজমালি, তেমনি লাঙল আর গাড়ি টানা পশু এবং খামারের মূল সরঞ্জামের বেলায়ও। নতুন সামাজিক কাঠামের মধ্যে সমবায়ের ফলে একই সঙ্গে পৃথক পৃথক কৃষকের এবং সমগ্র সমষ্টির স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে চলা সম্ভব হল।

সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা দূর করা এবং ব্যাপক পরিসরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিষ্পন্ন করার একটি কর্মসূচি লেনিন রচনা করেছিলেন। এই কর্মসূচির শুরুতে ছিল অতীতের ভয়ংকর জের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং গ্রন্থাগার আর বারোয়ারি

কেন্দ্র গড়ার জন্যে ব্যয়বরাদ্দ, আর সেটা এগিয়েছিল গণ-পরিসরে স্নাতক কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়া এবং বিজ্ঞান আর আর্টের চমকপ্রদ অগ্রগতি অবধি।

পরবর্তী বছরগুলিতে যেসব বাধাবিঘ্ন আর জটিলতা দেখা দেবে সেগুলি সম্বন্ধে লেনিন সম্যক অবহিত ছিলেন। তবু তখন যেসব কর্তব্য হাতে নেওয়া হচ্ছিল সেগুলির সার্থক পরিপূরণ হবে, এই দৃঢ়বিশ্বাসে তিনি একেবারে অটল ছিলেন। তিনি জানতেন, ঐ বিজয় নিশ্চিত করার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক শক্তি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি — যে-পার্টি জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল। এইজন্যেই, পার্টির ঐক্য তুলে ধরা, শৃঙ্খলা পালন করা এবং এইভাবে পার্টির সদস্যশ্রেণীর সংহতি বজায় রাখার উদ্দেশে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার জন্যে লেনিন আহ্বান জানিয়েছিলেন।

* * *

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে লেনিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখনও তাঁর বয়স ৫৩ হয় নি, কিন্তু নির্বাসনে আর গুপ্ত অবস্থায় কাজের সময়কার কঠোর জীবনযাত্রা, শত্রুর বুলেটে জখম হবার বিলম্বিত ক্রিয়া এবং তিনি সব সময়ে যে-প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করতেন, এই সবকিছুর নিদারুণ পরিণতি ঘটল।

১৯২৪ সালে ২১এ জানুয়ারি তারিখে লেনিন মারা গেলেন। মর্মাহত হল সারা পৃথিবী। তাঁর অসাধারণ গুণাবলি এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর বিরাট ভূমিকার কথা তাঁর শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারল না। মানবজাতির ইতিহাসে নবযুগের অভ্যুদয় — পুঁজিতন্ত্রের পতন এবং সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের অভ্যুদয় থেকে লেনিনের নাম অবিচ্ছেদ্য। ইতিহাসের একটা
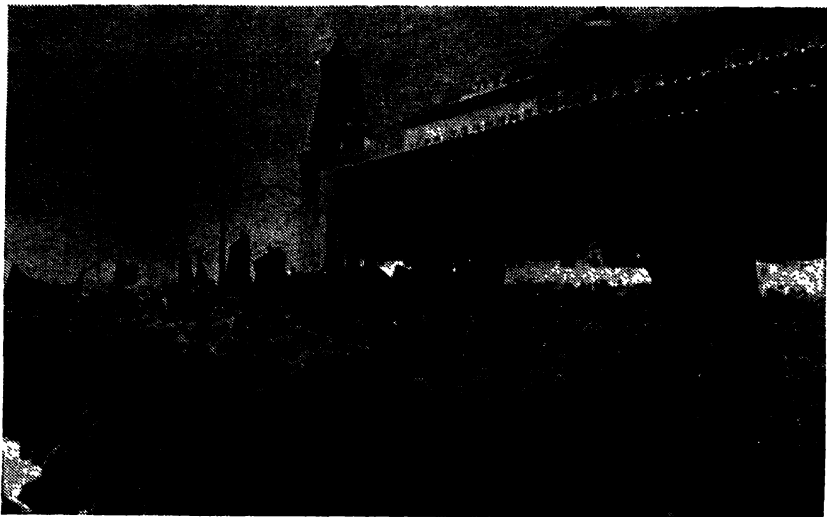
লেনিনের অন্ত্যেষ্টি। রেড স্কয়্যার। জানুয়ারি। ১৯২৪

নিষ্পত্তিমূলক সন্ধিক্ষণে শ্রমিক শ্রেণী পেয়েছিল মহামতি মহা-প্রতিভাশালী নেতা লেনিনকে।

লেনিনের মৃত্যুতে শ্রমজীবী জনগণ গভীরভাবে বেদনাহত হয়েছিল, তবুও তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দেখা দেয় নি: শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা জানত লেনিনের আদর্শ বজায় থাকবে, মহান নেতার প্রদর্শিত পথে জনগণকে পরিচালিত করবে কমিউনিস্ট পার্টি।

সেই বিষণ্ন দিনগুলিতে সোভিয়েত জনগণ যখন লেনিনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনগণের ঐক্য বিশেষ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার জন্যে শ্রমজীবীদের গণ-পরিসরে দরখাস্ত করাতে সেই ঐক্যের প্রবল প্রতিফলন ঘটেছিল। লেনিন মারা যাবার পরদিন শ্রমিকেরা পার্টি সদস্য হবার জন্যে দরখাস্ত করেছিল হাজারে-

হাজারে। মস্কোর শ্রমিকেরা বলেছিল: ‘আমরা রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে শামিল হচ্ছি, এটা নিছক সমাপাতনিক নয়। বছরের পর বছর আমরা ডজনে-ডজনে কমিউনিস্টদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করে আসছি, আর এখন আমরা পার্টিতে শামিল হচ্ছি কোন বিশেষ সুবিধা পাবার জন্যে নয়, আমাদের মহান প্রলেতারীয় পার্টির যে-ক্ষতি হয়েছে সম্প্রতি সেটা পূরণ করার উদ্দেশে।’

‘লেনিনের নামে ভরতি হওয়া’ বলে পরিচিত হয়েছিল এই আন্দোলন। এই আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর সেরা প্রতিনিধিদের ভিতর থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি নতুন সদস্য এসেছিল কমিউনিস্ট পার্টিতে। এরই সঙ্গে সঙ্গে ১ লক্ষ ৭০ হাজার যুবক-যুবতী শামিল হয়েছিল রাশিয়ার যুব কমিউনিস্ট লীগে (এখন এর নাম সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনীয় যুব কমিউনিস্ট লীগ বা কম্‌সোমল)।

সামাজিক-রাজনীতিক আবহাওয়া

অর্থনীতিকে যখন আবার দাঁড় করানো হচ্ছিল সেই সময়ে নতুন সমাজব্যবস্থা সংহত হতে থাকল। ন. আ. ক চালু করার ফলে কৃষককুলের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। কৃষকদের প্রধান অংশটা অচিরেই নতুন ব্যবস্থার প্রতি দৃঢ় এবং প্রবল সমর্থন দিল, তারা নতুন অবস্থা সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করল। কুলাক বিদ্রোহগুলো শিগগিরই ক্ষীণ হয়ে পড়ল, — ততদিনে সমস্ত সোভিয়েতবিরোধী দস্যু জোটগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। তবু, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন তোড়ফোড় কার্যকলাপের জোট বিদেশ থেকে পাঠানো হচ্ছিল।

আর্থনীতিক পুনরুদ্ধার এবং তারপরে শ্রমিক আর কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবার ফলে তাদের সামাজিক-আর্থনীতিক

সক্রিয়তা বেড়ে গেল। সোভিয়েতগুলিতে এবং আরও বহু জন-সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করল লক্ষ লক্ষ মানুষ। প্রজাতান্ত্রিক, গুবের্নিয়ার, আঞ্চলিক আর জেলা সোভিয়েতের কংগ্রেসগুলিতে প্রতিনিধি হিসেবে এবং সমস্ত স্তরের সোভিয়েতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ সোভিয়েতগুলির কাজে অংশ নিতে থাকল। শ্রমজীবীদের বিভিন্ন গণ-সম্মেলন সংগঠিত হতে থাকল — সেগুলিকে বলা হত শ্রমিক-কৃষকদের অ-পার্টি সম্মেলন: বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, সমবায়, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সংগঠনে মেয়েদের কাজে লাগানো হতে থাকল ক্রমাগত বেশি বেশি সংখ্যায়। ১৯২৩ সালের শেষাশেষি সাধারণের বিষয়াবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছিল প্রায় ৫ লক্ষ নারী। ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সংগঠন এবং কম্‌সোমলের ক্রিয়াকলাপও গণ-পরিসরে সম্প্রসারিত হল।

ঐ সময়ে পেটি-বুর্জোয়া মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টি চূড়ান্তভাবে এবং চিরকালের মতো ভেঙে গিয়েছিল। বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপসকামী হবার ফলে অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে এবং বিপ্লবের ঠিক আগের মাসগুলিতে এই দুটি পার্টি জনগণের আস্থা হারাতে আরম্ভ করেছিল। গৃহযুদ্ধের সময়ে বহিরাক্রমণকারী এবং শ্বেতরক্ষীদের পক্ষে চলে যাবার ফলে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থক হিসেবে এই পার্টি-দুটোর যথার্থ চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের পরে নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্জিত সাফল্যগুলি এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে জনগণের সমাবেশ বাদবাকি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এবং মেনশেভিক সংগঠনগুলির উপর শেষ আঘাত হেনেছিল, — ঐসব সংগঠন ভেঙে গিয়েছিল আপনা থেকেই।

তৃতীয় দশকের গোড়ায় রাশিয়ায় পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলি আর কোন সংগঠিত রাজনীতিক শক্তি ছিল না। সেগুলি থেকে

অবশিষ্ট ছিল শুধু এখানে-ওখানে কিছু বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সংগঠন, এদের কোন গণ-সমর্থন ছিল না।

সমস্ত বুর্জোয়া আর পেটি-বুর্জোয়া পার্টি ভেঙে মিলিয়ে যাবার পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে রইল শুধু একটি পার্টি — রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)*। লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই পার্টির কর্মনীতিগুলির নির্ভুলতা প্রতিপন্ন হল। তারা দেখল এবং উপলব্ধি করল যে, একমাত্র এই পার্টিই তাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে এবং মুক্তি আর সুখী জীবনের পথে পরিচালিত করেছে। অন্যান্য সমস্ত পার্টি গালভরা সব স্লোগান আওড়াতে-আওড়াতে প্রকৃতপক্ষে জনগণের স্বার্থের প্রতি শুধু বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিল — তাই, তাদের প্রত্যাখ্যান করে মেহনতীরা শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকেই সমর্থন করল।

ন. আ. ক-র প্রথম বছরগুলিতে শহর আর গ্রামাঞ্চল দুয়েতেই বুর্জোয়াদের সংখ্যা এবং তৎপরতা কিছুটা বেড়েছিল। শহরগুলোতে দেখা দিয়েছিল একটা নয়া-বুর্জোয়া স্তর, তাদের বলা হত ন. আ. ক-বাবু (ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, ব্যক্তিগত মালিক, রেস্তরাঁ আর ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের ভাড়াটিয়া-মালিক, ইত্যাদি)। ইতোমধ্যে গ্রামাঞ্চলে মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছিল গ্রাম্য বুর্জোয়া শ্রেণী — কুলাকেরা। এর ফলে বুর্জোয়া ভাব-ধারণার কিছু পরিমাণ পুনরুদ্ভব ঘটেছিল। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিসমাজের মধ্যে এই ধারণা দেখা দিয়েছিল যে, ন. আ. ক-র অর্থ হল কমিউনিস্ট পার্টির সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজ পরিত্যাগ করে শেষপর্যন্ত পুঁজিতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন। 'স্মেনা ভেখ' ('ভোল-বদল') নামে একটা

* ১৯১৮ সালের বসন্তকাল থেকে ১৯২৫ সাল অবধি এটাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির রীতি অনুযায়ী নাম। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৫২ সাল অবধি পার্টির নাম ছিল সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক); ১৯৫২ সাল থেকে নাম হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সো. ই. ক. পা।

প্রবন্ধসংকলন রুশী দেশান্তরীরা প্রাগে প্রকাশ করেছিল ১৯২১ সালে, ঐ 'স্মেনা ভেখ' নামে চিন্তাধারায় ঐ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল। ঐ দেশান্তরীরা বলেছিল ন. আ. ক-র রাশিয়া আবার শিগগিরই হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিতান্ত্রিক রাশিয়া। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে তারা দাবি করেছিল, ব্যক্তিগত কারবারিদের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, ভূমির রাষ্ট্রীয়করণ বাতিল করো, ইত্যাদি।

কমিউনিস্ট পার্টি একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এইসব বুর্জোয়া ভাব-ধারণার স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিল। লেনিনের বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং পার্টির বিভিন্ন প্রস্তাবে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, বুর্জোয়া মতাদর্শের সমস্ত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অবিচলিত সংগ্রাম চালানো কমিউনিস্টদের কর্তব্য। কমিউনিস্টরা বারবার সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ন. আ. ক দেশকে নিয়ে চলেছিল পুঁজিতন্ত্রের দিকে নয় — সমাজতন্ত্রের দিকেই। ১৯২২ সালে ২০এ নভেম্বর মস্কো সোভিয়েতের প্লেনারী অধিবেশনে বক্তৃতায় লেনিন সেই কথাই খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন: '...ন. আ. ক-র রাশিয়া হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া।'*

সেই বিশেষ সন্ধিক্ষণে খোদ কমিউনিস্ট পার্টিই চলছিল একটা কঠিন এবং উত্তেজনাপূর্ণ কালপর্যায়ের ভিতর দিয়ে। কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মী সরকারী কর্মনীতি সমর্থনের ব্যাপারে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসৃত লেনিনীয় কর্মধারার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করছিলেন। এইসব ভিন্নমতাবলম্বীর নেতা ছিলেন ত্রৎস্কি। বিশ্ব বিপ্লব ছাড়াই সমাজতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে জয়যুক্ত হতে পারে, এটা তিনি এবং তাঁর সমর্থকেরা বিশ্বাস করতেন না। শ্রমিক শ্রেণী আর

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩৩তম খণ্ড, ৪৪৩ পৃঃ

কৃষককুলের মধ্যে মৈত্রীকেও তাঁরা সমর্থন করতেন না, কেননা তাঁরা কৃষককুলকে একটা নিছক প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসেবে দেখতেন। ত্রৎস্কি পার্টির ঐক্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন — তিনি প্রতিপক্ষীয় ঘোঁট আর চক্রগুলির ক্রিয়াকলাপের অবাধ সুযোগ চাইছিলেন। ১৯২৩ সালের শরৎকালে পরিচালিত পার্টি বিতর্কের মধ্যে ত্রৎস্কিপন্থীরা পরাস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল — ঐ বিতর্কের মধ্যে পার্টি সদস্যদের মাত্র ১·৩ শতাংশ তাদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

১৯২৪ সালে জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ১৩শ পার্টি সম্মেলন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল যে, ত্রৎস্কিপন্থী প্রতিপক্ষটা ছিল 'বলশেভিকবাদ সংশোধন করার চেষ্টা এবং লেনিনবাদ থেকে সরাসরি বিপথগমনই শুধু নয়, এটা সন্দেহাতীতভাবেই একটা পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতিও বটে'। ত্রৎস্কিপন্থার বিরুদ্ধে অভিযানে একটা বড়রকমের ভূমিকা পালন করেছিলেন স্তালিন — তিনি ১৯২২ সালের বসন্তকালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন।

কিন্তু, ঐ পরাজয় সত্ত্বেও লেনিনবাদবিরোধীরা সক্রিয় ছিল। ১৯২৫ সালে দেখা দিয়েছিল জিনোভিয়েভ আর কামেনেভের পরিচালিত তথাকথিত 'নয়া প্রতিপক্ষ'। যে-ত্রৎস্কিপন্থীরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়ে বিশ্বাস করত না, তাদের কর্মসূচির সঙ্গে 'নয়া প্রতিপক্ষের' কর্মসূচি মোটের উপর অভিন্নই ছিল। এই প্রতিপক্ষকে ধিক্কার দিয়ে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির লেনিনীয় কর্মধারাই সমর্থন করেছিল। ঐ কালপর্যায়ে পার্টির প্রস্তাবগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়ের সম্ভাবনার একটা স্পষ্ট এবং সুষ্ঠু-সংজ্ঞাবদ্ধ চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন

১৯২২ সালে ৩০এ ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেসের ২,২১৫ জন প্রতিনিধিতে ভরতি হয়ে গেল মস্কোর বলশই থিয়েটার ভবন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পিয়ৎর স্মিদোভিচ কংগ্রেসের উদ্বোধন করলেন। করতালিধ্বনি ডুবে গেল 'আন্তর্জাতিক' সংগীতের সুরে। গানটি গাওয়া হল বহু ভাষায়, কিন্তু একই তার সুর, একই তার মর্মবাণী, তার ধ্বনিলহরীতে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। সেটা ছিল সোভিয়েত ইতিহাসে চিরঅবিস্মরণীয় হয়ে থাকার দিন, সেদিন, ১৯২২ সালের ৩০এ ডিসেম্বরের দিনটিতে গঠিত হল একটি বহু-জাতির রাষ্ট্র — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন।

আগেকার কোন কোন পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, আগে যা ছিল রুশ সাম্রাজ্য তার রাজ্যক্ষেত্রে অক্টোবর বিপ্লবের পরে স্থাপিত হয়েছিল কয়েকটি অ-রুশ প্রজাতন্ত্র, — অক্টোবর বিপ্লব ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল জাতিগত নিপীড়নের শৃঙ্খলটাকে, একদা শোষিত এবং সর্ব-অধিকারবঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষ জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা অর্জন ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে থাকল সোভিয়েত রাজ। তার ফলে রাষ্ট্র বুঝি হয়ে পড়ল দুর্বল, খণ্ড-বিখণ্ড, তা কিন্তু নয় কোনক্রমেই। রাশিয়ার জাতিগুলির যে-আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রাজ এবং জাতীয় রাষ্ট্রসত্তার প্রতিষ্ঠা প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু জাতির বিকাশ আর অগ্রগতির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করল, তাতে দৃঢ় এবং স্থায়ী ঐক্যের নিশ্চয়তা ছিল। অতীতে 'ঐক্যের' বনিয়াদ ছিল শ্বাসরোধ-করা নিপীড়ন, কিন্তু এই নতুন ধরনের ঐক্য ঘটল স্বেচ্ছায়, এটা হল জাতিগুলির অবাধ বাছনেরই প্রকাশ, কেননা সব শক্তি একাট্টা করার চূড়ান্ত গুরুত্বটাকে তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় প্রতীকচিহ্ন

আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সবার মিলিত সংগ্রামে বিপ্লবের ফলগুলিকে রক্ষা করার জন্যে পরস্পরকে সাহায্য করেছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি। লড়াইয়ের তাপে গড়ে উঠে পোড়-খেয়ে মজবুত হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সংগ্রামী মৈত্রী; আর গৃহযুদ্ধের পরে একীকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল আগের চেয়ে আরও প্রবলভাবে। পরস্পরকে সাহায্য করলে এবং হাতধরাধরি করে কাজ করলে, একমাত্র তবেই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল বিধ্বস্ত খেতগুলোকে আবাদ করা, ফার্নেস আর মরচে-

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পতাকা: লাল পটভূমিতে হাতুড়ি আর কাস্তে এবং সোনালী তারা
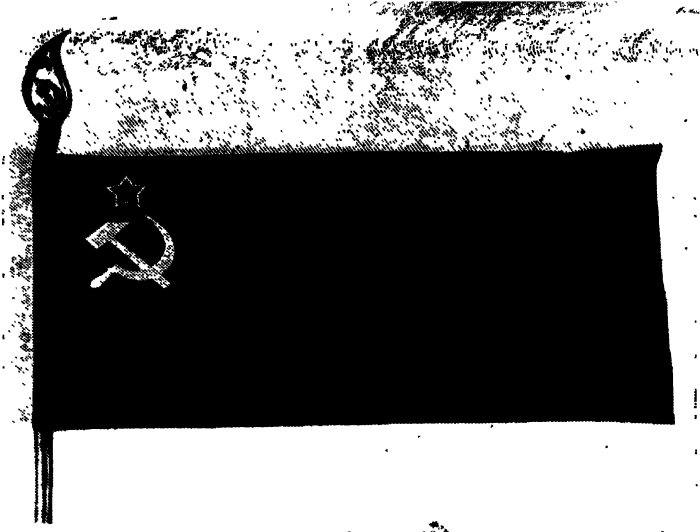
ধরা যন্ত্রপাতি আবার চালু করা; সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশাল সব কর্তব্যের সঙ্গে এ'টে ওঠা সম্ভব ছিল একমাত্র তবেই। বহিঃশত্রুদের থেকে বিপদের নিরন্তর আশংকার দরুনও সমস্ত শক্তি একাট্টা করার দরকার ছিল। সোভিয়েত জাতিগুলিকে দাস বানাবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির পরিকল্পনা ছাড়বার কোন লক্ষণ তারা দেখায় নি। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির ঘনিষ্ঠ ঐক্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল এই বিপদের প্রতিরোধ করার জন্যে।

তৃতীয় দশকের গোড়ায় দেশের রাজ্যক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ছিল কয়েকটা। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (রু. সো. ফে. স. প্র), তার জনসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ। প্রধানত রুশীদের অধ্যুষিত

আর দূর প্রাচ্য ছাড়াও রু.সো.ফে.স.প্র-র অন্তর্ভুক্ত ছিল *দাগেস্তান, এবং গোস্কায়া (পার্বত্য), তাতার, বাশকির, কাজাখ, তুর্কিস্তান* আর ইয়াকুত স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি এবং কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত বিভাগ।

ইউক্রেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ, বেলোরুশিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের —১৬ লক্ষ। ট্র্যান্স-ককেশিয়ার তিনটি প্রজাতন্ত্র — আজারবাইজান, আর্মেনিয়া এবং জর্জিয়া ১৯২২ সালে একত্রিত হয়ে গড়া ট্র্যান্স-ককেশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা ছিল ৫৬ লক্ষ।

এই সমস্ত প্রজাতন্ত্র একই স্বার্থ, লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য দিয়ে সম্পর্কিত ছিল, তাদের রাষ্ট্রীয় গড়নও ছিল একই রকমের। বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ভ্রাত্রোচিত সম্পর্ক সংহত করা হয়েছিল বিভিন্ন ইউনিয়ন-সন্ধিচুক্তি দিয়ে, সেগুলিতে আর্থনীতিক আর সামাজিক প্রশাসনের জন্যে এবং প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেও কতকগুলি সংস্থার সংযুক্তির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু, একই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতরে আরও ঘনিষ্ঠ সম্মিলনের প্রয়োজন বোধ করেছিল প্রজাতন্ত্রগুলি। সমস্ত প্রজাতন্ত্রে এই প্রশ্নটা তুলেছিল শ্রমজীবী জনগণ নিজেরাই। সম্মিলনের বিভিন্ন রূপের উপযোগিতা নিয়ে তখন আলোচনা চলল — বিশেষত তার কারণ, এমন কোন ঐতিহাসিক নজির ছিল না যার সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। দেশের সমস্ত জাতির স্বার্থ সবচেয়ে ভালভাবে এবং তাদের পারস্পরিক সুবিধা অনুসারে রক্ষা করা যায় কীভাবে?

সম্মিলনের উপযুক্ত রূপ বের করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত উপায়ে চেষ্টা করল। এইসব সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বিশেষ কমিশনের কাজ চলল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরেই। এইসব

আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত প্রস্তাবও উঠেছিল — কোন কোন প্রস্তাবে প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটার কথা ছিল ঢিলাঢালাই, আবার তার উল্টো এমন প্রস্তাবও ছিল যাতে কোন কোন সংখ্যালঘু জাতির স্বার্থের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ ঘটত। রাজনীতিক অভিজ্ঞতার সম্পদ ভাণ্ডার এবং উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিজ সিদ্ধান্তটিকে দাঁড় করিয়ে লেনিন্ প্রজাতন্ত্রগুলির চাহিদার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী রূপের সম্মিলন নির্ধারণ করলেন, — সমগ্রভাবে দেশের এবং প্রত্যেকটি পৃথক জাতির প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন।

রু.সো.ফে.স.প্র, ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া এবং ট্র্যান্স-ককেশিয়া প্রজাতন্ত্র — এই সব-ক'টি স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমানাধিকারের ভিত্তিতে সম্মিলিত হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নে।

দেশের সর্বত্র লোকে এই প্রস্তাবে স্বাগত জানাল। সারা দেশ জুড়ে গুবের্নিয়ার আর প্রজাতান্ত্রিক সোভিয়েতের কংগ্রেসগুলিতে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হল।

শেষে, ১৯২২ সালে ৩০এ ডিসেম্বর সমস্ত প্রজাতন্ত্রের জাতিগুলির প্রতিনিধিত্বমূলক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের 'ঘোষণাপত্র' এবং 'ইউনিয়ন-চুক্তি' অনুসমর্থিত হল। এই কংগ্রেসে নির্বাচিত হল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি (ৎস.ই.ক) — দুই কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালে সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা। প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র থেকে একজন করে নিয়ে এই ৎস.ই.ক-র প্রথম চার জন সভাপতি হয়েছিলেন মিখাইল কালিনিন, গ্রিগোরি পেত্রভ্স্কি, নারিমান নারিমানোভ এবং আলেক্সান্দর চের্ভিয়াকভ।

এর ছ'মাস পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৎস.ই.ক-র একটা

অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সংবিধান অনুসমর্থিত হয়েছিল, আর নির্বাচিত হয়েছিল দেশের প্রথম সরকার — জনকমিসার পরিষদ, তার প্রধান — লেনিন। সংবিধানটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল ১৯২৪ সালে ৩১এ জানুয়ারি দ্বিতীয় সারা-ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেসে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হবার সময়ে মধ্য এশিয়ায় ছিল রু. সো. ফে. স. প্র-র অঙ্গ হিসেবে তুর্কিস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আর তাছাড়া, বোখারা এবং খরেজম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র-দুটি। তিনটি প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটিতে কয়েকটা জাতিসত্তা বাস করত, কিন্তু মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের অঞ্চলগত বসবাস যা ছিল তদনুযায়ী ছিল না ঐ প্রজাতন্ত্র-তিনটির রাষ্ট্রীয় সীমান্তগুলি। ১৯২৪ সালে মধ্য এশিয়ায় জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় সীমান্তগুলি পুনঃনির্ধারিত হয়েছিল। জনসংখ্যার জাতিগত সংস্থিতির বিস্তারিত এবং অতি-সতর্ক বিচার-বিশ্লেষণের পরে মধ্য এশিয়ার জাতিগুলির ইচ্ছা অনুসারেই সেটা করা হয়েছিল। এর ফলে স্থাপিত হয়েছিল উজবেক আর তুর্কমেন ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র-দুটি, তাছাড়া, তাজিক*, কিরগিজ, এবং কারাকাল্পাক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি।

উজবেকিস্তানে আর তুর্কমেনিস্তানে প্রতিষ্ঠামূলক সোভিয়েত কংগ্রেসে এই দুটি প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে শামিল হবার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরে ১৯২৫ সালে তৃতীয় সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস তাদের অনুরোধ রক্ষা করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন হল ছ'টা প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়ন।

* তাজিক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ১৯২৯ সালে ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থনীতি পুনর্গঠনে অগ্রগতি
১৯২৬—১৯২৮

সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অবস্থান ১৯২৬—১৯৩২

আর্থনীতিক সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকাজ শুরু হয়েছিল কঠিন অবস্থার মধ্যে। মোটের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অবস্থান মজবুত হয়ে উঠছিল, দেশের গুরুত্ব বাড়ছিল, অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনীতিক, আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছিল আরও বেশি বেশি করে। তবে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলো তো সম্মিলিত সোভিয়েতবিরোধী ফ্রণ্ট গড়ার মতলব ছাড়ে নি। ঐসব মহল তখনও একদিকে আশা রাখত তারা সমবেত চেষ্টায় সোভিয়েত রাষ্ট্রটিকে উচ্ছেদ করতে পারবে, আর সোভিয়েতবিরোধী অভিযান প্রবলতর করে তুলে আসন্ন আর্থনীতিক সংকট এড়াবার সম্ভাবনা দেখত অন্যদিকে। লণ্ডন, প্যারিস আর ওয়াশিংটনের বহু সংবাদপত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক ভেঙে দেবার ডাক ছাড়তে থাকল। ১৯২৭ সালের বসন্তকালে বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল: লণ্ডনে সোভিয়েত বাণিজ্য কর্পোরেশন 'আর্কোস্' এর বাড়িতে পুলিস হানা দিল ১২ই মে। তবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৃটিশবিরোধী

ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ তোলার মতলবে সোভিয়েত বাণিজ্য লিগেশনের উপর অবৈধ পুলিসী আক্রমণের এই অপচেষ্টা — আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক নীতিগুলির পরিপন্থী এই নির্লজ্জ আক্রমণ — শেষে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের যাতে সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন দলিলপত্র তারা পায় নি।

তবু, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অস্টেন চেম্বারলেন ২৭এ মে তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পাঠানো নোটে ইং-সোভিয়েত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক ছেদ করার ঘোষণা করলেন।

বিভিন্ন সোভিয়েতবিরোধী প্ররোচনা সংগঠিত হয়েছিল অন্যান্য দেশেও। ৭ই জুন তারিখে একটা গুপ্তঘাতক পোল্যান্ডে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত পিয়ৎর ভইকভের উপর গুলি চালিয়েছিল। পোল্যান্ডের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো হিসেব করেছিল যে, তাতে পোল্যান্ড-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতি ঘটবে, এমনকি সামরিক সংঘাতও লেগে যাতে পারে, আর তাতে অংশগ্রহণ করত অন্যান্য শক্তিও। তবে, এই ষড়যন্ত্রটাও নিষ্ফল হয়েছিল।

ঐ সময়ে সোভিয়েতবিরোধী প্ররোচনা সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রাচ্যেও। ঐ একই ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে পিকিংয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতাবাসে আক্রমণ চলেছিল। রাষ্ট্রদূতাবাসে খানাতল্লাশি চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেওয়া হয়েছিল, রাষ্ট্রদূতাবাসের কয়েক জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সাংহাই আর তিয়েন্‌ৎসিনে সোভিয়েত কনসালেটেও আক্রমণ চলেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে হরেক রকমের কুৎসা-অভিযান উস্‌কে সম্মিলিত সোভিয়েতবিরোধী ফ্রন্ট গড়া ত্বরান্বিত করা যাবে এবং প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে একটা নতুন জেহাদ সংগঠিত করা যাবে বলে সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলো আশা

করেছিল। এই সোভিয়েতবিরোধী অভিযানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতাও তীব্রতর করে তোলা হচ্ছিল। সৈন্যবাহিনীগুলোকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছিল, বাড়ানো হচ্ছিল সামরিক ব্যয়। পুনরস্ত্রসজ্জা শুরু করেছিল জার্মানিও, — ভার্সাই সন্ধিচুক্তিতে লিপিবদ্ধ বাধা-নিষেধগুলো সত্ত্বেও, ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ এই চার বছরে জার্মানির যুদ্ধায়োজনের বাবত ব্যয় বেড়েছিল ১১ গুণের বেশি।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ আর শান্তির প্রশ্ন বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল, সেটা স্বতঃপ্রতীয়মান। সোভিয়েত সরকার শান্তির জন্যে এবং সমস্ত দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্যে অভিযান চালিয়েই যাচ্ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহির্বাণিজ্যিক যোগাযোগগুলোকে নষ্ট করতে পারে নি প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলো। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের রপ্তানি আর আমদানি উভয় বাণিজ্য হয়েছিল আগের বছরের চেয়ে অনেক বেশি। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করেছিল আইসল্যান্ড, লাতভিয়া, সুইডেন এবং ইরানের সঙ্গে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বেশ অগ্রগতি ঘটেছিল। বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্যের অবনতি ঘটলেও, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েত বাণিজ্য বেশকিছুটা বেড়েছিল। সোভিয়েত বাণিজ্য সংগঠনগুলি যেসব ফরমাশ আগে বৃটেনে দিত তার কোন-কোনটা তখন দেওয়া হচ্ছিল অন্যান্য দেশে। তার অর্থ হল, বৃটেনের শাসক মহলগুলি তাদের প্ররোচনা দিয়ে ক্ষুণ্ণ করেছিল নিজেদেরই আর্থনীতিক স্বার্থ — সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়।

জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম বার অংশগ্রহণ করেছিল, সেটাও ঐ বছরই। বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত এবং তথ্যাদির উল্লেখ করে

সোভিয়েত প্রতিনিধিদল দেখিয়ে দিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতার সুযোগ-সম্ভাবনা কী বিপুল।

নিরস্ত্রীকরণ-সংক্রান্ত আপস-আলোচনায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ সময়ে খুবই সক্রিয় অংশ নিচ্ছিল। লীগ অভ্ নেশন্স্-এর পরিষদের যে-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসাবার কথা ছিল তার প্রস্তুতি কমিশনের কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম বার অংশগ্রহণ করেছিল ১৯২৭ সালে ৩০এ নভেম্বর। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন মাক্সিম লিৎভিনভ; সোভিয়েত সরকারের তরফে তিনি সর্বাত্মক এবং ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণের একটা সংক্ষিপ্ত আর মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন। এই প্রস্তাবের মধ্যে ছিল নিম্নলিখিত দফাগুলি: প্রত্যেকটি দেশের সমস্ত রকমের সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া; সমস্ত অস্ত্র এবং সমরসম্ভার, দুর্গ, নৌ আর বিমান ঘাঁটি নষ্ট করে ফেলা; সমস্ত ধরনের যুদ্ধজাহাজ আর যুদ্ধবিমান খুলে ফেলা; বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি তুলে দেবার এবং ট্রেনিংয়ের জন্যে রিজার্ভিস্টদের সমাবেশ করানো নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা; যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের কারখানাগুলোকে ব্যবহার করার পক্ষে অকেজো করে ফেলা এবং সামরিক উদ্দেশ্যে সমস্ত রকমের ব্যয়বরাদ্দ বন্ধ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রস্তাব তোলার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল ঘোষণা করেছিল যে, মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রস্তাবের সঙ্গে অন্য যেকোন নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা থাকলে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতেও তারা প্রস্তুত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পেশ করা খসড়া-প্রস্তাবটা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল আর অকপট। এতে ছিল মাত্র দুটো দফা: (১) প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সর্বাত্মক এবং ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনার একটা সম্মেলন ডাকার বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনার জন্যে প্রস্তুতি কমিশন অবিলম্বে কাজ শুরু

কর্ক; এবং (২) সোভিয়েত প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত সম্মেলনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা এবং সেটাকে অন্মোদন করার জন্যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বসানো হোক ১৯২৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে। সোভিয়েত খসড়া-প্রস্তাবটির প্রবল ছাপ পড়েছিল, সেটা বহ্ ব্র্জোয়া পত্র-পত্রিকায়ও স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু, প্রধান প্রঁজিতান্ত্রিক দেশগ্রলি অন্সরণ করছিল সামরিকীকরণের কর্মনীতি, তাদের প্রতিনিধিরা কার্যত কোন আলোচনা ছাড়াই সোভিয়েত প্রস্তাবটিকে উপেক্ষা করে গিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেবার পরবর্তী দ্’বছরে ব্টিশ সরকারের মাল্ম হয়েছিল যে, সেটা গ্র্তরভাবেই ব্টিশ আর্থনীতিক স্বার্থের পরিপন্থী শ্ধ্ তাই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান শক্তি আটকাতে এবং তার আন্তর্জাতিক অবস্থানের সংহতি ব্যাহত করতেও সেটা অপারগ। ১৯২৯ সালের বসন্তকালে ৮৪ জন ব্টিশ শিল্পপতি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিল আর্থনীতিক যোগাযোগ প্নঃস্থাপনের জন্যে। লেবর পার্টি এবং উদারনীতিক পার্টি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক অবিলম্বে প্নঃস্থাপনের পক্ষপাতী — তারা ১৯২৯ সালের মে মাসে পার্লামেন্টের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল।

১৯২৯ সালের জ্লাই মাসে ব্টিশ সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে প্রস্তাব তুলেছিল দ্ই দেশের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক প্নঃস্থাপনের জন্যে। এর ফলে, কূটনীতিক সম্পর্ক অবিলম্বে প্নঃস্থাপনের ব্যবস্থায্ক্ত নিয়মপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐ বছরই শরৎকালে।

এইভাবে চতুর্থ দশকের প্রারম্ভ নাগাতই সম্মিলিত সোভিয়েতবিরোধী ফ্রন্ট গড়ার অপচেষ্টা একেবারে ভেস্তে গিয়েছিল।

১৯২৯ সালে পংজিতান্ত্রিক দন্নিয়া পড়ে গিয়েছিল একটা *আর্থনীতিক সংকটের আবর্তে*, তার ফলে সমগ্র পংজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিহিত যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রকোপিত হয়ে উঠেছিল। ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতিক অবস্থান সমানে আরও মজবুত হয়ে উঠছিল, আর দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ এগোচ্ছিল দ্রুত। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বহু দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ দ্রুত বেড়ে চলছিল, কিন্তু এই বিশেষ সময়টায় সোভিয়েত কূটনীতিকদের কর্মশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছিল প্রধানত শান্তি বজায় রাখার জন্যে সংগ্রামে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত বেশি মাত্রায় উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছিল। প্রাচ্যে জাপান নেমে পড়েছিল সামরিক কার্য-কলাপে, উদ্বেগজনক সব সংবাদ আসছিল জার্মানি থেকে — সেখানে ফাশিস্তরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী ফৌজ অনধিকার প্রবেশ করেছিল উত্তর-পূর্ব চীনে। ১৯৩৩ সালের বসন্তকাল নাগাত জাপান চীনের চারটে প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল। জাপান সরকার ২৭এ মার্চ লীগ অভ্ নেশন্স্ থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজ আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ একেবারে অবাধে সম্প্রসারিত করে চলবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। এইভাবে দূর প্রাচ্যে সৃষ্টি হল যুদ্ধপ্রসারের কেন্দ্র।

ততদিনে ইউরোপে পরিস্থিতিও অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে জার্মানির শাসক মহলগুলি ১৯২৯ সাল নাগাত দেশের যুদ্ধ-শিল্পের বেশির ভাগটাকে আগেকার মাত্রায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। চার বছর পরে, আর্থনীতিক মন্দা এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের লক্ষণীয় বৃদ্ধির মধ্যে জার্মান বুর্জোয়ারা ক্ষমতা তুলে দিল

ফাশিস্তদের হাতে, ফাশিস্তরা পৃথিবীর মানচিত্রটাকে নতুন করে প্রস্তুত করার লক্ষ্য গোপন করল না একটুও।

প্রাচ্য আর পশ্চিম উভয় অঞ্চলে যুদ্ধপ্রসারের কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠতে থাকার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করল আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংহত করার জন্যে। ১৯৩১ সালে স্বাক্ষরিত হল সোভিয়েত-আফগান নিরপেক্ষতা এবং পারস্পরিক অনাক্রমণের সন্ধিচুক্তি, আর পোল্যান্ডের সঙ্গে অনুরূপ সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল তার পরের বছর। নভেম্বর মাসে অনাক্রমণ সন্ধিচুক্তিতে সই দিল সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ফ্রান্স এবং আরও কয়েকটা দেশ। সেই কালপর্যায়ের বিশেষ অবস্থায় সোভিয়েত কূটনীতিকেরা যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, এই হল তার সংক্ষিপ্ত এবং অতি অসম্পূর্ণ বিবরণ।

অস্ত্রসজ্জা হ্রাস এবং তার উপর বাধা-নিষেধ নিয়ে আলোচনার জন্যে ১৯৩২ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলন লীগ অভ্ নেশন্স্-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হলেও, লীগের সদস্য নয় এমন কয়েকটি দেশও, তার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, এমনি সময়েই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ সম্মেলন। এই কারণেই সোভিয়েত প্রতিনিধিরা প্রস্তাব করেছিল যে, নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাবলির সমাধান করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার অবিলম্বে। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল যে-কর্মসূচি রচনা করেছিল সেটা সর্বাত্মক এবং ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণ ঘটাবার বনিয়াদ হতে পারত, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত, তাও ঘোষণা করেছিল সোভিয়েত প্রতিনিধিরা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরস্ত্রীকরণের আরও একটা কর্মসূচি পেশ করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট দেশগুলি আনুপাতিক হারে অস্ত্রসজ্জা কমাবার বিষয়ে একটা চুক্তি করুক,— নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাবলির সমাধানের একটা গ্রহণযোগ্য বনিয়াদ বের করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐকান্তিক কামনা তাতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবগুলি ছিল অকপট এবং মূর্ত-নির্দিষ্ট, কিন্তু পশ্চিমী শক্তিগুলির বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল তার থেকে বিসদৃশ — সেগুলি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মনোযোগটাকে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান থেকে ভিন্নমুখ করে দিয়েছিল।

ফলে, কোন অগ্রগতি ঘটল না, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বেড়ে গেল।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজনের সূত্রপাত

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোয় আসছিল বড় বেশি ঠাণ্ডা শীতকাল — তবু, পত্র-পত্রিকার স্টলগুলি খোলার সময়ের অনেক আগে থেকেই সেগুলিতে লাইন লেগে যেত। সোভিয়েত রাজধানীতে তখন চলছিল কমিউনিস্ট পার্টির ১৪শ কংগ্রেস। বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল এই কংগ্রেস, কেননা আলোচিত হচ্ছিল সবারই পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন একটা বিষয়: সোভিয়েত সমাজের বিকাশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্তব্য আর প্রণালী।

এটা কিছু মামুলি কংগ্রেস ছিল না: দ্বিতীয় অধিবেশনের পরে, পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির তরফে স্তালিন, মলোতভ এবং কুইবিশেভের প্রধান বিবরণগুলি পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে

প্রতিনিধিদের একটা গ্রুপ জিনোভিয়েভকে বলতে দেবার জন্যে দাবি জানাল। জিনোভিয়েভ পেশ করলেন একটা যুগ্ম-বিবরণ, তা থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, পার্টির নিয়মাবলি অগ্রাহ্য করে গড়ে উঠেছিল একটা পার্টিবিরোধী উপদল, সেটা মূলনীতির দিক দিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটি আর তার পলিটব্যুরোর সাধারণ কর্মনীতি থেকে বিপথগামী। তারপরে চলল উত্তেজনাপূর্ণ এবং জটিল প্রকৃতির লড়াই, — দেশের প্রয়োজনের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বিকাশের পন্থা প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রতিফলিত হল সেই লড়াইয়ে।

সেই সময় অবধি সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল, শহরেও এবং গ্রামাঞ্চলেও আর্থনীতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছিল সমানে। জারের আমলে শান্তিপূর্ণ অবস্থার শেষ বছর ১৯১৩ সালের অংকগুলোতে আবার শিগগিরই পেঁছে যাবার অবস্থা ছিল তখন। কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ছিল সমানে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছিল — বিশেষত শিল্পে বাণিজ্যে।

তবু, দেশ তখনও ছিল খুবই কৃষিপ্রধান। জনসংখ্যার চার-পঞ্চমাংশ — আরও যথাযথভাবে বললে, জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ, অর্থাৎ, ১৯২৬ সালের আদমশুমারীর সময়কার ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ — বাস করত গ্রামাঞ্চলে, সেখানে কৃষি-প্রণালীগুলো ছিল প্রধানত পশ্চাৎপদ ধরনের। দেশে মোট উৎপাদনের মাত্র তৃতীয়াংশ ছিল শিল্পগত; তখন বিদ্যমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির বেশির ভাগে উৎপন্ন হত বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য। সমস্ত শিল্পোৎপন্নে ভারি শিল্পের ভাগ ছিল মাত্র ৪০ শতাংশ। ১০-১২ বছর আগে যেমনটা ছিল তেমনি তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়েও দেশে যথেষ্ট-বিকশিত ইঞ্জিনিয়রিং শিল্প ছিল না, তাছাড়া, রাসায়নিক আর বৃহদায়তন নির্মাণশিল্পের বহু শাখাও ছিল নিম্ন মানের।

জটিল যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধাতু, রবার, তুলো, ট্র্যাক্টর, ঘড়ি এবং আরও অনেক জিনিস আমদানি করতে হত, ঠিক যেমনটা শিল্পের অবস্থা ছিল জারের আমলে, তখন — যা লেনিন বলেছিলেন — টেকনিকাল সরঞ্জাম ছিল আমেরিকার শিল্পে যা ছিল তার দশমাংশ মাত্র, আর জার্মান এবং বৃটিশ শিল্পে যা ব্যবহৃত হত তার চতুর্থাংশ।

পুনঃস্থাপন কালপর্যায়ের শেষে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত ছিল জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশ — এর মধ্যে ছিল শ্রমিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনগুলির প্রশাসনিক কর্মিবৃন্দ, কুটিরশিল্পী — সমবায় সমিতিগুলির মানুষ, এবং যারা যৌথখামারে ভরতি হয়েছে সেইসব কৃষক। জনসংখ্যার বেশির ভাগ তখনও ছিল ছোট কৃষকেরা — তারা আবাদ করত নিজ নিজ জমিখণ্ডে। শহর আর গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়ারা (অর্থাৎ, যাদের বলা হত ন. আ. ক-বাবুরা, আর কুলাকেরা) তখনও বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিল, তারা ছিল জনসংখ্যার ৭ শতাংশ। অর্থাৎ কিনা, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কায়েম হবার আট বছর পরেও, সংখ্যার দিক থেকে, বিভিন্ন শোষক শ্রেণীর অবশেষগুলো শক্তিশালী ছিল শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় সমানই, শ্রমিকরা তখন ছিল জনসংখ্যার ৭·৭ শতাংশ।

এই চিত্রটা পূর্ণাঙ্গ হবে আরও দুটো তথ্য দিয়ে: দেশের লেবর এক্সচেঞ্জগুলিতে তখন প্রায় দশ লক্ষ বেকারের নাম লেখানো ছিল; শহরগুলিতে ব্যক্তিগত পুঁজি কিছুটা সুবিধে করে নিচ্ছিল, গ্রামে কুলাকদের খামারের সংখ্যা বাড়ছিল।

পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল যেসব বাধা সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশ ব্যাহত করছিল সেগুলির উপর, কিন্তু আসল যেসব শক্তিকে

অবলম্বন করে এইসব বাধা অপসারণ করা যায় সেগুলি সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি ছিল না; সমাজতন্ত্র যে একটিমাত্র দেশেও গড়া সম্ভব, এটাকে তারা আবার অস্বীকার করতে লেগেছিল। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, অন্যান্য প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন সমাজ গড়া অসম্ভব। হাত গুটিয়ে বসে অন্যান্য দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্যে অপেক্ষা করো — এই ছিল তাদের সিদ্ধান্ত।

তারা কেউ কেউ কথা তুলেছিল যে, কৃষির উন্নয়ন, রপ্তানিবৃদ্ধি, শস্য, শণ, দারু, অতসীতন্তু বিক্রি করার জন্যে সর্বশক্তিপ্রয়োগে চেষ্টা করে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ক্রমে জমিয়ে তোলা দরকার। এর অর্থ দাঁড়াত, সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশই থেকে যেত পরবর্তী বহু বছর যাবত; তেমন অবস্থায় দেশের প্রতিরক্ষাক্ষমতা শক্তিশালী করার কোন উপায়ই থাকত না, সে-কথা তারা আদৌ বিবেচনায় ধরে নি।

প্রতিপক্ষের লোকেরা গোঁ ধরে এই কর্মনীতি সমর্থন করেছিল, তারা মনে করত, প্রথমে হালকা শিল্প সম্প্রসারিত করে পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো, কাপড় এবং বিভিন্ন অত্যাবশ্যক পণ্যের বিক্রি বাড়ানো দরকার, শুধু তখন — বিরাট পরিমাণ মুনাফা জমাবার পরে — ভারি শিল্পের বনিয়াদ গড়া শুরু করার পালা। এই সম্ভাবনার চিত্রটা অবশ্য খুবই আকর্ষণীয় মনে হতে পারত: জনগণকে অঢেল ভোগ্য পণ্য দেবার স্বপ্ন দেখে নি এমন কমিউনিস্ট কে ছিল! তবে, স্বপ্ন যদি নিছক উদ্ভট কল্পনা না হয়, তার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকা চাই। সেই কালপর্যায়ে সামাজিক বিকাশের বুনিয়াদী প্যাটার্ন এবং বিশেষ-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বিবেচনায় না-ধরে কোন উপযুক্ত কর্মনীতি নির্ধারণ করা এবং সেটাকে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব ছিল। প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা ছিল এখানেই।

সেই কালপর্যায়ে দেশের সামনেকার বিপুল কষ্ট-কাঠিন্য ছিল অতীত থেকে পাওয়া জিনিস, — সেগুলি ছিল পুনঃস্থাপনের কর্তব্য নিষ্পন্ন করা এবং সমগ্র অর্থনীতির টেকনিকাল আর সামাজিক পুনঃসংগঠনে উত্তরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'বৃদ্ধির যন্ত্রণা'। সেগুলি ছিল না নিষ্পত্তিমূলক উপাদান: নতুন পরিস্থিতির মর্ম-উপাদানটা ছিল এই যে, শ্রমিক শ্রেণী ছিল রাজনীতিক ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ অধিকারী, শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ছিল অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রগুলি, তার প্রতি মেহনতী কৃষককুলের সমর্থন ছিল, আর পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার কর্মশক্তি এবং দৃঢ়সংকল্পে ভরপুর ছিল শ্রমিক শ্রেণী।

পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পরিকল্পনা নির্ধারণ করল কমিউনিস্ট পার্টির ১৪শ কংগ্রেস। আগে প্রতিপক্ষের মতামতের সমালোচনা ক'রে এবং তাদের উপদলীয় কার্যকলাপে ধিক্কার দিয়ে পার্টির এই সর্বোচ্চ সংস্থা (কংগ্রেস) একটিমাত্র দেশেও সমাজতন্ত্র গড়ার সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে লেনিনের থিসিসের ভিত্তিতে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। দু'সপ্তাহ ধরে চলেছিল এই কংগ্রেস, এতে গৃহীত হল একমাত্র নির্ভুল কর্মনীতির পরিকল্পনা — সেটা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে যন্ত্রপাতি আর শিল্পের সরঞ্জাম আমদানিকারী দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আর শিল্পের সরঞ্জাম উৎপাদনকারী দেশে পরিণত করার জন্যে, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি দিয়ে পরিবেষ্টিত সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় গড়া স্বাধীন আর্থনীতিক ইউনিটে পরিণত করার জন্যে। এককথায়, সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজনের পরিকল্পনা রচনা করল এই কংগ্রেস।

ভারি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং প্রতিরক্ষাক্ষমতা গড়ে তোলাই ছিল দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিতে পরিণত করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। একমাত্র তবেই অভূতপূর্ব স্বল্প

কালপর্যায়ের মধ্যে দেশের টেকনিকাল আর আর্থনীতিক অনগ্রসরতা ঘুচানো, মানুষের উপর মানুষের শোষণ আর বেকারির অবসান ঘটানো এবং বহু লক্ষ কৃষকের সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনা খুলে ধরা সম্ভব ছিল।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজনের পরিকল্পনাটি কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটন ছিল না। ১৯২১ সালেই লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন: 'কৃষি পুনঃসংগঠিত করতে সক্ষম এমন বৃহদায়তনের যন্ত্রপাতির শিল্পই সমাজতন্ত্রের পক্ষে একমাত্র সম্ভাব্য বৈষয়িক ভিত্তি।'* দেশ যখন বিদ্যুৎসজ্জিত হবে, অর্থনীতির সমস্ত বিভাগ যখন আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনের অনুযায়ী টেকনিকাল বনিয়াদ পাবে, একমাত্র তখনই সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হবে, এ বিষয়ে লেনিন নিশ্চিত ছিলেন। গৃহযুদ্ধ আর বহিরাক্রমণ-হস্তক্ষেপ যুদ্ধের সময়ে এবং আর্থনীতিক পুনঃস্থাপনের বছরগুলিতে এমন কোন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি, কিন্তু তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় অর্থনীতির যুদ্ধপূর্ব মাত্রায় পেঁছনো সহজ ছিল না। বহু পুরন কারখানাকে আবার চালু করার সময়ে সেগুলিকে 'গোয়েল্রো' বিদ্যুৎসজ্জা পরিকল্পনা অনুসারে পুনর্গঠিত, পুনঃসজ্জিত এবং সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। এই সময়েই দেশে উৎপন্ন হয়েছিল প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন, প্রথম প্রথম মোটরগাড়ি আর ট্র্যাক্টরগুলি, যা জারের রাশিয়ায় উৎপন্ন হয় নি কখনও। এটাও বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই কালপর্যায়ে বিদ্যুৎ, শক্তিশিল্পের সরঞ্জাম, টেক্সটাইল শিল্পের তাঁত এবং কোন কোন রকমের কৃষি যন্ত্র আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি উৎপাদনে সোভিয়েত সূচকগুলি ১৪শ পার্টি কংগ্রেসের বেশকিছুটা আগেই ১৯১৩ সালের মাত্রাগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩২তম খণ্ড, ৪৫৯ পৃঃ

যারা মনোভাবের দিক দিয়ে তখনও ছিল অতীতের মধ্যে আবদ্ধ এবং পুরন ধরনধারন কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তাদের দৃষ্টিতে এইসব সাধন ছিল কষ্ট-কাঠিন্যের সাগরে ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপমাত্র, আপাতিক সাফল্য-মাত্র। অন্যদিকে, সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত সরকার এইসব সাধনের মূল্যায়ন করেছিল একেবারে ভিন্নভাবে। তাঁরা দেখেছিলেন, এতে প্রতিফলিত হয়েছিল তখন নির্দিষ্ট আকার ধারণ করছিল যে-সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, তারই শ্রেষ্ঠত্ব আর সুবিধাগুলো; তাঁরা দেখেছিলেন সেটা ছিল তখন কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা অনুসারে যে-পুনর্নির্মাণকাজ চালু হচ্ছিল, তারই নির্দেশক। ন. আ. ক-র কল্যাণে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশ পেঁছে গিয়েছিল একটা মোড় ঘোরার মুখে, তার ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার প্রয়োজনীয় বৈষয়িক আর টেকনিকাল ভিত্তি সৃষ্টি করার জন্যে অভিযান প্রবলতর করা সম্ভব হয়েছিল। ১৪শ পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে দেশের বিকাশের জন্যে এই নতুন পর্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে স্তালিন ১৯২৫ সাল এবং অক্টোবর বিপ্লব সাধনের কালপর্যায়ের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব মনে করেছিলেন: 'তখন, ১৯১৭ সালে কর্তব্যটা ছিল বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতায় উত্তরণ। এখন, ১৯২৫ সালে কর্তব্যটা হল এই, যে-বর্তমান অর্থনীতিকে সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক বলা যায় না, এর থেকে উত্তরণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে, যে-অর্থনীতি হওয়া চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি।'*

কমিউনিস্ট পার্টির ১৪শ কংগ্রেস সোভিয়েত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে শিল্পযোজন কংগ্রেস হিসেবে। ১৯২৫

* ই. ভ. স্তালিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৭ম খণ্ড, ২৫৮ পৃঃ

সালের শেষটা পরে প্রতিপন্ন হল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশের ক্ষেত্রে যেন একটা জলবিভাজিকা। দেশের জীবনের বহু দিক তখনও ছিল অনেকটা কয়েক পুরুষ ধরে যা ছিল তেমনই। মাগ্‌নিৎনায়া পর্বতে তখনও ছিল পাইনগাছের সেই মর্মরধ্বনি, তখনও মানচিত্রে ওঠে নি মাগ্‌নিতোগর্স্ক শহর, যদিও অনতিবিলম্বেই এই শহরটি হয়েছিল উরাল অঞ্চলের এবং গোটা দেশেরই প্রধান ধাতুশিল্পকেন্দ্র। নীপারের বিখ্যাত নদীপ্রপাত নির্ঝরায়িত হয়ে নেমে গেল নদীটির নিচের দিককার ধীরে-প্রবাহিত জলপৃষ্ঠে, 'দ্‌নেপ্রোগেস' শব্দটা তখনও কেবল প্রকল্পটির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়রদের মধ্যে পরিচিত ছিল। পরে মধ্য এশিয়া আর সাইবেরিয়ার মধ্যে যোগসাধন করল যে তুর্ক-সিব্‌ রেলপথ তার জায়গায় তখনও ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে চলত উটেরা। জনসংখ্যার বিরাট অংশ তখনও ছিল নিরক্ষর; যাদের ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এমন গ্রাম ঐ সময়ে ছিল বিরল; দেশের বহু নতুন নির্মাণক্ষেত্রে পরে যাঁরা হয়েছিলেন শ্রম-বীর, তাঁদের অনেকেই তখনও করছিলেন খেতমজুরগিরি। কিন্তু, সংবাদপত্র, বেতারবার্তা এবং প্রচার-তথ্য সংগঠনজালির হাজার হাজার কর্মীর সরাসরি দেওয়া সংবাদাদি শিল্পযোজনের নতুন ধারণাটাকে অচিরেই ঘরে-ঘরে দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে এনে দিল। শব্দটা সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে উঠল শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি, বিপুল পরিসরে যন্ত্রসজ্জা, সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, বর্ধিত সমৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রগতির প্রতীক।

'ক্রাস্‌নি পুতিলোভেৎস্‌' কারখানার একজন শ্রমিকের কথায় ঐ বছরগুলির আবহাওয়াটা ছবির মতো ফুটে ওঠে। লেনিনগ্রাদের শ্রমিকদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন: 'একবার মনে করে দেখুন, আমাদের কারখানাটার কোন ভবিষ্যৎ ত্রৎস্কি দেখতে পান নি বলে এটাকে তিনি বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। সেসব কথাকে

এখন তো হাস্যকর মনে হয়। আমাদেরটার মতো আরও দশটা, হয়ত আরও এক-শ'টা কারখানাই তো এখন নির্মাণ করা দরকার, গড়া দরকার সেসব কারখানা চালাবার জন্যে বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং আরও অনেকিছু। আমি পড়তে শিখেছি সবেমাত্র — আমি তো ওসব তেমন ভাল জানি নে। কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণী এ সবকিছুর ব্যবস্থা করবে: বেকারি, ন. আ. ক-বাবু আর কুলাকদের আমরা অবসান ঘটাব। আমাদের ভয় খাওয়াতে পারে না কোন মনিব কিংবা পুঁজিপতি।' একেবারে প্রত্যেকেই ভাবছিল এই ধারায়, তেমনটা মনে করলে ভুল হবে; ছিল পরিকল্পের প্রকাশ্য বিরোধীরা, তারা সম্ভাব্য সর্বতোভাবে সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজনের পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বাধা দিয়েছিল, আর তাছাড়া ছিল অবিশ্বাসপ্রবণ আর সন্দেহবাদীরা। পার্টি আর সরকারী কর্মকর্তা আর শিল্পের আদর্শ-শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এবং নির্মাণক্ষেত্রগুলিতে অন্তর্ঘাত আর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অবধি ঘটেছিল। অগ্নিসংযোগ, মেশিন-ভাঙা এবং গুপ্তহত্যার ঘটনার বেশ কতকগুলি উল্লেখ ছিল পত্র-পত্রিকায়।

১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে দনেৎস্ অববাহিকায় নাশকতায় লিপ্ত একটা সংগঠন ধরা পড়েছিল: শিল্পক্ষেত্রে প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ এবং খনি আর কারখানার প্রাক্তন মালিকদের নিয়ে সেটা ছিল একটা প্রকাণ্ড সোভিয়েতবিরোধী দল। বহু সভা-সমাবেশে শ্রমজীবীরা প্রচণ্ড ক্রোধ আর ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে তারা সরকারের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছিল। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি ঘটাবার জন্যে তারা আরও ভালভাবে এবং আরও বেশি কাজ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিল।

ঐ সময়ে সমস্ত এবং যেকোন অনুষ্ঠানাদিতে — শহর আর গ্রাম সোভিয়েতের নির্বাচনে, ট্রেড ইউনিয়ন আর কমসোমলের

কংগ্রেসে, বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে কিংবা জনসংগঠনের সভায় — শিল্পযোজনই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়: জনগণকে সবচেয়ে পুরোপুরি এবং ব্যাপকভাবে তাতে শামিল করানো যায় কীভাবে, যথাসম্ভব দ্রুত এবং কার্যকরভাবে পার্টির সাধারণ শিল্পযোজন কর্মনীতি বাস্তবায়িত করা যায় কীভাবে। যে-সুবিপুল সাংগঠনিক কাজ বলশেভিকেরা সম্পাদন এবং তত্ত্বাবধান করেছিল সেটা সুফলপ্রসূ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ শিল্পযোজনের অভিযানে সরাসরি শামিল হয়েছিল অচিরেই, তার ফলে শিল্পযোজনের সাফল্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল আগেভাগেই।

এই ব্যাপারে পুঁজিতান্ত্রিক সরকারগুলো প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের কোন আর্থিক আনুকূল্য করে নি — এটা তো বোঝাই যেত। সোভিয়েত জনগণের কেবল নিজেদেরই সংগতি-সংস্থানের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন গতি ছিল না। আগে যেসব লাভ বুর্জোয়া আর ভূস্বামীরা পকেটস্থ করত, জার-পরিবারের লোকেরা উড়িয়ে দিত এবং হরেক রকমের ঋণের সুদ বাবত দিয়ে দিত বিদেশী পুঁজিপতিদের, সেই সবটাই সোভিয়েত রাষ্ট্র তখন বিনিয়োগ করল শিল্পে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আর রাষ্ট্রীয় বাজেটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে সোভিয়েত সরকার কৃষি আর হালকা শিল্পে লাভের কিছুটা বরাদ্দ করল ভারি শিল্পের জন্যে। ১৯২৭ সালে একটা বিশেষ শিল্পযোজন ঋণ চালু করে সেটাকে বণ্টন করা হয়েছিল চাঁদার (কিস্তি) ভিত্তিতে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই শ্রমজীবী জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাদের রাষ্ট্রকে ঋণ দিয়েছিল ২০ কোটি রুবল; ১৯২৮ সালে আর-একটা ঋণ চালু করা হলে সেটাও সমানই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল — এবার পাওয়া গিয়েছিল ৫০ কোটি রুবল। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন রকমের আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রীয় ঋণ চালু করা হয়েছিল পনরটা।

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো, মালমশলায় মিতব্যয়িতা এবং কলে-কারখানায় কর্ম-সংগঠনের উন্নতিসাধনের গণ-অভিযানে সুফল হয়েছিল আরও জমকালো। এই অভিযানে খুবই তাৎপর্যসম্পন্ন ভূমিকা পালন করেছিল সবচেয়ে আগুয়ান শ্রমিক-সমষ্টিগুলি। বিশেষ সৃজনশীল-সুদক্ষ উদ্যম প্রদর্শন করেছিল মস্কো-কাজান রেলপথের ওয়াগন মেরামত কর্মশালার শ্রমিক-সমষ্টি। কমিউনিস্ট পার্টির ১৪শ কংগ্রেসের পরেই সেখানকার পার্টি সেলের সম্পাদক সেখানে কাজ-করা কমসোমল সদস্যদের জড়ো করে বলেছিলেন: 'পার্টির ডাকে তোমরা কীভাবে সাড়া দেবে, ছেলেরা? তোমাদের একটা দৃষ্টান্তস্থাপন করা উচিত। গোটা কর্মশালাটাকে দেখিয়ে দাও তোমরা বেশি উৎপাদনশীলতা ঘটাতে পারো; তোমরা কমসোমলের সদস্য, তোমরা হলে দেশের প্রগতিশীল নওজোয়ানের আগুয়ান বাহিনী, নওজোয়ানের ঝটিকা-ব্রিগেড, যা লেনিন বলতেন।' এর পরে চলেছিল প্রাণবন্ত আলোচনা, শেষে স্থির হল গড়া হবে একটা নওজোয়ান ব্রিগেড, আর দেখতে হবে যাতে কিছুই বাতিল না-হয়। তারা সবাই কাজ করেছিল বিশেষ কঠোরভাবে, আর কাজের মধ্যে সাহায্য করেছিল পরস্পরকে। তারা ক্রমে কাজে আরও বেশি সুদক্ষ হয়ে উঠেছিল। চার-জনের এক-একটা গ্রুপ প্রথমে পাঁচ জনের, পরে ছ'জনের কাজ করে ফেলছিল। এর প্রথম প্রথম ফলের তাৎপর্য স্বতঃপ্রতীয়মান: এই তরুণ শ্রমিকেরা কাজ করল তাদের পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে আরও অনেকটা, তাদের মজুরি দাঁড়াল কর্মশালায় সবচেয়ে বেশি।

মস্কোয় আর লেনিনগ্রাদে, উরাল অঞ্চলে, দনেৎস্ অববাহিকায় এবং তাশখন্দেও বিভিন্ন কলে-কারখানায় অনুরূপ সব কমসোমল-নওজোয়ান ব্রিগেড গড়া হয়েছিল। নতুন নতুন উচ্চতর লক্ষ্যমাত্রার জন্যে তারা সবাই কাজ করেছিল সোৎসাহে, তারা ঝটিকা-ব্রিগেড বলে খ্যাত হয়েছিল।

এমনসব লোকও ছিল যারা এইসব ব্রিগেড এবং জন-উদ্যমের অন্যান্য দৃষ্টান্তকে ঘৃণাভরে বিদ্রূপ করত কিংবা তাদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করত, — বদ্ধমূল রুশী অনগ্রসরতা দ্রুত অতিক্রম করা সম্ভব, এটা তারা বিশ্বাস করতে অপারগ ছিল, বিশ্বাস করতে চাইতই না আসলে। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রে সাধারণ শ্রমজীবীরা মহান আদর্শের তরফে স্বেচ্ছায় কতখানি ত্যাগস্বীকার করতে আর অভাব-অনটন সহ্য করতে পারে, সেটা তারা বুঝতে অপারগ হয়েছিল — তবে, অবশ্য, সেই সময়কার মেজাজটাকে যা গড়ে তুলেছিল সেটা তো হতাশাগ্রস্তদের সন্দেহবাদ কিংবা জন-শত্রুদের বিদ্বেষ নয়। সে-মেজাজটাকে গড়ে তুলেছিল রেল-শ্রমিক এবং ধাতু আর টেক্সটাইল শ্রমিকদের শ্রম-বীরত্ব, তারা শিল্পযোজনের জন্যে নিয়োগ করেছিল সমস্ত কর্মশক্তি আর উৎসাহ-উদ্যম — সঞ্চয় তো বটেই।

সমগ্র জনগণের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে ১৯২৬—১৯২৭ আর্থনীতিক বর্ষে শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল ১০০ কোটি রুবল। শিল্পযোজন অভিযানের শুধু প্রথম তিন বছরেই শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল প্রায় ৩৩০ কোটি রুবল: অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র থেকে পাওয়া আয়, সরকারী ঋণের চাঁদা এবং কঠোর মিতব্যয়িতার ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। এই আয়ের বণ্টন থেকে দেখা যায় সেই কালপর্যায়ে অগ্রাধিকার পেয়েছিল কী: ভারি শিল্পের নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং যেগুলি ছিল সেগুলির সম্প্রসারণের জন্যেই ব্যয়বরাদ্দের বেশির ভাগ পৃথক করে রাখা হয়েছিল। আগে অর্থ যা হাতে আসত সেটা ব্যয় করা হত প্রধানত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনঃস্থাপন করা এবং সাধারণ মেরামতের জন্যে, কিন্তু এই সময়ে সর্বপ্রধান স্থানে এসেছিল নতুন নতুন শিল্পায়তন। বিনিয়োগ-করা পুঁজি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা এবং উৎপাদনের পরিমাণ অবিলম্বে বাড়ানো যেত না, প্রধানত এরই থেকে অসুবিধা দেখা দিত। এইসব বিনিয়োগ

থেকে সর্বোচ্চ মাত্রায় উপকার পাওয়া যেত শুধু কয়েক বছর পরে, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে অন্য কোন সমাধান ছিল না। তার উপর, তখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরক্ষাক্ষমতা মজবুত করে তুলতে বাধ্য করেছিল। পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলির বাহিনী সর্বাধুনিক বিমান, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি আর রাসায়নিক অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছিল, কিন্তু যে-রাষ্ট্রে কায়েম হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সেখানে বিমানবাহিনী, মোটরযান শিল্প গড়া সবেমাত্র শুরু হচ্ছিল, — কৃষির অগ্রগতি আর সীমান্তের নিরাপত্তা এই দুয়েরই জন্যে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন রসায়ন শিল্পের কতকগুলি শাখা সেখানে তখনও খোলাই হয় নি।

শিল্পযোজনের বাবত প্রথম কোটি কোটি রুবল বরাদ্দ করা হয়েছিল বিশেষ-নির্দিষ্ট কোন্ কোন্ প্রকল্পের জন্যে? ১৯২৬ সালের শেষের দিকে ভল্‌খভ নদীতে একটা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করা হয়েছিল — এটা তখন ছিল এইরকমের প্রকল্পগুলির মধ্যে ইউরোপের সর্ববৃহৎ। এই সাধন-সাফল্যটি প্রসঙ্গে 'প্রাভদা'য় লেখা হয়েছিল: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ ফলপ্রসূ হতে পারে কি? হ্যাঁ, তা পারে! নদীর দূর-দূর পাড়ে সুদূরবর্তী জলাগুলোতে দীপ্তি পাওয়া হাজার-হাজার বাতি এই উত্তরটাকে ঝলকে তুলেছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে নি। এখন কার পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব যে, স্‌ভির, নীপার আর দন্ নদীতেও গড়া হবে বিদ্যুৎকেন্দ্র। যদি বহিঃশত্রু আমাদের বাধা না-দেয় শ্রমিক শ্রেণীর কথা হল এই: ভল্‌খভ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সময়ে যেমন সেই একই আভ্যন্তরিক সংগতি-সংস্থান তারা সমবেত করতে পারে।'

তার কয়েক মাস পরেই নির্মাণ-শ্রমিকেরা দেখা দিল নীপারের নদীপ্রপাতে — যা পরে হয়েছিল নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্র। ডজন

ডজন ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কার-অভিযাত্রিদল গেল খিবিনি পর্বতে, উরাল অঞ্চলে, মধ্য এশিয়ায়। ভলগা নদীর ধারে একটা ট্র্যাক্টর কারখানা এবং মাগ্‌নিৎনায়া পর্বত আর ক্রিভয় রোগ্‌-এর কাছে দুটো ধাতুশিল্প কারখানা নির্মাণের প্রারম্ভিক কাজ চলল ১৯২৭ সালে। একটার পরে একটা শিল্পের সমস্ত শাখাকেই আরও বেশি বেশি হালনাগাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে পুনঃসজ্জিত করা হল। মধ্য এশিয়া থেকে সাইবেরিয়া অবধি একটা রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হল।

বেকারের সংখ্যা কমে আসছিল দ্রুত। ১৯২৬—১৯২৯ সালের কালপর্যায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছিল ৭০ শতাংশ; নতুন বাসস্থান পেয়েছিল প্রায় ৯ লাখ শ্রমিক এবং তাদের পরিবার।

১৯২৭ সালে দেশে উদ্‌যাপিত হল বিপ্লবের দশম বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে ঘোষণা হল, সাত-ঘণ্টার কর্মদিন চালু হবে, কিন্তু মজুরি কমবে না। কৃষকের অবস্থারও উন্নতি হল বেশকিছুটা। সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন শ্রমজীবীদের সমস্ত অংশেরই স্বার্থের আনুকূল্য করছিল।

কৃষির যৌথকরণ

মোট শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল ১৯২৭ সালে ১৩ শতাংশ, তার পরের বছর ২১ শতাংশ, আর ১৯২৯ সালে ২৬ শতাংশ। কিন্তু, কৃষিক্ষেত্রে অবস্থাটা ছিল একেবারে অন্য রকমের। ১৯২৭—১৯২৮ সালে কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল মাত্র ৩ শতাংশ, আর ১৯২৯ সালে সেটা ৩ শতাংশ কমেই গিয়েছিল। শিল্পে বৃদ্ধি এবং কৃষি উন্নয়নের হারের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ক্রমাগত আরও বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠছিল।

নতুন নতুন নির্মাণক্ষেত্র খোলা এবং নতুন নতুন কল-কারখানা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আর কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ছিল

সমানে। শহরের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিগগিরই রুটি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের বর্ধিত যোগানের প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল শ্রমজীবীদের আসল মজুরির বৃদ্ধি এবং তাদের বৈষয়িক কল্যাণের মোটের উপর উন্নতি। ১৯২৬—১৯২৭ সালে শহরগুলিতে রুটি খাবার পরিমাণ বেড়েছিল ১৯১৩ সালের তুলনায় ২৭ শতাংশ — যদিও ঐ সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছিল মাত্র ১২ শতাংশ।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং শিল্পের জন্যে কাঁচামালের যোগান দেওয়া কৃষকদের পক্ষে ক্রমাগত আরও কঠিন হয়ে উঠল। আবাদী জমির পরিমাণ এবং পশুসংখ্যা (গরু, শুয়র, ভেড়া আর ছাগল) যুদ্ধপূর্ব মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও, পণ্য উৎপাদন, অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কাছে কিংবা খোলা বাজারে বিক্রি করার মতো জিনিসের উৎপাদনে ভাটা পড়েছিল। সেটা দেখাতে একটা তথ্যই যথেষ্ট: ১৯১৩ সালে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত শস্যের পরিমাণ ছিল ২,০৮,০০,০০০ টন, কিন্তু ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ সালে বিক্রি হয়েছিল তার অর্ধেক মাত্র। শিল্পকেন্দ্রগুলিতে খাদ্যের যোগান অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে উঠছিল, দোকানে লাইন লাগানো আবারও হয়ে উঠেছিল একটা নিয়মিত ব্যাপার। ফটকাবাজ, কুলাক আর ব্যক্তিগত কারবারিরা সে-পরিস্থিতি কাজে লাগাতে একটুও দেরি করে নি। তখনও বেশকিছু পরিমাণ বেকারি ছিল — তার ফলেও পরিস্থিতিটা হয়েছিল গুরুতর। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যশ্রেণীর মধ্যে প্রতিপক্ষীয়রা শিল্পযোজনের গতিমাত্রা কমাবার জন্যে ক্রমাগত বেশি সোচ্চার হয়ে ডাক ছাড়ছিল।

শহরবাসীদের এবং লাল ফৌজের জন্যে রুটি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের যোগান নিশ্চিত করার জন্যে সরকার ১৯২৮ সালে শহরগুলিতে রেশনিং চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। লেনিন যে বলেছিলেন, 'ক্ষুদ্রায়তন খামার অভাব থেকে উদ্ধার করতে পারবে

না,'* সেই কথাটাকে ঐ পরিস্থিতি অকাট্যভাবে যথার্থ প্রতিপন্ন করল। জারতান্ত্রিক নিপীড়ন এবং ভূস্বামী আর বড় বুর্জোয়াদের শোষণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করল অক্টোবর বিপ্লব। তখন কৃষি পরিস্থিতিতে মাঝারি কৃষকের ভূমিকাই ছিল নিষ্পত্তিমূলক গুরুত্বসম্পন্ন। সরকার গরিব কৃষকদের দেওয়া সাহায্য সর্বক্ষণ বাড়িয়ে চলছিল, সমবায়ের বুনিয়াদে তাদের একাট্টা হতে উৎসাহিত করছিল এবং গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়া বা কুলাকদের রাশ ধরে রাখার জন্যে করছিল সবকিছু। তবু, গ্রামাঞ্চলে গুরুতর গরিবি ছিল বিস্তর, তখনও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল। যন্ত্রসজ্জার ব্যাপারে কোন মূলগত পরিবর্তন তখনও ছিল বেশকিছুটা দূরে, বেশির ভাগ জমিতে কাজ চলত হাতে, ফসলবোনা ফসলকাটা হত হাত দিয়ে, পশুপালনের কাজ হত হাতে। স্মরণাতীত কাল থেকে যা হয়ে আসছিল সেইভাবে তখনও সাধারণভাবে ব্যবহৃত কৃষি সরঞ্জাম ছিল কেঠো লাঙল, কাস্তে, নিড়ানি, ইত্যাদি।

কৃষকের জমিখণ্ডগুলোর টুকরো-টুকরো হয়ে যাবার প্রক্রিয়াটা তখনও চলছিল: ১৯২৭ সালে কৃষকের জোতজমার সংখ্যা ছিল মোট আড়াই কোটির বেশি — অর্থাৎ, বিপ্লবের আগে যা ছিল তার চেয়ে কয়েক লক্ষ বেশি। কৃষককুলের শ্রেণীগত স্তরায়নও তখনও চলছিল — যদিও তার গতিবেগটা ছিল আগের চেয়ে অনেক কম। মাঝারি কৃষকদের স্তরটা সমানে বাড়ছিল, তেমনি বাড়ছিল সম্পন্ন, কুলাক খামারগুলির অনুপাত — সেটা ১৯২৬—১৯২৭ সাল নাগাত দাঁড়িয়েছিল ৩·৯ শতাংশ। নাচার হয়ে মজুরিখাটা কৃষকদের সংখ্যাও বাড়ছিল: কৃষক পরিবারগুলির প্রায় এক তৃতীয়াংশের আদৌ কোন পশু কিংবা চাষের সরঞ্জাম ছিল না।

পৃথক পৃথক জোতজমাগুলো ছিল ছোট্ট ছোট্ট, যন্ত্রসজ্জার মান ছিল নিচু, খুবই নিচু ছিল উৎপাদিকা-শক্তির মাত্রা — এইসব

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ৩০তম খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ

প্রধান কারণে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ছিল অত কম এবং কৃষক দেশকে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর পর্যাপ্ত যোগান দিতে পারত না। কোটি কোটি কৃষক পরিবারের থাকা-খাওয়া চলছিল আগেকার যেকোন সময়ের চেয়ে ভাল, কিন্তু রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করার মতো উদ্বৃত্ত ছিল সামান্যই। ঐসব কৃষকই ছিল তখন প্রধান উৎপাদনকারী, সেটা ভূস্বামী আর কুলাকরা নয় — এরা আগে বাজারে ফেলবার জন্যেই শস্য আর শিল্পে-প্রয়োজনীয় ফসল ফলাত। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে — রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারগুলিতে — হত মোট কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের মাত্র ২ শতাংশ এবং বিক্রয়ের জন্যে উৎপন্ন পণ্যের মাত্র ৭ শতাংশ (১৯২৭ সালের তথ্য)।

ক্রমবর্ধমান শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধের দরুন দেশের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল ঢের বেশি উত্তেজনায় ঠাসা। একদিকে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের সাহায্য মালুম ক'রে গরিব আর মাঝারি কৃষকেরা তাদের রাজনীতিক তৎপরতা প্রবলতর করে তুলছিল: গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়াদের শোষণকর অভিসন্ধিগুলোর বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াচ্ছিল আরও বেশি বলিষ্ঠভাবে, দৃঢ়সংকল্প হয়ে। অন্যদিকে, জনগণের উপর আরও কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ চালাবার জন্যে কুলাকেরা সচেষ্ট ছিল — এজন্যে তারা করতে না-পারত এমন কাজ ছিল না। খেত-মজুর খাটিয়ে, জমি খাজনা-বিলি করে, কিংবা গরিব কৃষকদের সাময়িকভাবে শস্যমাড়াই কল কিংবা ঘোড়া-বলদ ব্যবহার করতে দিয়ে গ্রামাঞ্চলের পুঁজিপতিরা কৃষকদের উপর ক্রমাগত বেশি আয়ত্তি কষে ধরছিল।

শোষক শ্রেণীগুলির অবশিষ্টাংশগুলো বিশেষভাবে ক্ষমতাশালী ছিল মধ্য এশিয়ায়, ককেশাসে, কাজাখস্তানে এবং দেশের আরও বেশ কতকগুলো উপান্তবর্তী জাতীয় অঞ্চলে, যেগুলি অল্প কিছুকাল আগেও ছিল রুশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে অনগ্রসর অংশ। 'ভূমি আর জল রাষ্ট্রীয়করণে'র ডিক্রি উজবেক প্রজাতন্ত্রে ১৯২৫

সালের আগে কার্যে পরিণত হয় নি। ভূমি, পশু, জলের উৎস এবং ঘাসের জমির বেশ মোটা একটা অংশ তখনও ছিল ধনী ভূস্বামী বা বাইদের হাতে (সেখানে ধনী ভূস্বামীদের বলা হত বাই)।

১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে সারা মধ্য এশিয়ায় আর কাজাখস্তানে ভূমি আর জল সংস্কার চালু হয়েছিল। বড় বড় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি-তালুকদারি খতম করা হয়েছিল, কুলাকদের আর গীর্জার ভূমির অনেকটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল — এইভাবে শোষণের মওকা গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলা হয়েছিল কঠোরভাবে। কুলাকরা ঐ সময়ে সোভিয়েতবিরোধী ক্রিয়াকলাপ তীব্রতর করে তুলছিল দেশজুড়ে: নানা রকমের সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালাতে, পার্টি আর সোভিয়েত কর্মকর্তা এবং রাজনীতিগতভাবে সক্রিয় কৃষকদের খুন করতে তাদের একটুও আটকাত না। গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের ঘটনা সরকারীভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল ১৯২৬ সালে ৪০০টা, ১৯২৭ সালে ৯০০টা এবং ১৯২৮ সালে ১,১২৩টা। রক্তপাত, খুন কিংবা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছাড়া দিন কাটত না একটাও।

১৯২৮ সালে কুলাকরা শস্য-ধর্মঘট গোছের একটা ব্যাপার সংগঠিত করেছিল, তার দরুন রাষ্ট্রের শস্যক্রয় হয়েছিল প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। কৃষির যা হাল ছিল, তাতে গ্রামগুলি দেশকে প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিতে অপারগ হল। ইউক্রেনে আর উত্তর ককেশাসে ফসলহানির দরুন পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটল। এইসব এলাকা যে-পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করতে পারবে বলে নির্ভর করেছিল তা তো হলই না, তার উপর রাষ্ট্রকে সহায়তা দিতে হল ক্লিষ্ট এলাকাগুলোর মানুষকে।

আর্থনীতিক সংস্থাগুলো এবং শস্যসংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ভুলভ্রান্তির দরুন পরিস্থিতি হয়ে উঠল আরও গুরুতর। কৃষকদের

বহু রকমের শিল্পজাত জিনিসের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বিক্রয় সংস্থার কর্মীদের অব্যবস্থার ফলে সেসব জিনিস অনেক সময়ে পড়ে থাকত গুদামে-গুদামে। কর-সংক্রান্ত প্রনিয়মগুলোকেও যথেষ্ট কড়াকড়িভাবে খাটানো হয় নি; অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকেরা কর ফাঁকি দিতে পেরেছে পদে-পদে। রাষ্ট্রের জন্যে শস্য কিনবার কাজে নিযুক্ত রাষ্ট্রীয় আর সমবায় সংস্থাগুলির মধ্যে পাল্লাপাল্লিও কৃষিজাত দ্রব্যাদির সরবরাহের সুষ্ঠু সংগঠন ব্যাহত করেছিল।

শস্যের দাম চড়িয়ে কিংবা গুদামজাত মাল বিক্রি করতে সরাসরি নারাজ হয়ে গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়ারা ঐ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল। তারা একটা প্রকাশ্য অন্তর্ঘাত লাগিয়ে দিয়েছিল, — শস্য সরবরাহ বন্ধ রেখে তারা সোভিয়েত রাজকে বাধ্য করতে চেয়েছিল বিভিন্ন ছাড়-রেয়াত দিতে, পুঁজিতন্ত্রীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার ফিরিয়ে আনতে এবং সাধারণভাবে কুলাকদের উপর চাপ দেওয়া বন্ধ করতে।

এই সংকটজনক অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জনকমিসার পরিষদ তিরিশ হাজার পার্টি সদস্য এবং বিভিন্ন বিশেষ কর্মিদল পাঠিয়েছিল গ্রামগুলিতে। তাদের সাহায্যে স্থানীয় কৃষকেরা উদ্যোগী অভিযান চালিয়েছিল অন্তর্ঘাতকদের বিরুদ্ধে। তখন যে-নতুন কৃষি কর্মনীতি চলছিল সেটাকে কৃষকদের কাছে বুঝিয়ে বলার জন্যে চালু করা হয়েছিল একটা ব্যাপক অভিযান। বিভিন্ন আর্থ বিভাগ আর বিপণন সংগঠনের কর্মীরা তাদের কাজে আরও বেশি দৃঢ়সংকল্প এবং দক্ষতা দেখিয়েছিল। গ্রামগুলিতে পাঠানো হয়েছিল আরও বেশি শিল্পজাত জিনিস।

যারা শস্য বিক্রি করছিল আগুনদামে, সেইসব কুলাক আর মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও সরকার সিদ্ধান্ত করেছিল — তাদের ধরা হচ্ছিল সাধারণ অপরাধী হিসেবে। যারা তাদের উদ্বৃত্ত শস্য সরকারের বাঁধা দামে বিক্রি করতে নারাজ

হয়েছিল তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাদের জাতদ্রব্য *বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত-করা উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রীর* চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছিল গরিব কৃষকদের।

অবশ্য, এইসবই ছিল জরুরী ব্যবস্থা, — সেগুলির পিছনকার উদ্দেশ্যের কথা পার্টি এবং সরকারী নেতারা গোপন করেন নি। রাষ্ট্রের হাতে তখন সংকটের মোকাবিলা করার মতো মজুত শস্যও ছিল না, তেমনি, ব্যাপক পরিসরে শস্য আমদানি করার মতো বিনিময় কারেন্সিও ছিল না। কৃষককুলের মেহনতী স্তরটির সক্রিয় সমর্থন থাকলে, একমাত্র তবেই শ্রমিক শ্রেণী শহরের বাসিন্দা এবং লাল ফৌজের জন্যে নিয়মিত শস্যের যোগান নিশ্চিত করতে পারার ভরসা করতে পারত।

এই কর্ম-পরিকল্পনা সংগত প্রতিপন্ন হল, গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়াদের হার হল। কেন্দ্রীয় কমিটি আবারও দেখিয়ে দিল, তার কর্মনীতি ছিল নির্ভুল, আর ভ্রান্ত ছিল পার্টির ভিতরকার দক্ষিণপন্থীরা। ঐ দক্ষিণপন্থীরা কুলাকদের উপর চাপ দেওয়ায় আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, কুলাকেরা শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র গ্রহণ করবে স্বেচ্ছায়ই। তবে, বাস্তব অবস্থা থেকেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল: আগেকার ক্ষমতা হারাবার পরেও কুলাকেরা সরকারের বিরোধিতা করে চলেছিল এবং প্রতিরোধের নতুন নতুন ধরন আর কায়দাকরণ বের করছিল।

তবু, ১৯২৮ সালের ঘটনগুলির ভিতর দিয়ে দেখা গিয়েছিল, এই জরুরী অবস্থার কর্মনীতি কেবল স্বল্পমেয়াদী সুবিধাজনক উপায় হিসেবেই কার্যকর। এইসব উপায়ে কৃষি উৎপাদন সাধারণভাবে বাড়ানো অসম্ভব। বলশেভিকরা দেখল, গোটা সমস্যাটার মূলগত সমাধান রয়েছে অন্যত্র — সেটা হল, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রটাকে সংহত করা, ব্যাপক পরিসরে রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামার সংগঠিত করা, যাতে খাদ্য আর কাঁচামালের চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ১৫শ কংগ্রেসে *রচিত নির্দেশনামাটি ছিল এইসব উপাদান নিয়েই।*

ঐ কংগ্রেস থেকে প্রকাশিত সিদ্ধান্তে বলা হল: 'কৃষকদের ছোট ছোট পৃথক পৃথক জোতজমাগুলোকে একত্র ক'রে বড় বড় যৌথখামার হিসেবে পুনর্গঠিত করাকেই বর্তমান কালপর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রধান কর্তব্য বলে তুলতে হবে।'

এই নির্দেশনামা রচিত হবার সময়ে দেশে যৌথখামার ছিল মোটামুটি ১৫,০০০, সেগুলির অন্তর্ভুক্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রায় ২,০০,০০০ — অর্থাৎ, সেগুলির মোট সংখ্যার শতাংশেরও কম। এইসব যৌথখামার প্রধানত ছিল মাঝারি আকারের, এক-একটাতে জোতজমা ছিল ১০-১৫টা। প্রচেষ্টা আর সহায়-সম্বল একজোট করা হলে সচরাচর আয় যা বাড়ে, শুধু তাতেই এইসব যৌথখামারের সুবিধা গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রের সাহায্যে যৌথখামারগুলি কম দামে যন্ত্রপাতি, সার এবং অন্যান্য মালমশলা পেত, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সাধারণ পৃথক জোতজমাগুলোর চেয়ে অনেক ভালভাবে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল। যৌথখামারগুলিকে সমর্থনের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে গণ্য করে রাষ্ট্র সুপরিকল্পিতভাবে সেগুলির গড়ে-বেড়ে ওঠার বিশেষ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। যৌথখামারীদের বেশির ভাগই গোড়ায় ছিল গরিব কৃষক, তাদের আর্টেলে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল সামান্যই, তা সত্ত্বেও তাদের গড়পড়তা ফসল হতে থাকল যারা ব্যক্তিগত ভিত্তিতে খেতখামার করত তাদের চেয়ে বেশি।

তবে, শুরুতে এইসব যৌথখামারকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা শক্ত ছিল, কেননা অভিজ্ঞতা, তহবিল আর উপযুক্ত কর্মীর কমতির দরুন তাদের অগ্রগতি খুবই ব্যাহত হত। আর-একটা প্রতিবন্ধ ছিল বেশির ভাগ কৃষকের নিষ্ক্রিয় অনগ্রসরতা, কুলাকরা তাদের সম্পত্তির মালিকানার মনোবৃত্তিটাকে কাজে লাগাত। শহুরে

শিল্পও তখনও অবধি গ্রামাঞ্চলের মানুষকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে যন্ত্রপাতি আর শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দেবার অবস্থায় ছিল না। (১৯২৬ সালে দেশে ট্র্যাক্টর ছিল মাত্র চোদ্দ হাজারটা।)

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ১৫শ কংগ্রেস যৌথকরণের পরিকল্পনা ঘোষণা করলে, আশাবাদীদেরও মত ছিল যে, যৌথখামার আন্দোলন গোড়ায় ছড়াবে অত্যন্ত ধীরগতিতে। কিন্তু, ঘটনগুলি হয়েছিল খুবই ভিন্ন রকমের: ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাত যৌথখামারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আগের বছরের শেষে যা ছিল তার চেয়ে আড়াই-গুণ বেশি। ব্যাপক পরিসরে যৌথখামার স্থাপনের পরিকল্পনার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়েছিল অচিরেই।

ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যায় কৃষক-জোট একত্রে ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি কিনতে থাকল। অন্যান্য রূপের সমবায়ও চালু হল। কৃষিজাত দ্রব্য যুক্তভাবে উৎপাদন এবং বিক্রি করার জন্যে গড়া উৎপাদন সমবায়গুলি ১৫শ পার্টি কংগ্রেসের পরে বাড়তে থাকল আগের চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত। আগে যেসব জোতজমার মালিক ছিল গরিব আর মাঝারি কৃষকেরা সেগুলির অর্ধেকের বেশি ১৯২৯ সাল নাগাত সমবায় হিসেবে মিলিত হয়ে গিয়েছিল— এইসব সমবায়ের চার-পঞ্চমাংশ ছিল উৎপাদন সমবায়। যৌথখামার আন্দোলনের তত্ত্বাবধান করার জন্যে স্থাপিত হয়েছিল সারা-ইউনিয়ন যৌথখামারকেন্দ্র — কলখোজৎসেন্ত্‌র্‌।

১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম সারা-ইউনিয়ন যৌথখামারীদের কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিল চার-শ’ চার জন প্রতিনিধি, — এর আগে গুবের্নিয়ার, আঞ্চলিক আর জেলা স্তরে অনুষ্ঠিত অনুরূপ কংগ্রেসগুলির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ প্রতিনিধিরা আলোচনা করেছিল।

এই কংগ্রেসে সরকারের তরফে বক্তৃতা করেছিলেন মিখাইল

কালিনিন। সমগ্রভাবে দেশের জীবনে যৌথখামারগুলির ভূমিকা সূত্রবদ্ধ করে তিনি বলেছিলেন, যৌথখামারীরা 'সমাজতন্ত্রের নির্মাতারা, যে-জগতে তারা বাস করে সেটাকে নতুন করে গড়ে তোলার কর্তব্য তারা ধরেছে সচেতনভাবে, সেটা তারা করবে এলোমেলোভাবে নয় — সুষ্ঠু কাণ্ডজ্ঞানের নীতি অনুসারে, যাতে যেটাকে তারা সবচেয়ে ভাল মনে করে সেই পথে অর্থনীতিকে সচেতনভাবে চালানো যায়, যাতে অর্থনীতির প্রবাহটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়'। তিনি জোর দিয়ে আরও বলেছিলেন: '...লোককে যৌথখামারে যোগ দেওয়াবার জন্যে আমরা কোন জবরদস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করছি নে, কিন্তু, স্বভাবতই, যৌথখামারগুলিকে সরকার সহায়তা দেয় এবং তাদের সহায়তা দেয় যেসব কৃষক ব্যক্তিগত জোতজমা নিয়ে কাজ করছে তাদের চেয়ে বেশি...' তখন যৌথখামারগুলির প্রধান অংশটা নির্ভর করত লাঙল-টানা পশু আর কায়িক শ্রমের উপর — তাই, যন্ত্রপাতি কিনতে সাহায্য করার জন্যে রাষ্ট্র তাদের সুবিধাজনক ক্রেডিটের ব্যবস্থা দিত এবং যেসব কৃষক যৌথখামারে যোগ দেয় নি তাদের কাছে ট্র্যাক্টর বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছিল। তবে, যৌথখামারগুলির সংখ্যা বাড়ছিল ট্র্যাক্টরের সরবরাহের চেয়ে বেশি দ্রুত। তার ফলে উদ্ভূত অসামঞ্জস্য অতিক্রম করার জন্যে রাষ্ট্র-পরিচালিত মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন ব্যবস্থা মারফত যৌথখামারগুলিকে যন্ত্রপাতি দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এইভাবে রাষ্ট্র যৌথখামারগুলির ব্যাপক পরিসরে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব করে তুলেছিল — তার জন্যে যৌথখামারগুলি দিত নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য। এইসব নতুন ধারা এবং ঘটনের মূল্যায়ন ক'রে গস্‌প্লান (রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন) স্থির করেছিল যে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার বছরগুলিতে কৃষকদের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ জোতজমার যৌথকরণ সম্ভব হবে।

শিল্প এবং অন্তর্বাণিজ্য থেকে ব্যক্তিগত পংজি উৎখাত করার ব্যবস্থাবলি

সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজনে উত্তরণ এবং কৃষির যৌথকরণের অভিযান হল ন. আ. ক-বাব্ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ, শোষক শ্রেণীগুলির অবশিষ্ট যারা ১৯২১ সালে ন. আ. ক চালু হবার পরে আবার নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পরিচালিত সংগ্রামের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক পর্ব। দেশে বিভিন্ন শ্রেণী-শক্তির মধ্যে অনুপাত এবং সাধারণ আর্থনীতিক আর রাজনীতিক অবস্থা ততদিনে এ কাজ নিষ্পন্ন করাটাকে সহজতর করে তুলেছিল।

তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে শহুরে আর গ্রাম্য বুর্জোয়ারা ছিল জনসংখ্যার মাত্র ৪·৬ শতাংশ — সেটা ১৯১৩ সালে ছিল ১৬·৩ শতাংশ। এটা বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল মস্কো-সংক্রান্ত অঙ্কে। ১৯২৬ সালে এই নগরীতে মজুর খাটানো নিয়োগকর্তা ছিল প্রায় চার হাজার (কারখানা মালিকেরা বাদে)। এটা হল বিপ্লবের আগেকার সংখ্যার মাত্র পঞ্চমাংশ। ইতোমধ্যে, ঐ একই সময়ে কারখানা মালিকদের সংখ্যা ১৯১৩ সালের অঙ্কের এক-দ্বাদশাংশে নেমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৪৫। এই অবস্থা ছিল মস্কোয় — যেখানে ব্যক্তিগত পুঁজির পুনঃপ্রাদুর্ভাব হয়েছিল বিশেষ লক্ষণীয়। অন্যান্য শহরে ন.আ.ক-বাবুদের অবস্থা ছিল আরও দুর্বল।

অর্থনীতির যেসব শাখার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ক্রেতা-সাধারণের সঙ্গে, যেসব শাখায় মুনাফা তোলা যেত দ্রুত, সাধারণত সেগুলিতেই ব্যক্তিগত পুঁজি দাঁড়াতে পেরেছিল। ব্যক্তিগত কারবারগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল ক্ষুদ্র, মাঝারি

রকমের ছিল অল্প কয়েকটা মাত্র। রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটায় শ্রমিক ছিল গড়ে ২৫৭ জন, আর ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায় অংকটা ছিল মাত্র ২২। ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন হত মাত্র ৪ শতাংশ, সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক ছিল ২·৫ শতাংশ।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অবস্থাটা ছিল খুবই পৃথক। এক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের; ১৯২৫—১৯২৬ আর্থনীতিক বর্ষে এই সমগ্র শাখায় উৎপাদনের প্রায় ৮২ শতাংশ হত ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন ক্ষেত্রে। খুচরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত পুঁজি ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে (মোট পরিমাণের ৪৩ শতাংশ), বিশেষত খামারে জাতদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে। এই ব্যক্তিগত মালিকানার খুচরা বাণিজ্য চলত খুব ছোট ছোট এবং ইতস্তত ছড়ানো দোকান মারফত — সেই ব্যবস্থাটা ছিল অত্যন্ত বিশাল। ১৯২৫—১৯২৬ সালে ব্যক্তিগত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে বেশি — পাঁচ লক্ষর বেশি। তবে, সেগুলোর অর্ধেকের বেশি ছিল ছোট দোকান আর স্টল, তার বেশির ভাগ ছিল শহরে।

সোভিয়েত অর্থনীতিতে বৈদেশিক-মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা আর ছিল না। ক্ষমতাশালী বৈদেশিক পুঁজিপতিরা প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইছিল না — তারা পারস্পরিক সুবিধাজনক চুক্তিতে সই দিতে নারাজ ছিল। বৈদেশিক কারবারিদের দেওয়া কনসেশনের ভিত্তিতে শিল্পোৎপাদন সবচেয়ে বেশি দাঁড়িয়েছিল ১৯২৭—১৯২৮ সালে: দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের ০·৬ শতাংশ। এই রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল তখনকার ইরকুৎস্ক্ গুবের্নিয়ায় লেনা স্বর্ণক্ষেত্র কনসেশন। এর মালিকদের সোনা,

বিভিন্ন লৌহেতর ধাতু এবং লোহা আকরিক নিষ্কাশনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। জর্জিয়ায় ম্যাঙ্গানিজের আকরে কাজ করার জন্যে মার্কিন একচেটে কারবারিরা এবং মস্কোয় বল-বেয়ারিং উৎপাদনের জন্যে সুইডেনের এস. কে. এফ নামে কারবার কনসেশন পেয়েছিল। এইসব চুক্তি সই করার সময়ে সোভিয়েত সরকার সযত্নে নজর রেখে নিশ্চিত করেছিল যাতে অর্থনীতির প্রধান শাখাগুলোতে বৈদেশিক পুঁজি অনধিকার প্রবেশ করতে না-পারে; সাম্রাজ্যবাদীদের কোন হানিকর শর্ত চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টাও সোভিয়েত সরকার দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৯২৬ সালে সোভিয়েত শিল্পে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল পাঁচ কোটি রুবলের একটু কম। তিন বছর পরে কনসেশন ছিল ৫৯টা — সেগুলোর মধ্যে বারোটা জার্মান, এগারোটা জাপানী, ছ'টা বৃটিশ এবং চারটে মার্কিন। সেগুলিকে চালাত মোট কুড়ি হাজার শ্রমিক এবং কর্মচারী।

এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা তাদের সই-করা চুক্তি ভাঙতে উদ্যত হত প্রতি পদে। তাদের বেশির ভাগই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করত; শ্রম-প্রক্রিয়া যন্ত্রসজ্জিত করতে এবং নতুন সরঞ্জাম চালু করতে তাদের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। লেনা স্বর্ণক্ষেত্র কারবারটা সোনা তোলার কাজ শিগগিরই অব্যবস্থায় ফেলে দিয়েছিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, তার ফলে হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে পড়েছিল, মস্ত লোকসান হয়েছিল রাষ্ট্রের। আমেরিকানদের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে জর্জিয়ায়ও কোন ইতিবাচক ফল হয় নি। এইসব কনসেশন চুক্তি পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল কেবল বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ক্ষেত্রে: যেমন, সুইডেনের কারবারিদের সঙ্গে চুক্তি, — তারা বৈদ্যুতিক মোটর উৎপাদনের কারখানা নির্মাণ করেছিল ইয়ারোস্লাভ্ল্-এ, তাছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়নে বল-বেয়ারিং

উৎপাদন সংগঠিত করতে অনেককিছু করেছিল, এই উৎপাদন চালু হয়েছিল সেই প্রথম। মার্কিন কোটিপতি হ্যামার মস্কোয় পেন্সিল উৎপাদন সংগঠিত করেছিলেন — সেটাও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

তবে, নিজস্ব শিল্প বাড়াবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কনসেশনের রূপে বৈদেশিক পুঁজি টানবার জন্যে যে-চেষ্টা করেছিল তার ফল মোটের উপর সন্তোষজনক হয় নি। তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার শাসক মহলগুলোর সোভিয়েতবিরোধী কর্মনীতি। স্বাক্ষরিত কনসেশনগুলোর খুব বেশির ভাগই প্রয়োজনীয় ফল দেয় নি। কেবল মুনাফার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিদেশী কারবারগুলো সোভিয়েত আইন লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বৈরভাব ছড়িয়ে পড়েছিল দ্রুত। তাদের টেকনিকাল এবং আর্থনীতিক সূচকগুলোর মান ছিল নিচু। সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব কনসেশন ক্রমেই আরও বেশি মাত্রায় সেকেলে হয়ে পড়েছিল। সেগুলোকে গুটিয়ে ফেলার জন্যে ১৯৩০ সালে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

'বৈদেশিক-মালিকানাধীন এবং ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্টির কাজ' সম্বন্ধে ১৯২৬ সালের অগস্ট মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ব্যক্তিগত আর বৈদেশিক-মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক এবং তাদের নিযুক্ত-করা শ্রমিকদের মধ্যে কঠিন এবং পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক দেখা দিয়েছিল বলে ঐ সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হয়েছিল। মালিকেরা ধরেছিল দুমুখো কর্মনীতি: তারা যেসব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সেগুলো তারা পালন করে নি তাই শ্রমিকেরা সক্রিয় প্রতিবাদ এবং ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছিল; কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে তারা শ্রমিকদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ভেদ-

বিভেদ সৃষ্টি করতে, তাদের কাউকে-কাউকে টাকা দিয়ে বশ করতে এবং শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়তে একত্রিত হবার পথে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। তখন এইসব কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক পরিসরে আরও প্রবল প্রচার চালাবার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানিয়েছিল। পার্টি সেল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, — শ্রমিকদের আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং দৈনন্দিন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে বলা হয়েছিল। হাতে যত উপায় ছিল সেই সবই দিয়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম সমর্থন করেছিল। এইসব শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করেছিল সমাজতান্ত্রিক আদালত ও জনসাধারণ। শ্রমজীবী জনগণ জানত, শিল্পে আর অন্তর্বাণিজ্যে যে-ব্যক্তিগত পুঁজি তাদের স্বার্থ লঙ্ঘন করত সেটা ছিল একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র, আর ন. আ. ক-বাবু বুর্জোয়াদের চিরতরে ভাগিয়ে দেবার দিন বেশি দূরে ছিল না।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সর্বাঙ্গীন বিকাশ নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা আরও সংহত আর সম্প্রসারিত করার জন্যে, শিল্প আর অন্তর্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্র থেকে পুঁজিপতিদের উৎখাত করে সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক আর রাজনীতিক জয় হাসিল করার জন্যে পথ নির্ণয় করেছিল ১৪শ পার্টি কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র যতকাল সম্পূর্ণত ব্যক্তিগত পুঁজির জায়গায় আসবার অবস্থায় ছিল না, ততকাল ব্যক্তিগত পুঁজির হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতি মেনে নিতে হয়েছিল; সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত পুঁজি ব্যবহার করা এবং পরে ক্রমে সেটাকে সংযত করে শেষে একেবারে উৎখাত করা সম্ভব এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল।

এই কর্তব্য হাতে নেবার সময়ে সরকার ব্যবহার করেছিল প্রথমে এবং সর্বোপরি আর্থনীতিক উপায়। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে

গুরুত্বসম্পন্ন একটা উপায় ছিল — সমাজতান্ত্রিক শিল্প আর বাণিজ্যের যেসব শাখা আগে ছিল প্রধানত কিংবা সম্পূর্ণত ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষেত্র সেগুলিকে সম্প্রসারিত করা। ব্যক্তিগত কারবারিদের রাশ ধরে রাখার জন্যে সরকার বিভিন্ন প্রণালী ব্যবহার করেছিল: পণ্য আর কাঁচামালের মজুত কমিয়ে দেওয়া কিংবা একেবারে বন্ধ করা; ক্রেডিট দিতে নারাজ হওয়া; ব্যক্তিগত শিল্পপতি কিংবা ব্যাপারীদের উপর মালবহনের মাশুল ধার্য করা এবং কর বসানো।

এই অবস্থায়, ব্যক্তিগত ব্যাপারীদের পয়সা কামিয়ে চলতে হলে, বাজারে যেসব পণ্যের সরবরাহ খুব কম ছিল সেগুলির বাবত আগুনদাম হাঁকতে হত। যেসব জিনিসের সরবরাহ ছিল যথেষ্ট সেগুলির বেলায় রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত কারবারের দামের মধ্যে পার্থক্য ছিল সামান্য — যেমন দেশলাইয়ের দাম ব্যক্তিগত কারবারের বাজারে ছিল ২ থেকে ৩ শতাংশ বেশি; কিন্তু যেসব জিনিসের সরবরাহে কমতি ছিল সেগুলির বেলায় পার্থক্যটা হত বিরাট। ১৯২৬ সালে ব্যক্তিগত কারবারের বাজারে সুতী কাপড়ের দাম ছিল ৩০ শতাংশ বেশি। আরও দামী ছিল নুন। কিন্তু, যখনই রাষ্ট্রীয় আর সমবায় দোকানগুলিতে দুষ্প্রাপ্য জিনিস সরবরাহ করা এবং সরকারী দাম কমানো সম্ভব হল, অমনি ব্যক্তিগত কারবারের বাজারেও দাম কমে গিয়েছিল।

ব্যক্তিগত ব্যাপারী আর কারবারিদের সম্বন্ধে শ্রমজীবীদের মনোভাব কী রকমের ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত কারবারের উপর আরও কড়াকড়ি বাধা-নিষেধ এবং ব্যক্তিগত মুনাফার উপর আরও বেশি কর ধার্য করার জন্যে তারা প্রায়ই দাবি জানাত।

শিল্পের প্রসারের ফলে ১৯২৭ সালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পণ্যগুলির দাম কমানো গিয়েছিল — তার ফলে ফটকাবাজির

সুযোগ কমে গিয়েছিল অনেকটা। দেশের সর্বত্র ব্যক্তিগত মালিকানার দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যেতে থাকল। ১৯২৭ সালে সেগুলির সংখ্যা কমে গিয়েছিল প্রায় ২৫ শতাংশ, সেগুলিতে বেচা-কেনার পরিমাণও কমে গিয়েছিল আরও বেশি।

কিন্তু, কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর বেলায় তখনও বাজারে প্রাধান্য ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপারীদের। ১৯২৭ সালে ইউক্রেনে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কেনা খাদ্যসামগ্রীর জন্যে চলে যেত শ্রমিকের মজুরির প্রায় অর্ধেকটা।

১৯২৮—১৯২৯ সালে শিল্পে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। ১৯২১ সালে পাশ করা যে-আইনে কোন ব্যক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইজারা নিতে পারত, সেটাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত কারবারিদের সঙ্গে করা ইজারা চুক্তিগুলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলিতে তখন উৎপন্ন হচ্ছিল আরও সস্তা আর সরেস জিনিস — তার সঙ্গে পাল্লা দিতে অপারগ হচ্ছিল বহু ব্যক্তিগত কারবারি আর ব্যাপারী। ময়দা-কল, পাকা চামড়া এবং নিরেস তামাক শিল্প থেকে তারা ক্রমে উৎখাত হয়ে যাচ্ছিল, — এখানে শিল্পের মাত্র তিনটে শাখার কথা উল্লেখ করা হল। ১৯২৬ সালে ছোট ছোট ব্যক্তিগত কারবার এবং পৃথক পৃথক কুটিরশিল্পী দেশে বিক্রি-করা সমস্ত জুতোর ৭৫ শতাংশ উৎপন্ন করেছিল — এদের বেশির ভাগই নির্ভরশীল ছিল পুঁজিতান্ত্রিক কারবারী এবং ব্যক্তিগত মালিকানার দোকান-মালিকদের উপর। যখন বছরে মোট ৪ কোটি ৫০ লক্ষ জোড়া জুতোর দরকার ছিল, তার এক কোটির কম জোড়া দিয়েছিল রাষ্ট্র। দু'বছর পরে অবস্থাটা উলটে গিয়েছিল — তখন রাষ্ট্র উৎপন্ন করছিল প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ জোড়া।

নিজেদের অধীনে নিযুক্ত লোকেদের উপর শোষণ তীব্রতর ক'রে, নিজেদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে আর্টেল স্থাপন করা সমেত

নানা বেআইনী উপায় অবলম্বন ক'রে পুঁজিপতিরা নিজেদের অবস্থান সংহত করতে চেষ্টা করেছিল। এর ফলে পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি এবং আরও বেশি ধর্মঘট হয়েছিল। শ্রমজীবী জনগণের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আদালতগুলিও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকেরা যেসব কারখানায় কাজ করত সেগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবার দাবি করেছিল।

ঐ সময়ে কৃষক পরিবারগুলি রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় বাণিজ্য ব্যবস্থা মারফত কিনেছিল তাদের সুতী কাপড়ের ৯৭ শতাংশ, কৃষি সরঞ্জামের ৮৩ শতাংশ, বাড়ির ছাদের জন্যে প্রয়োজনীয় লোহার ৮৮ শতাংশ, পেরেকের ৯৬ শতাংশ। জটিল কৃষি যন্ত্রপাতি আর সার সরবরাহ হত কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মারফত। ব্যক্তিগত ব্যাপারী দালালের আর আবশ্যকতা ছিল না। তার উপর, ব্যক্তিগত ব্যাপারীদের মুনাফার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা, দেশের সাময়িক আর্থনীতিক অসুবিধাটাকে তাদের কাজে লাগাবার চেষ্টা এবং যেসব কাঁচামালের সরবরাহে ঘাটতি ছিল সর্বাগ্রে আর সর্বোপরি সেগুলি সংগ্রহ করার জন্যে তাদের চেষ্টার অর্থ ছিল এই যে, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের বিকাশের পথে একটা গতিরোধক ছিল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রটা। ১৯২৮—১৯২৯ সালে কৃষিজাত কাঁচামালের ঘাটতির দরুন রাষ্ট্র কতকগুলি জিনিসের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে অপারগ হয়েছিল — সেগুলি ছিল জুতো আর চামড়া, শ্বেতসার আর গুড়, তামাক আর উদ্ভিজ্জ তেল এবং মাখন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বিরাট পরিমাণে ঐসব জিনিস সরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক যন্ত্রপাতির ঘাটতি থাকায় তবু তাদের উৎপাদন হয়েছিল কম এবং নিরেস।

যেগুলো ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেগুলো সমেত ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন বাণিজ্য আর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর

মালিকেরা কীভাবে তাদের মুনাফা ব্যবহার করে সেটা বের করার জন্যে আর্থ সংস্থাগুলির তদন্ত চালিয়ে দেখা গিয়েছিল, আয়ের বেশির ভাগটাই তারা খাটাত বেআইনী ফটকাবাজিতে।

শিল্প মোটের উপর আবার দাঁড়িয়ে গেল, ব্যাপক পরিসরে যৌথকরণের প্রথম প্রথম সুফলগুলি ফলতে থাকল, পুঁজিপতিরা বেআইনী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে থাকল — এইসব লক্ষ্য করে সোভিয়েত সরকার ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে আর্থনীতিক এবং প্রশাসনিক চাপ তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর ফলে ১৯২৯ সাল নাগাত মোট শিল্পোৎপাদনে ব্যক্তিগত পুঁজির হিস্‌সা কমে দাঁড়িয়েছিল ০·৩ শতাংশ, তখন ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১৭৭টা — সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক ছিল ১,৭০০ জন। সোভিয়েত রাষ্ট্র তখন পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ সমাধা করছিল — এই প্রক্রিয়াটার বনিয়াদ স্থাপন করা হয়েছিল বিপ্লবের ঠিক পরেই।

১৯৩০ সালে জুন-জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির ১৬শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনীতিক বিবরণে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হল যে, শিল্পে পুঁজিপতিদের উপর সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব কায়েম হবে, না, পুঁজিপতিরা সমাজতন্ত্রকে বাতিল করে দেবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা চিরতরেই হয়ে গেছে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে।

ততদিনে বাণিজ্যক্ষেত্র থেকেও ব্যক্তিগত পুঁজি কম-বেশি পুরোপুরি উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। তখন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা বস্তুত দেশের সমস্ত পণ্য কেনা-বেচা চালাচ্ছিল। ১৯৩১ সালে খুচরা বাণিজ্যের শতকরা ১০০ ভাগই এসে গিয়েছিল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণে।

ব্যক্তিগত পুঁজি তখন আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে পড়ে গিয়ে টিকে থাকার জন্যে সংগ্রামে যেকোন কুশলী গতিবিধির শরণ নিতে প্রস্তুত ছিল। ন. আ. ক-বাবুরা রাষ্ট্রযন্ত্রে অনুপ্রবেশ করতে,

রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মীদের ঘুষ দিয়ে বশ করতে চেষ্টা করেছিল এবং কখনও কখনও বড়রকমের আর্থনীতিক অপরাধ এবং প্রতিবৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সরাসরি লিপ্ত হয়েছিল। এর ফলে শহরগুলিতে পুঁজিপতিদের একটা শ্রেণীগত গ্রুপ হিসেবে অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবার প্রক্রিয়াটা শুধু ত্বরায়িতই হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ন. আ. ক-বাবু বুর্জোয়ারা পরাস্ত হল, তাদের আর্থনীতিক চলিতকর্ম একেবারেই অচল, সেকেলে প্রতিপন্ন হল।

শহরগুলিতে ব্যক্তিগত পুঁজিকে উৎখাত করা হয়েছিল প্রধানত জবরদস্তির প্রণালী আর দমনের ব্যবস্থা দিয়ে, এমনটা বলে দিতেই বুর্জোয়া ইতিহাস-রচয়িতারা অভ্যস্ত। কিন্তু, অঙ্ক আর তথ্য থেকে খুবই পৃথক চিত্রই ফুটে ওঠে। প্রাক্তন মালিকদের শতকরা মাত্র ৪·৫ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কিংবা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন অপরাধ, ফটকাবাজি, উৎকোচ প্রদান কিংবা জুয়াচুরি করেছিল। ন. আ. ক-বাবুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভবিষ্যতে কোন্ ক্ষেত্রে কাজ করতে চায়, সেটা তাদের অবাধে বেছে নিতে দেওয়া হয়েছিল; শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে সমভিত্তিতে সমগ্র জনগণের সৃজনশীল শ্রম- প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের সুযোগ তাদের দেওয়া হয়েছিল।

ন. আ. ক-বাবুদের কখনও কোন রকমের গুরুত্বসম্পন্ন আর্থনীতিক কিবা রাজনীতিক শক্তি ছিল না। তার অর্থ হল এই যে, নিম্নতম মাত্রায় চাপ দিয়েই সোভিয়েত সরকার তাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম চালাতে পেরেছিল। এই কারণে, গ্রাম্য বুর্জোয়া বা কুলাকদের বেলায় যা করা হয়েছিল সেইভাবে বলপ্রয়োগ করে একটা গোটা শ্রেণীকে দখলচ্যুত করার বদলে, তুলনার অযোগ্য মাত্রায় দুর্বল শহুরে বুর্জোয়াদের সম্বন্ধে বলশেভিকরা একেবারে ভিন্ন কর্মকৌশল প্রয়োগ করেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা
১৯২৮—১৯৩২

পরিকল্পনা রচনা এবং গ্রহণ

১৯২৯ সালে ২০এ মে মস্কোয় বসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চম সোভিয়েত কংগ্রেস। বৈঠকগুলি চলেছিল বলশই থিয়েটারে, যেখানে মনে হয়েছিল প্রতিনিধিরা মাত্র আগের দিনই আলোচনা করছিল গোয়েল্‌রো পরিকল্পনা নিয়ে। ১০-১৫ বছরের একটা কালপর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার একটা কর্মসূচি আলোচনাধীন হয়েছিল ১৯২০ সালের শেষের দিকে। সেঁতসেঁতে ঠাণ্ডা হল্‌-ঘর, উঁচু উঁচু ভেড়ার চামড়ার টুপি আর সৈনিকদের ওভারকোটগুলো এবং বক্তাদের মুখে উচ্চারিত কথাগুলির মধ্যে একটা লক্ষণীয় বৈসাদৃশ্য ছিল। তারপর থেকে কেটে গিয়েছিল নয় বছরের শান্তিকালীন কাজ, আর সবকিছু এত বদলে গিয়েছিল, যেন চেনাই যায় না: হল্‌-ঘর ছিল বিজলী বাতিতে ঝলমলে, স্টল আর অলিন্দগুলি ঠাসা ছিল কল-কারখানা, নির্মাণক্ষেত্র এবং খামারের নর-নারীদের দিয়ে। ইতোমধ্যে কেটে-যাওয়া বছরগুলিতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তখন আর্থনীতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পরিকল্পনার বিষয়টা তোলা সম্ভব করেছিল। ইতোমধ্যে বৃহদায়তনে পুনর্নির্মাণকাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল, পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছিল অনেক, প্রাপ্তব্য সহায়-সম্বল আর তহবিলের যতদূর সম্ভব যুক্তিসম্মত

সদ্ব্যবহারের জন্যে একটা অভিযান চলছিল — এটা ছিল কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনব্যবস্থা সংহত করার সময়। দরকার ছিল ভবিষ্যৎ কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রণীত একটা কর্মসূচি, যাতে বিবৃত হবে বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট অঙ্ক আর অনুসূচি, এবং এইভাবে পৃথক পৃথক শিল্প প্রতিষ্ঠান আর অঞ্চলের জন্যে, তেমনি, সমগ্রভাবে শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যের জন্যেও উন্নয়ন-পরিপ্রেক্ষিত নির্দিষ্ট করা হবে।
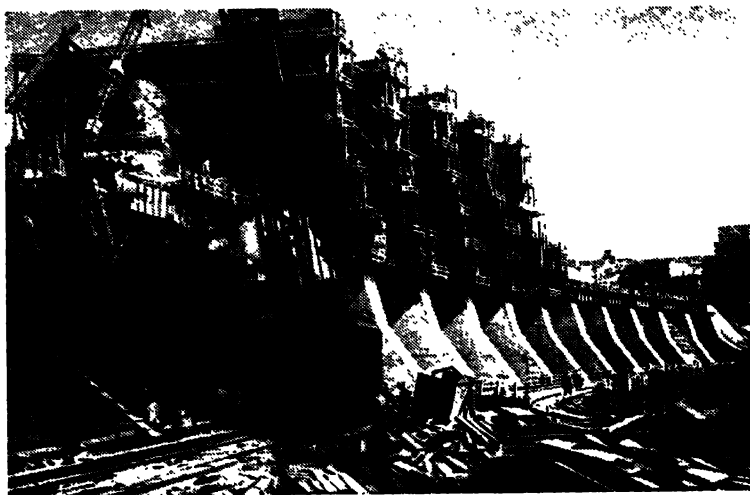
নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সময়ে

এই রকমের পরিকল্পনা রচনা করাটা ছিল খুবই জটিল কাজ; এমন পরীক্ষা চালাতে যাওয়া হচ্ছিল মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম বার। ১৯২৬ সালে রচিত পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম প্রথম খসড়াগুলিকে বাতিল করে দিতে হয়েছিল, কেননা তার সবগুলিতেই কম-বেশি মাত্রায় গুরুতর বিভিন্ন ত্রুটি ছিল। কিন্তু, নানা সমস্যা যে দেখা দিয়েছিল, সেটা নজির এবং ট্রেনিং-পাওয়া

বিশেষজ্ঞের অভাবের দরুনই শুধু নয়। পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রধান কর্তব্যগুলির প্রকৃতি আর লক্ষ্য কী হবে, সে-সম্বন্ধে গস্‌প্লানের কর্মিবৃন্দের মধ্যে এবং জাতীয় অর্থনীতির উচ্চ পরিষদ আর কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিতেও দীর্ঘকাল যাবত মতৈক্যে পেঁছনো যায় নি। ত্রৎস্কির সমর্থকেরা দাবি করছিল গোড়ার বছরগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ আর শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার এবং কালপর্যায়ের শেষের দিকে সেগুলির ক্রম-পরিমিতকরণ। এই উদ্দেশ্যে তারা আবারও প্রস্তাব করেছিল যে, সমগ্র জনসাধারণের এবং বিশেষত কৃষকদের দেয় কর বাড়িয়ে এমন কর্মনীতি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

এর একেবারে উলটো দিকে দাঁড়িয়ে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকারীদের মুখপাত্রেরা প্রস্তাব করেছিল যে, শিল্পগত বৃদ্ধির উঁচু হারের জন্যে অভিলাষী হওয়া আদৌ চলবে না — জোরটা উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের উপর না-দিয়ে তা দিতে হবে হালকা শিল্প আর ভোগ্য পণ্যের উপর। এই কর্মনীতির অনুগামীরা কুলাকদের উৎপাদনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া আর্থনীতিক অগ্রগতির কথা ভাবতেই পারত না।

উপরে যা বলা হল তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই বিশেষ বিষয়টা নিয়ে মতবিরোধটা মামুলি আলোচনা ছিল না, — যেকোন বড়রকমের নতুন পথ ধরতে গেলে এটা অপরিহার্য। মতবিরোধগুলোর একটা রাজনীতিক প্রকৃতি ছিল — সেটা এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ার বিষয়ে পৃথক পৃথক ভিন্নমুখী রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ত্রৎস্কিপন্থী আর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকারীরা উভয়েই যে-মতাবস্থানে দাঁড়িয়েছিল সেটা মূলত বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদেরই অনুরূপ — তারা নিজেদের

জ্ঞান আর প্রত্যয় অনুসারে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন নমুনা ছাড়া কিছু গ্রহণ করতে অপারগ ছিল, অন্য কোন উপায়ে সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনায় তাদের কোন আস্থা ছিল না।

'সর্বাত্মক শিল্পযোজনের' পরিকল্পটায় পার্টি সরাসরি ধিক্কার দিল — ঐ পরিকল্প ছিল কৃষককুলের উপর শোষণ চালাবার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর তিন জন সদস্য — 'প্রাভদা'র প্রধান সম্পাদক নিকোলাই বুখারিন, জনকমিসার পরিষদের সভাপতি আলেক্সেই রিকভ এবং সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি মিখাইল তম্‌স্কির পরিচালিত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকারীরাও কোন সমর্থন পেলেন না।

এইসব প্রতিপক্ষের পরাজয় হল বড়রকমের তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটনা। ১৯২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ১৫শ পার্টি কংগ্রেস দেখিয়ে দিল, প্রতিপক্ষের ভাব-ধারণা ছিল লেনিনবাদ থেকে ভিন্নমুখী। ত্রৎস্কিপন্থী প্রতিপক্ষের অনুগামী হওয়া এবং তার মত প্রচার করাকে পার্টির সদস্যপদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অসাধ্য বলে ঘোষণা করা হল।* প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা করার জন্যে নির্দেশনামা গৃহীত হয়েছিল এই কংগ্রেসে — তাতে এমন আর্থনীতিক সম্প্রসারণের কর্মসূচি রূপায়ণের ব্যবস্থা ছিল,

---

* ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়ে ত্রৎস্কিপন্থীরা মস্কোয় এবং লেনিনগ্রাদে তাদের নিজস্ব মিছিল-সমাবেশ করবার চেষ্টা করেছিল। এতে পার্টির নিয়মাবলি লঙ্ঘিত হয়েছিল শুধু তাই নয় — এটা আরও ছিল সোভিয়েতবিরোধী ক্রিয়াকলাপ। ১৯২৭ সালে নভেম্বর মাসেই পরের দিকে ত্রৎস্কি এবং জিনোভিয়েভ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। পার্টিতে একটা আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে, পার্টির সমস্ত সদস্যের শতকরা ৯৯ জনেরও বেশি কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন অনুমোদন এবং সমর্থন করেছিল।

যাতে শিল্প, কৃষি আর অন্তর্বাণিজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের হিস্‌সা বছর-বছর সমানে বেড়ে যাবে এবং উন্নয়নের হার হবে পংজিতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে ঢের বেশি। অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল ভারি শিল্পকে।

১৯২৮—১৯২৯ সালে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকারীদের মতামতের কঠোরতম সমালোচনা হয়েছিল। পার্টির দলিলপত্রে বলা হয়েছিল, শিল্পযোজনের গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া এবং গ্রাম্য বুর্জোয়াদের অধিকার পুরোপুরি বজায় রাখার জন্যে তাদের বক্তব্য গৃহীত হলে কার্যক্ষেত্রে তার ফল দাঁড়াত 'পংজিপতিদের সঙ্গে শ্রেণীগত সহযোগের কর্মনীতি, কুলাকদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রামের কর্মনীতির জায়গায় ''কুলাকদের সমাজতন্ত্রে প্রবৃত্ত হবার'' কর্মনীতির স্থাপনা'।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ১৬শ পার্টি সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকারীরা সম্পূর্ণত পরাস্ত-পর্যুদস্ত হয়েছিল। পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া রচনা ততদিনে বস্তুত শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই পরিকল্পনা রচনায় একটা গুরুত্বসম্পন্ন অবদান ছিল বিভিন্ন পরিকল্পন সংস্থা এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও শ্রমজীবীদের নিজেদেরও। এক্ষেত্রে তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল যে, চাঞ্চল্যকর নির্মাণ প্রকল্পগুলির মহান লক্ষ্য জনগণকে যথার্থই অনুপ্রাণিত করেছিল।

কয়েক জন বিজ্ঞানীর উদ্যম ছিল বিশেষ আগ্রহজনক। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে বড় একদল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্প আর কৃষি ক্ষেত্রে রসায়নের ভূমিকার উপর আরও বেশি মনোযোগ দেবার প্রস্তাব ক'রে জনকমিসার পরিষদের কাছে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। আলেক্সেই বাখ্‌, নিকোলাই জেলিন্‌স্কি, নিকোলাই কুর্ণাকভ, আলেক্সেই ফাভোর্‌স্কি,

আলেক্সান্দর ফের্সমান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী তখন রাশিয়ায় এবং বিদেশেও পরিচালিত কাজের পরিলক্ষিত ধারা বিশ্লেষণ ক'রে তখনই বলতে পেরেছিলেন যে, সূচনা হচ্ছিল এক নতুন যুগের, তার সঙ্গে সঙ্গে আসবে তেজষ্ক্রিয়তা এবং পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের নিঃসীম সম্ভাবনা। এর ফলে এইসব বিজ্ঞানী এবং মন্ত্রীদের মধ্যে একটা বৈঠক হয়েছিল, তাতে প্রস্তাবগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছিল এবং এই আলোচনার ফলাফল পরে প্রতিফলিত হয়েছিল পাঁচসালা পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের মধ্যে। এরই সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতিক্ষেত্রে রসায়নের প্রয়োগ এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে জনকমিসার পরিষদ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য ইয়ান রুদ্জুতাকের অধীনে একটা কমিটিও বসিয়েছিল। পরিকল্পনায় আরও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, এবং দু'-তিন বছরের মধ্যেই সবার মুখে মুখে শোনা যাচ্ছিল বোব্রিকি (এখন নভোমস্কোভ্স্ক), বেরেজ্নিকি, খিবিনি, আক্তিউবিন্স্ক, মগিলেভ, ইয়ারোস্লাভ্ল, ইত্যাদি জায়গায় নির্মীয়মাণ বিশাল বিশাল রাসায়নিক কারখানার কথা।

পাঁচসালা পরিকল্পনার দুটো ভাষ্য নিয়ে ১৬শ পার্টি সম্মেলনে পর্যালোচনা করা হয়েছিল — একটা ছিল লঘিষ্ঠ ভাষ্য, অন্যটা গরিষ্ঠ; গরিষ্ঠ ভাষ্যে উপস্থাপিত প্রকল্পগুলির পরিসর ছিল অপর ভাষ্যে উপস্থাপিত প্রকল্পগুলির চেয়ে ২০ শতাংশ বড়। ঐ দ্বিতীয়, অধিকতর উচ্চাভিলাষী ভাষ্যটিকেই সম্মেলনের প্রতিনিধিরা গ্রহণ করেছিল। এইভাবে, আর্থনীতিক বৃদ্ধির হার একটুও কমিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রস্তাবকেই পার্টি চূড়ান্তভাবে বর্জন করেছিল। তখন ঐ পরিকল্পনাটি আইনে পরিণত হবার জন্যে সেটাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী সোভিয়েত কংগ্রেসে গ্রহণ করার দরকার ছিল।

১৯২৯ সালে ২০এ মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল মস্কোয় বলশই থিয়েটারে: প্রধান বিবরণ পেশ করেছিলেন গস্‌প্লানের সভাপতি গ্লেব্‌ ক্র্‌জিজানভ্‌স্কি। মঞ্চের পিছনটা জুড়ে টাঙানো প্রকাণ্ড মানচিত্রে দেখানো হয়েছিল পাঁচ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখতে কেমনটা হবে। মানচিত্রখানার সর্বত্র ডজন-ডজন তারা, বিন্দু, চৌকো ঘর আর রেখাগুলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রখানা নিজেই নিজের কাহিনী জানিয়ে দিল। নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র, কয়লাখনি, তৈল কূপ, ট্র্যাক্টর আর মোটরযানের কারখানা, যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামার, রেলপথ আর নতুন নতুন শহরের চিত্র সৃষ্টি করল সেই মানচিত্র। বিবরণ পেশ করা শেষ হলে মানচিত্রে সবগুলি আলো জ্বলে উঠল, তখন যেন একটা জাদুদণ্ড একটা পর্দাকে সরিয়ে দিল, আর অমনি উদ্‌ঘাটিত হল তার পিছনে লুকনো ছিল দেশের ভবিষ্যৎ চেহারাটা —১৯৩৩ সালের সোভিয়েত ইউনিয়ন: শিল্পে এবং কৃষিতে পরাক্রমশালী দেশ। এই চিত্রটিকে প্রচণ্ড করতালিধ্বনি তুলে স্বাগত জানিয়ে প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল সমবেতকণ্ঠে গাইল 'আন্তর্জাতিক' সংগীত।

আলোচনা চলেছিল কয়েক দিন ধরে। শেষে ১৯২৯ সালের ২৮এ মে তারিখে দেশের সর্বোচ্চ বিধানিক সংস্থায় গৃহীত হল সেই পরিকল্পনা। তখন ঐ পরিকল্পনাটিকে যথার্থই মহাসমারোহময় মনে হয়েছিল। তিনখানা স্থানবহুল গ্রন্থখণ্ড ভরতি করে বিবৃত হয়েছিল পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলি, দেশের অর্থনীতি আর অঞ্চলগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সামনেকার মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি। পরিকল্পনাটির সমস্ত বিভাগেই একটা কেন্দ্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন স্থান জুড়ে ছিল নির্মাণের কর্মসূচি। দেশের অর্থনীতিতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৬,৫০০ কোটি রুবল — অর্থাৎ, তার আগেকার পাঁচ বছরে যা বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার চেয়ে

আড়াই-গুণ বেশি। অর্থাৎ কিনা, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া এবং পুরনগুলোকে পুনর্নির্মাণ করার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল দৈনিক সাড়ে-তিন কোটি রুবল। শিল্পক্ষেত্রে বরাদ্দ-করা অর্থের তিন-চতুর্থাংশের বেশি পৃথক করে রাখা হয়েছিল ভারি শিল্পের জন্যে। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ১,৫০০টার বেশি প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। ব্যবস্থা ছিল শিল্প এসে যাবে দেশের অর্থনীতির সর্বাগ্রবর্তী স্থানে — শিল্প হবে অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। আশা করা গিয়েছিল এই নতুন শিল্প-ক্ষমতার সমর্থন পেয়ে কৃষির সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রটাকে যা বাড়ানো যাবে তাতে ১৯৩৩ সাল নাগাত মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশ হবে কৃষিতে, যেখানে ১৯২৭—১৯২৮ সালে এই অংকটা ছিল ২ শতাংশ। কৃষকদের মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ জোতজমাকে বিভিন্ন যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারে একজোট করার পরিকল্পনাও রচনা করা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরও এগিয়ে নেবার জন্যে কর্তব্যগুলি বিবৃত করা হয়েছিল এই পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে। ব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে, চল্লিশের-কমবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা হবে, সাংস্কৃতিক আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত করা হবে বিস্তর।

দেশের শিল্পযোজন এবং কৃষির যৌথকরণ আরও এগিয়ে নেওয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নকে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা, সেটা করার ভিতর দিয়ে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রীদের আরও কার্যকরভাবে উৎখাত করা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়াই ছিল এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠল শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা করার সময় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন আর কমসোমলের সাহায্যে বিরাট পরিসরে প্রচারকাজও চালাচ্ছিল, — ঐসব নতুন লক্ষ্যসাধনের কাজে শ্রমজীবী জনগণকে সংশ্লিষ্ট করা ছিল তার উদ্দেশ্য। লেনিনের 'কী করে প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে হয়' শীর্ষক প্রবন্ধ সেই প্রথম প্রকাশিত হল 'প্রাভদা'য় ১৯২৯ সালে ২০এ জানুয়ারি তারিখে। তখনকার পরিস্থিতিতে প্রবন্ধটি এতই প্রাসঙ্গিক ছিল যে, মনে হয়েছিল প্রবন্ধটি লেখা ছিল যেন সেই উপলক্ষেই —১৯১৭ সালের শেষের দিকে নয়।

লেনিন লিখেছিলেন, শ্রমজীবীরা নিজেদের জন্যে আর নিজেদের রাষ্ট্রের জন্যে, সমগ্র জনগণের কল্যাণের জন্যে কাজ করার সুযোগ পাবে কেবল সমাজতন্ত্রের আমলেই। যথার্থ গণ-ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে পরস্পরের সমকক্ষ হবার প্রতিযোগিতার প্রথম সুযোগ দেবে সমাজতন্ত্র। জনগণের মধ্যে সদা-সর্বদাই থাকে কর্মদক্ষতার যে-অব্যবহৃত উৎস, সেটাকে শোষণভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা দশকের পর দশক যাবত পায়ের তলায় শ্বাসরুদ্ধ করে এবং দলে-পিষে রেখেছিল। যে-কাজে শ্রমজীবীরা নিজেদের সৃজনী-শক্তি দেখাতে পারে, নিজেদের সামর্থ্য গড়ে-বাড়িয়ে তুলতে পারবে এবং নিজেদের উদ্যম প্রদর্শন করতে পারবে, তাতে শ্রমজীবীদের অধিকাংশের সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব করে একমাত্র সমাজতন্ত্রই। মানুষের উপর মানুষের শোষণ নিশ্চিহ্ন করা হলে, একমাত্র তবেই আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় আসতে পারে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম-প্রচেষ্টাক্ষেত্রে সহযোগিতা আর পরস্পরের সমকক্ষ হবার কমরেডীয় প্রতিযোগিতা।

আগেই দেখানো হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজের প্রতি এই নতুন মনোভাব দেখা দিয়ে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল। সেটা দেখা যায় প্রথমে কমিউনিস্ট সুবোৎনিকে (যে-অবসরদিনে লোকে স্বেচ্ছায় কাজ করে বিনা-পারিশ্রমিকে) এবং পরে ঝটিকা-ব্রিগেড আন্দোলনে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার গোড়ায় বিশেষত জনগণের মধ্যে শ্রম-প্রতিযোগিতা বিকাশের অনুকূল অবস্থা ছিল।

কারখানা আর নতুন নতুন শহর নির্মাণ এবং বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্নির্মাণের কাজ ক্রমাগত দ্রুততর বেগে চলছিল, যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্যে চাহিদা বাড়ছিল, শ্রমজীবীদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল সাধারণভাবে। শ্রমিক শ্রেণীতে বিক্ষিপ্ততার প্রক্রিয়াটা হয়ে গিয়েছিল দূর অতীতের ব্যাপার, ১৯২৯ সাল নাগাত দেশের শ্রমিকদের অর্ধেকের বেশির জন্ম হয়েছিল শহরেই। পুনর্নির্মাণ অভিযানের প্রথম বছরগুলিতে শিল্পে নবাগত ছিল শ্রমিকদের মাত্র ২০ শতাংশ। শিল্পে শতকরা আশি জন কাজ করছিল অন্তত তিন বছর ধরে; মোট শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক শিল্পে কাজ শুরু করেছিল বিপ্লবের আগে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে নিরক্ষর শ্রমিকদের অনুপাত অনেক কমে গিয়েছিল (১৯২৯ সালে দাঁড়িয়েছিল ১৪ শতাংশ)।

তবু স্বভাবতই, কল-কারখানার কাজে তখনও বেশকিছুসংখ্যক লোক ছিল অনগ্রসর। তাদের মধ্যে যারা মাত্র আগের দিনও ছিল কৃষক, তাদের ছিল নিজ নিজ জোতজমা, তাদের অনেকে তখনও কামনা করত কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে গ্রামে ফিরে একটা ঘোড়া কিংবা গরু কিনবে। কারখানার সমস্ত শ্রমিকের প্রায় ২০ শতাংশ কোন খবরের কাগজ পড়ত না, প্রতি সাত জনে একজন ছিল নিরক্ষর। যখন জীবনযাত্রার মান ছিল অপেক্ষাকৃত নিচু, খাদ্য রেশনিং বলবৎ ছিল, বৃহৎ পরিসরে বাসগৃহ নির্মাণের উপযোগী

কোন তহবিল ছিল না, সেই সময়ে, খুবই স্বভাবতই, কিছু কিছু শ্রমিক আর কর্মচারী সন্তুষ্ট ছিল না। তবে, সমগ্রভাবে সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাবটাকে তারা রূপ দিত না। সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর ঝটিকা বাহিনী ছিল কর্তব্যনিষ্ঠ অভিজ্ঞ শ্রমিকদের নিয়ে। ১৯২৯ সালের বসন্তকালে কারখানা শ্রমিকদের শতকরা মাত্র ১২ জন ছিল কমিউনিস্ট, আরও শতকরা ৮·৫ জন ছিল কমসোমল সদস্য। এই অংশটাই শহরের প্রলেতারিয়েতের প্রধান অংশটাকে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালিত করত। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলো সংসাধিত করার জন্যে অভিযান সংগঠিত করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রধানত নির্ভর করত তাদেরই উপর।

অগ্রসর শ্রমিকেরা লেনিনের প্রবন্ধটিকে দেখত সক্রিয় হবার জন্যে পার্টির আহবান হিসেবে। এই রকমের একজন শ্রমিক ছিলেন লেনিনগ্রাদের 'ক্রাস্‌নি ভিবোরজেৎস' কারখানার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের ব্রিগ্রেড-নেতা মিখাইল পুতিন। তিনি কেবল ব্রিগেড-নেতাই ছিলেন না, — জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক জ্ঞানের প্রসারের জন্যে প্রচারক হিসেবেও তিনি কাজ করতেন। শ্রমিকেরা তাঁর বক্তব্য শুনত সাগ্রহে। গোটা ব্রিগেডের সমস্ত শ্রমিক তাঁকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করত, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। একদিন দুপুরে খাবার ছুটির সময়ে কমরেডীয় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে লেনিনের প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁদের কারখানায় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার অনুযায়ী কাজ হচ্ছিল না; এর কারণ ছিল বিশেষত ঘন ঘন অসঙ্গতভাবে কাজ এড়িয়ে চলা, দেরিতে কাজে আসা এবং কাজে দক্ষতার অভাব। কিন্তু, পুতিনের ব্রিগেডটি উন্নতিশীল ছিল — এতে আট জনের মধ্যে চার জন ছিলেন পার্টি সদস্য, আরও একজন ছিলেন কমসোমল সদস্য। নিজেদের কাজের কোটা তাঁরা সব

সময়েই প্রণ করতেন, কিন্তু কী করে অন্যান্যদেরও সমকক্ষ করে তোলা যায়, এই ছিল কথা। বিষয়টা নিয়ে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছিল, কিন্তু শেষে তাঁদের ঠিক জায়গায় পে'ছে দিল লেনিনের প্রবন্ধটি। তাঁরা স্থির করলেন, তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে অন্যান্য ব্রিগেডের কাছে প্রস্তাব তোলা হবে, — সমষ্টিগত আলোচনার পরে তাঁরা একত্রে নির্ধারণ করলেন নিম্নলিখিত শর্তগুলি: কাজের পারিশ্রমিক ১০ শতাংশ কমানো, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি ১০ শতাংশ বাড়ানো, কাজে খুঁত এড়িয়ে চলা, গোটা কারখানার মধ্যে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল হবার জন্যে প্রত্যেকটি ব্রিগেডের চেষ্টা — এইসবই স্বেচ্ছায়। ঐ সময়ে এসব বাধ্যবাধকতা একটুখানি ছিল না, কেননা তখন বেশকিছুসংখ্যক শ্রমিক পড়তে জানত না বললেই হয়, এবং গীর্জার সমস্ত পালপার্বণ পালন করত নিয়মিতভাবে, আর সেটাকে তারা কাজে গরহাজির হবার উপযুক্ত ওজর বলে মনে করত। পুতিন এবং তাঁর কমরেডদের প্রস্তাবে গোড়ায় নানা অবিমিশ্র সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল, রূঢ় সমালোচনা কানে আসত বিস্তর:

'এই এলেন তাহলে নতুন মনিব!'

'তোমাদের ওসব চুক্তি-টুক্তি আমার মতো মানুষের জন্যে নয়!'

'তাহলে, তোমরা আমাদের পকেট ফাঁক করে দিতে চাইছ, অ্যা?'

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা গণ-পরিসরে সংগঠিত করা হচ্ছিল ১৯২৯ সালে, কিন্তু অমনসব মন্তব্য শোনা যেত শুধু তখনই নয়। সুবিদিত নবপ্রবর্তক নিকিতা ইজোতভ অনুরূপ নানা আশঙ্কা-সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন ১৯৩২ সালেও। কয়লা তোলার উন্নততর প্রণালী সম্বন্ধে 'প্রাভ্‌দা'য় তাঁর একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে বহু কয়লা-কাটা শ্রমিক বেশ স্পষ্টভাষায়ই অননুমোদন প্রকাশ করেছিল: 'দেখো, ওস্তাদ সবকিছু ফাঁস করে

দিচ্ছে! অতসব হৈচৈ না-করে নিজের কাজ করলেই তো হয়!’ তবে, পুরন দুনিয়ার যতসব বদ অভ্যাস আর বদ্ধধারণা গণ-উৎসাহ-উদ্দীপনার ক্রমবর্ধমান জোয়ারটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। কমিউনিস্ট এবং কমসোমল সদস্যদের সাংগঠনিক কাজের সুফল ফলেছিল অচিরেই। বেশির ভাগ শ্রমিক শিগগিরই সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলন সমর্থন ক’রে তাতে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। যারা আগের দিনও ছিল কৃষক, এমনসব লোকও কাজের পারিশ্রমিক স্বেচ্ছায় কমাতে রাজী হয়েছিল, নওজোয়ান শ্রমিকেরা কাজ এড়াবার কোন চেষ্টা না-করে কর্তব্যপালন করেছিল বিবেকবুদ্ধি অনুসারে, পুরন শ্রমিকেরা তাদের ‘বৃত্তিগত গোপনকথা’ জানিয়ে দিয়েছিল নবীন শ্রমিকদের। এই সবকিছুতে প্রতিফলিত হয়েছিল কাজের প্রতি লোকের নতুন মনোভাব এবং তাদের সামাজিক বিবেকবুদ্ধি।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা উদ্যম আর দলবদ্ধ হয়ে কাজে উৎসাহ যোগাল, শ্রমিকদের সাহায্য করল কাজটাকে নতুন এবং আরও সৃজনশীল আলোকে দেখতে এবং নিজেদেরকে নিজেদের কর্তা বলে বোধ করতে। শিল্পের সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে এবং দেশের সমস্ত প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানে আর নির্মাণ প্রকল্পে এই নতুন ব্যবস্থাটা ক্রমে চালু হয়ে গেল। যারা দায়-দায়িত্ব পালন করত বিশেষ ভালভাবে, তাদের মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতা অভিযানে বিজয়ী বলে চিহ্নিত করা হতে থাকল। তাদের দেওয়া হত বিশেষ লাল পতাকা, তাদের সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হত, রেডিও অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। খুবই বিশিষ্ট রেকর্ডওয়ালা শ্রমিকদের পুরস্কার দেওয়া হত ছুটিযাপন ভবন আর স্বাস্থ্যনিবাসে থাকার টিকিট, — প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে কাজের বিশিষ্ট রেকর্ডের জন্যে পাওয়া বিশেষ শংসাপত্র বহু প্রবীণ শ্রমিক এখনও অবধি সযত্নে রেখে দিয়েছেন।

১৯২৯ সালের শেষের দিকে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঝটিকা শ্রমিক-ব্রিগেডগুলির একটা সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস। নিজেদের সাধনগুলি সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করেছিলেন ইউক্রেন, উরাল অঞ্চল, বেলোরুশিয়া আর মধ্য এশিয়া, লেনিনগ্রাদ এবং নিজ্নি নভগোরদের শ্রমিকেরা। পরবের আবহাওয়ার মধ্যেও এইসব শ্রমিক নিজেদের কাজ সম্বন্ধে কার্যকর আলোচনা করেছিলেন, ভবিষ্যতের বিভিন্ন প্রকল্প রচনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার উপায়াদি নিয়ে আলোচনা চালিয়েছিলেন।

এই কংগ্রেসের সময়ে সর্মোভো'র শ্রমিকদের উদ্যোগে কিছু কিছু সেরা প্রতিনিধি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এর থেকে দেখা যায়, কমিউনিস্ট পার্টি যখন সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সংগঠিত করছিল এবং তাতে শামিল হবার জন্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে উৎসাহিত করছিল সেই সময়ে জনগণের বহুসংখ্যক সেরা প্রতিনিধি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন — পার্টি বেশকিছুটা বেড়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে প্রবলতর গতিবেগ সঞ্চারিত হল, বহু কর্তব্য যা একসময়ে একেবারেই অসম্ভবপর বলে মনে হত সেগুলিও তখন সাধিত হতে থাকল।

শিল্পক্ষেত্রে মাগ্নিতোগর্স্ক আর নভোকুজনেৎস্কের মতো মজবুত ঘাঁটি, উরাল অঞ্চল আর সাইবেরিয়ার শিল্পকেন্দ্রগুলি আজকাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরেও বহু দূর-দূর দেশে বিখ্যাত। কিন্তু, আজ যা মাগ্নিতোগর্স্ক সেখানে ১৯২৯ সালে একটা রেল-স্টেশনও ছিল না। সেখানে ছিল শুধু একখানা বিচ্ছিন্ন রেলগাড়ির কামরা — তবু, নামটা লোকের কাছে সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিল দেশজুড়ে। মাগ্নিতোগর্স্ক নির্মাণ প্রকল্প লোকের জন্যে অপেক্ষা করছে, এই মর্মে লেখা পোস্টার

দেখা যেত অসংখ্য শহরে আর গ্রামে, আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ চলে গিয়েছিল উরাল অঞ্চলে।

শুরুটা কঠিন ছিল, তা ঠিক,—গোড়ার দিকে বেশির ভাগ কাজ করতে হত হাত দিয়ে। নির্মাণকাজের জন্যে ট্র্যাক্টর আর লরি বড় একটা পাওয়া যেত না। মামুলি ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ঠেলাগাড়ি আর কোদাল, তুলো-ভরা জ্যাকেট আর তেরপলের দস্তানারও ঘাটতি পড়ত প্রায়ই, নির্মাণ-শ্রমিকদের থাকতে হত অস্থায়ী কুটিরে। একই সময়ে বহুসংখ্যক শ্রমিক যখন এসে পড়ত, তাদের থাকতে হত ট্রেঞ্চে। এসব কারও-কারও সহ্যশক্তিতে কুলত না, তাদের ফিরে যেতে হত, কিন্তু সবকিছুর মোকাবিলা করে থেকেই গিয়েছিল বেশির ভাগ।

খিবিনিতে, বেরেজ্‌নিকিতে, তুলার কাছে, আক্তিউবিন্‌স্কে রাসায়নিক কারখানাগুলির নির্মাণক্ষেত্রে এবং এখন নভোকুজনেৎস্ক নামে পরিচিত শহরের কাছে ধাতু কারখানার নির্মাণক্ষেত্রেও কাজ শুরু হয়েছিল ঐ একই রকমের কঠোর অবস্থার মধ্যে। ঐ সময়ে সেখানে শহরও ছিল না, ধাতু কারখানাও ছিল না — ছিল শুধু পরিকল্পনাকারীদের তালিকায় এই দুটি নাম। তবে, ১৯২৯ সালের শেষাশেষি কাজ চলছিল চব্বিশ ঘণ্টাই। রাত্রে কাজ চলত ফ্লাডলাইটের আলোয়, দারুণ শীতে যান্ত্রিক এক্সক্যাভেটর যখন আর ব্যবহার করা যেত না তখন লোকে কুপিয়ে যেত সেই পাথরের মতো মাটিতে। সমস্ত নতুন নির্মাণক্ষেত্রের মতো এখানেও কোটা ছাড়িয়ে কাজ, স্বেচ্ছায় ওভারটাইম খাটা এবং অবসরের দিনে কাজ করা পাকাপোক্ত রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল।

সবচেয়ে বিবেকবান এবং কর্মচঞ্চল শ্রমিকেরা নিজেদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে অতি বড় বিষয়াসক্তদেরও অনুপ্রাণিত করে তুলত। কোন জরুরী অবস্থায় সাহায্য করার জন্যে পার্টি আর কমসোমল সদস্যরা যখন মাঝ-রাতে ঘুম থেকে উঠে যেত

তখন অন্যান্যেরাও অনুসরণ করত তাদের দৃষ্টান্ত। যাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তারা যদি সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পরে কোন জরুরী কাজ শেষ করে দিতে যায়, কিংবা অন্যান্যকে পড়তে-লিখতে শেখাবার জন্যে দেয় অবসর সময়টা, সেক্ষেত্রে অন্যান্যের ঔদাসীন্য সম্ভব নয়।

মীর-সৈয়দ আর্দুয়ানভ নামে ঐ সময়কার একজন বিশিষ্ট শ্রমিক সেইসব দিনের কথা মনে করে বলেন: 'আমাদের আর্টেলটা একত্রিত ছিল প্রথমত এবং সর্বোপরি আরও বেশি বৈষয়িক পারিতোষিকের সম্ভাবনা দিয়ে। কিন্তু, কাজের ভিতর, ভবিষ্যৎ কারখানার ভিত্তির জন্যে দশক-দশক, শত-শত ঘনমিটার মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করছিলাম কী আমরা গড়ছিলাম আর সেটা কার জন্যে।' ৩৫ জন মাটি-কাটা মজুরের এই আর্টেলে বেশির ভাগ ছিল তাতার আর বাশকির। বেরেজ্নিকিতে রাসায়নিক কারখানার নির্মাণক্ষেত্রে নির্মাণকর্মিদলগুলিতে যেসব প্রাক্তন কুলাক অনুপ্রবেশ করেছিল, তারা একাধিক বার আর্দুয়ানভ এবং তাঁর আর্টেলের উপর প্রভাব চাপাতে চেষ্টা করেছিল — এই আর্টেল তখন সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযানে অংশগ্রহণ করছিল। কুলাকদের এবং তাদের লোক-জনের পরিকল্পিত আক্রমণগুলোর একটাতে আর্দুয়ানভের একজন সাথী নিহত হয়েছিলেন, আর তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল দীর্ঘকাল। তবে, এই বেপরোয়া বিরোধিতা আর্টেলটিকে ভয় খাইয়ে হতোদ্যম করতে পারে নি — হয়ত তারা বরং এর ফলে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, তখনও তারা যে- পরিস্থিতির মধ্যে ছিল তার প্রকৃতিটা কী। এই মাটি-কাটা মজুরেরা আগের চেয়ে আরও ভালোভাবে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল, আর্টেলের সবাই যাতে পড়তে-লিখতে শেখে তার ব্যবস্থা করেছিল সযত্নে, নতুন নতুন কাজ শিখে পেশাদার

কনক্রিট প্রস্তুতকারক হয়েছিল। আর্দুয়ানভের নেতৃত্বে এই আর্টেলের চোদ্দ জন পার্টি সদস্য হয়েছিল; আগে যা ছিল আর্টেল, সেটা হয়ে উঠেছিল একটা আদর্শস্বরূপ ঝটিকা-ব্রিগেড।

শ্রমিক শ্রেণীর উৎসাহ-উদ্দীপনা আর কর্মোদ্যম বেড়ে চলেছিল মাস-পর-মাস। শিগগিরই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি সংসাধন করা যাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অবস্থার বেশকিছুটা অবনতি ঘটেছিল — সেটা মনে রাখলে দেখা যায়, পরিকল্পনা সংসাধনের ঐ সম্ভাবনাটা ছিল বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের চিরাচরিত ভীতিপ্রদর্শন আর প্ররোচনাগুলোর জায়গায় প্রত্যক্ষ সামরিক হামলা চালাতে আরম্ভ করেছিল, চীনা-পূর্ব রেলপথ হস্তগত করার জন্যে মাঞ্চুরিয়ার সামরিক শক্তি এবং শ্বেতরক্ষীদের চেষ্টার মধ্যে সেটা দেখা গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পাঁচসালা পরিকল্পনার কর্মসূচির পর্যালোচনা করার দরকার দেখা দিয়েছিল, সেটা করার পরে ভারি শিল্পের এবং বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষাক্ষমতার পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন শিল্প-শাখাগুলির সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছিল নতুন করে, শিল্পযোজনের গতিবেগ আরও ত্বরান্বিত করা হয়েছিল, সেটাকে চাঙ্গা করা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলনের পটভূমিতে আরও বেশি প্রচেষ্টা দিয়ে, — এইসব মিলে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে বিভিন্ন তাৎপর্যসম্পন্ন সাফল্যের পথ সুগম হয়েছিল। মধ্য এশিয়া আর সাইবেরিয়ার মধ্যে যোগাযোগের রেলপথ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ১৯২৭ সালের ১লা মার্চ: গোড়ায় যা পরিকল্পনা ছিল তার সতর মাস আগে। তুর্কসিব্ (তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথ) নামে পরিচিত প্রায় ৯৫০ মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ হল কাজাখস্তান, কিরগিজিয়া

এবং রাশিয়া ফেডারেশনের মধ্যে যোগসূত্র। নতুন রেলপথ বরাবর স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যবহৃত নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং মাটি-কাটা মজুরদের জীবনযাত্রা আর কাজের ধরনধারন দেখে চমৎকৃত হত। এই প্রথম স্টীম ইঞ্জিন দেখে বুড়োদের কোন সন্দেহই রইল না যে, ও ইঞ্জিনের চাকা ঘোরায় শয়তান, আর কমবয়সীরা সেইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথা শুনে হাসত একটু একটু। জীবনটাকে যারা দেখতে শিখেছিল নতুন দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তরুণ জুমগালি ওমারভ। তিনি তুর্কসিব্ প্রকল্পে কাজে লেগেছিলেন ছাব্বিশ বছর বয়সে — তখনও তিনি পড়তে-লিখতে পারতেন শুধু কোনমতে। এই রেলপথ নির্মাণের কাজের মধ্যেই তিনি ইস্কুলে পড়া শেষ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ

নতুন তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়া রেলপথে প্রথম ট্রেন। ১৯২৯

দিয়েছিলেন। কিন্তু, ঐ রেলপথ খোলার দিন অবধিও তাঁর বিশ্বাসই হত না যে, তিনি নিযুক্ত হবেন তার সুপারভাইজর।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল নতুন নীতি এবং নতুন নতুন মনোভাব, এইসব নতুন ধারার পিছনকার বলটা ছিল জনগণ নিজেরাই — তারা তখন হয়ে উঠেছিল দেশের মালিক।

প্রথম সোভিয়েত ট্র্যাক্টর জোড়া হয়েছিল স্তালিনগ্রাদে ১৯৩০ সালে ১৭ই জুন তারিখে। প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সবাই মিলে এসে গিয়েছিল সারাতভ থেকে — এতে দেখা যায়, প্রথম সোভিয়েত ট্র্যাক্টরের দেখা দেওয়াটা কতখানি গুরুত্বসম্পন্ন ছিল ঐ সময়ে। কয়েক দিন পরে ১ নং স. ত. জ ট্র্যাক্টরটিকে আনা হয়েছিল রাজধানীতে। মস্কোর রাস্তাগুলোর উপর দিয়ে সেই ট্র্যাক্টর চলার সময়ে সোৎসাহ হর্ষধ্বনি তুলেছিল নগরীর মানুষ। ট্র্যাক্টরটিকে আনা হয়েছিল বলশই থিয়েটারে — সেখানে চলছিল কমিউনিস্ট পার্টির ১৬শ কংগ্রেস। দেশের প্রথম ট্র্যাক্টর কারখানার নির্মাণ শেষ হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের দশ মাস আগেই — এই ঘোষণায় সোৎসাহ জয়ধ্বনি তুলেছিল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা।

মস্কোয় আসার সুযোগ যাঁদের হয় তাঁরা সেই ট্র্যাক্টরটিকে দেখতে পারেন। অতীতের অন্যান্য বহু নিদর্শনের মধ্যে সেটা রয়েছে বিপ্লব মিউজিয়মে। যন্ত্রটা সেকেলে ধরনের — তার পরাক্রমশালী আধুনিক প্রতিরূপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সামান্যই। তবু, এটা একটা 'প্রদর্শিত বস্তু' নয় কথাটার মামুলি অর্থে: তেইশ বছর ধরে খেতে কাজ ক'রে এই ট্র্যাক্টর সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যসাধনে অবদান রেখেছে, সেটা আজও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সহায়ক, এমন কথা বললেও অতিশয়োক্তি হবে না।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার বছরগুলিতে সাধনগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা বিশেষ ঘটনা হল কৃত্রিম রবার শিল্পের স্থাপনা। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম দফা কৃত্রিম রবার উৎপাদনের ঘোষণাটা সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

ইতোমধ্যে, কৃত্রিম রবারের বড় বড় কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছিল ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌, ভরোনেজ আর ইয়েফ্রেমভে। প্রথম দুটোতে উৎপাদন শুরু হয়েছিল ১৯৩২ সালের শরৎকালে, আর এই জিনিসের উৎপাদন জার্মানিতে শুরু হয়েছিল তার পাঁচ বছর পরে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪২ সালের আগে নয়।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় অর্জিত সাফল্যগুলির বিবরণের মধ্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে আরও বহু। মস্কোয় একদিন তার নিজস্ব বেয়ারিং উৎপন্ন হবে, এমন কথা সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে মাত্র মুষ্টিমেয় লোকই ভাবতে পারত, কিন্তু সংশয়বাদীদের হতাশ করে গড়ে উঠল বেয়ারিংয়ের কারখানা। সোভিয়েত সরকার ব্লুমিংয়ের জন্যে ইজোরা কারখানায় ফরমাশ দিলে সেটাকে শুনতে অনেকটা অপার্থিব বলেই মনে হয়েছিল। এটা কিছু আপতিক ব্যাপার নয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্লুমিং সরবরাই করার বাবত মার্কিন একচেটিয়া কারবারিরা অসম্ভব রকমের চড়া দাম হেঁকেছিল: পরিব্যয়-মূল্যের চেয়ে সাতগুণ বেশি। ও জিনিস আমেরিকা থেকে কেনা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের গত্যন্তর নেই, এতে ঐ কারবারিরা ষোল-আনাই নিশ্চিত ছিল। কিন্তু, তাদের হিসেবে ভুল ছিল: ইজোরা কারখানা সরকারী ফরমাশ পূরণ করেছিল ন'মাসের মধ্যে।

নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজটা প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থানে রয়েছে। দেশকে বিদ্যুৎসজ্জিত করার অভিযানে দেশের সমস্ত মানুষ সাড়া দিয়েছিল সাগ্রহে। উঁচু মাত্রায় সুদক্ষ সমস্ত কর্মী এবং সমস্ত সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয়েছিল এই কাজে — এতে অংশগ্রহণ করেছিল একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সমগ্র জনগণ। এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন বিখ্যাত শক্তি-বিশেষজ্ঞ — আলেক্সান্দর ভিন্তের, তিনি পরে হয়েছিলেন একজন আকাদমিশিয়ন। ১৯৩২

সালে বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজ করছিল ৫,২০০ জন কমিউনিস্ট এবং ৭,৫০০ জন কমসোমল সদস্য। যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন এই ঝটিকা-বাহিনী অন্যান্য অযুত অযুত নির্মাণ-শ্রমিকের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। প্রকল্প নির্মাণ যাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ করা যায়, এই উদ্দেশ্যে শ্রমিক কিংবা ইঞ্জিনিয়রেরা বিভিন্ন নবপ্রবর্তনার প্রস্তাব তুলত একেবারে প্রতিদিনই। প্রথম টারবাইনটাকে জোড়ো হয়েছিল ৩৪ কর্ম-দিনের মধ্যে। নির্মাণক্ষেত্রে টেকনিকাল উপদেষ্টা মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা সেটা বিশ্বাস করতেই চায় নি: তাদের দেশে এই রকমের টারবাইন জুড়তে সময় লাগত গড়ে ৪৫ কর্ম-দিন। তাদের চোখের সামনেই পঞ্চম টারবাইনটা ২৪ কর্ম-দিনে জোড়া হলে তারা আরও হকচকিয়ে গিয়েছিল।

বাঁধটাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শেষ করার চেষ্টায় নির্মাণ-শ্রমিকেরা প্রতিদিন তাদের নির্দিষ্ট শিফ্‌টের পরে অতিরিক্ত এক ঘণ্টা — 'সমাজতান্ত্রিক ঘণ্টা' — কাজ করত। এটা আরম্ভ করেছিল কমিউনিস্ট এবং কমসোমল সদস্যরা — পরে হাজার হাজার অ-পার্টি শ্রমিকও এতে শামিল হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলনের মধ্যে আগুয়ান শ্রমিকেরা কোটার দ্বিগুণ কাজ করত। দিন-পর-দিন, ঘণ্টা-পর-ঘণ্টা বাঁধ বেড়ে চলেছিল। বাঁধটা ছিল লম্বায় ৭৬০ মিটার, ৬৪ মিটার উঁচু, অর্থাৎ, কুড়ি তলা বাড়ির চেয়ে বেশি। নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রথম শিল্পে-ব্যবহার্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছিল ১৯৩২ সালের ১লা মে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি মিখাইল কালিনিন এবং ভারি শিল্পের জনকমিসার গ্রিগোরি ওর্জোনিকিদ্‌জে। সবচেয়ে বিশিষ্ট কাজের রেকর্ড যাঁদের ছিল, এমন ৭০ জন নির্মাণ-শ্রমিককে

‘অর্ডার’ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এই নির্মাণকাজে অংশগ্রহণকারী ৪৫,০০০ শ্রমিককে অভিনন্দন জানিয়ে ওর্জোনিকিদ্‌জে বলেছিলেন: ‘নিজেদেরই প্রচেষ্টায় এই যে-বিদ্যুৎকেন্দ্র আমরা নির্মাণ করেছি, এটা এই রকমের স্টেশনগুলির মধ্যে পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ। এই বিশাল প্রকল্প নিয়ে আমাদের কাজ শুরু করার সময়ে সংশয়-বাতিকগ্রস্তরা অনেক ঘ্যানঘেনে নালিশ জানিয়েছিল, বিদেশে অনেকে ব্যর্থতার আশায় বিদ্বেষপরায়ণ উল্লাস প্রকাশ করেছিল, সেই সবকিছু সত্ত্বেও আজ আমরা অনাস্থাবাদী আর সংশয়প্রবণ লোকেদের দিকে ফিরে বলতে পারছি — এসো, স্বচক্ষে দেখে যাও: নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে!’

১৯৩২ সালেই মাগ্‌নিতোগর্স্ক আর কুজনেৎস্কের ফার্নেসগুলোতে ঢালাই লোহা উৎপন্ন হচ্ছিল; খিবিনির অ্যাপাটাইট সারে পরিণত হচ্ছিল লেনিনগ্রাদে আর ইউক্রেনে; খারকভে আর নিজ্‌নি নভগোরদে জোড়া হয়েছিল প্রথম প্রথম ট্র্যাক্টরগুলি আর মোটরযান; চালু হয়েছিল ক্লিন, মগিলেভ আর লেনিনগ্রাদের কৃত্রিম তন্তু কারখানা, তেমনি, বেরেজ্‌নিকি আর ভসক্রেসেন্‌স্কের রাসায়নিক কারখানা, ক্রাস্ন-উরাল্‌স্কে তামা-বিগলন কারখানা, তাশখন্দে কৃষি যন্ত্রপাতি কারখানা।

১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় শিল্পায়তন নির্মিত হয়েছিল মোট ১,৫০০টা, অর্থাৎ কিনা, নতুন নতুন ভীমকায় শিল্পায়তন চালু হয়েছিল দিনে অন্তত একটা করে। আগে-অনগ্রসর উপান্তবর্তী জাতীয় অঞ্চলগুলিতে উন্নয়ন হয়েছিল বিশেষ দ্রুত: বরাবরকার শিল্পকেন্দ্রগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছিল শতকরা ১০০ ভাগ, কিন্তু জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে বৃদ্ধিটা ছিল শতকরা ২৫০ ভাগ। তার মানে, লেনিনের জাতি-সংক্রান্ত কর্মনীতিটিকে কার্যে

পরিণত করা হচ্ছিল। দেশের অ-রুশ সংখ্যালঘুদের অধ্যুষিত যেসব এলাকায় আগে চলত কঠোর নিপীড়ন সেসব এলাকায় আর্থনীতিক অনগ্রসরতা ঘুচিয়ে দেবার মজবুত ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল।

বরাবরকার শিল্পকেন্দ্রগুলিতেও বিভিন্ন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল — এইসব জায়গায় বহু কারখানায় বড়রকমের পুনর্নির্মাণকাজ চলেছিল। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আর টেকনিক চালু করা হয়েছিল বাকুর তৈলক্ষেত্রে আর দনেৎস্ অববাহিকার কয়লা খনিগুলিতে। মস্কোয় 'ক্রাস্‌নি প্রলেতারি' মেশিনটুল কারখানা, কলোম্‌নায় ইঞ্জিন তৈরির কারখানা এবং লেনিনগ্রাদে 'ক্রাস্‌নি ত্রেউগোল্‌নিক' রবার-আকারণ কারখানার মতো দীর্ঘকালের শিল্পায়তনগুলিতেও নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করা হয়েছিল। আগেকার আ. ম. ও মোটরযান কারখানার জায়গায় দ্রুত গড়ে উঠছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড় মোটরযান কারখানাগুলির একটি, — মস্কোকে তখন আর কেবল সুতী কাপড়ের এলাকা বলা চলত না। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী হয়ে উঠল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৈদ্যুতিক-ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একটা কেন্দ্র।

সর্বত্র শ্রম দেশের চেহারা বদ্‌লে দিতে থাকল। পুঁজিতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ঐ সময়কার মূল উপাদান— সেটা আগেই তত্ত্বগতভাবে নির্ধারিত থাকলেও কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নেই সেটা কার্যক্ষেত্রে প্রকটিত হল। খাদ্য আর বাসগৃহের ঘাটতির ব্যাপারটা ছাড়িয়ে বহু দূর অবধি নজর চলত সোভিয়েত ভূমির বন্ধুদের। তারা সামনে দেখতে পেল নির্মাণ-প্রকল্প আর যৌথখামারের একটা দেশ, যে-দেশের মানুষ ঘুচিয়ে দিল শোষণ আর বেকারি, একটা রাষ্ট্র, যা চালু করল পৃথিবীতে সবচেয়ে খাটো কর্ম-দিন, আর প্রত্যেকটি শ্রমজীবীর জন্যে নিশ্চিত করল কাজ, পড়াশুনা আর অবসরবিনোদনের সমান অধিকার।

সমাজতন্ত্রের প্রতি শ্রেণীগত বিদ্বেষে যাদের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন নয় এমন সবাই বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনেকার কষ্ট-কাঠিন্যগুলো বৃদ্ধির যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়।

তখন সমাজতন্ত্রের উদয় হল কেবল পৃথিবীর ষষ্ঠাংশে, সেটা বেশ ভালভাবেই বুঝে সোভিয়েত নর-নারীদের আস্থা ছিল উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, সেই ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তারা বহু কষ্ট-দুর্ভোগ আর অভাব-অনটন মেনে নিয়েছিল, বহু ত্যাগস্বীকার করেছিল। সোভিয়েত শিল্প এগিয়ে চলছিল যথার্থই অবিশ্বাস্য বেগে; ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তৈল শিল্পে পরিকল্পনা সংসাধিত হয়ে গিয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের আগেই —১৯৩১ সাল নাগাত। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী বৈঠক থেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাক্রমশালী শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করার দিকে নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে, শিল্পের সমস্ত শাখার টেকনিকাল পুনঃসজ্জার বনিয়াদ গড়া হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক বনিয়াদ। এ হল পার্টি, শ্রমিক শ্রেণী এবং সমগ্র সোভিয়েত জনগণের একটা বিরাট জয়।

তার বিশ বছরের কম সময় আগে, ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় মোট উৎপাদনের তিন-পঞ্চমাংশ ছিল কৃষিজাত দ্রব্য: দেশের গোটা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে মেশিনটুল তৈরি হত বছরে মাত্র ১,৭৫৪টা। দেশে ট্র্যাক্টর কিংবা মোটরযান তৈরি হত না একটাও, — ১৯২৮ সাল অবধিও পণ্য উৎপন্ন হত শহরের চেয়ে গ্রামেই বেশি। তারপরে পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশকিছুটা বেশি উৎপন্ন হল শিল্পে, ভারি শিল্পে উৎপাদন দাঁড়াল হালকা শিল্পের

চেয়ে বেশি। ১৯৩২ সালে উৎপন্ন হয়েছিল ১৯,৭০০টা মেশিনটুল (১৯২৮ সালের মোট সংখ্যার চেয়ে দশগুণ বেশি), ৪৯,০০০টা ট্র্যাক্টর (১৯২৮ সালের মোট সংখ্যার চেয়ে ৩৮-গুণ বেশি), ২৩,৯০০ খানা মোটরগাড়ি আর লরি (১৯২৮ সালের মোট সংখ্যার চেয়ে ৩০-গুণ বেশি)। বিদ্যুৎশক্তি, সার, গ্যাস, তৈল, সিমেণ্ট এবং কাগজ উৎপাদনও বেড়েছিল বেশ মোটা পরিমাণে।

বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন পরিবর্তন কেবল উৎপাদনের পরিমাণ এবং অর্থনীতির ভিতরে নানা সংযুতিতেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল না, — আসল জিনিসটা ছিল এই যে, এগুলি হল সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সাফল্য, যে-শিল্পের মালিক জনগণ, যে-শিল্প সমানে এগিয়ে চলল একটা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে, আর এই অগ্রগতির ভিতর দিয়ে সংহত করে তুলল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে। অর্থনীতিক্ষেত্রে এমন হারে উন্নয়ন পৃথিবীতে আগে কখনও দেখা যায় নি। সমাজতন্ত্র গড়া হচ্ছিল এই প্রথম, আর এই প্রথম মানবজাতি দেখল সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্বগুলি।

যৌথকরণের জয়জয়কার

১৯২৬—১৯২৯ সালে অর্জিত দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষির পুনঃসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রারম্ভিক লক্ষণীয় সাফল্যগুলি দেখে স্থানীয় নির্বাহী সংস্থাগুলির ভারপ্রাপ্ত অনেক পার্টি কর্মী যৌথকরণ অভিযান ত্বরায়িত করার জন্যে বারবার বক্তব্য উপস্থিত করছিলেন। যেমন, জর্জিয়ায় সোভিয়েত কংগ্রেসে ঐ মর্মে একটা প্রস্তাব পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল। মধ্য রাশিয়া আর মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অংশেও অনুরূপ মতপ্রকাশ করা হয়েছিল ১৯২৯ সালের বসন্তকালে। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের কৃষিজাত দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল ভীষণ: শ্রমজীবী জনগণের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং শিল্পে প্রয়োজনীয়

কাঁচামালের যোগান দেওয়া যাতে সম্ভব হয়, এমন অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে তাগিদ আলোচ্য কাল-পর্যায়ে খুবই স্বাভাবিক ছিল। ১৯২৯ সালের বসন্তে এবং গ্রীষ্মে সর্বাত্মক যৌথকরণ অভিযান চালাবার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল।

কৃষককুলের বিভিন্ন বিস্তৃত অংশ যৌথখামারে শামিল হতে উৎসুক ছিল। গরিব আর মাঝারি কৃষকদের জোতজমাগুলোর পঞ্চমাংশ যৌথখামারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল বছরের শেষাশেষি। প্রথম পাঁচসালা (১৯২৮—১৯৩২) পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ধরে ফেলা হয়েছিল ১৯২৯ সাল শেষ হবার আগেই। ১৯২৯ সালে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী অধিবেশন থেকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে আর-একটা ঐতিহাসিক পর্ব শুরু হতে যাচ্ছিল।

১৯২৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামগুলিতে কর্মব্যস্ততার প্রাবল্য ছিল বিপ্লবের সময়কারই মতো। কৃষিকাজে ব্যাপৃত লক্ষ লক্ষ মানুষের তখনকার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল নতুন জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনুপ্রেরণা, যা শহরের বিশেষক উপাদান হয়ে উঠেছিল আগেই। নতুন নতুন নির্মাণ-প্রকল্প আর সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলনে নতুন নতুন নায়ক সম্বন্ধে তথ্যাদি পত্র-পত্রিকা আর রেডিও অনুষ্ঠান মারফত প্রচারিত হত প্রতিদিনই। গড়ে উঠছিল নতুন নতুন কল-কারখানা, গ্রামাঞ্চলে বিজলী বাতি দেখা দিচ্ছিল আরও ঘন ঘন। কৃষকদের ঘরে ঘরে আইকনের বরাবরকার জায়গাটায় দেখা দিচ্ছিল লাউডস্পীকার; ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য কৃষিযন্ত্র দেখা যেতে থাকল আরও হামেশা। শহরের শ্রমিক আর গ্রামের কৃষকদের মধ্যে সহযোগের নতুন নতুন ধরনধারনের প্রসার ঐ বছরগুলিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পার্টি এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনগুলিতে গৃহীত একটা প্রস্তাব অনুসারে, বড় বড় কল-কারখানাকে নির্দিষ্ট কোন

কোন গ্রামের পৃষ্ঠপোষক করা হত, তারা দলে দলে কর্মী পাঠাত স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে গ্রামাঞ্চলে বলশেভিক কর্মনীতির মূল উপাদানগুলির ব্যাখ্যা দেবার জন্যে, শিক্ষা আর সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সাহায্য করতে এবং অনেক সময়ে কৃষকদের দৈনন্দিন কাজে আনুকূল্য করার জন্যে। পৃথক পৃথক গ্রাম এবং পরে গোটা গোটা অঞ্চল ঐসব কল-কারখানার সঙ্গে উৎপাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে প্রতিযোগিতার বিশেষ ধরনের চুক্তি করত, তাতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরা গ্রামবাসীদের সমর্থন করার নিশ্চয়তা দিত, কৃষকদের জরুরী প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আরও বেশি বেশি পরিমাণে উৎপাদন করার প্রতিশ্রুতি দিত, আর বিভিন্ন যৌথখামার স্থাপনে কৃষকেরা আরও বেশি সমবেত প্রচেষ্টা নিয়োগ করত, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রকে শস্য এবং অন্যান্য জাতদ্রব্য সরবরাহ করার পরিকল্পনা তৈরি করত।

তারা যৌথখামারে শামিল হল

সাধারণত যৌথখামারগুলি সংগঠিত করার কাজে সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত কমিউনিস্ট, কমসোমল সদস্য এবং নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের কাছে সুপরিচিত অ-পার্টি কর্মীরা। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল গরিব কৃষক, যারা গৃহযুদ্ধে লড়েছিল। কৃষকদের মধ্যে তাদের যে-প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সেটা সর্বাত্মক যৌথকরণে সাফল্যের জন্যে খুবই গুরুত্বসম্পন্ন ছিল, তার বিশেষ কারণ ছিল এই যে, তখনও বড় বড় সমস্যার সমাধান বাকি ছিল; খামারের যন্ত্রপাতির ঘাটতি ছিল গুরুতর, আর কুলাকদের বিরোধিতা ছিল বিশেষভাবে হিংস্র।

ঐ সময়ে কুলাকদের হাতে ছিল মোট কৃষক জোতজমার প্রায় চার-পাঁচ শতাংশ — অর্থাৎ, মোটামুটি ১১,০০,০০০টা। কুলাকেরা তখনও সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিরোধিতা করছিল — সেটা সোভিয়েতবিরোধী আলোড়ন আর হুমকি দিয়েই শুধু নয়, তারা আরও চালাত অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড আর সন্ত্রাস।

গ্রাম্য প্রলেতারিয়েত — আগেকার খেত-মজুরেরা — বিশেষ উঁচু মাত্রায় সুশৃঙ্খল সংগঠন দিয়ে কুলাকদের বাধা দিয়েছিল। কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা ব্যবহার করত একটা জাতিরূপী প্রলেতারীয় অস্ত্র — ধর্মঘট। ১৯২৯ সালে ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনগুলির খতিয়ানের মধ্যে এই রকমের গোটা-পঞ্চাশেক ধর্মঘটের উল্লেখ ছিল। এইসব খেত-মজুর নিছক আর্থনীতিক প্রকৃতির দাবিদাওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকত না — তারা গ্রামাঞ্চলের শেষ শোষক শ্রেণীটাকে খতম করে দেবার জন্যেও সর্বশক্তিপ্রয়োগে চেষ্টা করত। উত্তর ককেশাসে এই রকমের একটা ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী খেত-মজুরেরা স্থানীয় কৃষকদের উদ্দেশে এই আবেদন করেছিল: 'কমরেডসব, আমরা মজুরি করব না চিরকাল। চিরকাল আমরা কুলাকদের জন্যে কাজ করব না। কুলাকদের পরাস্ত

করার জন্যে আপনারা যৌথখামারে একজোট হন, গড়ে তুলুন সমাজতান্ত্রিক কৃষি।’

শিল্প শ্রমিক, জনসংগঠন এবং সরকারী সংস্থাগুলি ধর্মঘটীদের প্রবল সমর্থন দিয়েছিল — যেমন, কিয়েভের কাছে একটা গ্রামে দু’-সপ্তাহের ধর্মঘটের সময়ে কিয়েভের ট্র্যাম ডিপো এবং ট্যানারি শ্রমিকেরা তাদের মজুরির একাংশ পাঠিয়েছিল ধর্মঘটী খেত-মজুরদের সাহায্য করার জন্যে। যেসব কুলাক শ্রম-আইন লঙ্ঘন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল; আগেকার খেত -মজুরদের আরও বেশি কাজ দেবার জন্যে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রীয় খামার ট্রাস্ট আরও একটা খামার গড়েছিল।

১৯২৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষকদের বড় বড় অংশ যৌথকরণ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী স্তর মাঝারি কৃষকেরা যৌথখামারে শামিল হতে আরম্ভ করল, এই নতুন ঘটনটা পরে ঐ সময়কার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। ঘটনাস্রোতে কুলাকদের উৎখাত করা এবং তাদের কার্যকরণের পরিধি গণ্ডিবদ্ধ করার কর্মনীতি থেকে শ্রেণী হিসেবে তাদের রাজনীতিগতভাবে খতম করে দেবার কর্মনীতি ধরবার প্রয়োজন দেখা দিল। শস্য উৎপাদনে কুলাকদের ভূমিকা কয়েক বছর আগে যতখানি গুরুত্বসম্পন্ন ছিল, তখন আর ততটা ছিল না। ১৯২৯ সালে যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলি রাষ্ট্রের কাছে শস্য বিক্রি করেছিল কুড়ি লক্ষ টনের বেশি — অর্থাৎ কিনা, আগের বছর কুলাকরা রাষ্ট্রের কাছে যতটা বিক্রি করেছিল ততটাই। এইভাবে, যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলি উৎপাদনশীল শক্তি হিসেবে কুলাকদের জায়গা নেবার প্রয়োজনীয় বৈষয়িক বনিয়াদ হয়ে উঠল।

শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের খতম করা বলতে তাদের দৈহিকভাবে খতম করা বুঝায় নি কখনও। শুধু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের হন্যে

শত্রুরাই সুপরিকল্পিতভাবে ঐ মিথ্যাটা রটিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এখনও তা করে চলেছে — সেটা তাদের নিজেদের অভিসন্ধি হাসিল করার জন্যে। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে কুলাকদের বঞ্চিত করা এবং এইভাবে শ্রমজীবী জনগণের উপর শোষণের যাবতীয় সম্ভাবনা রহিত করাই ছিল কার্যক্ষেত্রের উদ্দেশ্য। গোড়ায় বহু যৌথখামার বেশকিছু প্রাক্তন কুলাককে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটনাবলির মধ্যে দেখা গেল, অপেক্ষাকৃত কর্মপটু এবং অভিজ্ঞ সংগঠক হিসেবে ঐসব কুলাক শিগগিরই বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে বসে গিয়ে কৃষির নতুন যৌথখামার ব্যবস্থাটাকে বানচাল করতে লেগেছিল। বিষয়-সম্পত্তি যৌথখামারের হাতে তুলে দিতে নারাজ কুলাকেরা তাদের পশুগুলোকে কেটে মাংস খেত, সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করে দিত এবং তাইই করতে প্ররোচিত করত অন্যান্য কৃষককে। এইসব নাশকতাকারীদের ক্রিয়াকলাপ আটকাবার জন্যে শেষপর্যন্ত বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। একটা সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে, যেসব এলাকায় সর্বাত্মক যৌথকরণ চলছিল সেখানে জমি ইজারা দেওয়া এবং জন খাটানো নিষিদ্ধ হয়েছিল; কুলাকদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং কুলাকদের উৎখাত করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন স্থানীয় সরকারী সংস্থাকে। স্বভাবতই, ঐ পরিস্থিতিতে আইনলঙ্ঘনকারীদের যৌথখামার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। যেসব এলাকায় সর্বাত্মক যৌথকরণ চলছিল সেগুলিতে ১৯৩০ সালের গোড়া থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে মোট ২,৪০,০০০টা কুলাক পরিবারকে উৎখাত করা হয়েছিল। কুলাকদের এইভাবে বেদখল করাটা ছিল গরিব আর মাঝারি কৃষকদের নিজেদেরই চালানো প্রশাসনিক ব্যবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে তৈরি বিভিন্ন কমিশন কুলাকদের বিষয়-আশয় আর পশুর তালিকা তৈরি করে সেগুলো তুলে

দিত যৌথখামারের হাতে। উৎখাত-করা কুলাকদের ঘর-বাড়িতে বসানো হত ইস্কুল, ক্লাব আর সাধারণের পাঠাগার। উৎখাত করা হয়েছিল কুলাক পরিবারগুলোর শুধু একটা অংশকেই: সরকারী সিদ্ধান্তে কেবল সন্ত্রাসবাদী আর অন্তর্ঘাতক দস্যুদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুবিধি ছিল। কতকগুলি কুলাক পরিবারকে দেশের বিভিন্ন সুদূর এলাকায় পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। অধিকাংশ কুলাককে (অন্তত ৭৫ শতাংশ) পুনর্বাসিত করা হয়েছিল তারা গোড়ায় যেসব প্রশাসনিক এলাকায় ছিল তার ভিতরেই, তাদের বিষয়-সম্পত্তির একাংশ রাখতেও দেওয়া হয়েছিল — অতিরিক্ত জন না-খাটিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট জোতজমা নিয়ে কাজ চালাবার জন্যে যতখানি অত্যাবশ্যক।*

মেহনতী কৃষককুল আর দেশের সমস্ত মেহনতী উভয়েরই স্বার্থে পরিচালিত কৃষির যৌথকরণের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সমাজে সবচেয়ে সংগঠিত এবং পরিচালক শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর বিপুল প্রয়াস। যৌথখামারগুলি গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করার জন্যে ১৯২৯ সালের শেষে ২৫,০০০ শ্রমিককে গ্রামে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তারা ছিল প্রথমত এবং সর্বোপরি কমিউনিস্টরা, যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল সাংগঠনিক কাজে। তবে, পরিকল্পিত সংখ্যাটাকে অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা, ১৯৩০ সালের গোড়ায় গ্রামে গিয়েছিল প্রায় ৩৫,০০০ শ্রমিক। এরই সঙ্গে সঙ্গে, যৌথকরণ অভিযানে কুড়ি কুড়ি শিল্পায়তনের সংশ্লিষ্ট হবার ব্যাপারটাকে প্রবলতর করে তোলা হয়েছিল এবং খামারের যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন

* আগে যারা ছিল কুলাক তাদের নতুন করে শিক্ষাদীক্ষা দেবার জন্যে সোভিয়েত সরকার বিস্তর কাজ করেছিল। সামাজিকভাবে উপযোগী কাজে শামিল হবার পরে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পরে হয়ে উঠেছিল কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক, তারা পেয়েছিল সমস্ত অধিকার, আর নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে তাদের অনেকে ফ্রন্টে লড়াই করেছিল এবং সাহস আর বীরত্বের জন্যে সরকারী সম্মানচিহ্ন পেয়েছিল।

রাসায়নিক সার এবং কৃষির জন্যে প্রয়োজনীয় আরও নানা পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন কারখানা নির্মাণ আর উন্নয়নের জন্যে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পার্টি সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলের কমিউনিস্টরা তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রবলতর করে তুলেছিল। ১৯৩০ সালের মে মাসে যৌথখামারগুলিতে ছিল ৩ লক্ষ ১৩ হাজারের বেশি পার্টি সদস্য এবং ৫,৫৩,০০০ জন কমসোমল সদস্য। এ সংখ্যাটা ছিল মোট কৃষক শ্রমবাহিনীর মাত্র ৬·৫ শতাংশ — অর্থাৎ, প্রতি এক-শ' জন অ-পার্টি কৃষকের পাশে ছিল তিন জন কমিউনিস্ট আর ছ'জন কমসোমল সদস্য। অঙ্কটাকে আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য মনে হতে পারে, কিন্তু তারা ছিল একটা সংগঠিত, আগুয়ান আর একমনা বাহিনীর প্রতিনিধি, এই বাহিনীর সদস্যরা তাদের সবার অভিন্ন লক্ষ্যসাধনের জন্যে কাজ করছিল যেন একটিমাত্র মানুষের মতো — এতেই নিহিত ছিল তাদের শক্তি। স্থানীয় কর্মীরা সমবেত হয়ে তাদের সমর্থন করেছিল, জনগণও অচিরেই এগিয়ে এসেছিল তাদের পথ ধরে। তাদের অনেকেরই প্রাণসংশয় হত প্রায়ই। সোভিয়েত কৃষিক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্যে জীবন দিয়েছিলেন, এমন বেশকিছু নাম রয়েছে ঐ সময়কার ইতিহাসের পাতায়। বিভিন্ন যৌথখামার, প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক বসতি, রাস্তা আর ইস্কুল রয়েছে এইসব বীরের নামে, কিন্তু তাঁদের বীরত্বের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন স্মরণিক হল পয়মন্ত যৌথখামারগুলি, যেগুলিকে গড়ে তুলতে তাঁরা সাহায্য করেছিলেন তৃতীয় দশকের শেষের দিকে এবং চতুর্থ দশকের গোড়ায়।

যৌথকরণের প্রারম্ভিক পর্বের সাফল্য বেশকিছু লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। অনেকেই একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গিয়েছিল যে, যেহেতু সোভিয়েত জনগণ গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হতে পেরেছে, বুর্জোয়া আর ভূস্বামীদের তাড়িয়ে দিয়েছে, কল-কারখানা সব

গড়ে তুলতে পেরেছে নিজেদেরই প্রচেষ্টায়, কাজেই, গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার কাজটাও হবে সংক্ষিপ্ত এবং সহজ ব্যাপার।

১৯২৯ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একটা অধিবেশনে গস্‌প্লানের সভাপতি গ্লেব ক্র্‌জিজানভ্‌স্কি বলেছিলেন: 'কোন একটা অঞ্চলে কৃষক জোতজমাগ্‌লোর ৫০ শতাংশের বেশির যৌথকরণে আমরা কৃতকার্য হলে, তার থেকে কী সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে? আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, আগে যারা গেছে তাদের পথ ধরে বাদবাকি কৃষকদের চলতে প্রস্তুত হয়ে যাবার উপযোগী অবস্থা রয়েছে।' ১৯৩০ সালে জনকমিসার পরিষদের সভাপতি পদে নিয়্‌ক্ত ভিয়াচেস্‌লাভ মলোতভ মনে করেছিলেন, ১৯৩০ সালে দেখা দেবে 'যৌথকৃত বিভিন্ন অঞ্চলই শ্‌ধ্‌ নয় — গোটা গোটা যৌথকৃত প্রজাতন্ত্রও'।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন ছিল উত্তেজনায় ঠাসা, শিল্পযোজন চলছিল দ্র্‌তগতিতে, কৃষকেরা যৌথখামারে শামিল হচ্ছিল দলে-দলে, এমন সময়ে সমাজতান্ত্রিক ধারায় কৃষির কাঠামটাকে র্‌পান্তরিত করার জর্‌রী তাগিদ স্বাভাবিকই এবং বোধগম্য। কিন্তু, যেসব ক্ষেত্রে যৌথকরণ হয়েছিল প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক কাজ ছাড়াই, যেসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং স্‌যোগ্য সংগঠকের কমতি ছিল, সেসব ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি ছিল অনিবার্য। বহ্‌ ক্ষেত্রে কৃষকদের যেভাবে যৌথখামারে শামিল করানো হয়েছিল, সেটাকে স্বেচ্ছাম্‌লক বলা চলে না কোনমতেই। বাস্তবিকপক্ষে, এমনসব ঘটন ছিল যখন কোন কোন কৃষক যৌথখামারে যোগ দিতে দ্বিধা করলে, কিংবা সিদ্বান্তটা নিতে কিছ্‌টা দেরি করতে চাইলে, তাদের ধরা হত সোভিয়েতবিরোধী হিসেবে। মাঝারি কৃষকদের অনেক সময়ে কুলাকদের দলে ফেলা হত; বসতস্থল, ভেড়া, ছাগল, হাঁস-

মুরগি আর সবজি-খেতের যৌথকরণে বাধ্য করার ঘটনাও ছিল বিস্তর। তাছাড়া আবার, কোন কোন শস্য-উৎপাদন এলাকায় বড় বেশি লোককে নিয়ে অতি বিশাল সব খামার স্থাপন করার চিন্তা পেয়ে বসেছিল যৌথকরণের পথিকৃৎদের।

পাশাপাশি আর-একটা ঘটন ছিল উরাল অঞ্চলে, পশ্চিম সাইবেরিয়ায়, ইউক্রেনে এবং দেশের আরও কোন কোন অংশে কমিউনের স্থাপনা। এইসব কমিউনে মেয়ে-পুরুষেরা স্বেচ্ছায় বারোয়ারি করে ফেলেছিল উৎপাদনের মূল উপকরণগুলো শুধু নয়, সমস্ত বসতস্থল, ভেড়া, ছাগল আর হাঁস-মুরগিও। সাধারণত তারা যৌথ আয় বিলি করত সমান-সমান ভাগে। কমিউনের আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান বিষয় নিয়েও আলোচনা চলত সমষ্টিগত ভিত্তিতে।*

এই ধরনের কমিউনগুলির প্রতিষ্ঠা (শহরে আর গ্রামাঞ্চলেও) ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন নীতি অনুসারে, সমষ্টিগত মনোবৃত্তি দিয়ে পরিচালিত হয়ে জীবন রূপান্তরিত করার জন্যে সেগুলির সদস্যদের অত্যুৎসাহী কামনার ফল। কিন্তু উৎপাদন-শক্তিগুলির মাত্রা, শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক অবস্থা এবং আয় বন্টনের ঢালাও সমতার নীতি উৎপাদনবৃদ্ধির অনুকূল ছিল না। বহু ক্ষেত্রে এইসব কমিউনের জীবন লোকের মন থেকে সম্পত্তির মালিকানার প্রবৃত্তি দূর করতে এবং পারস্পরিক মর্যাদা আর সাথিত্বের মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক হলেও, এইসব সংঘের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় নি। সেগুলোর কোন-কোনটা ক্রমে ভেঙে গিয়েছিল, কোন-কোনটাকে পুনর্গঠিত

---

* সাধারণত আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কমিউন দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রেও। শ্রমিকেরা তাদের মজুরি মিলিয়ে গড়ত সাধারণের তহবিল, খেত একত্রে বারোয়ারি ব্যবস্থায়, এবং থাকার খরচ, পরব, লেখা-পড়া, জামা-কাপড়, ইত্যাদি বাবত দিত সমান-সমান।

করা হয়েছিল কারখানায় উৎপাদন-ব্রিগেড হিসেবে কিংবা উৎপাদন-আর্টেল, অর্থাৎ সাধারণ যৌথখামার হিসেবে।

বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা কয়েক বারই জোর দিয়ে বলে গেছেন, কৃষকের কৃষির পুনঃসংগঠনের ব্যাপারে বিস্তর বাধাবিঘ্ন সংশ্লিষ্ট থাকে, কেননা পৃথক পৃথক কৃষক-খামারীর মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ক্ষুদে সম্পত্তি-মালিকেরই মতো। তার উপর, এই যৌথকরণ অভিযান যখন পরিচালিত হচ্ছিল তখন বৈরকার পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলো দিয়ে পরিবেষ্টিত সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য হয়ে একই সময়ে শিল্পের প্রসার ত্বরায়িত করতে হচ্ছিল, প্রতিরক্ষাক্ষমতা আরও মজবুত করতে হচ্ছিল, আর কৃষিকে পুনঃসংগঠিত করতে হচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক ধারায়, তাই সেটা হয়ে উঠেছিল আরও জটিল।

প্রারম্ভিক পর্বে ভুলভ্রান্তি এবং পার্টির কর্মনীতির বিকৃতির দরুন সবে যৌথখামারে শামিল-হওয়া বহু কৃষক যৌথখামারের উপর বিমুখ হয়ে পড়েছিল। যৌথকৃত জোতজমার সংখ্যা ১৯৩০ সালের বসন্তকালে ছিল মোট জোতজমার অর্ধেকের বেশি, কিন্তু ঐ বছরের মাঝামাঝি নাগাত সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছিল মোটামুটি ২৪ শতাংশ।

তবে, গ্রামগুলির সামাজিক পুনঃসংগঠন নিয়মিত করার জন্যে পার্টি এবং সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থাবলি ক্রমাগত বেশি সুফলপ্রসূ হয়েছিল। ভুলভ্রান্তিগুলোর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। যৌথকরণের কোন কোন সংগঠক যেসব চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের অপরাধ করেছিল সেগুলির পিছনকার বিভিন্ন কারণ জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এবং তার সঙ্গে স্তালিনের 'সাফল্যের দরুন বেসামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে; কীভাবে এবং কী প্রণালীতে ঐসব ভুলভ্রান্তি সংশোধন করতে হবে তাও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল

যৌথখামারের নতুন আদর্শ নিয়মাবলি, তাতে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল যৌথখামারের কর্তব্যগুলি কী, যৌথখামার স্থাপন করতে হয় কীভাবে, কী রকম হবে সদস্যদের দৈনন্দিন কাজের ধরনধারন। তাতে ব্যবস্থা ছিল যে, প্রত্যেক কৃষক তার বাড়ির লাগাও এক খণ্ড জমি রাখতে পারবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে, নিজের ছোটখাটো খামারের সরঞ্জাম রাখতে পারবে, আরও রাখতে পারবে কিছু গরু, ভেড়া, ছাগল আর হাঁস-মুরগি। তার সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, সমস্ত লাঙল কিংবা গাড়ি টানা পশু, বীজের মজুত এবং যৌথখামার চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় ঘর-বাড়ি হবে সামাজিক সম্পত্তি। কুলাকদের এবং ভোটদাতার অধিকার থেকে বঞ্চিত অন্যান্যদের যৌথখামারের সদস্য করা হত না। এই সময়ে রাষ্ট্র যৌথখামারগুলির জন্যে আরও অর্থবরাদ্দও করেছিল, তাদের কয়েকটা বিশেষ সুযোগসুবিধা দিয়েছিল, কোন কোন কর থেকে তাদের রেহাই দিয়েছিল। কৃষিতে উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ সংহত করার দিকে সমস্ত রাষ্ট্রীয় আর জনসংগঠনকে পার্টি আর সরকার বারবার পরিচালিত করেছিল।

১৯৩০ সালের শরৎকালে এইসব ব্যবস্থার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হল। যৌথখামারগুলিতে ফসল উঠল পৃথক পৃথক কৃষকদের চেয়ে ভাল, রাষ্ট্রকে তারা সরবরাহ করল সমগ্র পণ্য শস্য উৎপাদনের প্রায় তৃতীয়াংশ। রাষ্ট্র-পরিচালিত মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি থেকে আনুকূল্য-পাওয়া খামারগুলির রেকর্ড হল সবার সেরা। ১৯৩১ সাল নাগাদ এমন স্টেশন চালু ছিল ১,৪০০টা, সেগুলিতে ট্র্যাক্টর ছিল মোট ৬২,৪০০টা। ১৯৩১ সালের বসন্তকালে মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি সমস্ত যৌথখামারের চতুর্থাংশের চাহিদা মেটাতে পেরেছিল এবং তাদের আবাদী জমির তৃতীয়াংশে কাজ দিয়েছিল। যৌথখামারীদের আয় হল পৃথক পৃথক কৃষকদের চেয়ে বেশি — এটা ছিল বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। অধিকতর অনুকূল অবস্থায়ই

আরম্ভ হয়েছিল যৌথখামারগুলিতে কৃষকদের পরবর্তী ব্যাপক সমাগম। তার পরিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি থেকে: প্রতিদিন গড়ে উঠেছিল মোটামুটি ১১৫টা যৌথখামার, একটা-দুটো মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন এবং দুটো রাষ্ট্রীয় খামার।

যৌথখামারের আয় বণ্টনের নতুন নতুন নীতি গড়ে উঠেছিল ক্রমে। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখা গিয়েছিল, আয় ভাগাভাগি হবে কৃষকের পরিবারের আকার, কিংবা প্রয়োজন, কিংবা যৌথখামারে তাদের নিয়ে-আসা বিষয়-আশয়ের পরিমাণ অনুসারে নয়। চালু-করা নতুন পদ্ধতি অনুসারে যৌথখামারীদের করা কাজের পরিমাপ হত কার্য-দিনের সংখ্যার হিসেবে, তাঁতে কাজের গুণাগুণ আর পরিমাণ দুইই এবং তাতে নিযুক্ত শ্রম-প্রচেষ্টা বিবেচনায় রাখা হত। ফুরনের কাজও চালু করা হয়েছিল। কোন কাজের কত দাম হতে পারে, সেটা কার্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তিসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্য যথাযথ মাত্রায় নির্ধারণ করা যেত।

যৌথকরণের নিষ্পত্তিমূলক ফল পাওয়া গিয়েছিল ততদিনে। প্রায় দেড় কোটি পৃথক পৃথক জোতজমা আর আবাদী জমির বারো-আনির বেশি নিয়ে তখন যৌথখামার ছিল মোট ২,১১,০০০টা। মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনের দেওয়া সুযোগসুবিধা পেত যৌথখামারগুলির তৃতীয়াংশ, এইসব খামারেই ছিল দেশের সমস্ত যৌথখামারের মোট আবাদী এলাকার প্রায় অর্ধেক। সোভিয়েত কৃষির ব্যবহারের জন্যে কৃষি যন্ত্রপাতি তখন ছিল মোট ১,৪৮,৫০০টা।

১৯৩২ সালে কুলাক খামার ছিল ৬০,০০০টা, সেগুলিতে জমি ছিল মোট মাত্র পঁচিশ লক্ষ একর। কুলাকরা আর আগের মতো একটা পৃথক শ্রেণী ছিল না, তবে, দেশের কোন কোন অংশে, যেমন তাজিকিস্তানে ১৯৩৪ সাল অবধিও তাদের শুধু কোন

কোন অধিকার সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে তার চেয়ে কঠোর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি; উজবেক প্রজাতন্ত্রে কুলাক শ্রেণী মিলিয়ে গিয়েছিল মাত্র ১৯৩৪ সালে, আর দাগেস্তানের পার্বত্য এলাকাগুলিতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ হবার আগে সেটা ঘটে নি।

বাদবাকি শোষক গ্রুপগুলির প্রতিরোধের দরুন কৃষির এবং সাধারণভাবে দেশের বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল। এটা হয়েছিল সর্বোপরি দেশের পশুসংখ্যার ক্ষেত্রে, — প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে এই সংখ্যাটা আগেকার সংখ্যার প্রায় অর্ধেকে দাঁড়িয়েছিল।

সে যা-ই হোক, প্রধান সমস্যাটার মোকাবিলা করতে গিয়ে সোভিয়েত কৃষি কৃতকার্য হল — সেটা হল শ্রমজীবী জনগণের খাদ্য আর শিল্পের জন্যে কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান এবং দূরপাল্লার প্রয়োজনে মজুদ গড়ে তোলা।

সর্বাত্মক যৌথকরণ অভিযান শুরু হবার আগে রাষ্ট্রের শস্য কেনার পরিমাণ ছিল বছরে গড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ টনের কিছুটা বেশি, আর অভিযানটা চলার সময়ে পরিমাণটা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের বেশি। যৌথকরণের কল্যাণে তুলোর যোগানও হয়েছিল পর্যাপ্ত। তবে, আরও একটাকিছু ছিল আরও বেশি গুরুত্বসম্পন্ন: কৃষিক্ষেত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রীরা উৎখাত হয়ে গিয়েছিল, আর কৃষি প্রলেতারিয়েত — খেত-মজুরও হয়ে পড়েছিল অতীতের বস্তু। প্রথম পাঁচসালা কালপর্যায়ে আগেকার দশ লক্ষর বেশি খেত-মজুর যৌথখামারে যোগ দিয়েছিল, লাখ-নয়েক কাজ শুরু করেছিল রাষ্ট্রীয় খামারে কিংবা মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনে, আর বাদবাকিরা গিয়েছিল কলে-কারখানায়, কিংবা পড়াশুনা করে আপিসের কর্মচারী হবার সুযোগ পেয়েছিল।

যৌথকরণ অভিযান উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাল, লক্ষ লক্ষ প্রাক্তন ক্ষুদে মালিক

যৌথভাবে কাজ করতে শিখতে আরম্ভ করল। গ্রামাঞ্চলে কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বেশ বাড়তে থাকল। কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যাধিক্য, গরিবি আর জেরবার হবার বিপদ আর রইল না কৃষকদের জীবনে। অল্প কিছুকাল আগেও যৌথখামারীরা ছিল সোভিয়েত জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ, এখন তারা সংখ্যার দিক দিয়ে হয়ে উঠল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা শ্রেণী। এর অর্থ হল, সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হল যেমন শহরে, তেমনি গ্রামেও।

কাজ আর জীবনযাত্রার অবস্থার রূপান্তর। বেকারি খতম

সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রাপ্রণালীতে বিভিন্ন লক্ষণীয় পরিবর্তন এনে দিল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা। বিপুল সংখ্যায় কল-কারখানা, খনি আর তৈলক্ষেত্র নির্মাণের ফলে উত্তরে আর কাজাখস্তানে কোন কোন অঞ্চল, সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্য হয়ে উঠল নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র। ঐ কালপর্যায়ে মানচিত্রে দেখা দিয়েছিল ষাটটা শহর আর বড় বড় শিল্প-বসতি। শহর প্রসারের প্রক্রিয়াটা বিপ্লবের আগেই আরম্ভ হয়ে খুবই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু প্রক্রিয়াটা যথার্থই ব্যাপক পরিসরে চলেছিল তৃতীয় দশকের শেষ এবং চতুর্থ দশকের গোড়ার দিকের আগে নয়। অর্থনীতির ব্যাপক পুনর্গঠন শুরু হওয়া অবধি সময়ে শহর আর গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যে অনুপাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বদলায় নি — অর্থাৎ, তখনও শহরের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশ। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে এই অংকটা বেড়ে হয়েছিল ২৪ শতাংশ। এই বৃদ্ধিটা হল ১৮৯৭ এবং ১৯২৬ সালের আদমশুমারের মধ্যে তিরিশ বছরে যা হয়েছিল তার সমান — এটা হল শহরের জনসংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধি।

শহরের জনসংখ্যা বাড়ল কেবল নতুন নতুন শহর গড়ার ফলে নয়; পুরন শিল্পকেন্দ্রগুলোও বাড়ছিল দ্রুত। শিল্পযোজনের বিপুল পরিসরের ফলে কল-কারখানার শ্রমিক এবং আপিসের কর্মচারীদের সংখ্যা স্বভাবতই অনেক বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে শহরবাসীদের সংখ্যা বেড়েছিল ৪৪ শতাংশ, আর শ্রমিক-কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়েছিল দ্বিগুণের বেশি — ১,০৮,০০,০০০ থেকে ২,২৬,০০,০০০: এর মধ্যে ছিল ৮০,০০,০০০ শিল্প শ্রমিক (আগে ছিল ৩৮,০০,০০০), ২৩,০০,০০০ নির্মাণ শ্রমিক (আগে ছিল ৭,০০,০০০), ২০,০০,০০০ পরিবহন শ্রমিক (আগে ছিল ১৩,০০,০০০)। এই বৃদ্ধি ঘটেছিল অর্থনীতির কেবল সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে। ১৯৩২ সাল নাগাত দেশের শ্রম-বাহিনীর এক শতাংশেরও কম নিযুক্ত ছিল পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রে। পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলোর এই দ্রুত উৎখাত এবং জন খাটানোর অবসান পরিকল্পনারচয়িতাদের সবচেয়ে বড় আশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারি একেবারেই খতম হয়ে গেল — এটা হল ঐ সময়কার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যেও বেকারের সংখ্যা বাড়ছিল — সংখ্যাটার সর্বোচ্চ মাত্রা হয়েছিল ১৭,০০,০০০, তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে মোটামুটি ৯০,০০,০০০ জনের পুরো কাজ ছিল না। ভূমি-অর্থনীতিতে লোকসংখ্যাধিক্য বলে পরিচিত এই অবস্থাটা ছিল নগণ্য-ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক পৃথক কৃষক জোতজমার প্রাধান্যের সরাসরি পরিণতি। প্রতি বছর পনর লক্ষ অবধি কৃষক দলে দলে শহরে গিয়ে শিল্পে কিংবা নির্মাণক্ষেত্রে কাজ খুঁজত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সময়কার বেকারির মর্মটা বিদেশের অনুরূপ ব্যাপার থেকে পৃথক ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে

অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হবার সময়ে বেকারের সংখ্যা বাড়ছিল। শিল্প অবিরাম সম্প্রসারিত হচ্ছিল, শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছিল সমানে। অনুরূপ বৃদ্ধি ঘটছিল নির্মাণ আর পরিবহন ক্ষেত্রেও। কিন্তু, একই সময়ে পুরো-কাজ না-করা কৃষকেরা ভিড় করে শহরে আসছিল সর্বক্ষণ, এই কারণেই বেকারদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটা ছিল যোগ্যতাবিহীন। বেকার শিল্প শ্রমিক ছিল মোট সংখ্যার ১৫-১৭ শতাংশের বেশি নয় — বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর কারণ ছিল শ্রমিকদের খুব বেশি সংখ্যার এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করা।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থাটা ছিল খুবই পৃথক, কেননা এসব দেশে বেকারি সাধারণত শিল্পে তেজিমন্দির সঙ্গে জড়িত ছিল। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বসে-থাকা শ্রমিকদের মধ্যে সব সময়েই থাকত বহু দক্ষ শ্রমিক।

তবে, তৃতীয় দশকে বেকারি একটা গুরুতর সমস্যা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নেও। পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ তখন রাষ্ট্রের হাতে ছিল না। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারের কর্মনীতির মূলধারা স্পষ্টই: সেটা হল প্রত্যেকটি সোভিয়েত নাগরিকের কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা এবং চিরকালের জন্যে বেকারি দূর করা।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলি আর ট্রেড ইউনিয়ন যা পারে যাবতীয় সমর্থনই দিয়েছিল বেকারদের। লেবর এক্সচেঞ্জে যাদের নাম রেজিস্ট্রি করা ছিল তাদের কয়েকটা বিশেষ অধিকার নিশ্চিত ছিল: তাদের বাড়িভাড়া দিতে হত সাধারণ পরিমাণের অর্ধেক, রেল আর জাহাজ ভাড়া তাদের জন্যে ছিল অর্ধেক, তারা কোন কোন ভাতা পেত, আর লাঞ্চ পেত সস্তায় কিংবা অমনি। বেকারদের অনেককে রাস্তা তৈরি করা, পার্ক আর বাগান তৈরি করা, রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া এবং জলাভূমির জল নিষ্কাশনের কাজ দেওয়া হত।

বহু ট্রেড ইউনিয়ন তাদের তহবিলের একাংশ দিত বেকার রিলিফের জন্যে। কিন্তু, এইসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও বেকারি একটা বড়রকমের সামাজিক সমস্যা হয়েই ছিল — তার ক্ষতিকর ক্রিয়া ঘটত সমগ্র জনসংখ্যার এবং বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের উপর।

সোভিয়েত সরকার, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব এবং শ্রম জনকমিসারিয়েত বেকারি সমস্যা নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আর পলিটব্যুরোতেও সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা করার সময়ে এই সমস্যাটার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই কাজের জন্যে যাঁরা দায়ী ছিলেন তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, ঐ পাঁচ বছরে শ্রম-বলের জন্যে চাহিদা খুবই বেড়ে যাবে, কিন্তু ঐ কালপর্যায় শেষে বেকারি একেবারেই খতম হয়ে যাবে, এমনটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। এই পরিস্থিতির বেলায়ও পূর্বাভাসদাতারা বাস্তব ঘটন দিয়ে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হলেন, এক্ষেত্রে নিজেদের হিসেবের ভুল তাঁরা স্বীকার করলেন বড় খুশি মনেই — এতে দেখা গেল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুবিধা-সৌকর্য এবং সারা দেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির দ্রুত সংহতি।

১৯২৯ সালের শেষাশেষি নাগাতই শ্রম জনকমিসারিয়েত ঘোষণা করেছিল: 'বছরের গত চতুর্থাংশ (অক্টোবর-ডিসেম্বর — সম্পাঃ) সংক্রান্ত অংকগুলোতে প্রয়োজনীয় শ্রম-লোকবলের প্রাপ্তিসাধ্যতার দিক থেকে পরিস্থিতি গুরুতর, কেননা রিজার্ভ যথেষ্ট নয়।' সমগ্রভাবে অর্থনীতির দিক থেকে শ্রমিকের ঘাটতির উল্লেখ করা হল এই প্রথম সরকারী দলিলে। ১৯৩০ সালে বেকারের সংখ্যা ঝপ্ করে নেমে গিয়েছিল: দেশে লেবর এক্সচেঞ্জগুলিতে সরকারীভাবে রেজিস্ট্রি-করা বেকার এপ্রিল মাসে ছিল ৮,৫০,০০০ জন, আর শরৎকাল নাগাত অংকটা কমে গিয়েছিল

৭৫ শতাংশ, ঐ বছরের শেষাশেষি লেবর এক্সচেঞ্জগুলো খালি হয়ে গিয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্দশ বার্ষিকী দিনে 'প্রাভ্‌দা'র প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরপে শিরোনামা ছিল: 'প্রলেতারীয়রা! সমস্ত দেশের শ্রমিকগণ! আজ আপনারা সাধারণের স্কয়্যারে, সভায় আর মিটিংয়ে সমবেত হয়ে পুঁজিতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র এই দুই আর্থনীতিক ব্যবস্থার সাধনগুলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন।

'মনে রাখবেন!

'পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে আছে:

'অযুত অযুত বেকার আর ক্রমবর্ধমান বিশ্ব সংকট, অযুত অযুত বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা, ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে বেড়ে-চলা গরিবি, ভুখা আর দৈন্যদশা। চলছে নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী রক্তস্নানের প্রস্তুতি।

'যে-দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের জয়জয়কার চলছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি:

'শিল্পের বিপুল প্রসার, বেকারি খতম, রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারের ভিত্তিতে বৃহদায়তনের যন্ত্রসজ্জিত কৃষি উৎপাদন, শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার উন্নততর অবস্থা এবং বলশেভিক পার্টি আর তার লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঘিরে তাদের সংহতি।'

পৃথিবী যখন অভূতপূর্ব আর্থনীতিক সংকটের আঘাতে-আঘাতে কেঁপে-কেঁপে ভেঙে-ভেঙে পড়ছিল তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন হল পৃথিবীর প্রথম দেশ যেখানে মানুষের কাজ করার পবিত্র অধিকার নিশ্চিত হল কার্যক্ষেত্রে। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের সামনে বিভীষিকাগুলোকে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাজগৎ আর আড়াল করতে পারছিল না। এই পটভূমিতে, যে-দেশ সবেমাত্র সমাজতন্ত্র গড়তে শুরু করেছিল সেখানে বেকারি

একেবারেই খতম হয়ে যাবার সাফল্যটা ছিল আরও বেশি গুরুত্বসম্পন্ন। বড়রকমের এই জয়টার অর্থ হল শ্রমজীবী জনগণের সমস্ত অংশের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিই শুধু নয়, এতে আরও এল একান্তভাবে নিয়োজিত উৎসাহ-উদ্দীপনার মেজাজ, আর লোকে অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে নিশ্চিত হল তাদের সমাজ যে-পথে পা বাড়িয়েছে সেটাই সঠিক।

তখনও যেসব বাধাবিপত্তি ঘিরে ছিল, শান্ত মনে এবং দৃঢ়ভাবে সেগুলোর মোকাবিলা করতে সোভিয়েত নর-নারীদের সহায়ক হয়েছিল এই প্রত্যয়। খাদ্য, বিভিন্ন অপরিহার্য ভোগ্য পণ্য, কাপড়-জামা, জুতো — সবেতেই ছিল রেশনিং। কারখানার ক্যাণ্টিনে আর দোকানে খাদ্যসামগ্রীর যোগান একটু ভাল করার সর্বাত্মক চেষ্টায় কারখানাগুলি আলু আর তরিতরকারি জন্মানো এবং পশুপালনের মতো অতিরিক্ত কাজ চালাত। আগুয়ান এবং তড়িতকর্মা শ্রমিকেরা অগ্রাধিকার পেত: বোনাস হিসেবে তাদের দেওয়া হত স্বাস্থ্যনিবাস আর ছুটিযাপন ভবনে যাবার টিকিট, কিংবা তাদের প্রচেষ্টার জন্যে পুরস্কার দেওয়া হত স্যুটের কাপড়, উপহারের ঘড়ি, এমনকি শুধু জুতোও।

শ্রমজীবী জনগণ বেশ ভালভাবেই জানত, এসব সমস্যা ছিল সাময়িক; তারা তো নিজেদের চোখেই দেখতে পেত কীভাবে ক্রমে কাজ আর জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল, সোভিয়েত শহরগুলির চেহারা বদলে যাচ্ছিল, গড়ে উঠছিল আরও আরও বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়, নিখরচ চিকিৎসাব্যবস্থা সংগঠিত হচ্ছিল ক্রমাগত ব্যাপকতর পরিসরে।

এই সময়ে শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জন্যে সাত-ঘণ্টার কাজের দিন চালু হয়েছিল; যারা ভূগর্ভে কিংবা অস্বাস্থ্যকর বৃত্তিতে কাজ করত তারা কাজ করতে শুরু করেছিল দিনে ছ'ঘণ্টার বেশি নয়। কমবয়সী আর গর্ভবতীদের জন্যে

বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার বছরগুলিতে সমাজবিমা বাবত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেড়েছিল তিনগুণ আর চিকিৎসাব্যবস্থা বাবত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেড়েছিল ৪·৫-গুণ। বৃহৎ পরিসরে গৃহনির্মাণ চলছিল সর্বত্র — মস্কোয়, লেনিনগ্রাদে, সমস্ত প্রজাতন্ত্রের রাজধানীতে এবং সমস্ত প্রধান শহরে গড়ে উঠছিল নতুন নতুন বসত-মহল্লা; তবে, এইসব শহরের জনসংখ্যা বাড়ছিল আরও বেশি দ্রুত। নতুন নতুন শহরে আর শিল্পকেন্দ্রে নির্মাণ-শ্রমিকদের সাধারণত থাকতে হত কোনমতে কাজ চলবার মতো চালাঘরগোছের ঘর-বাড়িতে, তাতে বেশির ভাগ আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ছিল না। অবস্থাটা আরও বেশি জটিল হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, এইসব প্রকল্পের বেশির ভাগই ছিল কেন্দ্র থেকে বহু দূরে দূরে — সেসব জায়গায় উত্তরের শীত, মধ্য এশিয়ার গরম আর বালুরাশি এবং দূর প্রাচ্যের তাইগার দুর্গম বনভূমির কঠোরতা বড় বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

কিন্ডারগার্টেন আর শিশুশালারও ভীষণ ঘাটতি ছিল, সাধারণের যানবাহনে ভিড় হত মাত্রাতিরিক্ত। তবে, সোভিয়েত মেহনতী জনগণের লক্ষণীয় মেজাজটাকে যা গড়ে তুলেছিল সেটা এইসব কঠোরতা আর কাঠিন্য নয়। নিকট অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করলেই, আর নিজেদের চারপাশে তাকালেই তারা দেখতে পেত কীসব বিরাট পরিবর্তন ঘটছিল আর তাতে অংশগ্রহণ করছিল তারা নিজেরাই। প্রথম পাঁচসালা কালপর্যায়ে কিন্ডারগার্টেনে জায়গা বেড়েছিল শহর অঞ্চলে ৬·৬-গুণ এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৯৩-গুণ। রেডিও আর বিজলী আলো শিগগিরই সর্বত্র মামুলি হয়ে দাঁড়াল। তখন যা ছিল সেইসব বসতস্থানে আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্যে বহু শহরে বৃহদায়তনের পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হল। প্রধান জল-

নল, স্বাস্থ্যবিধানের উপায়-উপকরণ, টেলিফোন যোগাযোগ, পার্ক আর সাধারণের উদ্যান রচনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে বড়রকমের অগ্রগতি হল আর-একটা গুরুত্বসম্পন্ন ঘটন। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যথার্থই দেশজোড়া পরিসরের ব্যাপার। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম কমসোমল কংগ্রেস আবেদন জানাল, যারা পড়তে-লিখতে জানে তারা যেন যারা তা জানে না তাদের সেটা শেখায়। 'লিক্‌বেজ' (রুশ ভাষায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ কথাটার সংক্ষেপ) এবং 'কুল্‌ৎপখোদ' (জনসংখ্যার বিস্তৃততম অংশে সাক্ষরতা প্রসারের অভিযান) মানে কী, তা জানত শিশুরাও। বহু যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামার বিশেষভাবে নির্দিষ্ট খেতে তোলা ফসল থেকে পাওয়া আয় আলাদা করে রাখত পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন-খাতা আর পেন্সিল কেনার জন্যে। শিল্পক্ষেত্রের আর অন্যান্য কর্মচারীরা এবং বিভিন্ন পেশার কর্মীরা এই অভিযানের জন্যে চাঁদা তুলে দিয়েছিল। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সাহায্য করার জন্যে কোন পারিতোষিক না-নিয়ে স্বেচ্ছায় খুবই বিস্তর কাজ করেছিল শহর আর গ্রামাঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরা — সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি শিক্ষকেরা। ফল যা হল তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়: ১৯২৭ সালে ইউরোপে সাক্ষরতা-মাত্রার তালিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান ছিল মাত্র উনবিংশ, কিন্তু ১৯৩২ সাল নাগাত প্রাপ্তবয়স্কদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পড়তে-লিখতে পারত। উপান্তবর্তী জাতীয় এলাকাগুলিতে অর্জিত ফল হয়েছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে সাক্ষরতা-মাত্রা বেড়েছিল তাজিকিস্তানে ৪ থেকে ৫২ শতাংশে, উজবেকিস্তানে ১২ থেকে ৭২ শতাংশে, ট্র্যান্স-ককেশিয়ায় ৩৬ থেকে ৮৬ শতাংশে।

৮ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাও চালু হয়েছিল এই সময়েই। শিক্ষক হিসেবে তালিম
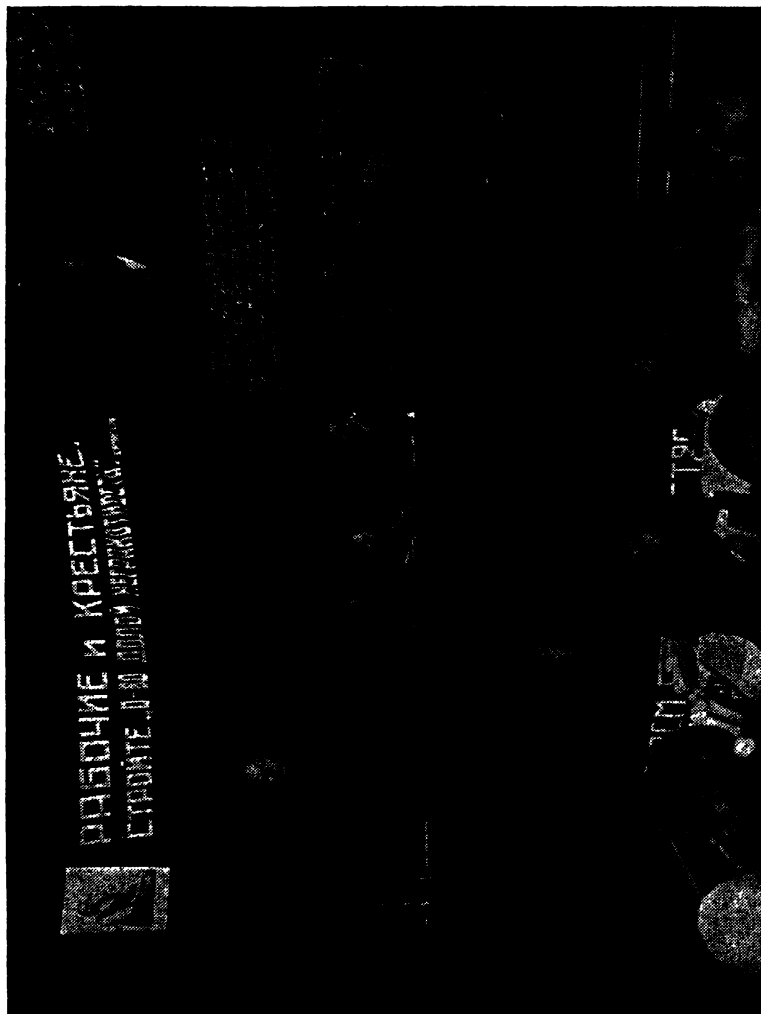
'নিরক্ষরতা দূরীকরণ' সমিতির একটা সভায় নাদেজ্দা ক্রুপ্স্কায়ার বক্তৃতা

পাবার জন্যে বিশেষভাবে পাঠানো হত কমিউনিস্টদের আর কমসোমল সদস্যদের।

দেশে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক আর শিক্ষণ সারগ্রন্থের সংখ্যা বেড়েছিল কয়েক ডজন-গুণ; এর মধ্যে বেশকিছুসংখ্যক বই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অ-রুশ জাতির ভাষায়। ফলে, ১৯৩৩ সাল নাগাত সারা দেশে চার-বছরের আবশ্যিক শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৪ সাল নাগাত সাত-বছরের আবশ্যিক শিক্ষা চালু করা হচ্ছিল শহরগুলিতে — বাস্তবিকপক্ষে, তখন সেটা শেষ হয়ে আসছিল।

উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায়ও শুরু হল মূলগত পুনঃসংগঠন। ছাত্রমণ্ডলীর গঠনে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। তখন ছাত্রদের বেশির ভাগ হয়ে দাঁড়াল শ্রমিক আর কৃষকদের ছেলে-মেয়ে। সুযোগ্য কর্মীর ঘাটতির দরুন কতকগুলি ক্ষেত্রে বিদ্যমান কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হয়েছিল, এবং যেসব ছাত্রের নিজেদের বেছে-নেওয়া ক্ষেত্রে প্রচুর প্রয়োগীয় অভিজ্ঞতা ছিল তাদের ট্রেনিংয়ের জন্যে বিভিন্ন বিশেষিত উচ্চতর শিক্ষায়তন খুলতে হয়েছিল, শুধু তাই নয়, অপেক্ষাকৃত কম অধ্যয়ন-কালও (প্রচলিত পাঁচ বছরের জায়গায় চার বছর) চালু করতে হয়েছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের শেষাশেষি নাগাত সমস্ত পাঠ্যধারায় প্রধান বিষয়গুলিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা আবার চালু করা হয়েছিল। ছাত্রদের স্বাধীন কাজে প্রত্যাশিত মানও উচ্চতর করা হয়েছিল, পাঁচ-বছরের পাঠ্যধারাগুলি আবার হয়ে উঠেছিল নিয়ম।

উচ্চতর শিক্ষায়তন আর বিশেষিত মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যা ১৯৩২ সালে ছিল পনর লক্ষর বেশি। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে মধ্য এশিয়ায় আর কাজাখস্তানে উচ্চতর শিক্ষায়তনে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছিল চার থেকে পঞ্চান্নয়; ঐ একই

সময়ে সংখ্যাটা হয়েছিল ট্র্যান্স-ককেশিয়ায় দ্বিগুণ, আর ইউক্রেনে তিনগুণের বেশি। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শামিল হয়েছিল দু'-লক্ষর বেশি স্নাতক। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার গোড়ায় ভারি শিল্পে সমস্ত স্নাতক কর্মী আর পরিচালকদের ৬০ শতাংশের বেশি ছিল আগেকার পাঁচ বছরে স্নাতক-হওয়া নওজোয়ানেরা।

ঐ সময়ে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ক্লাব আর সাধারণের পাঠাগারগুলি। ১৯৩২ সালে সাধারণের গ্রন্থাগারগুলিতে বই ছিল ৯ কোটি ১০ লক্ষ কপি — অর্থাৎ, বিপ্লবের ঠিক আগে যা ছিল তার দশগুণ ছাড়িয়ে বেশি। সংবাদপত্রগুলির মোট প্রচারসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ কপি — অর্থাৎ, সংখ্যাটা ১৯২৯ আর ১৯৩৩ সালের মধ্যে বেড়েছিল প্রায় চারগুণ। ১৯৩২ সালে সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির ৮৮টা ভাষায়। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে 'প্রাভ্‌দা'র প্রচারসংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৬,২০,০০০ থেকে ১৬,০০,০০০ কপি।

কেন্দ্রীয় আর স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে শ্রমিক আর কৃষক সংবাদদাতাদের স্বেচ্ছায় পাঠানো লেখা আর খবরাখবরেও প্রতিফলিত হয়েছিল শিক্ষাতৃষা এবং দেশের রাজনীতিক আর জন-জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ। লক্ষ লক্ষ লোক লিখে জানাতে থাকল তাদের সহকর্মীদের বিভিন্ন সাধনের কথা, তারা খুলে ধরতে থাকল আমলাতান্ত্রিকতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত, তারা বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করে নিজেদের প্রস্তাবাদি তুলে ধরতে থাকল — এই সবকিছুরই উদ্দেশ্য ছিল জনগণের কাজ আর জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নীত করানো। কুলাকেরা এবং অন্যান্য সোভিয়েতবিরোধীরা এইসব সংবাদদাতার এবং গ্রামে গ্রামে ক্লাব আর সাধারণের পাঠাগারের সংগঠকদের কাজের হিংস্র বিরোধিতা

করত, এটা কিছু আপাতিক ব্যাপার ছিল না। শুধু ১৯২৮ সালেই এই রকমের ১১১ জন স্বেচ্ছাসংবাদদাতা নিহত হয়েছিলেন, হামলা আর মারপিটে জখম হয়েছিলেন ৩৪৬ জন। পুরোগামী সোভিয়েত লেখক মাক্সিম গোর্কি তখন লিখেছিলেন: 'শ্রমিক আর কৃষক সংবাদদাতাদের কল্যাণে, বিপুল বিস্তৃত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র, এর সমস্ত সুদূর কোণে কোণে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সতর্ক দৃষ্টি আর কণ্ঠস্বর; এদেশে পত্র-পত্রিকাগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খুঁটিনাটি অবধি জীবনের যে-বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরছে, এমনটা কখনও কোন দেশে হয় নি।' এই কথাটাতে কোন অতিশয়োক্তির লেশমাত্রও নেই। ১৯৩২ সালে শ্রমিক-কৃষক সংবাদদাতা 'বাহিনীতে' লোক ছিল তিরিশ লক্ষ জন।

এই সময়েই মিখাইল শলোখভ আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি লাভ

মস্কোয় 'ক্রাস্নি বোগাতির' কারখানায় শ্রমিকদের 'ধীরে বহে দন' উপন্যাস থেকে কোন কোন অধ্যায় পড়ে শোনাচ্ছেন মিখাইল শলোখভ। ১৯২৯

করেছিলেন তাঁর 'ধীরে বহে দন্'এর জন্যে — এতে চিত্রিত হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে কসাক কৃষককুলের জীবন আর নিয়তি; এই সময়েই নিকোলাই ওস্ত্রোভ্স্কির লেখা আবেগমুখর উপন্যাসে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সমসাময়িকদের এবং বিপ্লবে তাদের ভূমিকা। শয্যাগত, অন্ধ এবং গৃহযুদ্ধের সময়কার জখমগুলোর দরুন প্রায় সম্পূর্ণত পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায়ও এই লেখক নিজ পুরুষ-পর্যায়ের কাহিনীটিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছিলেন — এই পুরুষ-পর্যায়টি বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল অমন দৃঢ়তাসহকারে, আর সর্বপ্রযত্নে এবং ভীষণ স্বাস্থ্যহানির দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে গড়ে তুলছিল সমাজতন্ত্র। ওস্ত্রোভ্স্কি এই উপন্যাসখানির নাম দিয়েছিলেন 'ইস্পাত মজবুত করে প্রস্তুত হল কীভাবে' (বাংলা অনুবাদে 'ইস্পাত' — অনুঃ) — এটা সোভিয়েত নওজোয়ানের বেছে-নেওয়া পথটিকে এককথায় তুলে ধরতে খুবই মানানসই। যেকোন বাধাবিপত্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করতে এই বইখানি নওজোয়ানের সহায়ক হয়েছে; নতুন জীবন গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণাদায়ক এই বইখানি অচিরেই কোটি কোটি পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়ের খুবই জনপ্রিয় অন্যান্য লেখক হলেন আলেক্সেই তলস্তয় — একজন প্রাক্তন কাউণ্ট, যিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লেখকদের একজন; গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কমিউনিস্ট আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ; সুমার্জিত ব্যঙ্গরসাত্মক লেখক ইল্‌ফ এবং পেত্রভ; বিখ্যাত সোভিয়েত কবি ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি।

সোভিয়েত পাঠকদের হৃদয়ে একটি বিশেষ আসনে সমাসীন মানুষটি হলেন বিশিষ্ট প্রলেতারীয় লেখক মাক্সিম গোর্কি — তিনি স্বদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে এসেছিলেন ১৯২৮ সালে। দেশে ব্যাপকভাবে ঘুরে ঘুরে তিনি শ্রমিক, যৌথখামারী এবং পুরন আর নতুন বুদ্ধিজীবিসমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে

দেখা-সাক্ষাৎ আলোচনা করতেন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে গোর্কি বহুসংখ্যক প্রবন্ধ লিখে সেগুলিতে সমাজতন্ত্রের নির্মাতাদের বীরত্বের মহিমা ঘোষণা করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধপ্রস্তুতির স্বরূপ খুলে ধরেছিলেন। নতুন সোভিয়েত সাহিত্যের মতাদর্শগত মর্মবস্তু এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পরসাত্মক নীতিগুলির সংহতিসাধন প্রসঙ্গে এই সামাজিক-দায়িত্বশীল লেখক এবং জননায়কের অক্লান্ত প্রয়াস ছিল বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন।

১৯৩২ সালের অগস্ট মাসে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অপেশাদার শিল্পীদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন অলিম্পিয়াড; শখের দলগুলির নাট্যাভিনয় হয়েছিল প'চিশটা ভাষায়।

দেশের রঙ্গমঞ্চ জীবনেও এই বছরগুলিতে বিস্তর আগ্রহজনক ঘটন ছিল। দেশের যেসব অঞ্চলে বিপ্লবের আগে আদৌ কোন থিয়েটারই ছিল না সেসব জায়গায়ও থিয়েটার খোলা হয়েছিল — যেমন, মধ্য এশিয়ায় ১৯৩৩ সাল নাগাতই থিয়েটার হয়েছিল ৫০টা, সেগুলিতে নাট্যাভিনয় চলছিল বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির ভাষায়।

সোভিয়েত সাহিত্য আর আর্ট সাধারণভাবেই সোভিয়েত জনজীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, এবং সংসাধিত লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট উপলব্ধি পেতে, ধীর-স্থিরভাবে সামনেকার সমস্ত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে এবং আশাবাদী প্রত্যয় নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে জনগণের সহায়ক হয়েছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর্থনীতিক পুনর্গঠন নিষ্পন্ন
১৯৩৩—১৯৩৭

নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করার অভিযান। স্তাখানভ আন্দোলন

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ধার্য লক্ষ্য-মাত্রাগুলি দেশের অর্থনীতির বেশির ভাগ শাখায় সংসাধিত হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৯৩৩—১৯৩৭ সালের কালপর্যায়ের লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়েছিল বেশকিছুটা আগেই,—শিল্পযোজন অভিযান শুরু হবার সময় থেকে শ্রমজীবী জনগণ যেসব নতুন দক্ষতা আর জ্ঞান অর্জন করেছিল সেগুলির কথা পরিকল্পনারচয়িতাদের বিবেচনায় ছিল। সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদে অর্থনীতির পুনর্গঠনকাজ সমাধা করা, নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে অর্থনীতিকে পুনঃসজ্জিত করা এবং শ্রম শোষণের সমস্ত সম্ভাবনা রহিত করে দেওয়াই ছিল নতুন পরিকল্পনার লক্ষ্য।

আগেকার পাঁচ বছরে কোন-না-কোন কারণে সংসাধন করে ওঠা যায় নি, এমন অনেক কাজ করার ছিল। নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্র ইতোমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রধান ব্যবহারক 'জাপোরজ্স্তাল' ইস্পাত কারখানার নির্মাণকাজ তখন গোড়ার দিককার পর্বে রয়ে গিয়েছিল। ধাতু শিল্পেও সমন্বয়ের গুরুতর অভাব ছিল: এই শিল্পে ১৯১৩ সাল থেকে তো বটেই, ১৯২৮ সাল থেকেও গুরুত্বসম্পন্ন অগ্রগতি ঘটলেও, পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রাগুলি সংসাধিত হয় নি।

অজৈব সার, আরও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য এবং হালকা শিল্পের বেলায় লক্ষ্যমাত্রাগুলো এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে গুরুতর অসামঞ্জস্য ছিল। শিল্পযোজনের প্রচণ্ড গতিবেগের দরুন কিছু মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তার ফলে বিদ্যমান ক্ষমতাগুলিকে বাড়িয়ে দেখা থেকে অর্থ আর শ্রম তহবিলের কিছু অপচয় ঘটেছিল, শিল্পের অন্যান্য সহায়ক শাখায় বিভিন্ন পরিকল্পিত লক্ষমাত্রায় পেঁছন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

নবনির্মিত কারখানাগুলিকে পুরোপুরি চালু করার কাজটা দেখা গেল খুবই জটিল ব্যাপার। গোড়ায় ধরে নেওয়া হয়েছিল, পরিকল্পিত উৎপাদনক্ষমতায় পেঁছন যাবে চটপট, কিন্তু দেখা গেল, স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন সরঞ্জাম আয়ত্ত করতে শেখার চেয়ে কারখানা নির্মাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। স্তালিনগ্রাদে বিশাল ট্র্যাক্টর কারখানা নির্মিত হয়ে গিয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের আগেই — ১৯৩০ সালের জুন মাসে, কিন্তু তাতে দিনে ১৪৪টা ট্র্যাক্টর উৎপাদনের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের আগে পেঁছন যায় নি। এই রকমের ঝঞ্ঝাটগুলোর কারণ ছিল এই যে, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে ব্যাপক হারে লাইন্-উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশ পা দিয়েছিল সেই সবেমাত্র। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আর ইঞ্জিনিয়রকে তালিম দেবার দরকার ছিল।

আগেকার পাঁচ বছরে কুড়িয়ে-তোলা অভিজ্ঞতার মূল্য এই পরিস্থিতিতে ছিল অপরিমেয়। আগে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল যন্ত্রসজ্জাকে, কিন্তু নতুন কারখানাগুলোকে চালাবার উপযুক্ত সুযোগ্য কর্মিবাহিনী ছিল এখনকার মুখ্য চাহিদা। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা এবং নতুন নতুন ধরনের উৎপাদন কায়দা করার জন্যে অভিযানই হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কেন্দ্রী বিষয়। উৎপাদনের উপায়-উপকরণাদি নির্মাণের ক্ষেত্রেও

কথাটা প্রযোজ্য ছিল — সেটা তখন আরও ব্যাপক পরিসরে বাড়াবার ব্যবস্থা ছিল। স্তালিনগ্রাদে যা করা হয়েছিল তার থেকে ভিন্ন কায়দায় চাল্ করা হয়েছিল খারকভ আর চেলিয়াবিন্স্ক ট্র্যাক্টর কারখানাদ্বটিকে। মস্কো মোটরযান কারখানায়ও উৎপাদনের বেগ গড়ে তোলা হয়েছিল স্থির-নিয়মিতভাবে। কোন কোন কর্মশালা গড়ার কাজ চলতে থাকার সময়েও হাজার হাজার শ্রমিক অধ্যয়ন

চেলিয়াবিন্স্ক ট্র্যাক্টর কারখানার প্রথম সন্তান

করছিল বিভিন্ন টেকনিকাল বিদ্যালয়ে, বিভিন্ন শিল্পে-তামিল আর বৃত্তিশিক্ষা পাঠ্যক্রম নিয়ে এবং কারখানাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোটরযান ইঞ্জিনিয়রিং ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগে। পরে, সরঞ্জামগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে চালু করা এবং সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়ে সেটাকে ব্যবহার করা নিয়ে কর্মিদলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উৎপাদন-পরিব্যয় কমে আসছিল বছর-

বছর। ১৯৩৫ সালের মধ্যে এই মোটরযান কারখানায় উৎপাদন হচ্ছিল তার পরিকল্পনা ছাপিয়ে: দিনে ১১০খানা লরি।

বিদ্যুৎসজ্জায় অগ্রগতির ফলে শ্রমিকদের মাথাপিছু প্রাপ্তিযোগ্য বিদ্যুৎশক্তির সূচক দ্বিগুণেরও বেশি করা গিয়েছিল। এর সঙ্গে শ্রমিকদের উচ্চতর দক্ষতা এবং উন্নততর উৎপাদন-সংগঠন মিলে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বেড়েছিল ৮২ শতাংশ (অর্থাৎ, পরিকল্পিত মাত্রার চেয়ে ঢের বেশি)। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির জন্যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল অনেকটা কম — তবু, সেটা পরিপূরণ হয় নি। ঐ সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায়ই বাড়ানো যেত শুধু আরও শ্রমিক নিয়োগ করে। কিন্তু, আলোচ্য কালপর্যায়ে নতুন নতুন টেকনিক আয়ত্ত করার ফলে বহু কারখানায় আর নির্মাণক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা কমানো গিয়েছিল। এটা ঘটেছিল বিশেষত নির্মাণ শিল্পে — যদিও তার পরিসর বেড়েছিল।

শ্রমিকেরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করেছিল সানন্দে, কেননা নতুন প্রযুক্তি মানে ছিল কাজের অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্যতা, বেশি মজুরি এবং যোগ্যতা বাড়াবার সুযোগ। দেশের সর্বত্র বহুসংখ্যক শিল্প শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল, — অর্থনীতির কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনের ফলে, আগে যারা ছিল নির্মাণ-শ্রমিক তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে উপযুক্ত তালিম দিয়ে বিভিন্ন উৎপাদনের কর্মশালায় বদলি করা গিয়েছিল।

বহুসংখ্যক কৃষক কাজের খোঁজে দলে দলে শহরে আসছিল আগেরই মতো। তবে, ইতোমধ্যে রাষ্ট্র এই সমাগমটাকে নিয়ন্ত্রিত করে ফেলেছিল; গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভিতর থেকে শিল্প শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্যে বিশেষ বিশেষ সংগঠন বসানো হয়েছিল।

নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আর টেকনিক চালু এবং কায়দা করার জন্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া পড়ে গিয়েছিল সারা দেশে।

১৯৩৩—১৯৩৪ সালে শিল্পে আর পরিবহনক্ষেত্রে যোগান দেওয়া সরঞ্জামের পরিমাণ ছিল গোটা প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ের সমান। আগুয়ান শ্রমিকদের সংখ্যাও বেড়েছিল দ্রুত।

দনেৎস্ অববাহিকার একটা খনিতে নিকিতা ইজোতভ নিয়মিতভাবেই এক শিফ্‌টে কুড়ি টন অবধি কয়লা কেটে নিজের কোটার চারগুণ কাজ করতেন। সহকর্মীদের নানা কার্যকর পরামর্শ দেওয়া ছিল তাঁর অভ্যাসের ব্যাপার। কেন্দ্রীয় পত্র-পত্রিকাগুলি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্যে শিল্পক্ষেত্রের নবপ্রবর্তকদের উদ্দেশে আহ্বান জানালে, তাতে অচিরেই ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল শিল্পের সমস্ত শাখায়ই। সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিকের একটা আবশ্যিক 'নিম্নতম টেকনিকাল জ্ঞান' চালু হয়েছিল ঐ সময়েই।

১৯৩৩ সালে মস্কো থেকে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি এবং সেখান থেকে আবার মস্কো অবধি সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি মোটরগাড়ির একটা দৌড় হয়েছিল — সেটাকে সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিল সারা দেশের মানুষ। এর পরে একটা সোভিয়েত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারীয় বেলুন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিল। ১৯৩২ সালে একখানা সোভিয়েত বরফ-ভাঙা জাহাজ ইতিহাসে সেই প্রথম এক নাব্য মরশুমের মধ্যেই আর্খাঙ্গেল্‌স্ক থেকে ভ্লাদিভস্তক অবধি উত্তর-সাগরীয় পথে পাড়ি জমিয়েছিল। (সুয়েজ কিংবা পানামা খাল হয়ে প্রচলিত গমনপথের চেয়ে এটা ছিল দৈর্ঘ্যে অর্ধেক।) ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মে 'চেলিউস্কিন' নামে আর-একখানা সোভিয়েত জাহাজ একটা গুরুত্বসম্পন্ন মেরু-অভিযানে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। জাহাজখানা ভাসমান বরফের চাপে চূর্ণ হয়েছিল, তখন নারী-শিশুসমেত সমস্ত কর্মী আর যাত্রী চুকোৎকা সাগরের মাঝখানে ভাসমান বরফস্তরে আশ্রয় নিয়ে নিরুপায় অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। 'শ্মিদ্‌ত্ শিবিরে'র (এই নামটা হয়েছিল সুবিদিত বিজ্ঞানী

অত্তো শ্মিদ্‌ত্‌-এর নামে — তিনি ছিলেন ঐ অভিযানের পরিচালক) লোকেরা তাঁদের সাহস আর শৃঙ্খলা দিয়ে সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছিলেন। উদ্ধারকাজে পাঠানো হয়েছিল দেশের সেরা সেরা বৈমানিকদের, — প্রচণ্ড কাঠিন্য-কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁরা অভিযানের সমস্ত মানুষকে নিরাপদে মূলভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। এই মহা-কৃতিত্বের স্মারক হিসেবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ১৯৩৪ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে চালু করেছিল সর্বোচ্চ সোভিয়েত সম্মানচিহ্ন — সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর-

'চেলিউস্কিন' অভিযানের সদস্যরা এলেন মস্কোয়

নায়ক খেতাব। মেরু-অভিযাত্রীদের যাঁরা উদ্ধার করেছিলেন, সর্বপ্রথমে তাঁরাই — এ বৈমানিকেরা — এই খেতাব পেয়েছিলেন।

এইসব নাবিক, বৈমানিক আর মেরু-অভিযাত্রীদের মহা-কৃতিত্বের মধ্যে সোভিয়েত নর-নারীর বীরত্ব আর সাহস প্রদর্শিত হল শুধু তাই নয়, তাঁরা যে তখন দেশের সেবায় কত উঁচু মাত্রার

টেকনিকাল দক্ষতা আর বিশেষিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন সেটাও এতে স্পষ্ট ফুটে উঠল। মেরু-অভিযাত্রীরা এবং ঐ সাহসী বৈমানিকেরা সুমেরু থেকে ফিরে এলে সারা মস্কোর মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসে তাঁদের বীরের সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

১৯৩৪ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির ১৭শ কংগ্রেসে বক্তৃতা আর বিবরণগুলিতে তখনকার বিদ্যমান মেজাজের মানানসই প্রকাশ ঘটেছিল। এই কংগ্রেসের উদ্বোধন-দিন ২৬এ জানুয়ারি 'প্রাভ্‌দা'র একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শিরনামা ছিল 'বিজেতাদের কংগ্রেস'। স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির বিবরণ পেশ করার পরে পার্টির তখনকার ২৮ লক্ষর বেশি সদস্যের দূতেরা — কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা — একে একে উঠেছিলেন বক্তৃতামঞ্চে। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রতিরক্ষা জনকমিসার ক্লিমেন্ত ভরোশিলভ, ভারি শিল্প জনকমিসার গ্রিগোরি ওর্জনিকিদ্‌জে, সংভরণ জনকমিসার আনাস্তাস মিকোয়ান এবং অপেক্ষাকৃত বড় পার্টি সংগঠনগুলির নেতারা। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের ভাব-ধারণা কীভাবে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছিল সে-বিষয়ে নাদেজ্‌দা ক্রুপ্‌স্কায়ার বক্তৃতা প্রতিনিধিরা শুনেছিল মহা-আগ্রহভরে। গস্‌প্লানের সভাপতি ভালেরিয়ান কুইবিশেভ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করার পরে প্রাণবন্ত আলোচনা চলেছিল। এই কংগ্রেসের কাজ এবং গৃহীত প্রস্তাবাদিতে পরিলক্ষিত হয়েছিল সমগ্রভাবে সোভিয়েত সমাজের অর্জিত বড় বড় সাফল্যগুলি এবং পার্টির সদস্যশ্রেণীর মজবুত ঐক্য-সংহতি। এইসব সাফল্য এবং পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুদের হন্যে করে তুলেছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সম্পাদক, লেনিনগ্রাদের বলশেভিকদের নেতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সের্গেই কিরভ এক প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন ১৯৩৪ সালের

১লা ডিসেম্বর তারিখে। এই হত্যাকাণ্ডের পরে সোভিয়েত জনগণ সমাজতন্ত্রের শত্রুদের সম্বন্ধে সতর্ক প্রহরা প্রবলতর করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল পার্টির ভিতরে আগেকার প্রতিপক্ষীয় ঘোঁটগুলির নেতারা — তারা সোভিয়েতবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। এদের কেউ কেউ একসময়ে পার্টিতে বিভিন্ন উঁচু পদে ছিল — তারা সোভিয়েত রাজের শত্রু হয়ে উঠতে পারে, তা মনে করাও শক্ত ছিল।

ইতোমধ্যে, শিল্প আর কৃষি উভয় ক্ষেত্রে নতুন নতুন সাধন-সাফল্য জনগণের মনোবলকে চাঙ্গা করে তুলেছিল। ১৯৩৫ সালে বড় একদল শিল্প শ্রমিকের শ্রম-কৃতিত্বের জন্যে সরকার তাদের সম্মানিত করেছিল, আর তাদের প্রয়াসের এই স্বীকৃতিতে সাড়া দিয়ে আগুয়ান শ্রমিকেরা আগের চেয়ে আরও বেশি বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। বস্তুতপক্ষে, ঐ বছর কতকগুলি বড়রকমের সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। গোর্কি মোটরযান কারখানার শ্রমিকেরা শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন মোটর শিল্পে স্থাপিত মাত্রায় পেঁছে গিয়েছিল। মাগ্‌নিতোগর্স্কের শ্রমিকেরা ততদিনে দেশের মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় ধাতু উৎপন্ন করছিল — তাদের তখন চলত রাষ্ট্রীয় অনুদান ছাড়াই।

মস্কোয় দেশের প্রথম পাতাল রেলপথের উদ্বোধন হল ঐ বছরের একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঐ সময়ে রাজধানীর জনসংখ্যা তিরিশ লক্ষ, — ট্র্যাম, বাস আর ট্রলিবাস (১৯৩৩ সালে চালু-করা) এবং ট্যাক্সি চলাচল যা ছিল সেটা যাত্রিসংখ্যা নিয়ে এঁটে উঠতে পারত না (তখনও নগরীতে ঘোড়ার গাড়ি দেখা যেত)। দেশের সমস্ত জায়গার শ্রমিকদের অবদান ছিল এই প্রকল্পে: এর জন্যে সরঞ্জাম উৎপন্ন করেছিল পাঁচ-শ'র বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্প নির্মাণের কাজে মস্কোর কমসোমল সংগঠন পাঠিয়েছিল পনর হাজার তরুণ-

তরুণীকে। প্রয়োজন হলে তারা একটানা দু’-তিন শিফ্‌টেও কাজ করত, এবং টেকনিকাল জ্ঞান ব্যবহার ক’রে, আর প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র, আর বিজ্ঞানীদের কার্যকর সহযোগের উপর নির্ভর ক’রে তারা কোটা ছাপিয়ে কাজ করত নিয়মিতভাবেই। মস্কো পাতাল রেলপথ সরকারীভাবে খোলা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে ১৫ই মে — প্রথম প্রথম ট্রেনগুলি চলতে শুরু করল। এই সাফল্য ছিল সোভিয়েত বিজ্ঞানী আর শ্রমিকদের একটা মস্ত জয়।

১৯৩৫ সালের আর-একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেশের পূর্বাঞ্চলে নির্মাণকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সোভিয়েত শিল্পের নিজস্ব তামার বড় প্রয়োজন ছিল। ঐ সময়ে তামার জানা আকরের ৬০ শতাংশ ছিল কাজাখস্তানে। এখন যেখানে রয়েছে কৌন্‌রাদ শহর সেখানে একটা তামা কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল — জায়গাটা ছিল নিকটতম রেল-স্টেশন থেকে ৩০০ মাইল দূরে। এ অবস্থায় পথ ছিল শুধু একটা: তামা খনি গড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা রেলপথও পাতা। প্রথমে সেই নির্মাণক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল ৫০০ পার্টি সদস্য এবং ১,০০০ কমসোমল সদস্যকে — এটা হল আরও একটা বীরকীর্তি কাহিনীর সূচনা।

দু’টি স্টীম ইঞ্জিন এবং কতকগুলো প্ল্যাটফর্মের উপাংশ বালখাশ হ্রদের পথে এনে জোড়া হয়েছিল। সেগুলোকে জনশূন্য বালুময় এলাকার ভিতর দিয়ে নেওয়া হয়েছিল অস্থায়ী রেলপথে, এই রেলপথকে মাঝে মাঝে গুটিয়ে নিয়ে সামনে গিয়ে আবার জুড়ে তৈরি করা হত লাইনের আর-একটা অংশ। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে কৌন্‌রাদে যন্ত্রপাতি নেওয়া হয়েছিল ‘চলন্ত রেলপথে’। অচিরেই তামা খনিতে কাজ এগোতে থাকল ক্রমাগত দ্রুততর মাত্রায়; শিগগিরই গড়ে উঠতে থাকল একটা তাপন কারখানা, বিভিন্ন কর্মশালা আর ফ্ল্যাট-বাড়ির শ্রেণী। ১৯৩৫ সালের শরৎকাল নাগাত কারাগান্দা-বালখাশ রেলপথ চালু হয়ে

গিয়েছিল — তার মানে তামা খনিক্ষেত্রে যাবার পথ খুলে গেল।

আর্থনীতিক উন্নয়নের একই দ্রুত গতি বজায় রাখার জন্যে পার্টি শিল্পক্ষেত্রে সাফল্যগুলিরই শুধু নয়, ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিরও সযত্ন বিশ্লেষণ করত। কারখানার ম্যানেজার, আগুয়ান শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র এবং বিজ্ঞানীদের পাঠানো বিভিন্ন বিবরণ নিয়ে পার্টির স্থানীয়, শহর আর বিভাগীয় কমিটিগুলি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও সযত্নে বিচার-বিশ্লেষণ করা হত। বিভিন্ন সমষ্টিগত আলোচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল যে, অনেক সময়েই উৎপাদনের নিকৃষ্ট সংগঠন এবং হার ধার্য করার অনগ্রসর পদ্ধতির দরুনই শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি আরও বাড়ছিল না। আগুয়ান শ্রমিকেরা আধুনিক টেকনিকের উদ্ভাবনশীল আয়ত্তি দিয়ে যেসব দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল সেগুলির উপর বিশেষ জোর দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। শিগগিরই দেখা গিয়েছিল, এই সিদ্ধান্তটি হয়েছিল খুবই সময়োপযোগী।

দেশের পত্র-পত্রিকাগুলির শিরনামে আলেক্সেই স্তাখানভের নাম প্রথম উঠেছিল ১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। দনেৎস্ অববাহিকায় 'ইর্মিনো-মধ্য' খনির এই তরুণ কয়লা-কাটা শ্রমিক আন্তর্জাতিক যুব দিবসের সম্মানে একটা নতুন রেকর্ড করতে মনস্থ করেছিলেন। ৩১এ অগস্ট রাত্রের শিফ্‌টে ১০২ টন কয়লা কেটে তিনি প্রচলিত কোটার চোদ্দ-গুণ বেশি কাজ করলেন। দনেৎসের খনি-শ্রমিকের এই বিশেষ কৃতিত্ব কেবল পেশীর ব্যাপার ছিল না: কয়লা কাটার আরও বেশি সাশ্রয়ী উপায় বের করার জন্যে আগুয়ান খনি-শ্রমিকেরা কিছুকাল যাবত বিস্তর বিচার-বিবেচনা করে আসছিল। আগে, একই শ্রমিক কয়লা কাটত, খোঁড়া জায়গায় ছাতে ঠেকনো দিত, তারপরে আবার গাঁইতি ধরত। আলেক্সেই স্তাখানভ আরও সহজসাধ্য শ্রমবিভাগ চালু করতে মনস্থ করলেন: তাঁকে দেওয়া হল একদল ছাত ঠেকনো-দেওয়া শ্রমিক, তারই ফলে তিনি

উৎপাদিকাশক্তি তুলতে পারলেন অভূতপূর্ব উঁচু মাত্রায়। এই রেকর্ড দেখে অন্যান্যরাও তদবধি না-ব্যবহৃত বিভিন্ন উপায় বের করতে থাকল।
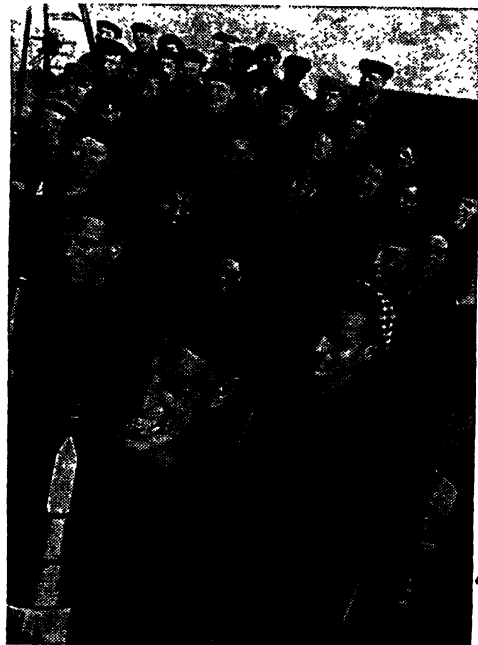
খনি-শ্রমিক আলেক্সেই স্তাখানভ এবং
তাঁর সাথীরা। দনেৎস্ অববাহিকা। ১৯৩৫

কয়েক দিন পরেই উৎপাদনে নতুন রেকর্ড-করা অন্যান্য শ্রমিক সম্বন্ধে খবর বের হতে থাকল সংবাদপত্রগুলিতে:গোর্কি মোটরযান কারখানার বুসিগিন, লেনিনগ্রাদে ‘স্করোখদ’ জুতা কারখানার স্মেতানিন, মস্কোর একটা ইঞ্জিনিয়রিং কারখানার গুদভ, ভিচুগা সুতাকলের ইয়েভদাকিয়া আর মারিয়া ভিনোগ্রাদভা, পরিবহনক্ষেত্রে ক্রিভোনস্। এইসব রেকর্ড অবশ্য রাতারাতি সাধিত হয় নি, এগুলি

ছিল সযত্ন বিচার-বিশ্লেষণ আর প্রস্তুতির ফল, কিন্তু এই সমস্ত রেকর্ড-ভাঙা শ্রমিকই ছিলেন নিজ নিজ কাজে সেরা সেরা ওস্তাদ, তাঁরা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে কাজ করে আসছিলেন অনেক আগে থেকেই। এইসব ব্যক্তি এবং গোটা গোটা কর্মিদল আর কর্মশালার উৎসাহ-উদ্দীপনা অচিরেই একটা দেশজোড়া আন্দোলনের রূপ ধারণ করল, — বিদ্যমান উৎপাদন-হারগুলোকে বদ্‌লে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির ঢালাও বৃদ্ধি ঘটানো হল তার লক্ষ্য।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জনকমিসার পরিষদ স্তাখানভপন্থীদের একটা সারা-ইউনিয়ন সম্মেলন বসাল। শ্রমিক শ্রেণীর তিন হাজার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির চার-দিনের সম্মেলন চলল ক্রেমলিনে। তাঁরা অভিজ্ঞতা বিনিময় করলেন, আর্থনীতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উপায়াদি নির্ধারণ করলেন, সামনেকার সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্যগুলিকে তুলে ধরলেন। শ্রমিক কিংবা কমিসার, কারখানার ম্যানেজার কিংবা পার্টি কর্মী, প্রত্যেকটি প্রতিনিধি ক্রেমলিনের এই সম্মেলনে পেলেন আর্থনীতিক আর রাজনীতিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান।

এইসব স্তাখানভপন্থী অতীতে কী ছিলেন? মাত্র দশ বছর আগেও আলেক্সেই স্তাখানভ ছিলেন এক কুলাকের জনমজুর, আলেক্সান্দর বুসিগিন তাঁর কৃষক বাস্তু বিক্রি করে শহরে এসেছিলেন সবে ১৯২৯ সালে। পিয়ৎর ওর্লভ বয়সে এই দু'জনের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন: ঠাকুরদা আর বাবার মতো তিনিও বিপ্লবের আগে ছিলেন পাথরের রাজমিস্ত্রি। তিনি মস্কোয় বেশ কয়েকটা পাথরের বাড়ি তৈরি করেছিলেন, যদিও নিজে থাকতেন একটা ছোট কাঠের বাড়িতে। বিপ্লবের পরে তিনি নিজ কাজে সর্বজনপ্রশংসিত ওস্তাদ হয়ে উঠলেন — তাঁর প্রণালী-পদ্ধতি গ্রহণ করলেন আরও বহু পাথরের রাজমিস্ত্রি।

মস্কো সম্মেলনের পরে শ্রমিকদের নতুন নতুন বিস্তৃত অংশ সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার মধ্যে চলে আসতে থাকল। এক বছরের মধ্যে প্রতি তিন কিংবা চার জনে একজন শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করছিল। বিভিন্ন কর্মশালা, কারখানা আর নির্মাণ প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা স্তাখানভ আন্দোলনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শ্রমিকদের যোগ্যতা বাড়ানো এবং দেশের সমগ্র আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে এর গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁরা বেশ সচেতন ছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পে কর্ণধারেরা নিজেরাই ছিলেন শ্রমিক, তাই তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না।

তাঁদের একজন ছিলেন প্রাক্তন ধাতু-শ্রমিক পাভেল করোবভ। তাঁর জন্ম হয় ১৯০২ সালে, বালক বয়সেই তিনি বাপের পথ ধরে মাকেয়েভ্কা ধাতুশিল্প কারখানায় কাজ ধরেছিলেন। বিপ্লবের কল্যাণে তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পাভেল হলেন ইঞ্জিনিয়র, তারপরে তিনি একটা গোটা কর্মশালার ভার পেলেন, শেষে তিনি হলেন মাগ্নিতোগর্স্ক ধাতু-কারখানাসমষ্টির অধিকর্তা। অনুরূপ পথেই এগিয়ে এসেছিলেন লেনিনগ্রাদে কিরভ ইঞ্জিনিয়রিং কারখানার অধিকর্তা ক. ওৎস্, মস্কো মোটর কারখানার অধিকর্তা ই. লিখাচভ, বেরেজ্নিকি অজৈব সার কারখানার অধিকর্তা ম. গ্রানোভ্স্কি, কুজনেৎস্কে নতুন শিল্পকেন্দ্র নির্মাণকাজের পরিচালক স. ফ্রাঙ্কফুর্ৎ। এঁরা সবাইই স্নাতক ইঞ্জিনিয়র ছিলেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ এবং দক্ষ সংগঠক, প্রত্যেকেরই ছিল বিপুল ইচ্ছাশক্তি আর কর্মোদ্যম। শিল্প আর পার্টি কাজ দুইয়েতেই নেতৃত্ব করার প্রয়োজনীয় গুণাবলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের ফলে এঁরা আশপাশের অন্যান্যের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বড়রকমের শিল্পায়তন চালু হয়েছিল ৪,৫০০টা — অর্থাৎ, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় যা

হয়েছিল তার তিনগুণ বেশি। এই কালপর্যায়ে শিল্পোৎপাদন হয়েছিল দ্বিগুণ। আগের মতো, ভারি শিল্পেরই উন্নয়ন হয়েছিল সবচেয়ে দ্রুত; অর্থনীতির সমস্ত প্রধান শাখার টেকনিকাল পুনর্নির্মাণকাজ মোটের উপর শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৯৩৭ সাল নাগাত। অ-রুশী জাতিগুলির অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্র আর অঞ্চলগুলিতে ফল হয়েছিল আরও বিশেষ লক্ষণীয়। বিপ্লবের পর থেকে কুড়ি বছরে ইউক্রেনের শিল্প সাতগুণের বেশি সম্প্রসারিত হয়ে সেখানে ১৯৩৭ সালে উৎপাদন হয়েছিল ১৯১৩ সালে সারা জারের রাশিয়ার সমান। কাজাখস্তানে এবং মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছিল স্থানীয় শ্রমিক শ্রেণী। ১৯৩৭ সালে সারা দেশে শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল এক কোটির বেশি, আর ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে মধ্য এশিয়ায় শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বেড়েছিল ৬০ শতাংশ — অর্থাৎ, পুরন শিল্পকেন্দ্রগুলি আর ইউক্রেনে যা হয়েছিল তার প্রায় তিনগুণ।

বিভিন্ন জাতীয় প্রজাতন্ত্রের শিল্পোন্নয়ন দ্রুত সমমাত্রিক হয়ে আসছিল। কাজাখস্তান অচিরেই হয়ে উঠল কয়লা, তৈল আর বিভিন্ন লৌহেতর ধাতুর একটা প্রধান কেন্দ্র। কয়লা-খনি শিল্প কিরগিজিয়ার চেহারা বদলে দিল। কৃষি যন্ত্রপাতি, টেক্সটাইল আর কাঁচা তুলোর উৎপাদন শুরু হল সোভিয়েত উজবেকিস্তানে। তুর্কমেনিয়ায় গড়া হল বিভিন্ন তৈলক্ষেত্র আর রাসায়নিক কারখানা। তাজিকিস্তানে বিভিন্ন শিল্পায়তন দ্রুত গড়ে উঠতে থাকল, অনুরূপ সব ঘটন চলতে থাকল প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রে, প্রত্যেকটি এলাকায়।

১৯৩৩—১৯৩৭ সালের কালপর্যায়ে ভোগ্য পণ্য শিল্পের উন্নয়নের জন্যে অর্থ আর প্রচেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিমাণের চেয়ে বেশি। যেমন, জর্জিয়ায় চা, টিনবন্দী করা, ওয়াইন এবং জুতো শিল্পকে বিশেষ স্থান

দেওয়া হয়েছিল। নানা রকমের কাপড় আর খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের একটা কেন্দ্র হয়ে উঠল মধ্য এশিয়া।

১৯৩৭ সালে মোট শিল্পোৎপাদনের ৮০ শতাংশ হয়েছিল নতুন কিংবা সম্পূর্ণত পুনর্নির্মিত কারখানাগুলিতে। দেশের পূর্ব ভাগে উৎপাদন-শক্তিগুলির তাৎপর্যসম্পন্ন বিকাশ ঘটল। ক্রমাগত বেশি আর্থনীতিক গুরুত্ব লাভ করতে থাকল কুজনেৎস্ক কয়লা অববাহিকা আর কারাগান্দা কয়লাক্ষেত্র। ভলগা আর উরাল অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তৈল আবিষ্কৃত হওয়ায় সেটা হয়ে উঠল একটা প্রধান তৈল-উৎপাদনকেন্দ্র। উরাল অঞ্চল, সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যের শিল্প-শক্তিবৃদ্ধির হার হল দেখবার মতো।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, জার্মানিতে ফাশিবাদের উদ্ভব, প্রাচ্যে জাপানের আগ্রাসী উগ্রতা — এই সবকিছুর দরুন প্রতিরক্ষার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের আরও বেশি ব্যয় করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। তার অর্থ দাঁড়াল হালকা শিল্পে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বরাদ্দ — এর ফলে পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার সংসাধন কিছু পরিমাণে ব্যাহত হল। গোড়ায় মনে করা হয়েছিল, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় হালকা শিল্পের প্রসার হবে ভারি শিল্পের চেয়ে বেশি দ্রুত, কিন্তু তা হতে পারল না। ইতোমধ্যে লাল ফৌজের পুনঃসজ্জার গতিমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে দেশের সিনেমাগুলিতে 'কিয়েভের জন্যে লড়াই' নামে একখানা দলিল- চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল — এতে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল ঐ বছর ইউক্রেনে আর বেলোরুশিয়ায় পরিচালিত সামরিক মহড়ার দৃশ্য। বৈদেশিক কূটনীতিক আর সংবাদদাতারা এই মহড়ায় দর্শক ছিল, তারা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিল সোভিয়েত সাঁজোয়া ইউনিটগুলির উঁচু-মাত্রার গতিশীলতা আর বিমানছত্রীসৈনিকদের কার্যকরণ, উভয় দৃশ্য চমকে দিয়েছিল পশ্চিমী দর্শকদের।

১৯৩৭ সালে একদল সোভিয়েত বৈমানিক এবং সমগ্র সোভিয়েত বিমানবহরই সারা পৃথিবীর মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল, তখন ২১এ মে তারিখে মিখাইল ভদোপিয়ানভের

'তাইমির' নামে বরফকাটা জাহাজকে অভিবাদন জানাচ্ছেন পাপানিনের অভিযানের সদস্যরা। ১৯৩৬

পরিচালিত সোভিয়েত বিমানগুলি সুমেরুর বরফের উপর অবতরণ করেছিল, সেখানে নিয়ে গিয়েছিল একটা গোটা বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রিদলকে। ইভান পাপানিনের নেতৃত্বে এই চার-জনের অভিযাত্রিদলটি ভাসমান বরফস্তরের উপরে ছিলেন ২৭৪ দিন।

উত্তর মেরু হয়ে প্রথম মস্কো — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমান উড্ডয়ন হয়েছিল জুন মাসে। আন্দ্রেই তুপোলেভের ডিজাইন-করা একখানা বিমানে করে ভালেরি চ্‌কালভের নেতৃত্বে বৈমানিকেরা সেই ৭,৫০০ মাইল আকাশপথ অতিক্রম করেছিলেন ৬৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে। এক মাস পরে ঐ একই উড্ডয়ন করেছিলেন মিখাইল গ্রমোভের নেতৃত্বে একদল বৈমানিক। এইসব বিশ্ব রেকর্ড সারা পৃথিবীতে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, পৃথিবীর সর্বত্র পত্র-পত্রিকাগুলি ভরে প্রকাশিত হয়েছিল এইসব বীরের ফোটো। ঐ বিমান এবং তার ডিজাইনারেরাও উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল।

এইসব সাফল্য যে সম্ভব হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সাধনগুলি এবং শ্রমিক শ্রেণীর একান্তভাবে নিয়োজিত প্রচেষ্টারই কল্যাণে, সেটা ব্যাখ্যা করে বলা নিষ্প্রয়োজন।

১৯৩৭ সালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছিল ইউরোপে সর্বপ্রধান এবং সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি। সম্পূর্ণতই আভ্যন্তরিক সঞ্চয়ন-প্রভবগুলি ব্যবহার ক'রে এবং দেশীয় উৎপাদন বিকশিত করিয়ে এটা সাধিত হয়েছিল। আমদানি-করা পণ্যও সহায়ক হয়েছিল, সেটা বিশেষত ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে, — আমদানি বাবত ১৯১৭ থেকে ১৯৩৭ সালের জন্যে যত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার ৪০ শতাংশ ঐ পাঁচ বছরে ব্যয় করা হয়েছিল বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আর কাঁচামাল কেনার জন্যে। তবে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়েও বিদেশে কেনা পণ্যাদি দেশে মোট ব্যবহৃত পণ্যাদির ৩-৩·৫ শতাংশের বেশি ছিল না, আর তার পরের পাঁচ বছরে অংকটা কমে দাঁড়িয়েছিল ১ থেকে ০·৭ শতাংশে। ১৯৩৭ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছিল টেকনিকাল এবং আর্থনীতিক দিক দিয়ে একটি স্বয়ম্ভর শক্তি।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হবার আগেই সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথকৃত কৃষি একরকম সর্বতোভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কৃষকদের অধিকাংশই যৌথখামারে যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছায়। আবাদী জমির মোটামুটি ৮০ শতাংশে চাষ-বাস চালাচ্ছিল রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারগুলি। তবে, এইসব নতুন খামারের যথার্থই লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে এবং তাদের প্রায় অফুরন্ত নিহিত ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাবার অবস্থায় আসতে তখনও আরও কিছু সময় দরকার ছিল। চতুর্থ দশকের গোড়ায় কৃষি উৎপাদন বাড়া তো দূরের কথা, বরং কমেই গিয়েছিল। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুদের কটু আর শ্লেষাত্মক মন্তব্যের কোন ইয়ত্তা ছিল না। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে দোষারোপের তালিকার অন্ত ছিল না। সমাজতন্ত্রের বহু বিরোধী এখনও সেই সময়কার কাঠিন্য-কঠোরতা আর অসামঞ্জস্যগুলোর কথা তোলে পরমানন্দে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল সেটাকে ধীর-স্থিরভাবে এবং বস্তুগতভাবে নির্ধারণ করতে হলে ইতিহাসটাকে দেখা দরকার একেবারে ভিন্ন দিক থেকে।

ঐ সময়ে বেশির ভাগ যৌথখামার ছিল ছোট, আর্থনীতিক বিচারে দুর্বল। গড়ে, প্রত্যেকটা যৌথখামারের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষকদের ৭১টা জোতজমা, যৌথ আবাদ করা জমির পরিমাণ ছিল ১,০৭০ একর, আর ছিল ১৩টা গরু, ১৫টা শুয়োর, ইত্যাদি। এইসব খামারে কাজের মাত্র পঞ্চমাংশ চলতে পারত যন্ত্র দিয়ে, বাদবাকি সবটাই করতে হত হাতে কিংবা পশুর সাহায্যে।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনঃসংগঠন থেকে উদ্ভূত এইসব সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে পার্টি খুবই সচেতন ছিল এবং এগুলিকে সাময়িক ব্যাপার বলে মনে করত। বৃহদায়তনের যৌথ কৃষির নিষ্পত্তিমূলক

সুবিধা এবং রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পার্টি আস্থা হারায় নি মুহূর্তের জন্যেও। ১৯৩৩ সালে জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির একটা প্লেনারী বৈঠক থেকে বলা হয়েছিল: 'যেসব গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা আর অনগ্রসর টেকনিকের প্রাধান্য ছিল সেখানে স্থাপিত এইসব বহু কৃষি প্রতিষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গেই, একটামাত্র বছরের মধ্যে আদর্শ, উঁচু-মাত্রায় লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে, এমনটা আশা করা হাস্যকর। রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারগুলিকে যথার্থই আদর্শ প্রতিষ্ঠান করে তুলতে হলে রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারগুলির **সাংগঠনিক** সংহতির জন্যে চাই সময় এবং অবিচলিত, ধৈর্যশীল, কষ্টসাধ্য কাজ, হানিকর উপাদানগুলোকে খেদানো দরকার, বলশেভিক পরিচালকদের সযত্নে বেছে নিয়ে তালিম দেওয়া দরকার।'

অল্পকাল পরেই যৌথখামারগুলিকে সংহত করা এবং সেগুলির যন্ত্রসজ্জা নিবিড়তর করার অভিযান চালু হয়ে গিয়েছিল সর্বশক্তি দিয়ে। ১৯৩৩ সালের গোড়ায় কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান দেওয়া সম্বন্ধে রাষ্ট্র নতুন প্রনিয়ম চালু করেছিল, তাতে ব্যবস্থা ছিল, প্রত্যেকটা যৌথখামার রাষ্ট্রের কাছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জাতদ্রব্য বিক্রি করবে বাঁধা দামে — এটা কার্যক্ষেত্রে ছিল একরকমের কর। এই কোটা পূরণ করার পরে যৌথখামারীরা বাদবাকি জাতদ্রব্য নিজেদের মধ্যে ইচ্ছামতো ভাগ-বাটোয়ারা করতে পারত। রাষ্ট্র আর খামারগুলির মধ্যে এই নতুন সম্পর্কের অর্থ হল, যৌথখামারের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকেরা অধিকতর বৈষয়িক প্রবর্তনা পেল।

এরই সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনে এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে বিশেষ বিশেষ পার্টি সংস্থা বসাল, সেগুলিকে বলা হত রাজনীতিক বিভাগ, সেগুলিতে নেতা নিয়োগ করত সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটি। এগুলি আসলে ছিল পার্টি থেকে নেওয়া জরুরী ব্যবস্থা, — কৃষি উন্নয়নে

পার্টির তত্ত্বাবধান জোরদার করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। পার্টির কিছু কিছু সেরা প্রতিনিধিকে নিয়োগ করা হয়েছিল এইসব পদে। তাদের প্রায় অর্ধেক ছিল উচ্চতর শিক্ষা পাওয়া লোক, তারা পার্টি কাজ করে আসছিল বছর-দশেক ধরে। গ্রামাঞ্চলে এই নতুন শক্তিসঞ্চারের ক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল অচিরেই। ১৯৩৩ সালের গোড়ায় মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল যৌথখামারের তড়িতকর্মীদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস। কৃষির যৌথখামার ব্যবস্থাটাকে সংহত করার উদ্দেশ্যে পার্টির চালু-করা ব্যবস্থাগুলোকে আগুয়ান খামারীরা যথোপযুক্ত বলে গ্রহণ করেছিল। এই কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাদের চূড়ান্ত প্রস্তাবে বলেছিল: 'সোভিয়েত রাজ আর বলশেভিকরা আমাদের কী উপকার করছেন, সেটা আমরা কার্যক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি। এ আমাদের নিজেদেরই রাজ। এ আমাদের নিজেদেরই পার্টি। তারা আমাদের আপনজন, — যেকোন সময়ে যেকোন শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়তে প্রস্তুত জয়যুক্ত সমাপ্তি অবধি।'

রাজনীতিগতভাবে সক্রিয় খামারীদের সহায়-সমর্থনে রাজনীতিক বিভাগগুলির কর্মীরা রাজনীতিক আর আর্থনীতিক কাজের দ্রুত এবং মূলগত পুনঃসংগঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল ব্যবস্থাপন কর্মীদের বাছন আর তালিমের উপর। আড়াই লক্ষর বেশি আগুয়ান যৌথখামারীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন কাজে। গ্রামাঞ্চলে পার্টি সেলগুলির সংখ্যা এই সময়ে দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল: যৌথখামারীদের মধ্যে পার্টি সদস্যদের মোট সংখ্যা ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে ছিল চার লক্ষর সামান্য বেশি, আর ১৯৩৪ সালের শেষাশেষি সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৭,৯০,০০০।

যৌথখামারগুলিতে ব্যবস্থাপনের এবং সাধারণ কর্মীদের বদল করা হল ব্যাপক পরিসরে, রাজনীতিগতভাবে সক্রিয় খামারীদের

সংখ্যা বেশ বাড়ল, — যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামার এবং মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির সাংগঠনিক সংহতি এবং সেগুলির কাজের উপর তার কল্যাণপ্রভাব পড়ল। অবশিষ্ট যেসব সোভিয়েতবিরোধী লোক অন্তর্ঘাতী এবং ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামগুলি থেকে খেদিয়ে দেওয়া গেল। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই কাজ মোটের উপর বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হল, সেটা নিম্নলিখিত তথ্যগুলো থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়:

আগে যা ছিল পৃথক পৃথক কৃষকের জোতজমি সেগুলির ৭১ শতাংশের বেশি যৌথখামারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে, — সারা দেশের মোট আবাদযোগ্য জমির ৮৭ শতাংশের বেশিতে চাষ-বাস চালাত এইসব যৌথখামার। পশুপালগুলো বেড়েছিল বেশকিছু পরিমাণে। সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে ছিল ২,৬১,০০০টা ট্র্যাক্টর, ৩৩,০০০টা কম্বাইন হার্ভেস্টার আর ৩৪,০০০খানা লরি। নতুন যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করার ফলে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন টেকনিকাল পাঠ্যধারা আর ট্র্যাক্টরচালনার পাঠ চালু করার দরকার হল হাজার হাজার লোকের জন্যে — তাদের মধ্যে যৌথখামারের সভাপতি,মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনের পরিচালক এবং জেলা আর বিভাগীয় পার্টি কমিটির সম্পাদকেরা। প্রাস্কোভিয়া আঙ্গেলিনার নামটি ঐ সময়ে শোনা যেত প্রতি ঘরে ঘরে: সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম নারী ট্র্যাক্টরচালিকা-দল তিনি গড়েছিলেন। আঙ্গেলিনা যখন প্রথম ট্র্যাক্টর চালাবার কাজ ধরেছিলেন তখন বেশকিছু লোক মেয়েদের এ ধরনের কাজ করায় আপত্তি তুলেছিল। আঙ্গেলিনা এবং তাঁর সহকর্মিনী ট্র্যাক্টরচালিকাদের উপর নিন্দা-কটূক্তি বর্ষিত হয়েছিল শুধু তাই নয়, তাঁদের উপর হামলাও হয়েছিল। কিন্তু, নতুন সমাজের প্রগতিশীল রীতিই জয়যুক্ত হল — অচিরেই হাজার হাজার নারী আঙ্গেলিনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পুরোপুরি দক্ষ

ট্র্যাক্টরচালিকা হয়ে প্রচলিত কোটা ছাপিয়ে কাজ করারও যোগ্যতা দেখালেন।

শ্রম-শৃঙ্খলাও উন্নততর হল। ১৯৩৪ সালে প্রতেক্যটি কর্মসমর্থ যৌথখামারীর গড়পড়তা কর্ম-দিন হয়েছিল মোট ১৬৬টা — এটা ছিল ১৯৩২ সালের গড় হিসেবের উপর ৪৮টা বেশি; এর প্রত্যেকটা কর্ম-দিনের দাম ছিল মোটামুটি ৭ পাউন্ড শস্য। আগুয়ান আর্টেলগুলির প্রতি কর্ম-দিনের বাবত আয় হয়েছিল আরও বেশি: ২৬ থেকে ৩৫ পাউন্ড, আর তার উপর আলু এবং নগদ পয়সা।

তবে, কম-উৎপাদনশীল আর্টেলও ছিল, সেগুলিতে আয় হয়েছিল কম। এমনসব আর্টেলের অস্তিত্ব থেকেই দেখা যায়, বহু যৌথখামারের যৌথ অর্থনীতি তখনও যথেষ্ট বিকশিত হয় নি। এসব ক্ষেত্রে যৌথখামারীরা নির্ভর করত বহুলাংশে তাদের পৃথক নিজ নিজ জমিখণ্ডের উপর, তাতে তারা পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে ফলাত আলু, তরিতরকারি আর সূর্যমুখী, আর জাতদ্রব্যের একাংশ বিক্রি করত। মনে রাখা দরকার, এইসব জমিখণ্ডের উপর কর ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যৌথখামার ব্যবস্থাটা অচিরেই বদ্ধমূল হয়ে সুফল দিতে আরম্ভ করল। ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রকে জাতদ্রব্য দেওয়ার ব্যাপারটা ১৯৩২ সালে যখন হয়েছিল তার চেয়ে তিন মাস আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। জরুরী ব্যবস্থার শরণ নেবার আর দরকার ছিল না। রাজনীতিক বিভাগগুলিরও আর দরকার ছিল না। মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক বিভাগগুলিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে তা পরিবর্তিত রূপে টিকে ছিল ১৯৪০ সাল অবধি। ১৯৩৩ — ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রকে দেওয়া শস্যের পরিমাণ হয়েছিল ১৯৩২ সালের পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশি, এর ৯২ শতাংশ এসেছিল যৌথ

আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলি থেকে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে রেশনিং তুলে দেওয়া হল — এটা হল সোভিয়েত কৃষির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সবচেয়ে জোরাল প্রমাণ (রুটি এবং আরও নানা রকমের খাদ্যসামগ্রীর রেশনিং চালু হয়েছিল ১৯২৮ সালে, তখন কৃষকদের ব্যক্তিগত জোতজমাই ছিল শস্যের প্রধান যোগানদার)। নতুন কৃষিব্যবস্থা ছিল শহর আর গ্রাম অঞ্চলগুলির মধ্যে পণ্য-চলাচল সম্প্রসারণের অনুকূল।

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তড়িতকর্মা যৌথখামারীদের দ্বিতীয় সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস। দেশের সমস্ত জায়গা থেকে আগত প্রতিনিধিরা ছিল একান্নটা জাতিসত্তার মানুষ, তাদের প্রায় তৃতীয়াংশ ছিল নারী। এইসব অঙ্ক যৌথকরণে অগ্রগতির সোচ্চার প্রমাণ, ততদিনে যৌথকরণের আওতায় এসে গিয়েছিল দেশের সমস্ত অংশ, সমস্ত জাতি আর জাতিসত্তা, সমস্ত সংখ্যালঘু নৃকুলগত লোকসমষ্টি। যৌথখামারের নতুন নিয়মাবলি গৃহীত হয়েছিল এই কংগ্রেসে, তার একাংশে ছিল: 'শ্রমজীবী কৃষকদের চলার একমাত্র সঠিক পথ হল যৌথকরণ আর সমাজতন্ত্রের পথ। আর্টেলগুলির সদস্যরা এই দায়িত্ব নিচ্ছে যে, তারা আর্টেলগুলিকে সংহত করে তুলবে, কাজ করবে আন্তরিকভাবে, শ্রমের রেকর্ড অনুসারে সমষ্টিগত আয় ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে, সামাজিক সম্পত্তি রক্ষা করবে, খামারের সরঞ্জাম ঘর-বাড়ি ট্র্যাক্টর যন্ত্রপাতি আর ঘোড়ার উপযুক্ত যত্ন নেবে, শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র থেকে ধার্য-করা কর্তব্য সমাধা করবে, এইভাবে যৌথখামারকে করে তুলবে সত্যিকারের বলশেভিক প্রতিষ্ঠান, আর তাতে যারা কাজ করে তাদের সবার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।'

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে জনকমিসার পরিষদ 'ভূমির স্থায়ী ব্যবহারের জন্যে কৃষি আর্টেলগুলিকে রাষ্ট্রীয় পাট্টা প্রদান সম্বন্ধে' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরই এইসব পাট্টা দেওয়া হয়েছিল।

এটা ছিল একটা গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান, যৌথখামারের সংশ্লিষ্ট সমস্ত সদস্য এই উপলক্ষে জমায়েত হয়েছিল। সমস্ত যৌথখামার এই পাট্টা পেয়ে গিয়েছিল ১৯৩৭ সালের মধ্যে। নিখরচে অবিচ্ছেদ্য ভোগ-ব্যবহারের জন্যে যৌথখামারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হল মোটামুটি ৯২ কোটি একর ভূমি — এই পরিমাণটা হল ১৯১৭ সালের আগে মেহনতী কৃষকেরা যে-পরিমাণ ভূমিতে কাজ করত তার আড়াইগুণ বেশি।

সারা দেশে কৃষকদের জীবনে বিভিন্ন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেল। পরিসংখ্যানের শুকনো ভাষায় ফুটে উঠল এই সরস চিত্র: কৃষকদের মাথাপিছু ডিম, দুধ আর শুয়োরের চর্বির ব্যবহার বিপ্লবের পর থেকে বেড়ে গেল যথাক্রমে ৩০০, ৫০ আর ৭০ শতাংশ। বিপ্লবের আগে চিনি ছিল একটা বিলাস-সামগ্রী, যা পাওয়া ছিল অসম্ভব — সেটা তখন কৃষকের খাবার টেবিলে মামুলি হয়ে উঠল। কৃষকদের বিশেষত জুতো, কাপড় আর সাবানের ব্যবহার এবং অন্যান্য শিল্পজাত জিনিসের ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ল কয়েক গুণ। বাইসিকেল, মোটরসাইকেল, ঘড়ি, রেডিও সেট্, গ্রামোফোন আর ক্যামেরার জন্যে গ্রামাঞ্চলের মানুষের চাহিদাও হল বিস্তর অচিরেই।

এইসব অগ্রগতি হল সোভিয়েত কৃষকের একান্তভাবে নিয়োজিত কাজের সুফল। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা তখন দীর্ঘকাল যাবত হয়ে আসছিল শিল্পকেন্দ্রগুলির শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের একটা অভ্যস্ত উপাদান — সেটা এখন কৃষিক্ষেত্রেও চালু হয়ে গেল ব্যাপক পরিসরে। ইউক্রেনের যৌথখামারী মারিয়া দেমচেঙ্কো চিনি-বীট উৎপাদনে রেকর্ড করলেন: প্রতি একরে ২০ টনের বেশি। উজবেকিস্তানে প্রথম যৌথখামারী ইউনুসভ তুলো ফলালেন প্রতি একরে ২টন করে। প্রতি একরে দেড় টন শস্য ফলালেন সাইবেরিয়ার ইয়েফ্রেমভ নামে খামারী। আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ অনুসরণ করল

এইসব পথিকৃতের দৃষ্টান্ত। নারী ট্র্যাক্টরচালিকা আঙ্গেলিনা, শস্যতোলা যন্ত্রচালক বোরিন এবং ঐ বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযানের অন্যান্য আগুয়ান কর্মীদের নাম আজও অবধি শ্রদ্ধেয়, কেননা যৌথকৃত কৃষির কত সুপ্ত ক্ষমতা আর সুবিধা আছে সেটা সমস্ত যৌথখামারী উপলব্ধি করল তাঁদের দৃষ্টান্ত থেকে। এইসব পথিকৃতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে তাঁদের সমকক্ষ হয়ে উঠবার প্রয়াসের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলের মানুষ কৃষিক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ঘটাল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মস্ত অগ্রগতি

চতুর্থ দশকে শিল্পযোজনের অগ্রগতি এবং কৃষির যৌথখামারব্যবস্থা মজবুত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা আর কলাবিদ্যা ক্ষেত্রে জনগণের অর্জিত সাফল্যও গুরুত্বে খাটো ছিল না।

এ তো কিছু গোপন কথা নয় যে, ১৯১৭ সালে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে নিশ্চিত ছিল, অন্য কোন কারণে না-হলেও, মেহনতী জনগণের অধিকাংশ নিরক্ষর বলে রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের ব্যর্থতা অবধারিত। শীত প্রাসাদ দখল হবার কয়েক দিন আগে একটা প্রতিক্রিয়াপন্থী পত্রিকায় এই ক'ছত্র দেখা গিয়েছিল: 'একবার যদি ধরেই নিই যে, বলশেভিকরা আমাদের পরাস্ত করবে, তখন আমাদের উপর শাসন চালাবে কারা? হয়ত বাবুর্চিরা — কাটলেট আর কাবাবের ওস্তাদেরা — আস্তাবলের খানসামারা কিংবা কয়লা-যোগানেরা? কিংবা আয়ারা হয়ত বাচ্চাদের কাঁথা- তোয়ালে কাচার ফাঁকে-ফাঁকে ছুটে-ছুটে যাবে রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈঠকে? নতুন সব রাষ্ট্রনায়ক হবে কারা? হয়ত থিয়েটারগুলোকে চালাবে তালাওয়ালারা, জলকলমিস্ত্রিরা চালাবে কূটনীতিক সার্ভিস,

আর ডাকব্যবস্থা চালাবে কাঠের মিস্ত্রিরা? এই রকমটাই দাঁড়াবে নাকি অবস্থাটা? না! এমন দশা কি সম্ভবপর? এই উন্মত্ত প্রশ্নের জবাব বলশেভিকদের দেবে ইতিহাস।'

নিরক্ষরেরা দেশের রাজনীতিক জীবনে সক্রিয় অংশীদার হতে কিংবা সমাজতন্ত্রের উপযুক্ত নির্মাতা হতে পারে না, এ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টি খুবই সচেতন ছিল। তবে, কমিউনিস্টরা নিশ্চিত ছিল যে, শোষকদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে শ্রমিক আর কৃষকদের বিস্তৃত অংশ অনগ্রসরতা ঘুচিয়ে দেবে, পুরন বুদ্ধিজীবিসমাজের প্রগতিশীল অংশগুলো তাদের পক্ষে চলে আসবে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর একটা জলবিভাজিকা ছিল, সেটা দেশের রাজনীতিক আর আর্থনীতিক জীবনেই শুধু নয়, সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও, তার বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রগাঢ় আর ঢালাও পরিবর্তন, যা বস্তুত হয়ে দাঁড়াল রীতিমতো একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

লেনিনের দৃষ্টিতে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল, যা যথার্থই লোকায়ত্ত — কথাটার বিস্তৃততম অর্থে লোকায়ত্ত — তাতে জাতির সাংস্কৃতিক রূপান্তরণ। এই লক্ষ্যসাধনের জন্যে প্রথম অত্যাবশ্যিক কাজ ছিল দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ-ভাণ্ডারকে, কলাবিদ্যা আর বৈজ্ঞানিক সাধনগুলিকে মুষ্টিমেয় বিশেষ-সুবিধাভোগী মহোদয়ের বদলে সমগ্রভাবে জনগণের নাগালের মধ্যে আনা এবং, তারপরে, শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক মান দ্রুত উন্নীত করা, আর তাদের ঢের বেশি সুষ্ঠু শিক্ষা দেওয়া, যাতে জনগণের প্রতিভাগুলি বিকাশের সুযোগ পায়। রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক আর সাংস্কৃতিক কাজকে লেনিন চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন বলে গণ্য করেছিলেন এই কারণেই। পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্বন্ধে যেসব প্রধান কর্তব্য নির্ধারণ

করে দিয়েছিলেন বিপ্লবের নেতা, সেগুলি চতুর্থ দশকের শেষাশেষি নাগাত নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

চতুর্থ দশকের আরম্ভের মধ্যেই শিক্ষা আর সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির কর্মীরা দেশের মধ্য অঞ্চলে আর উপান্তবর্তী জাতীয় অঞ্চলগুলিতেও নিরক্ষরতা দূর করার কাজে বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল।

এই প্রসঙ্গে, কাবার্দিনো-বাল্‌কার স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে একটা আগ্রহজনক পরিকল্প অনুসারে কাজ হয়েছিল। উত্তর ককেশাসের ঐ এলাকাটায় বিপ্লবের আগে পড়তে-লিখতে জানত জনসংখ্যার এক শতাংশ মাত্র, সেখানে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় অবধিও পরিস্থিতির কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নি। এই সময়ে একদিন বিভাগীয় পার্টি কমিটির অন্যতম সম্পাদক বেতাল্ কাল্মিকভ, স্থানীয় রেওয়াজ অনুসারে, বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ চাইলেন — নিরক্ষরতার ব্যাপারে কী করা যায়। শাদা-দাড়িয়াল সেই পর্বতবাসী বৃদ্ধরা শুধু ঘাড় কুঁচকে মাথা নেড়ে অসহায়ভাব প্রকাশ করলেন: তাঁদের প্রাচীন প্রজ্ঞাও এই অবস্থায় কিছু বাতলাতে পারল না। পার্টি সম্পাদক তখন বৃদ্ধদের বললেন নিজের বক্তব্য: গড়া হবে একটা বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র, একটা আবাসিক বিদ্যালয় গোছের কিছু, সেখানে ছেলে-বুড়ো সবাই জড়ো হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এতে সঙ্গে সঙ্গেই যে-মনোভাব ব্যক্ত হল সেটা বিস্ময়ের, কেননা বিভাগীয় বাজেটের পরিমাণ তখন ছিল মাত্র দশ লক্ষ রুবল। তবে, আর্থিক সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় বাধা ছিল না। স্থানীয় মোল্লাদের প্ররোচনায় ধর্মপ্রাণ সবাই তাদের ছেলে-মেয়েদের পর্বতে নিয়ে গুহায় কিংবা গোয়ালে লুকিয়ে রাখতে থাকল।

পার্টি আর কমসোমলের সদস্যরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছেলে-মেয়ে আর প্রাপ্তবয়স্কদের ভরতি করতে আরম্ভ করল সাধারণ বিদ্যালয়ের

শিক্ষা, পাঠ্যধারা, টেকনিকাল তালিম আর উচ্চতর শিক্ষার জন্যে — এই সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হচ্ছিল স্থানীয় 'লেনিন শিক্ষাকেন্দ্রে'। মধ্য রাশিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে পাঠানো শিক্ষকদের সঙ্গে একত্রে ঐ নতুন কেন্দ্রের পাঠ্যধারায় শিক্ষিত নর-নারীরা পরবর্তী নিরক্ষরতাবিরোধী অভিযানের সামনের সারিতে ছিল। কয়েক বছর পরে, ঐ বিভাগের প্রায় সমস্ত জেলা পার্টি সম্পাদক, রাষ্ট্রীয় খামারের অধিকর্তা এবং যৌথখামারের সভাপতি লেনিন শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যধারা শেষ করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন কর্মসূচি অনুসারে নির্মীয়মাণ নতুন প্রকল্পগুলিও গুরুত্বসম্পন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আগে যেসব আগুয়ান শ্রমিকের নাম করা হয়েছে (নভোকুজনেৎস্কের আন্দ্রেই ফিলিপভ, বেরেজ্‌নিকির মীর-সৈয়দ আদ্রুয়ানভ, তুর্ক্‌সিব রেলপথের কর্মী জুমগালি ওমারভ এবং গোর্কির আলেক্সান্দর বুসিগিন), এঁরা সবাই শিল্পক্ষেত্রে কাজ শুরু করার পরে পড়তে-লিখতে শিখেছিলেন, এঁরা প্রথমে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ক'রে পরে তড়িতকর্মা শ্রমিক হয়েছিলেন। নবীন পুরুষ-পর্যায়ের শিল্প শ্রমিকেরাও সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পাঠ্যধারা শেষ ক'রে সেখান থেকে গিয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল।

এ ব্যাপারে 'নতুন জীবন' শুরু করা আগেকার পুরুষ-পর্যায়ের মানুষের বেলায় ছিল আরও কঠিন কাজ। আদ্রুয়ানভ যখন নিজ কর্মিদলের অন্যান্যের সঙ্গে পড়া-লেখা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল তেতাল্লিশ। যারা এই রকমের পাঠ্যধারা নিত তারা সবাই দু'ঘণ্টা কম কাজ করতে পারবে বলে আইন ছিল, কিন্তু আদ্রুয়ানভের কর্মিদল প্রায়ই কাজের পরেও থেকে গিয়ে ওভারটাইম কাজ করত। কিন্তু, শ্রান্তি-ক্লান্তি সত্ত্বেও তারা কোনমতে তৈরি-করা ক্লাস-ঘরে গিয়ে বই নিয়ে পাঠে বসত।

আন্দ্রেই ফিলিপভ প্রেন কথা অনুস্মরণ করে বলেন: 'অন্যান্য শ্রমিকদের সংবাদপত্রের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে, নানা শব্দ উচ্চারণ করতে শুনে আমার হিংসে হতে থাকত: পড়া ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমার জানা ছিল না একটুও, আর এতসব বইয়ে ইণ্টিরেস্টিং জিনিস আছে যে বহুই তাতেও আমি নিশ্চিত ছিলাম...

'বর্ণ-পরিচয় যখন শুরু করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ। প্রথমে মনে হত, পেন্সিল নাড়াচাড়া করাটা কোদাল দিয়ে মাটি কাটার চেয়ে কঠিন। শেষপর্যন্ত পড়া আর লেখা কায়দা করতে গিয়ে আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে হয়েছিল যে কত বার তার ইয়ত্তা নেই — কিন্তু, গোটা শিফ্‌টের কাজের শেষেও আমার শার্ট থাকত উট্‌খটে শুকনো। তবে, শেষে জিনিসটা রপ্ত করেছিলাম — যদিও, সেজন্যে ঘুম কিছুটা বাদ দিতে হয়েছিল কিছুকালের জন্যে। কিন্তু শব্দের এক-একটা অংশ ধরে ধরে খবরের কাগজে শব্দগুলো যখন প্রথম প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম কোনমতে, তখন মনে হয়েছিল আমার পুনর্জন্ম হল। মনে হয়েছিল আমার চোখ ফুটল। আমার মনে হয়, আমি যখন প্রথম দেখেছিলাম আমি পড়তে পারি তখন আমি যা রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম তেমনটা আজকালকার ছাত্রদের প্রায়ই ডিগ্রি পাবার সময়েও হয় না।'

নিরক্ষরতা খতম করার অভিযান সর্বোচ্চ মাত্রায় পেঁছেছিল চতুর্থ দশকে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে দেশে গিজগিজ করত নির্মাণক্ষেত্রগুলির ভারাগুলো, তেমনি, এই সময়ে লোকে বলত, গোটা দেশই লেগেছিল বইয়ের পাতায় — তাতে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। সমস্ত বয়সেরই মানুষ কোন-না-কোন রকমের পড়াশুনো করতে লেগে গিয়েছিল।

অর্থনীতিক্ষেত্রে সাফল্যগুলোর ফলে ইস্কুল-বাড়ি তৈরি করা,

শিক্ষকশিক্ষণ আর সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্যে ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণ অর্থবরাদ্দ করা সম্ভব হল। ততদিনে কমবয়সীরা ছাড়াও, পুরন পুরুষ-পর্যায়েরও বেশির ভাগ লোক পড়তে-লিখতে শিখে ফেলেছিল। এটা ঘটেছিল লিক্‌বেজ অভিযান আর কল-কারখানায় আয়োজিত বিভিন্ন সাধারণ বিষয়ের পাঠ্যধারার কল্যাণেই শুধু নয়, এটা ঘটেছিল সমগ্র আর্থনীতিক ব্যবস্থার কল্যাণেও বটে — এই আর্থনীতিক ব্যবস্থার জন্যে শ্রমজীবীদের উচ্চতর দক্ষতা আর উন্নততর শিক্ষা থাকা দরকার ছিল, তেমনি, এই অর্থনীতি তা পাবার জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও দিত।

একবার একজন আগন্তুক, ইতালীয় প্রফেসর, নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্রের একজন নির্মাতা-প্রধানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর অধীন কত লোক কোন-না-কোন রকমের পাঠ্যধারা নিচ্ছিল।

'দশ হাজার,' এই ছিল উত্তর।

'এখানে আপনার অধীনে কত লোক আছে?'

'দশ হাজার।'

'তাহলে কাজটা করে কে?'

'পড়াশুনো যারা করছে তারাই।'

১৯৩৯ সালের আদমশুমারে দেখা গেল, নয় বছরের উপরকার মানুষের মধ্যে সাক্ষরদের অনুপাত ছিল ৮১ শতাংশ — আর, অঙ্কটা ছিল ১৮৯৭ সালে ২৪ শতাংশ, ১৯২৬ সালে ৫১ শতাংশ। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের শুরুতে লিক্‌বেজের ধারণাটাই হয়ে গিয়েছিল অতীত ইতিহাসের বস্তু।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে রূপান্তরটা ছবির মতো স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল বিশেষত উপান্তবর্তী জাতীয় এলাকাগুলিতে।

...দশ-বছরবয়সী ইয়াদ্‌গার ১৯৩০ সাল অবধিও ইস্কুলে যায় নি। ফেরগানা উপত্যকায় একটা বোর্ডিং স্কুল খোলা হলে সে ছিল

তাতে প্রথম প্রথম পড়ুয়াদের একজন। একদিন সে মায়ের বাড়িতে গেলে, স্থানীয় মোল্লা আর তার সৎ-বাপ তাকে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে মানা করে দিয়েছিল। মায়ের চোখের জলে কোন ফল হল না। ইস্কুলে পড়া শেষ করে ইয়াদ্‌গার ভরতি হলেন তাশখন্দ রেল-পরিবহন ইনস্টিটিউটে — তখন তিনি কমসোমলের সদস্যা। এই উজবেক বালিকা কখনও ইয়াশ্‌মাক পরেন নি, পরে তিনি ৫০০ আর ১,৫০০ মিটারের দৌড়ে প্রজাতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি রেল-লাইন আর পুল নির্মাণে ইঞ্জিনিয়রের কাজ করেছিলেন। এই ইয়াদ্‌গার নাস্রিদ্দিনভাই পরে হয়েছিলেন উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভানেত্রী।

কিরগিজ বালিকা তুসুন উস্‌মানভার জীবনটা মোটেই অনায়াসের ছিল না। তেরো বছর বয়সে তাকে এক স্থানীয় ধনীর দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে বেচে দেওয়া হয়েছিল। কিছু লেখাপড়া করার ইচ্ছা প্রকাশের জন্যে তাকে পেটান হয়েছিল, তার গায়ে কেরাসিন ঢেলে দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল, পুড়িয়ে মারা হবে। তবে, এমনসব অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি হার মানেন নি। চতুর্থ দশকে তুসুন উস্‌মানভা হয়েছিলেন কিরগিজিয়ায় প্রথমা নারী মন্ত্রী।

উপান্তবর্তী জাতীয় অঞ্চলগুলিতে শিক্ষাদানের মান মধ্য অঞ্চলগুলির সমপর্যায়ের হয়ে আসছিল — তবু, চতুর্থ দশকের শেষাশেষিও সেখানে আরও বিস্তর কাজ বাকি ছিল। পারিবারিক জীবনে আর দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে তখনও বজায় ছিল অতীতের বহু উপাদান।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে বড় বড় রকমের অগ্রগতি এবং সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে সাধনগুলি প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা

হল সোভিয়েত শিল্পকলায় আর সাহিত্যে, — লক্ষ্য আর মানসতার দিক দিয়ে এই শিল্পকলা আর সাহিত্য আগেকার সবকিছু থেকে পৃথক। লেখক আর কবি, অভিনেতা আর সংগীতকার, চিত্রকর আর ভাস্কর, চলচ্চিত্রনির্মাতা আর সাংবাদিকদের একটা নতুন পুরুষ গড়ে উঠতে থাকল। কমিউনিস্ট নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে অবদান রাখার জন্যে তাঁরা সবাই করছিলেন যথাসাধ্য। জনগণের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক, জনগণের দৈনন্দিন গরজের বিষয়গুলির সঙ্গে সক্রিয় সংস্রব ছিল তাঁদের রচনাবলির বিশেষক উপাদান। মাক্সিম গোর্কির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হল: কয়েক খণ্ডে 'গৃহযুদ্ধের ইতিহাস', রুশ ভাষায় 'সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ার কাজ' আর 'বৈদেশিক সংবাদ' ('জা রুবেজম্') পত্রিকা, 'বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী' নামে জীবনী সিরিজ এবং বিভিন্ন কল-কারখানার ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত পরিসরের পুস্তকমালা, যার সংকলনে সাহায্য করেছিল জনগণের বিস্তৃত অংশ।

এই সময়ে দেশের রোমাঞ্চকর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রচনার একটি বিশেষ লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কির কবিতাগুলি।

মায়াকভ্স্কির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক আর কবিরা শ্রমিক-সভায় বক্তৃতা করতেন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় সফরে যেতেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন। 'প্রাভদা'য় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত নিকোলাই পগোদিন আর মিখাইল কল্ৎসভের প্রবন্ধ আর বিশেষ আলোচনা-রচনা, ইলিয়া ইল্ফ আর ইয়েভগেনি পেত্রভের ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা, দেমিয়ান বেদ্নির কবিতা, বরিস ইয়েফিমভের কার্টুন।

বহু প্রতিভাশালী লেখক, প্রবন্ধকার আর সাংবাদিক উরাল অঞ্চল, সাইবেরিয়া আর মধ্য এশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে থেকে

কাজ করেছিলেন বছরের পরে বছর। এইসব অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল ভালেন্তিন কাতায়েভের গল্প ‘চলো, এগিয়ে চলো, কালগতি!’, কন্‌স্তান্তিন পাউস্তোভ্‌স্কির ‘কোল্‌চিস্‌’ আর ‘কারা-বুগাজ্‌’, ইলিয়া এরেনবুর্গের উপন্যাস ‘দ্বিতীয় দিন’ আর ‘এক নিঃশ্বাসে’, ব্রুনো ইয়াসেন্‌স্কির ‘মানুষ খোলস বদলাল’ (বাংলা অনুবাদে ‘গোত্রান্তর’ — অনুঃ) এবং আরও ডজন ডজন রচনা।

ভাসিলি লেবেদেভ-কুমাচ্‌, আলেক্সেই সুর্কভ এবং মিখাইল ইসাকভ্‌স্কির লেখা প্রাণবন্ত আশাবাদী গানগুলি ঐ সময়ে ব্যাপক পরিসরে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁদের গানগুলির স্বরলিপি রচনা করেছিলেন ইসাক্‌ দুনায়েভ্‌স্কি, দ্‌মিত্রি পোক্‌রাস, মাৎভেই ব্লান্তের এবং ভাসিলি সলোভিয়ভ-সেদই।

কল-কারখানার সংবাদপত্র বের করতে সাহায্য করতে লেগে গেলেন কবি আর লেখকেরা — এটা শিগগিরই একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সংসাধনে, নতুন জীবন গড়তে, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এগিয়ে নিয়ে চলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্যে শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করত তাঁদের কবিতা, স্কেচ, শ্লেষাত্মক কবিতা, ছড়া আর ব্যঙ্গরসাত্মক রচনাগুলি।

জনগণের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে শিল্পকলা আর সাহিত্য ক্ষেত্রের কর্মীরা যেসব ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতেন সেগুলির যা নিগূঢ়তা তেমনটা সচরাচর দেখা যায় না, সেগুলি চূড়ান্তমাত্রায় বাস্তব জীবনের অনুযায়ী; পার্টি আর সমুন্নত নীতিগুলির প্রতি প্রবল আনুগত্য সেগুলির বৈশিষ্ট্য।

চাপায়েভের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন দ্‌মিত্রি ফুরমানভ, তিনি ঐ রোমাঞ্চকর সেনানায়ক এবং জনগণের সন্তানের বর্ণাঢ্য কথা-প্রতিকৃতি রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে নাম-করা লেখক হয়েছিলেন। ফুরমানভের উপন্যাস

অবলম্বনে প্রস্তুত-করা একখানা চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। 'চাপায়েভের' অন্যতম পরিচালক সের্গেই ভাসিলিয়েভ বিপ্লবের দিনগুলিতে সরকারী আর সামরিক বার্তা বিলির কাজ করতেন। বিপ্লবের পরে এই প্রাক্তন বার্তাবহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হয়ে ডিগ্রি পাবার পরে সিনেমার কাজ শুরু করেছিলেন। গেওর্গি ভাসিলিয়েভের সহযোগে তাঁর প্রস্তুত-করা এই 'চাপায়েভ' চলচ্চিত্রখানি সারা পৃথিবীতে বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

অভিনব টেকনিকের সঙ্গে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু সমন্বিত করে বেশকিছুসংখ্যক সোভিয়েত চলচ্চিত্রনির্মাতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিভিন্ন অপূর্ব অবদান সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯২৫ সালে তোলা সের্গেই আইজেনস্টাইনের 'যুদ্ধজাহাজ পতেম্‌কিন' পৃথিবীর একখানি সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বলে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর সাধারণ্যে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকলাকে সর্বপ্রথমে হাজির করেছিল এই চলচ্চিত্রখানি। ১৯২৭ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্ট প্রদর্শনীতে 'যুদ্ধজাহাজ পতেম্‌কিন' প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। এই চলচ্চিত্রখানির নির্মাণকর্মিদল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন দু'বছর পরে, সেই সময়ে চার্লি চ্যাপলিন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিসের জন্যে তাঁরা আমেরিকায় এলেন। আইজেনস্টাইনের যুগ্ম-পরিচালক গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভ এই প্রশ্নে একটু হতচকিত হয়েই বিড়বিড়িয়ে বলেছিলেন, আমেরিকায় কীভাবে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয় তাই দেখতে তাঁরা গিয়েছিলেন। তার উত্তরে মহান চ্যাপলিন বলেছিলেন: 'চলচ্চিত্র তৈরি করা হয় মস্কোয়, এখানে লোকে করে পয়সা।'

১৯৩২ সালে প্রথম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নিকোলাই এক্‌-এর 'জীবনের পথে' জমকালো সাফল্যলাভ

করেছিল। পরবর্তী ভেনিস উৎসবে প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়েছিল আলেক্সান্দ্রভের 'আমুদে লোকজন'।

মস্কোয় যে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবে বিদেশী প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল সেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। তাতে ওয়াল্টার ডিস্‌নির কার্টুন চলচ্চিত্র ছিল, ফরাসী পরিচালক রেনে ক্লেয়ারও তাঁর একখানা চলচ্ছিত্র হাজির করেছিলেন। অস্ট্রিয়া থেকে পাঠানো 'পিটার' (তাতে প্রধান ভূমিকায় ফ্রান্সিস্‌কা গাল্‌) জাজ্জ্বল্যমান সাফল্যলাভ করেছিল। এই সমস্ত চলচ্চিত্রই যথোচিত প্রশংসা পেয়েছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক জুরির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল 'চাপায়েভ' এবং 'মাক্সিমের যৌবন' (তিন-খন্ডে একটি চলচ্চিত্রের প্রথম খন্ড, তিন খন্ডকে পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন গ্রিগোরি কজিন্ত্‌সেভ এবং লেওনিদ ত্রাউবের্গ ১৯৩৯ সালে)।

এর অল্প কিছুকাল পরেই ঘটেছিল সোভিয়েত সিনেমার বড় বড় সাধন — মিখাইল রোম্‌-এর 'অক্টোবরে লেনিন' (১৯৩৭) এবং '১৯১৮ সালে লেনিন' (১৯৩৯)। এই দু'খানা চলচ্চিত্রেই লেনিনের ভূমিকায় অতি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন বরিস শ্চুকিন।

নতুন নতুন আখ্যানবস্তু এল থিয়েটারেও। থিয়েটারের নতুন নতুন ধারার প্রবর্তকদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি হলেন — কন্‌স্তান্তিন স্তানিস্লাভ্‌স্কি, ভ্লাদিমির নেমিরোভিচ-দান্‌চেঙ্কো, ভ্‌সেভোলদ মেয়েরহোল্দ্‌, ইয়েভগেনি ভাখ্‌তান্‌গভ, সলোমন মিখোয়েল্‌স্‌, নিকোলাই অখ্লোপ্‌কভ, নিকোলাই চের্‌কাসভ। ভাস্কর্যক্ষেত্রে পৃথিবীজোড়া স্বীকৃতি পেয়েছিল ভেরা মুখিনার মহতী গ্রুপ — 'শ্রমিক এবং নারী যৌথখামারী', ১৯৩৭ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সোভিয়েত মন্ডপে এটিকে স্থাপন করা হয়েছিল। স্বভাববাদী আর ফর্মালিস্টিক ধারা রোধ

করার প্রয়াসের ভিতর দিয়ে আলেক্সান্দর দেইনেকা, ইউরি পিমেনভ, গেওর্গি নিস্‌কি এবং পাভেল করিনের মতো শিল্পীদের প্রতিভা সুপরিণতির শিখরে-শিখরে পেঁাছে গিয়েছিল। পিয়ৎর কঞ্চালভ্‌স্কি, কন্‌স্তান্তিন ইউওন, মার্তিরস সারিয়ান এবং ইগর গ্রাবারের শিল্পকর্মগুলিও এই সময়ে হয়েছিল প্রেরণাস্থল।

শ্রমিক এবং নারী যৌথখামারী। ভেরা মুখিনার ভাস্কর্য

১৯৩৪ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম সোভিয়েত লেখক কংগ্রেস। ২,৫০০ সদস্যের সোভিয়েত লেখক সমিতির ৫৫৭ জন প্রতিনিধি ছিলেন এই কংগ্রেসে, এই প্রতিনিধিরা ছিলেন

৫২টা জাতির মানুষ। সোভিয়েত সংস্কৃতি রূপে জাতীয়, আর মর্মবস্তুতে সমাজতান্ত্রিক, এই সংস্কৃতির দ্রুত অগ্রগতির সাক্ষ্য হল এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব।

তার আগেকার ১৭ বছরে সোভিয়েত লেখকদের সাধন বিশ্লেষণ করে মাক্সিম গোর্কি এই কংগ্রেসে বক্তৃতায় বলেছিলেন: 'আমাদের সমস্ত প্রজাতন্ত্রের সাহিত্য বহু ভাষায় লেখা হলেও, সোভিয়েত ভূমি প্রলেতারিয়েতের কাছে, সমস্ত দেশের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র যেসব লেখক আমাদের মঙ্গল কামনা করেন তাঁদের কাছে এই সাহিত্য দেখা দেয় একটা সমন্বিত সত্তা রূপে।'

মধ্য আর উচ্চতর শিক্ষা এবং বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রের এই দ্রুত সম্প্রসারণের জন্যে স্বভাবতই বিস্তর অর্থ দরকার হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা (১৯৩৩—১৯৩৭) পরিকল্পনায় এই খাতে ৮,০০০ কোটি রুবল বরাদ্দ করার ব্যবস্থা হয়েছিল গোড়ায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনগুলির সম্প্রসারণের বাবত খরচ হয়েছিল মোটামুটি ১১,০০০ কোটি রুবল — অর্থাৎ, প্রথম পরিকল্পনার মধ্যে যা মোট খরচ হয়েছিল তার চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। নতুন সমাজের বৈষয়িক বনিয়াদ বেশ সংহত হয়ে ওঠার ফলে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, থিয়েটার, মিউজিয়ম আর ছাপাখানা সম্প্রসারিত করার কাজ সহজতর হয়েছিল। সোভিয়েত নাগরিকদের জন্যে মাথাপিছু খরচের গড় পরিমাণ ১৯২৮—১৯২৯ সালের ৮ রুবল থেকে বাড়িয়ে ১৯৩৮ সালে করা হয়েছিল ১১৩ রুবল। ইস্কুলে শিক্ষাদানের সময় শিগগিরই সাত থেকে দশ বছর করা গিয়েছিল। ইস্কুলের ছেলে-মেয়েরা যারা প্রথমে দশ বছরের শিক্ষাগ্রহণ শেষ করে তারা ইস্কুল ছাড়ার পরীক্ষা দিয়েছিল ১৯৩৫ সালে। ঐ পর্বে ছেলে-মেয়েরা নিয়মানুযায়ী সাত বছরের

পড়া শেষ করে আরও তিন বছর ইস্কুলে থেকে তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারত।

মধ্যবিদ্যালয়ে সুষ্ঠু তালিমই হল প্রধান উপাদান যা ছাত্রদের শিক্ষার পরবর্তী পর্বে তাদের সাফল্য পূর্বনির্ধারিত করে দিল। ১৯৩৩—১৯৩৭ সালে উচ্চতর সোভিয়েত শিক্ষায়তনগুলি থেকে স্নাতক হয়েছিল ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক, ডাক্তার, ভূমি-বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ইত্যাদি। পূর্বগামীদের মতো নয়, — পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন-খাতা এবং অন্যান্য সহায়িকার নিদারুণ অভাবটা কী বস্তু, তা এই স্নাতকেরা জানে নি। এইসব স্নাতক হাতে-কলমে তালিম পেয়েছিল নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্রে 'আজোভ্‌স্তাল' ইস্পাত কারখানায়, খির্বিনি রাসায়নিক কারখানায়, মাগ্‌নিতোগর্স্কে — প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে গড়া বিশাল বিশাল সর্বাধুনিক শিল্পায়তনে।

আগুয়ান শ্রমিক — সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার নেতাদের জন্যে পার্টি আর সরকার সবিশেষ যত্ন নিয়েছিল। সদ্য-স্থাপিত বিভিন্ন শিল্প আকাদমিতে যোগ্যতা উন্নততর করাবার জন্যে ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষের জন্যে বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল; আগুয়ান শ্রমিকেরা সেখানে উচ্চতর শিক্ষা পেয়েছিল। এইসব আকাদমি থেকে যাঁরা স্নাতক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশজোড়া সুখ্যাতি পাওয়া বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের নবপ্রবর্তকেরা — যেমন, খনি-শ্রমিক ইজোতভ, কামার বুসিগিন, ট্রেন-ড্রাইভার ক্রিভোনস্‌, তাঁতিনী ভিনোগ্রাদভা, ইস্পাত-ঢালাইকার মাজাই।

সোভিয়েত উচ্চতর শিক্ষার অগ্রগতি দেশের বুদ্ধিজীবিসমাজটাকে রূপান্তরিত করে দিল — এখন তার কেন্দ্রী উপাদান হয়ে উঠল শ্রমিক আর কৃষকদের ছেলে-মেয়েরা। তাদের ভাবাদর্শ গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক স্বদেশভূমির সেবা করার আগ্রহ

দিয়ে। বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশের দুয়ার অবারিত হয়ে গেল শ্রমজীবীদের সামনে। কৃষক হিসেবে জীবন শুরু করে বল্টিক নৌবহরে নাবিক হয়েছিলেন ফ. কুপ্রেভিচ — তিনি পরে উদ্ভিদবিদ্যা আর শারীরবৃত্ত ক্ষেত্রে গুরুত্বসম্পন্ন গবেষণা চালিয়েছিলেন, পরে হয়েছিলেন বেলোরুশিয়ার বিজ্ঞান আকাদমির সভাপতি। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আকাদমিশিয়ান ব. পেত্রভ মস্কোয় শক্তি ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করতে যাবার আগে ছিলেন একটা যৌথখামারের হিসাবরক্ষক, পরে টার্নার। আরও একজন আকাদমিশিয়ান — মহাকাশযানের বিখ্যাত ডিজাইনার সের্গেই করোলিয়ভেরও কর্মজীবন শুরু হয়েছিল শ্রমিক হিসেবে।

পরে যাঁরা হলেন মস্ত মস্ত বিমান-ডিজাইনার — ওলেগ আন্তোনভ, সেমিয়ন লাভচ্কিন, আর্তিয়ম মিকোয়ান, আলেক্সান্দর ইয়াকভলেভ — তাঁরা তখন ছিলেন ছাত্র, তাঁদের কর্মজীবন সবে শুরু হচ্ছিল।

লেনিনগ্রাদে আব্রাম ইওফের অধীনে পদার্থবিদ্যা আর টেকনিকাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। এখানে গবেষণাকাজ শুরু করেছিলেন কাপিৎসা, সেমিয়নভ, কুর্চাতভ, আৎসিমভিচ, স্কোবেলৎসিন এবং ফ্রেঙ্কেল: তখনও তাঁরা নামী হয়ে ওঠেন নি, কিন্তু পরে তাঁরা হয়েছিলেন পৃথিবীবিখ্যাত। পরে আকাদমিশিয়ান হয়েছিলেন লান্দাউ, আলেক্সান্দ্রভ এবং কন্দ্রাতিয়েভ — তাঁরা এই ইনস্টিটিউটের গবেষণাকর্মিদলে যোগ দিয়েছিলেন। এইসব বিজ্ঞানীর অনেকেই পরে মস্কো, দ্নেপ্রপেত্রভ্স্ক, খারকভ, উরাল অঞ্চল এবং জর্জিয়ায় গিয়ে নতুন নতুন ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছিলেন, সেগুলি পরবর্তী বড় বড় সাধনের পথ তৈরি করেছিল।

কালক্রমে সোভিয়েত জেট ইঞ্জিনিয়রিং এবং ইউরি গাগারিন

আর তাঁর পরবর্তীদের মহাকাশে উড্ডয়ন পৃথিবীকে স্তম্ভিত করল। প্রথমে বিস্ময়করই মনে হয় যে, সোভিয়েত জনগণ গড়ল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা, ক্ষেপণ করল প্রথম স্পুৎনিক...এই তালিকা বাড়াবার দরকার নেই। চতুর্থ দশকে শিক্ষা আর বিজ্ঞানের জন্যে পৃথক করে রাখা অর্থের পরিমাণ এবং তখন গড়ে উঠছিল যে-নবীন বিজ্ঞানী পুরুষ-পর্যায়, সেদিকে তাকালে সোভিয়েত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার পরবর্তী সাধনগুলি ঘটার কারণ বোঝা যায়, শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে সমাজতন্ত্র যে নতুন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দিল সেগুলি উপলব্ধি করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

এইসব নতুন তরুণ বিশেষজ্ঞ এবং আগেকার পুরুষ-পর্যায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে সহযোগ খুবই সুফলপ্রসূ হয়েছিল। পৃথিবীবিখ্যাত বিমান-ডিজাইনার আন্দ্রেই তুপলেভের একটা মানানসই মন্তব্যে ঐ সময়কার আবহাওয়াটা বেশ ফুটে উঠেছে: 'এইসব ইঞ্জিনিয়র যে সমাজতন্ত্রের আদর্শের সেবা করতে বাধ্য হল, সেটা কিসের জন্যে? সাধারণভাবে মানবজাতিরই কল্যাণের জন্যে কাজের রোমাঞ্চ, আমাদের সৃজনশীল কর্মশক্তির অভূতপূর্ব প্রকাশ-পথ এবং চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন অতি বিবিধ টেকনিকাল গবেষণার সুযোগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল।'

আকাদমিশিয়ান ইয়েভ্‌গেনি পাতন্‌ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, পাঁচসালা পরিকল্পনার গোটা ধারণাটা সম্বন্ধেই তিনি দীর্ঘকাল যাবত অত্যন্ত সন্দেহবাদী ছিলেন: 'সময় কাটতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে এবং নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প নির্মাণের কাজ শুরু হলে, যে-কাজ আগেকার আমলে একেবারেই অসম্ভব হত, আমি বুঝতে শুরু করলাম যে, আমি ভ্রান্ত ছিলাম। নতুন নতুন নির্মাণ প্রকল্প, মস্কোর পুনর্গঠন এবং পার্টি আর সরকারের

চালু-করা অন্য পরিকল্পের সম্মুখীন হয়ে আমার বিশ্ববীক্ষায় ক্রমাগত বেশি প্রগাঢ় পরিবর্তন ঘটল। আমি বুঝতে শুরু করলাম, আমি সোভিয়েত ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে যাচ্ছি, কেননা এই ব্যবস্থা আর-সবকিছুর উপরে স্থান দেয় কাজকে, আর কাজই সব সময়ে ছিল আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল। এ বিষয়ে আমার প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে, আমি বুঝেছিলাম আমার ভাব-ভাবনাগুলি নতুন করে গড়ে উঠছিল একটা নতুন জীবনযাত্রাপ্রণালীর প্রভাবে।'

বিশ্ব সংস্কৃতির অগ্রগতি ঘটাবার ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অবদান বিদেশে ব্যাপক প্রশস্তি লাভ করল। ঐ সময়ে আক্ষরিক অর্থেই সমস্ত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের দেখা যেতে থাকল। বহুবার এই রকমের সব কংগ্রেসে যেসব সোভিয়েত বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন গুব্‌কিন, ইওফে, ফ্রুম্‌কিন, ভাভিলভ, ভল্‌গিন, লুকিন, পান্‌ক্রাতভা। ১৫শ আন্তর্জাতিক শারীরবৃত্ত কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন সুবিখ্যাত ইভান পাভ্‌লভ। ১৯৩৭ সালে আন্তর্জাতিক ভূবিদ্যা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল মস্কোয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ইভান গুব্‌কিন। সুপ্রজননবিদ্যা এবং নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ নিকোলাই ভাভিলভকে কয়েকটা বৈদেশিক বিজ্ঞান আকাদমির অনরারি সদস্য করা হয়েছিল।

সোভিয়েত সংস্কৃতি, বিজ্ঞান আর শিল্পকলার রোমাঞ্চকর অগ্রগতি সত্ত্বেও, তখনও বেশ কতকগুলি সমস্যার সমাধান বাকি ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছিল শিল্পযোজন আর কৃষির যৌথকরণ অভিযানের সঙ্গে একই সময়ে, আর তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনায় ঠাসা। রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্যে দরাজ হাতে অর্থবরাদ্দ করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘাটতির মোকাবিলা করতে হত।

ইস্কুল, ক্লাব আর সিনেমার সংখ্যা দ্রুত বাড়লেও, শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক চাহিদা বাড়ছিল আরও বেশি দ্রুত। বহু ইস্কুল বসত তিন শিফ্টে; শিক্ষক, অভিনেতা আর সংগীতকারের ঘাটতি ছিল প্রচণ্ড: যেমন, ১৯৩৪ সাল অবধিও রাশিয়া ফেডারেশনে শহরগুলিতে শিক্ষকদের তৃতীয়াংশের এবং গ্রামে শিক্ষকদের অর্ধেকের বিশেষ শিক্ষকশিক্ষণ পাওয়া ছিল না। ১৯৩৮ সালের গোড়ায় দেশে ফিল্ম প্রজেক্টর ছিল মোট ২৮,৫০০টা, সবাক চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা ছিল সেগুলির অর্ধেকেরও কম প্রজেক্টরে। ঐ বছরের মধ্যে রেডিও সেটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট চল্লিশ লক্ষ — এটা ছিল একটা বিরাট সাধন। কিন্তু বহু পরিবারে, বিশেষত গ্রামে, নিজেদের লাউডস্পীকার ছিল না। তবে, শিক্ষা আর সংস্কৃতির সুফলগুলিকে জনসংখ্যার ক্রমাগত বিস্তৃততর অংশের নাগালের মধ্যে পেঁছে দেওয়া হচ্ছিল প্রতিদিনই। সোভিয়েত বিজ্ঞানী, লেখক, সংগীতকার, চলচ্চিত্রনির্মাতাদের এবং রেডিও আর শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রেরণাদায়ক সাধনগুলি আক্ষরিক অর্থেই কোটি কোটি মানুষে সোৎসাহ প্রশস্তি লাভ করছিল।

অপেশাদার গান-বাজনা ইত্যাদি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করছিল সারা দেশে। সমস্ত কলে-কারখানায়, শহর আর গ্রামের ক্লাবগুলিতে, ইস্কুলে আর শিক্ষায়তনে এবং ফৌজী ইউনিটগুলিতে গড়া হয়েছিল আর্ট গ্রুপ, সেগুলির সদস্যরা নাট্যাভিনয় করত এবং আরও বিবিধ আর্ট-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ চালাত। নিজেদের প্রধান বৃত্তির সঙ্গে এইসব ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত করে তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তুলত, নিজেদের দিগন্ত সম্প্রসারিত করে তুলত, শুধু তাই নয়, তারা যাদের মধ্যে থাকত আর কাজ করত তাদেরও যোগাত সাংস্কৃতিক প্রবর্তনা। এইসব অপেশাদার গ্রুপ চালাবার কাজে মেয়ে-পুরুষদের তালিম দেবার একটা বিশেষ

'কেন্দ্রীয় জনগণের আর্ট ভবন' স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে, আর ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপের বিভাগীয় আর প্রজাতান্ত্রিক পর্যালোচনার আয়োজন করতেও আরম্ভ করেছিল শিগগিরই। এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে, ইভান কজ্‌লভ্‌স্কি, সের্গেই লেমেশেভ এবং বরিস গ্‌মিরিয়ার মতো বিখ্যাত গায়কেরা তাঁদের এই পেশাটা ধরেছিলেন প্রথমে অপেশাদার গ্রুপে। সংগীতরচয়িতা মাৎভেই ব্লান্তের প্রথমে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন মাগ্‌নিতোগর্স্কে শখের কনসার্টে। ইউক্রেনের রেঁদা-মিস্ত্রি বরিস গর্বাতভ হয়ে উঠেছিলেন একজন লেখক, তেমনি ট্রেন-ড্রাইভার আলেক্সান্দর আভ্‌দেয়েঙ্কো এবং শ্রমিক ইউরি লিবেদিন্‌স্কি। বিভিন্ন অপেশাদার কম্পানি থেকেই গড়ে উঠেছিল মস্কো আর লেনিনগ্রাদের কমসোমল থিয়েটার, তেমনি গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভের পরিচালিত সোভিয়েত ফৌজী নৃত্য-গীত কম্পানি এবং রাষ্ট্রীয় রুশী লোক-যন্ত্র সংগীত অর্কেস্ট্রাও।

দেশের সর্বত্র গড়া এইসব শখের আর্ট কম্পানিতে চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি নাগাত সদস্য ছিল তিরিশ লক্ষর বেশি। বহু-জাতির দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত জাতির মানুষই এইসব ক্রিয়াকলাপে শামিল হল — এটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে সংঘটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অপরাজেয়তার নিদর্শন।

বাস্তবিকই, আশ্চর্য রকমের স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশটি শত শত বছরের প্রচলিত অজ্ঞতা অনগ্রসরতা থেকে লাফিয়ে এসে গেল প্রগতি আর জ্ঞানালোকের নতুন যুগের মধ্যে।

বিপ্লবের আগে লেনিন লিখেছিলেন: 'রাশিয়ায়ও জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ শিল্পী তলস্তয়কে জানে। তাঁর মহান রচনাবলিকে যথার্থই **সবার** সম্পদ করে তুলতে হলে, যে-সমাজব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ আর কোটি কোটি মানুষকে অজ্ঞতা, তিমিরে-আচ্ছন্নতা, উঞ্ছবৃত্তি আর গরিবির মধ্যে ফেলে রাখে,

তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে, সমাধা করতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।'*

এই বিপ্লব হাসিল করা হল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের মধ্যে। বিশ্ব সংস্কৃতির সমস্ত শ্রেষ্ঠ অবদানের মতো তলস্তয়ের রচনাবলিও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্করণে প্রকাশিত হতে থাকল কোটি কোটি শ্রমজীবীদের জন্যে। ১৯১৩ সালে বই প্রকাশিত হত মাথাপিছু ০·৭ খানা, আর ১৯৩৮ সালের মধ্যে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছিল ৪·১— যদিও ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অনেকটা। বই প্রকাশিত হতে থাকল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতিসত্তার ভাষায় (সেগুলির সংখ্যা শতাধিক, তার চল্লিশটার বেশি জাতিসত্তার কোন লিখিত ভাষাও ছিল না অক্টোবর বিপ্লবের আগে)। পুশকিন, গোর্কি, তলস্তয় এবং চেখভের রচনাবলি প্রকাশিত হল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্করণে, তেমনি বৈদেশিক চিরায়ত সাহিত্যও: যেমন, বায়রন, গ্যেটে, হাইনে, ডিকেন্স আর সার্ভান্তেসের রচনাবলি, এখানে নাম করা হল মাত্র অল্প কয়েক জনের।

পুস্তক-টাইটেলের সংখ্যা এবং সংস্করণের পরিমাণ, এই দুই দিক থেকেই প্রথম স্থানে রইল রাজনীতিক এবং সামাজিক-আর্থনীতিক সাহিত্য। এর মধ্যেও দেখা গেল, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির সাধনগুলিকে জনগণের নাগালের মধ্যে এনে দেবার প্রচেষ্টায় নিহিত একটা বুনিয়াদী ধাঁচ. সামাজিক বিকাশের প্রকৃতি আর বিভিন্ন ধারা বোঝার জন্যে তাদের প্রবল আগ্রহ এবং সামাজিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকায় আসার জন্যে তাদের ইচ্ছা আর সামর্থ্য। যাদের অজ্ঞতা বলশেভিকদের পতন ঘটাবে বলে বুর্জোয়া সাংবাদিকেরা মত পোষণ করত সেই তালাওয়ালা, স্টোকার আর

---

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি, ১৬শ খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ**

জলকলমিস্ত্রিদেরই রাষ্ট্রের বিষয়াবলিতে সরাসরি জড়িত হবার সময় এসে গেল।

চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাত সোভিয়েত জনগণের সাংস্কৃতিক মানের যে-উন্নতি ঘটেছিল সেটা সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাধারণ প্রগতির চেয়ে বেশিকিছু। অন্যান্য বিভিন্ন দেশেও নিরক্ষরতা দূর হচ্ছিল — যদিও অনেক বেশি ধীরে, সর্বত্র দেখা দিচ্ছিল আরও বেশি বেশি বিজ্ঞানী, আরও বেশি সংবাদপত্র আর বই প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নে এই লাফিয়ে-অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, প্রথমত, অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে, দ্বিতীয়ত, এটা চলেছিল নতুন সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। জ্ঞান, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত বেশি করে প্রবেশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত নর-নারীদের পুনর্জন্ম হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে, সত্যিকারের সোভিয়েত দেশভক্ত হিসেবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ সমাধা

উত্তরণ কালপর্যায়ের সমীক্ষা

ছোট্ট বাচ্চা যখন প্রথম প্রথম পা ফেলতে থাকে, তাকে সাহায্য করে বড়রা। সোভিয়েত রাষ্ট্র যখন জন্মেছিল, তাকে নিজেই সবকিছু করতে হয়েছিল শুধু তাই নয়, সে ছিল শত্রু-পরিবেষ্টিত। রাশিয়ার সামাজিক-আর্থনীতিক, টেকনিকাল আর সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার দরুন পরিস্থিতিটা ছিল আরও জটিল। এই অনগ্রসরতা অতিক্রম করতে সময় দরকার ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগেই বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন যে, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা হাতে নেবার পরে পুরন সমাজটাকে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করতে বেশকিছুটা সময় লাগবে। তাঁরা বলেছিলেন, দরকার হবে একটা উত্তরণ কালপর্যায় — সেই সময়ে প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রকে সংহত করবে, ব্যক্তিগত মালিকানা আর মানুষের উপর মানুষের শোষণ ঘুচিয়ে দেবে।

সোভিয়েত জনগণ পুরন সমাজটাকে রূপান্তরিত করার কাজে নেমেছিল সেই ১৯১৭ সালেই। উত্তরণ কালপর্যায় কত দীর্ঘ হবে, তা আগেভাগে কেউ বলতে পারে নি, কিন্তু বলশেভিকরা বিপ্লবের প্রতাপ সম্বন্ধে কখনও আস্থা হারায় নি, যে পথ তারা ধরল তা

দিয়ে বিজয়ে পেঁাছন যাবে বলে তাদের দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। কার্ল মার্কস বিপ্লবকে 'ইতিহাসের ইঞ্জিন' বলে উল্লেখ করে গেছেন, সেটা অকারণে নয়। সোভিয়েত জনগণ ১৯১৭ সালে নিজেদের এবং দেশের পরিচালক হবার পরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আর্থনীতিক আর সামাজিক প্রগতির পথ ধরে এগোল লম্বা লম্বা পা ফেলে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন, কৃষির যৌথকরণ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালু করে দেবার কর্মনীতি কার্যে পরিণত করে সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণ তাদের মহান নেতা লেনিনের অনুজ্ঞা পালন করল, — চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাত দেশে পুঁজিতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের জয় নিষ্পন্ন হয়ে গেল। শ্রমিক আর কৃষকদের একটি বহু-জাতির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল — ইতিহাসে এই প্রথম।

মাঝ-চতুর্থ-দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পৃথিবীতে বৃহত্তম দেশ, জনসংখ্যায় তার স্থান ছিল তৃতীয় (চীন আর ভারতের পরে)। দেশ তখন বৈদেশিক কিংবা দেশীয় পুঁজির মুঠো থেকে মুক্ত। শিল্পোৎপাদনের পরিমাণে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই — পৃথিবীতে দ্বিতীয়।

বৃদ্ধির পরিসরের চেয়ে এই সম্প্রসারণের অভূতপূর্ব বেগই ছিল সোভিয়েত অর্থনীতির বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েত অর্থনীতির একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল — সেটা হয়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। স্বরাষ্ট্রীয় ফ্রণ্টে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় পুঁজিতান্ত্রিক আর ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদন, ইত্যাদি অন্যান্য সমস্ত আর্থনীতিক ধাঁচকে উৎখাত করল সমাজতন্ত্র। ১৯২৪ সালে জাতীয় আয়ের প্রতি ১০০ রুবলের মধ্যে অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র থেকে আসত ৩৫ রুবল, আর ১৯৩৭ সাল নাগাত এই পরিমাণটা দাঁড়িয়েছিল ৯৯ রুবলের বেশি। জাতীয়

আয় সৃষ্টির ব্যাপারে তখন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প আর শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাই হল নিষ্পত্তিমূলক।

বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটল অর্থনীতিরই শুধু নয়, জনসংখ্যার শ্রেণীগত গড়নেও। তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যার প্রতি-শতে পাঁচ জন ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর, প্রধানত কুলাক শ্রেণীর। ১৯৩৭ সালে বুর্জোয়াদের শ্রেণী হিসেবে অস্তিত্ব আর ছিল না, এই সময়ে প্রতি-শতে মাত্র ছ'জন ছিল যৌথখামারের বাইরে কাজ-করা কৃষক, বাদবাকি সবাই তখন কাজ করত সমাজতান্ত্রিক শিল্পে কিংবা যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারে। শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক এবং আপিস, আর বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্মী ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ জন।

শোষক শ্রেণীগুলিকে উৎখাত করা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তিই এইসব রূপান্তরের একমাত্র সারবান উপাদান নয়। খাস শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীগুলিতেও পরিবর্তন ঘটেছিল। বিপ্লবের আগে শ্রমিকেরা কোন উৎপাদনের উপকরণের মালিক ছিল না, কার্যত সমস্ত অধিকার থেকেই তাদের বঞ্চিত রাখা হত। কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক শ্রেণী হল নিজের পরিচালক — সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান বাহিনী।

বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ আর বহিরাক্রমণ, এবং অর্থনীতির পুনঃসংস্থাপন আর সমাজতান্ত্রিক পুনঃনির্মাণের সময়ে বরাবর শ্রমিক শ্রেণীই বাদবাকি শ্রমজীবী জনগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে — শ্রমিক শ্রেণীই হয়েছে সবচেয়ে সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী।

বলশেভিকবাদের শত্রু এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিরোধীরা রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভুয়ো আশংকা প্রকাশ করেছিল। শ্রমিকেরা যখন রাশিয়ার রাজনীতিক আর আর্থনীতিক জীবন পরিচালিত করতে শুরু করল, ঠিক তখনই অর্থনীতির

অগ্রগতি ঘটল চমকপ্রদ বেগে, জীবনযাত্রার উচ্চতর মান নিশ্চিত হল, বিপুল মাত্রায় বেড়ে গেল দেশের রাজনীতিক মর্যাদা।

গোড়ায় শ্রমিক শ্রেণী ছিল জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশমাত্র। বিপ্লবের দশ বছর পরেও রাষ্ট্রযন্ত্রে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ লক্ষ — এটা ছিল বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশি। তবে, রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর, দেশের সমগ্র আর্থনীতিক জীবনের উপর, সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াটার উপর শ্রমিকদের খাটানো প্রভাবের মাত্রাটা শ্রমিক শ্রেণীর নিছক সংখ্যাশক্তি দিয়েই নির্ধারিত হয় নি, সেটা আরও নির্ধারিত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন, ঐক্য-সংহতি আর কর্তৃত্বের মাত্রা দিয়ে, আর শেষপর্যন্ত, সোভিয়েত সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর আগুয়ান বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা দিয়ে। ১৯২৭ সালে রাষ্ট্রযন্ত্রে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসা কমিউনিস্টের সংখ্যা ছিল মোটামুটি দুই লক্ষ, এদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনের বেশি ছিল বিভিন্ন সর্বোচ্চ পর্যায়ের পদে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আর সমবায় সংগঠন, শিল্পক্ষেত্রের ট্রাস্ট আর প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের বেশির ভাগই এসেছিল শ্রমিক শ্রেণী থেকে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে আরও মজবুত করে তোলার উদ্দেশ্যে তৃতীয় দশকের শেষে আর চতুর্থ দশকের গোড়ায় রাষ্ট্রীয় এবং আর্থনীতিক যন্ত্র থেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বহিষ্কৃত করার ফলে বিভিন্ন দপ্তর আর কল-কারখানা থেকে প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিজাতীয় লোকেদের উৎখাত করার কাজটা বেশকিছু মাত্রায় ত্বরান্বিত হয়েছিল — ঐসব লোক ছিল আমলাতন্ত্রী আর সংকীর্ণ-ভাগ্যান্বেষীরা, যারা ন. আ. ক-র কালপর্যায়ে বিপথচালিত হয়ে আর শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ছিল না। এর পাশাপাশি চলল আর-একটা প্রক্রিয়া: সর্বোচ্চ পর্যায়ের পদগুলিতে ক্রমেই বেশি বেশি

করে নিযুক্ত হতে থাকল নিছক শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসা মানুষ নয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকেরা, যাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই শ্রমিক শ্রেণী পরিবারের মানুষ। এর ফল দাঁড়াল এই যে, চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাত বেশির ভাগ কারখানার অধিকর্তা শ্রমিক শ্রেণীজাত, তাদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

সোভিয়েত, ট্রেড-ইউনিয়ন আর কমসোমল সংগঠনগুলিতেও পরিস্থিতি গড়ে উঠল অনুরূপ ধারায়। এই একই সময়ে সশস্ত্র বাহিনীতে পার্টি সদস্য আর শ্রমিকদের ব্যাপক সমাগম ঘটল নতুন করে। ১৯৩৪ সালের গোড়ায় লাল ফৌজে কর্মরত লোকেদের শতকরা ৪৬ জন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ, আর সৈনিক এবং অধিনায়কদের মোটামুটি অর্ধেক ছিল কমিউনিস্ট আর কমসোমল সদস্য।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের নেতৃত্বে থেকে শ্রমিক শ্রেণী কখনও চিরস্থায়ী প্রাধান্য আর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা চায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯২৪ সালের সংবিধানে শ্রমিক শ্রেণীকে যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকতর মজবুত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিতে আরম্ভ করেছিল। চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময় অবধি সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্বাচনী অধিকার জনসংখ্যার সমস্ত অংশের জন্যে সমান-সমান ছিল না। নির্বাচন পরিচালিত হত প্রকাশ্য ভোটের ভিত্তিতে, তাতে পর্ব ছিল কয়েকটা — অর্থাৎ কিনা, জনসাধারণ সরাসরি নির্বাচিত করত কেবল স্থানীয় বিধানিক সংস্থার প্রার্থীদের, আর এই নির্বাচিত প্রার্থীরা নির্বাচিত করত ঠিক উপরকার সংস্থার প্রতিনিধিদের। যতকাল বিভিন্ন শোষক শ্রেণী এবং উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার (বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে) অস্তিত্ব ছিল, সেই

সময়ে ঐসব বাধা-নিষেধ চালু করা হয়েছিল। শহরগুলিতে প্রাথমিক নির্বাচনী ইউনিট আঞ্চলিক ছিল না, সেটা ছিল অর্থনীতিভিত্তিক — যেমন, কারখানা, দপ্তর কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন। উৎপাদনভিত্তিক নীতিটা রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আগুয়ান শ্রমিকদের আর সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র আরও মজবুত করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং সমস্ত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে কড়ার ছিল যে, সোভিয়েত কংগ্রেসগুলিতে কৃষক আর শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে ১:৫।

সোভিয়েত সংবিধানে শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে এইসব বিশেষ অধিকার লিপিবদ্ধ করার বস্তুগত এবং ইতিহাস-নির্দিষ্ট প্রয়োজন দেখিয়ে লেনিন তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন: 'প্রলেতারিয়েতের সংগঠন কৃষকদের সংগঠনের চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত চলেছে, তার ফলে শ্রমিকেরা হয়ে উঠেছে বিপ্লবের শক্ত ঘাঁটি, আর তারা পেয়েছে একটা বাস্তব অগ্রাধিকার...

'আমাদের সংবিধান এই অসমতা চালু না-করে পারে নি, তার কারণ, সাংস্কৃতিক মান নিচু, আর আমাদের সংগঠন দুর্বল।'*

১৯২৬ সালের নির্বাচনী অভিযানে জনসংখ্যার অন্য যেকোন স্তরের চেয়ে বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল শ্রমিক শ্রেণী। তেমনি ১৯২৭ সালেও — তাতে অংশগ্রহণ করেছিল জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ। শহরে ভোটাধিকার পাওয়া এক কোটি মানুষের মধ্যে থেকে ভোট দিয়েছিল যাট লক্ষ জন। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, তুলা আর স্তালিনগ্রাদের অপেক্ষাকৃত বড় কারখানাগুলিতে ভোট পড়েছিল শতকরা ৯০ থেকে ১০০টাই। এইসব নির্বাচনে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছিল ধাতু-শ্রমিকেরা আর মুদ্রণ-শ্রমিকেরা — শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে সুযোগ্য, শিক্ষিত এবং রাজনীতিগতভাবে সচেতন

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৯তম খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ

বাহিনীগুলি। ১৯২৯ সালে ভোট পড়েছিল ৬৩ শতাংশের বেশি, ১৯৩১ সালে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছিল শহরে ৭৯·৬ আর গ্রামে ৭০·৪ শতাংশ। তিন বছর পরে অঙ্কদুটো ছিল যথাক্রমে ৯১·৬ শতাংশ আর ৮৩·৩ শতাংশ।

নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভোটাধিকারবঞ্চিত গ্রুপগুলির সংখ্যা কমে গিয়েছিল। ১৯৩১ আর ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভোটাধিকারবঞ্চিত লোকের সংখ্যা কমেছিল শহরে ৪·৯ থেকে ২·৪ শতাংশে, আর গ্রামে ৩·৭ থেকে ২·৬ শতাংশে।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকাজ সমাধা হয়ে গেলে সোভিয়েত কৃষককুলে বিভিন্ন মূলগত পরিবর্তন ঘটেছিল। তারা আর ছিল না ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদক শ্রেণী, যা — লেনিনের ভাষায় — পুঁজিতন্ত্র আর বুর্জোয়ারা গড়ে-বাড়িয়ে তোলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং ব্যাপক পরিসরে, তারা হয়ে উঠেছিল একটা সমাজতান্ত্রিক যৌথখামারী শ্রেণী। পৃথক পৃথক কৃষক খামারীদের শ্রেণীটা ছিল বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের মানুষ নিয়ে, কিন্তু চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময়কার যৌথখামারী কৃষককুল ছিল সমস্ত সামাজিক ভেদ-বিভেদমুক্ত একটা শ্রেণী। এটা ছিল সামাজীকৃত কৃষি উৎপাদনের সূত্রে গাঁথা একটা নিয়তাকারের শ্রেণী।

ঐ সময়ে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার বিভিন্ন উপাদান ছিল — যৌথখামারী, রাষ্ট্রীয় খামার আর মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনের শ্রমিক এবং কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা। সোভিয়েত কৃষককুলের মধ্যে ততদিনে দেখা দিয়েছিল নতুন নতুন গ্রুপ, বিপ্লবের আগেকার রাশিয়ায় তাদের থাকা সম্ভব ছিল না: গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠল যৌথখামারে উৎপাদন-সংগঠকদের একটা গোটা বাহিনী — তারা হল কৃষি আর্টেলের সভাপতি, ব্রিগেড আর কর্মিদলের নেতা, ডেয়ারির তত্ত্বাবধায়ক, ইত্যাদি। ততদিনে যৌথখামারের কর্মীদের

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বহুসংখ্যক টেকনিকাল কর্মী: ট্র্যাক্টর, কম্বাইন-হার্ভেস্টার আর লরির চালক, মেরামতের মেকানিক, ইত্যাদি। ১৯৩৭ সালে যৌথখামারগুলিতে টেকনিকাল কর্মীদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দশ লক্ষর বেশি।

ততদিনে কৃষকের শ্রমের প্রকৃতিটাই বদলে গিয়েছিল। ছোট ছোট পৃথক পৃথক জমিখণ্ড আর হাতে চালানো সরঞ্জামের জায়গায় এল যৌথখামার আর যন্ত্রপাতি। তখন কৃষকের শ্রম হল কর্মিদলভিত্তিক। মালিকের পক্ষে যা জাতিরূপী, সেইসব ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবৃত্তিকে ক্রমাগত বেশি মাত্রায় উৎখাত করে তার জায়গায় আসছিল মূলত সমষ্টিগত মনোভাব।

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা আর সংস্কৃতি নিয়ে আসার অভিযানে ততদিনে নিষ্পত্তিমূলক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষাশেষি গ্রামাঞ্চলের মোটামুটি বারো-আনি মানুষ পড়তে-লিখতে পারত, আর তার মাত্র কুড়ি বছর আগেও জারের রাশিয়ার বেশির ভাগ কৃষক ছিল নিরক্ষর।

আগুয়ান যৌথখামারী হবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যৌথখামারগুলিতে কৃষকেরা যেভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল, সেটা হল গ্রাম্য জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তরের একটা লক্ষণীয় নির্দেশক। নির্বাচনী অভিযানে, সোভিয়েতের নির্বাহী সংস্থাগুলির দৈনন্দিন কাজে যৌথখামারীরা ক্রমাগত বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল।

সমগ্র জনগণের মালিকানায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, আর সমবায় এবং যৌথখামারের সম্পত্তি, এই দুই রকমের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির মধ্যেকার যোগসূত্রস্বরূপ অভিন্ন উপাদানগুলি শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের পরস্পরের প্রয়োজন আর স্বার্থ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতর উপলব্ধি সৃষ্টি করল, তাদের মধ্যে মৈত্রীকে করে তুলল আরও

মজবুত। অচিরেই সোভিয়েত ইউনিয়নে পরস্পরের বিরোধী বৈরকার বিভিন্ন শ্রেণী কিংবা আপস-মীমাংসার অসাধ্য কোন শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব আর রইল না। তখন সোভিয়েত সমাজ হল দুটো প্রধান বন্ধুপ্রতিম শ্রেণী — শ্রমিক আর কৃষক, এবং বুদ্ধিজীবিসমাজকে নিয়ে।

বিপ্লবের পরবর্তী প্রথম দুই দশকের মধ্যে বুদ্ধিজীবিসমাজেরও সামাজিক প্রকৃতি এবং গড়নে মূলগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। বিপ্লবের ঠিক আগে বুদ্ধিজীবিসমাজ ছিল প্রধানত বুর্জোয়া আর ভূস্বামী শ্রেণীর লোক নিয়ে, কিন্তু ১৯৩৬ সালের শেষাশেষি বুদ্ধিজীবীদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ছিল শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মানুষ। ১৯২৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিশিয়ন ছিল মোট ২,২৫,০০০ জন, ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসের আদমশুমারে দেখা গেল, সংখ্যাটা ইতোমধ্যে সাতগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল মোট ১৬,৫৬,০০০। ঐ একই সময়ে কৃষিক্ষেত্রে স্নাতক কর্মীর সংখ্যা ৪৫,০০০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২,৯৪,০০০, আর চিকিৎসাক্ষেত্রে যথাক্রমিক সংখ্যা ছিল ১,৮৫,০০০ আর ৬,৭৯,০০০। প্রকৃতপক্ষে, সর্বত্রই ছিল ঐ একই চিত্র; এগুলি হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল — এই বিপ্লব অন্যান্য জিনিসের মধ্যে গড়ে তুলল শ্রমিক আর কৃষকদের তনয়-তনয়াদের নিয়ে নতুন বুদ্ধিজীবিসমাজ। পুরন বুদ্ধিজীবীদের নতুন ব্যবস্থা সমর্থনের পক্ষে টেনে এনে তাদের নতুন করে শিক্ষাদীক্ষা দেবার কাজও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল: চতুর্থ দশকের শেষাশেষি এমনসব বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০।

সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়সাফল্যগুলির সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে নতুন সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলি সুনির্দিষ্ট রূপধারণ করেছিল। আগে যা ছিল রুশ সাম্রাজ্য, সেখানকার

অনগ্রসর জাতিগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হল এদিক থেকে নিষ্পত্তিমূলক গুরুত্বসম্পন্ন — তারা দুর্বারভাবে এগিয়ে সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করল পুঁজিতান্ত্রিক পর্বের পাশ কাটিয়ে। এটা সম্ভব হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কায়েম হবার ফলে, এবং মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান, ককেশাসের বিভিন্ন অঞ্চল আর অন্যান্য এলাকা, যেখানে ১৯১৭ সালের আগে পুঁজিতন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারে নি কিংবা ঐ সময়ে সবে শিকড় গাড়তে শুরু করেছিল, সেইসব অঞ্চলের মানুষের প্রতি দেশের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এলাকাগুলির শ্রমজীবী জনগণের বিপুল সাহায্যের কল্যাণে। সোভিয়েত রাজ রাশিয়ার সমস্ত জাতিকে মুক্ত করল, জাতিগত উৎপীড়নের অবসান ঘটাল এবং দেশের অধিবাসী সমস্ত জাতির রাজনীতিক, আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার অবিচল কর্মনীতি অনুসারে চলল।

আগে যা ছিল রুশ সাম্রাজ্য, তার বহু জাতি জাতীয় সার্বভৌমত্ব লাভ করল সর্বপ্রথমে সেই ১৯১৭ সালে। ভূমি আর জল সংস্কারের ফলে তারা উৎপাদনের প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কগুলোকে বিলুপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জমিন প্রস্তুত করতে পারল। শিল্পযোজন আরও বিশেষ দ্রুতগতিতে এগোল জাতীয় প্রজাতন্ত্র আর বিভাগগুলিতে। নতুন নতুন কল-কারখানা, খনি আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এইসব এলাকায় জাতীয় শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠে হয়ে দাঁড়াল নতুন নতুন সমাজতান্ত্রিক জাতীয় লোকসমাজ স্থাপিত হবার পিছনে নিষ্পত্তিমূলক শক্তি। যারা পৃথক পৃথক জোতজমার মালিক ছিল, আর আগে যারা ছিল যাযাবর, এই দুই রকমেরই কৃষকদের বিস্তৃত অংশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সামাজিক-আর্থনীতিক প্রস্তাবনাস্বরূপ হল কৃষকদের পৃথক পৃথক

জোতজমাগুলোর যৌথকরণ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবও বিভিন্ন চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটাল এইসব জাতির জীবনে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বাসিন্দা জাতিগুলির মধ্যে অতীত থেকে পাওয়া আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক অসমতা উত্তরণ কালপর্যায়ের শেষাশেষি — বিপ্লবের পরে কুড়ি বছরের মধ্যে — কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নতুন সমাজতান্ত্রিক নৃকুলগত লোকসমাজগুলি গড়ে-নির্দিষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির মধ্যে স্থাপিত হল অলঙ্ঘনীয় বন্ধুত্ব, প্রতিষ্ঠিত হল সুফলপ্রসূ সহযোগের সম্পর্ক, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি কার্যে পরিণত করা হল অতি কার্যকররূপে।

উত্তরণ কালপর্যায় শেষ হল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সংসাধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে — অর্থাৎ, সমাপ্ত হল নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি, যার উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিতান্ত্রিক উপাদানগুলির উপর সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির বিজয় ঘটানো। এর অর্থ হল, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল কার্যত সব দিক থেকেই।

প্রবর্তকের বিশেষত বহুসংখ্যক সমস্যা থাকে সব সময়েই। যারা পথ দেখিয়ে চলে, এবং শিক্ষাগুলোকে তুলে দেয় অনুগামীদের হাতে, তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে জয়গুলো ছাড়াও থাকে বিভিন্ন পরাজয় আর বেদনাদায়ক ক্ষয়-ক্ষতি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছবার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলিকে ছোট আর বড় বহুতর প্রতিবন্ধ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

তার কতকগুলি ছিল স্তালিনের ব্যক্তিতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিপ্লবের আগে গুপ্ত বলশেভিক আন্দোলনের একজন নেতা, অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে আর গৃহযুদ্ধ এবং বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে ইয়োসিফ

স্তালিনকে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমগ্র সোভিয়েত জনগণ শ্রদ্ধা করত। ১৯২২ সালে স্তালিন সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনে স্তালিনের বিশিষ্ট সেবাকে লেনিন প্রশংসা করেছিলেন, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল পাছে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্তালিন তাঁর হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। লেনিন বলেছিলেন: 'কমরেডরা যেন ঐ পদ থেকে স্তালিনকে অপসারণ করার একটা উপায় নিয়ে চিন্তা করেন এবং তাঁর বদলে নিয়োগ করেন অন্য একজনকে, যিনি মাত্র একটা গুণের অধিকারী হয়ে অন্যান্য সমস্ত দিক দিয়ে কমরেড স্তালিনের থেকে পৃথক হবেন — সেটা হল, কমরেডদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণু, অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসী, অপেক্ষাকৃত বিনয়ী এবং অপেক্ষাকৃত সুবিবেচক হওয়া, আরও কম খামখেয়ালী হওয়া, ইত্যাদি।'*

১৯২৪ সালে ১৩শ পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধিরা লেনিনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদানগুলি, লেনিনবাদবিরোধী ঘোঁটগুলি সম্বন্ধে স্তালিনের কঠিন আপসহীন মনোভাব এবং ত্রৎস্কিপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে প্রতিনিধিরা স্থির করেছিলেন, পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদে স্তালিনের থাকা সম্ভবপর।

তার পরবর্তী বছরগুলিতে পার্টি আর রাষ্ট্রের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে একত্রে স্তালিন গোড়ায় একটামাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্বন্ধে লেনিনের তত্ত্বটিকে সাফল্যের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন এবং এটা করার ভিতর দিয়ে তিনি বিপুল ব্যক্তিগত-প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। ততদিনে তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বাস্তবিকপক্ষেই

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি,** ৩৬তম খণ্ড, ৫৯৬ পৃঃ

বিপুল ক্ষমতা, কিন্তু বৈরকার দেশগুলির দ্বারা দেশ পরিবেষ্টিত থাকার তখনকার পরিস্থিতিতে এবং শোষক শ্রেণীগুলির বিভিন্ন অবশেষের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রীয় ফ্রণ্টে উত্তেজনাপূর্ণ সংগ্রামের অবস্থায় সেটা স্বাভাবিক বলেই বিবেচিত হয়েছিল। জনগণের বিস্তৃত অংশের দৃষ্টিতে স্তালিন হয়ে উঠেছিলেন 'আজকের লেনিন'। পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের নেতা এবং প্রতিষ্ঠাতা যতখানি প্রীতিভাজন আর শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন, সেটা অনেক দিক থেকেই ন্যস্ত হয়েছিল স্তালিনের উপর; মহান আদর্শটিকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, লেনিনের এমনই নিষ্ঠাবান শিষ্য বলে স্তালিন গণ্য হয়েছিলেন।

প্রথম যে-দেশে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কায়েম হয়েছিল তার সামনেকার জটিল আভ্যন্তরিক আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সোভিয়েত জনগণ সম্যক অবহিত ছিল। ক্ষমতা থেকে উচ্ছিন্ন আগেকার শ্রেণীগুলির বিভিন্ন অবশেষের পরিচালিত গোয়েন্দাগিরি আর সোভিয়েতবিরোধী নাশকতামূলক কার্যকলাপ এবং বিদেশ থেকে সংগঠিত নানা প্ররোচনামূলক বৈরী কার্যকলাপ তো মোটেই কিছু কাল্পনিক ব্যাপার ছিল না। ত্রৎস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রিকভ এবং তাঁদের সমর্থকদের চালানো উপদলীয় পার্টিবিরোধী কার্যকলাপ ছিল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে অগ্রগতির পথে একটা গুরুতর বাধা। এই কারণে, বিভিন্ন সুবিদিত পার্টি নেতাকে দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করা এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তাঁদের বহিষ্কৃত করাটাকে খুবই ন্যায্য বলেই মনে করা হয়েছিল।

স্তালিনের যেসব ন্যূনতা সম্বন্ধে লেনিন হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন, সেগুলো ইতোমধ্যে ক্রমাগত বেশি বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। পার্টি-জীবন আর জন-জীবন সংক্রান্ত লেনিনীয় নিয়মগুলিকে স্তালিন লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করলেন। সমাজতান্ত্রিক

নির্মাণকাজে বেশি বেশি সাফল্য অর্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামও তীব্রতর হয়, এই মর্মে স্তালিনের তত্ত্বের অত্যন্ত হানিকর পরিণতি ঘটেছিল। ১৯৩৭ সালে স্তালিন সরকারীভাবেই হাজির করেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে শোষক শ্রেণীগুলো উৎপাটিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ মোটের উপর সমাধা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছিল। পার্টি, ফৌজ, শিল্প, কৃষি এবং বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি জগতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে দমন করা হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে ঐ তত্ত্বের পরিণতি।

আগেরই মতো স্তালিনের নামটাকে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের প্রতীক হিসেবেই দেখা হচ্ছিল, কাজেই, ঐ সময়ে তাঁকে সমালোচনা করার যাবতীয় চেষ্টায় কেউ কর্ণপাত করে নি। বহু বছর যাবত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ভার ছিল বেরিয়ার উপর, ১৯৫৩ সালে বেরিয়ার বিচার হয়, শুধু তার পরেই প্রকাশ পেয়েছিল যে, পার্টি, ফৌজ আর অর্থনীতি ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট নর-নারী কুৎসার শিকার হয়েছিলেন।

তবে, এটা ঘটেছিল শুধু বহু বছর পরে, কিন্তু চতুর্থ দশকের শেষের দিকে পরিস্থিতিটা ছিল একেবারেই পৃথক। স্তালিন তখন ছিলেন সর্বজনবন্দিত নেতা, তিনি ছিলেন জনগণের পূর্ণ-আস্থাভাজন, পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলিকে বলা হত 'স্তালিন পরিকল্পনা', ১৯৩৬ সালের সংবিধানকে নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্তালিন সংবিধান'। তারপর থেকে যে-বছরগুলো কেটে গেছে তাতে এখন সত্য-মিথ্যা আর খাঁটি-কৃত্রিমের মধ্যে পার্থক্য টানা সম্ভব। বস্তুত, স্তালিন এখনও বলশেভিক পার্টির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ঐ সময়কার স্বীকৃত নেতা বলে গণ্য। এর সঙ্গে সঙ্গে, স্তালিনের ব্যক্তিতন্ত্র আর তার সঙ্গে ঐ ব্যক্তিতন্ত্র থেকে উদ্ভূত নেতিবাচক পরিণতিগুলো কঠোরভাবে ধিক্কৃত, — ঐসব পরিণতি

প্রকাশ পেয়েছিল প্রথমত এবং সর্বোপরি নিম্নলিখিতরূপে: *সমষ্টিগত নেতৃত্বের নীতি থেকে বিচ্যুতি, পার্টি-জীবন আর জন-জীবনের লেনিনীয় নীতি লঙ্ঘন, দমন-পীড়নের অন্যায় ব্যবস্থাবলি।*

ইতিহাসে বিভিন্ন ব্যক্তির বিশিষ্ট ভূমিকার ব্যাপারটাকে কমিউনিস্টরা কখনও অস্বীকার করে নি, এটা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার। শ্রমিক শ্রেণী তাদের নেতাদের, জনগণের স্বীকৃত পথপ্রদর্শকদের মহা সম্মান করে, এটা তো সবারই জানা কথা। সামাজিক বিকাশের প্রগাঢ় বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, ঘটনাবলির ঐতিহাসিক ধারার উপর বস্তুগতভাবে আলোকপাত ক'রে পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের নিয়ামক বুনিয়াদী সূত্রগুলিকে বেছে নেবার ক্ষমতা এবং জনগণকে মুক্তি অর্জনের সংগ্রামে পরিচালিত করার দক্ষতা থাকার কারণে যেসব ব্যক্তি চারপাশের আর-সবার উপর মাথা তুলে দাঁড়ান, তাঁরা যে-ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারী হন, সেটাকে অস্বীকার করা তো হাস্যকর। এমনসব নেতা ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রতিপাদন করা, শোষকদের পরাস্ত করা এবং শ্রেণীহীন সমাজ গড়া অসম্ভব হত। মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন ছিলেন ঠিক এই রকমেরই ব্যক্তি। এঁদের প্রত্যেকের জীবন এই সত্যের নিষ্পত্তিমূলক সাক্ষ্য যে, ব্যক্তিবিশেষের স্তাবকতা করার চেষ্টার সঙ্গে প্রলেতারীয় নেতাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির কোন মিল নেই, তেমনি, ব্যক্তিতন্ত্রের ধারণাটাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের থেকে মূলতই বিজাতীয়।

স্তালিনের সমালোচনা প্রসঙ্গে কমিউনিজমের শত্রুরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের সমগ্র ধারাটাকে বিকৃত করে চিত্রিত করেছে, তারা দেখাতে চেয়েছে, ব্যক্তিতন্ত্র যেন সোভিয়েত সমাজের বিকাশের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু, সোভিয়েত জনগণ এবং যারা বিষয়টা সম্বন্ধে সত্যিসত্যিই উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে

চায় তারা সবাই এটাকে ধরে একেবারে ভিন্নভাবে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আর ঘটনাবলির সযত্ন বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, স্তালিনের ব্যক্তিতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতিকে রুখে দিতে পারে নি। এই ব্যক্তিতন্ত্র সত্ত্বেও দেশ কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সামনে এগিয়ে গেছে, দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মর্মটা অপরিবর্তিতই থেকেছে। এর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হল, দেশটির ক্রমবর্ধমান শক্তি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং বিপ্লবের পরেকার প্রথম বিশ বছরে সঞ্চিত কার্যকর অভিজ্ঞতা, যার মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৩৬ সালের সংবিধানে।

১৯৩৬ সালের সংবিধান

১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটা প্লেনারী বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে স্থির করা হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে কতকগুলি সারবান সংশোধনীর একটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্যে সেটাকে পরবর্তী সোভিয়েত কংগ্রেসে পেশ করা হবে, — সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ ততদিনে মোটের উপর শেষ হয়ে গিয়েছিল, এই কাজের ধারায় যেসব বুনিয়াদী সামাজিক-আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটেছিল সেগুলি প্রতিফলিত হয়েছিল ঐসব সংশোধনীতে। এইসব সংশোধনীতে নির্বাচনী ব্যবস্থাটার আরও গণতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা ছিল; জনসংখ্যার অন্য কয়েকটা অংশের সঙ্গে তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীর যে-কতকগুলি বিশেষ নির্বাচনী অধিকার ছিল সেটা তুলে দিয়ে সবাইকে সমান ভোটাধিকার দেবার প্রস্তাব ছিল, পরোক্ষ নির্বাচনের জায়গায় সরাসরি নির্বাচন এবং প্রকাশ্য ভোটের জায়গায় গোপন

ভোটের ব্যবস্থা ছিল। অল্প কিছুকাল পরেই সপ্তম সোভিয়েত কংগ্রেস সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধন করার প্রস্তাব নিয়েছিল।

১৯৩৬ সালের জুন মাসে নতুন সংবিধানের একটা খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল পত্র-পত্রিকাগুলিতে। পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে এই ঐতিহাসিক দলিলখানা নিয়ে সমস্ত পর্যায়ে এবং জনসংখ্যার সমস্ত অংশের মধ্যে আলোচনা চলেছিল, অর্থাৎ কিনা, আলোচনা চলেছিল অন্য যেকোন সংবিধান নিয়ে কখনও যা হয়েছিল সেসবের চেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং প্রশস্ততর ভিত্তিতে। শুধু এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, খসড়া সংবিধানে রদবদল কিংবা সংযোজনের ১,৭০,০০০টা প্রস্তাব পেশ করেছিল শ্রমজীবীরা। এই দেশজোড়া আলোচনা থেকে জনগণের দৈনন্দিন কাজ আর রাজনীতিক কাজ উভয় ক্ষেত্রে তৎপরতা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল।

জেলা, বিভাগীয় এবং প্রজাতান্ত্রিক সোভিয়েত কংগ্রেসগুলি অনুষ্ঠিত হবার পরে, নতুন সংবিধান নিয়ে আলোচনা করে সেটাকে গ্রহণ করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অষ্টম বিশেষ সোভিয়েত কংগ্রেস বসেছিল মস্কোয় ১৯৩৬ সালে ২৫এ নভেম্বর তারিখে। সংবিধানের যেসব সংশোধনী এই কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই ছিল কোন কোন অংশের শব্দনির্বাচনশৈলী নিয়ে। তবে, অল্প কয়েকটা ক্ষেত্রে নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নও সংশ্লিষ্ট ছিল: যেমন, একটা সংযোজনায় এ কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল যে, যৌথখামারগুলির ব্যবহৃত ভূমি তাদের দেওয়া হয়েছে চিরকালের জন্যে, শুধু তাই নয়, সেটা তাদের নিখরচায় ব্যবহার করার জন্যেও বটে। কাজ থেকে পাওয়া আয় আর সঞ্চয় এবং একটা বসতবাড়ি, ইত্যাদিকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে পাবার জন্যে নাগরিকদের স্বত্বাধিকার আইনানুসারে

সংরক্ষিত, এই মর্মে একটা কড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তেমনি, সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাবার অধিকারও। প্রজাতন্ত্র আর জাতীয় বিভাগগুলি থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন সংশোধনী কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়েছিল; সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে গৃহীত আইনকানুন সমস্ত ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রের ভাষায় প্রকাশ করার বিষয়ে অনুবিধি যুক্ত করা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের চূড়ান্ত বয়ান অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে ৫ই ডিসেম্বর তারিখে — তখন থেকে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে একটা জাতীয় পরব হিসেবে — সংবিধান দিবস।

১৯৩৬ সালের সংবিধান হল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়ের বিধিসম্মত অভিব্যক্তি। এই সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে ছিল: ‘সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন শ্রমিক এবং কৃষকদের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।’ তাতে বলা হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনীতিক বনিয়াদ হল শ্রমজীবী জন-প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক বনিয়াদ হল তার অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং উৎপাদনের যন্ত্র আর উপায়-উপকরণের উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা, সেগুলি আছে দুটো রূপে — রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি (সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন) এবং সমবায় আর যৌথখামারের সম্পত্তি। নিজ শ্রমের ভিত্তিতে এবং অপরের শ্রমের উপর শোষণের সম্ভাবনা যাতে নেই, কৃষক এবং কারিগরের নিজস্ব এমন ছোট ছোট কাজ-কারবারও এই সংবিধানে অনুমত হয়েছিল।

এই সংবিধান অনুসারে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল এগারোটা ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র — সেগুলির প্রত্যেকটির

অধিকার সমান-সমান।* দেশে রাষ্ট্র-ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, সেটা সমানাধিকারসম্পন্ন দুটো কক্ষ নিয়ে: ইউনিয়ন সোভিয়েত এবং জাতিসমূহের সোভিয়েত। দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী, তেমনি সোভিয়েত সরকারও — সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিসার পরিষদ।

এই সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল যে, কাজ, অবসর, শিক্ষা, বৃদ্ধবয়সে এবং অসুস্থতা কিংবা কর্মক্ষমতাহানির অবস্থায় ভরণ-পোষণের জন্যে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার আছে। আরও বিবৃত হয়েছিল যে, অর্থনীতি, শাসন, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-রাজনীতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ আর নারীর অধিকার সমান-সমান। নাগরিকেরা যাতে এইসব অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে সেজন্যে ব্যাপক পরিসরে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে এই সংবিধান ঐসব অধিকারকে নিশ্চিত করেছিল। জাতি কিংবা নৃকুল নির্বিশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত নাগরিকের সমানাধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেকোন নৃকুলগত কিংবা জাতিগত গণ্ডিবদ্ধতার ওকালতি করা, কিংবা নৃকুল, কিংবা জাতির দরুন নাগরিকদের অধিকার যেকোনভাবে সীমাবদ্ধ করা এই নতুন সংবিধানে আইনত দণ্ডযোগ্য করা হয়েছিল।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাটিকে ১৯৩৬ সালের সংবিধানে বিধিসম্মত রূপ দেওয়া

---

* নতুন সংবিধান অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নলিখিত ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রগুলি: রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, বেলোরুশিয়া, ইউক্রেন, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া (এই শেষের তিনটি নিয়ে আগে ছিল ট্র্যান্স-ককেশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র), উজবেক, তুর্কমেন, তাজিক, কাজাখ এবং কিরগিজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলি।

হয়েছিল। এই বিষয়-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে ছিল: '...শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের ভিতরকার সবচেয়ে সক্রিয় এবং রাজনীতিগতভাবে সচেতন নাগরিকেরা মিলিত হয় সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এ, এই পার্টি হল সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সংহত এবং বিকশিত করার জন্যে সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের আগুয়ান বাহিনী এবং শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক আর সরকারী উভয় রকমের সমস্ত সংগঠনের নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রী-উপাদান।'

এই নতুন সংবিধান যে গৃহীত হল, এটা হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নিষ্পন্ন হয়ে যাবার নিদর্শন। সোভিয়েত ইতিহাসের প্রথম দুটো দশক জুড়ে এই উত্তরণ কালপর্যায়টা হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের কালপর্যায়। চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ মোটের উপর গড়া হয়ে গিয়েছিল, আর শোষক শ্রেণীগুলোকেও কার্যত উৎখাত করা হল। তার ফলে যে-পরিস্থিতি দাঁড়াল তাতে দেশের ভিতরকার শোষণকারীদের দমন করার প্রয়োজন আর ছিল না, এই বিশেষ পর্বে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কর্ম হল সর্বোপরি সাংগঠনিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের জায়গায় ক্রমে আসছিল সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র।

নতুন সংবিধানের কড়ারগুলি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে। সমান ভোটাধিকার আর গোপন ব্যালটের এই সরাসরি নির্বাচনের ফল হয়েছিল নিম্নলিখিতরূপ: মোট ১,১৪৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ছিল শতকরা ৪১·৫ জন শ্রমিক, শতকরা ২৯·৫ জন কৃষক এবং শতকরা ২৯ জন সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী। এই প্রসঙ্গে তুলনার জন্যে মনে করা ভাল: বিপ্লবের আগেকার আমলে

শেষ দুমায় প্রতিনিধিদের মধ্যে শ্রমিক আর কারিগর ছিল মাত্র ১১ জন; তাদের মধ্যে পাঁচ জন ছিল বলশেভিক শ্রমিক, — জারের সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় তাদের গ্রেপ্তার ক'রে পাঠিয়েছিল সাইবেরিয়ায়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে রেজিস্ট্রিভুক্ত মোট ৯,৪১,৩৮, ১৫৯ জন ভোটদাতার মধ্যে শতকরা ৯৬·৮ জন ভোট দিয়েছিল। তাদের মধ্যে শতকরা ৯৮·৬ জন ভোট দিয়েছিল কমিউনিস্ট এবং অ-পার্টি সদস্যদের ব্লকের প্রার্থীদের। মোট প্রতিনিধিদের মধ্যে সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর সদস্য ছিল ৮৭০ জন, আর ২৭৩ জন ছিল অ-পার্টি সদস্য; তাদের মধ্যে ১৮৭ জন ছিল নারী, আর সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬২ টা জাতির মানুষ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মিখাইল কালিনিন। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রবীণ সদস্য কালিনিন গোড়ায় ছিলেন ত্ভের গুবের্নিয়ার একজন কৃষক, পরে পেত্রগ্রাদের ধাতু-শ্রমিক।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধনগুলি পৃথিবীর সর্বত্র প্রগতিশীলদের মনে রেখাপাত করল। ১৯৩৭ সালে বিখ্যাত জার্মান লেখক হেনরিখ মান 'বাস্তবে রূপায়িত ভাবাদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন: 'পৃথিবীর বৃহত্তম দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে এবং প্রদর্শন করেছে তার গতিশীল প্রাণশক্তি... এখন থেকে মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে প্রগতির পথ হবে শুধু একটিই।'

আর-একজন সুবিদিত লেখক এবং ফাশিবাদবিরোধী লিয়ন ফেইখ্ৎভাঙ্গের ঐ বছর মস্কোয় এসেছিলেন। তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন: 'আমি মস্কো যাবার জন্যে রওনা হয়েছিলাম একজন দরদী হিসেবে... কিন্তু একেবারে গোড়ায় আমার দরদে সংশয়ের

ছাপ ছিল।' সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরবার সময়ে লেখক এই সিদ্ধান্তে পেণছেছিলেন: পশ্চিমের দম-আটকানো আবহাওয়া ছেড়ে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের তাজা হাওয়ার মধ্যে গেলে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো যায়... আবর্জনা আর নোংরা কড়িকাঠ এখনও ইতস্তত ছড়ানো দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সবকিছুর অনেক উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ভীমকায় আধুনিক সৌধটি, তার বর্ণালি-নকশাচিত্রখানি সুস্পষ্ট... পশ্চিমের গলদগুলোর পরে এই সৃষ্টির উপর দৃষ্টিপাত করা বড় মনোরম — একে অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বাগত না-জানিয়ে পারা যায় না।'

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এবং শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সোভিয়েত জনগণের সাধনগুলি মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বগুলির নির্ভুলতা প্রতিপন্ন করল। পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর-সাধনের পথে এগোল সোভিয়েত জনগণ — তারা হয়ে উঠল ভবিষ্যতের আবিষ্কার-অভিযাত্রী। অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে উৎসব-অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ দেশে হয়েছিল গণ-মিছিল আর সভা-সমাবেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের শহরে-শহরে আর গ্রামে-গ্রামেই শুধু নয়, বিদেশেও প্রলেতারিয়েত বার্ষিকীটিকে একটা বিরাট উৎসব হিসেবে পালন করেছিল — সেদিন পৃথিবীর সর্বত্র প্রলেতারিয়েত সংহতি প্রকাশ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে। বিপ্লবের পরে কেটে-যাওয়া দুই দশকে পুঁজিতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র এই দুই ব্যবস্থার গুণাগুণ লোকে সর্বত্র যেন তুলনা করে দেখছিল। সোভিয়েত সমাজের জীবনটা স্বচক্ষে দেখার সুযোগের জন্যে তারা সচেষ্ট থাকত। অসংখ্য বিদেশীর, বিশেষত শ্রমিক প্রতিনিধিদলগুলির তীর্থক্ষেত্রের মতো হয়ে উঠল সোভিয়েত

ইউনিয়ন। মে দিবসের আর অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়ে তারা আসতে থাকল আরও বিশেষভাবে বেশি সংখ্যায়।

১৯৩৮ সালের ১লা মে তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি মিখাইল কালিনিন বৈদেশিক অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন: ‘দুধ আর মধুর স্রোত বইছে না এ দেশে। আমাদের এটা হল শ্রমিকদের রাষ্ট্র; আমরা কাজ শুরু করেছিলাম অতি শোচনীয় গরিবির দশায়, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায় — রবিনসন ক্রুজোর হাতে-তৈরি কুঁড়েঘর থেকে... এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিস্তর ভুল-ভ্রান্তি হয়ত হয়েছে, হয়ত কখনও-কখনও আমরা কোনকিছু আরম্ভ করেছি ভুল কায়দায়, তা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু, একটা কথা আপনাদের বলবই... অস্তিত্বলাভ করছে একটি প্রলেতারীয় দুনিয়া... সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রলেতারিয়েতের মক্কা।’

কুড়ি বছর কোন ব্যক্তির জীবনেও স্বল্পকাল, আর অন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই যা যাত্রা করেছে নিজস্ব স্বাধীন পথে, এমন দেশের ইতিহাসে কুড়ি বছর আরও স্বল্পকাল। এই কারণে এই প্রথম দু’দশকের ফলাফল আরও বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে: পৃথিবীর যে-প্রথম রাষ্ট্রে কায়েম হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, সেখানে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা হয়ে উঠল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৮—১৯৪১

সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপ্রচেষ্টা ১৯৩৩—১৯৪১

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে জার্মানির বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গ জার্মান ফাশিস্তদের নেতা আদল্ফ হিটলারকে রাইখ চান্সেলর পদে নিয়োগ করলেন। জার্মানি তার যুদ্ধপ্রস্তুতি ত্বরায়িত করতে শুরু করল সেই মুহূর্ত থেকেই।

কোন যুক্ত কার্যকরণ স্থির করতে পশ্চিমী শক্তিগুলি নারাজ হল, এতে তাদের একগুঁয়েমি ছিল মানুষকে হতভম্ব করে দেবার মতো — তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংহত করার অভিযান চালিয়ে গেল। ১৯৩৩ সালে লীগ অভ্ নেশন্সের নিরাপত্তা কমিটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের এবং আক্রমণকারী পক্ষ বা আক্রমণকারীর সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্যে একটা প্রস্তাব তুলেছিল। ১৯৩৩ সালে ৩রা জুলাই কতকগুলি দেশের প্রতিনিধিরা লণ্ডনে মিলিত হয়ে একটা নিয়মপত্রে সই দিয়েছিলেন, তাতে 'আক্রমণ'-সংক্রান্ত ধারণাটার সংজ্ঞা ছিল, তার ভিত্তিটা যুগিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন-করা পুঁজিতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা ১৯৩৩ সালে আরও বেড়েছিল। ঐ বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল জুলাই মাসে স্পেন প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে, আর উরুগুয়ের সঙ্গে অগস্ট

মাসে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বহু বছর যাবত সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'না-স্বীকৃতির' কর্মনীতিতে নাছোড়বান্দা ছিল — তার মনোভাব বদলাবার কারণটা ছিল কী? কারণ ছিল বহু: সেগুলির মধ্যে ছিল — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিস্তৃত অংশে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বিভিন্ন সুবিধাজনক চুক্তি করা যেতে পারে বলে মার্কিন শিল্পপতিদের আশা এবং কিছু পরিমাণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন কোন ঘটন। অন্যান্য দেশেও বহুসংখ্যক মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে চাপ দিচ্ছিল।

বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ১৯৩৪ সালের মে মাসের অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল প্রস্তাব করেছিল, অধিবেশনটা শান্তি সম্মেলনে রূপান্তরিত করে নিয়মিত সময় অন্তর-অন্তর তার বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক। জার্মানি আর ইতালির ফাশিস্ত সরকারদুটো ঐ সময়ে তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, সমরবাদী জাপান চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল ইতোমধ্যেই — কাজেই, অস্ত্রসজ্জা কমানো আর সীমাবদ্ধ করার প্রশ্নাবলি নিয়ে পর্যালোচনা করা, ইউরোপীয় (এবং কেবল ইউরোপীয় নয়) নিরাপত্তা সংহত করার উপায়াদি বের করা এবং সামরিক সংঘাত রোধ করার ব্যবস্থাবলি নির্ধারণ করার জন্যে অমন একটা শান্তি সম্মেলনের কাজ চালিয়ে যাওয়াটা ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

সোভিয়েত প্রস্তাব গৃহীত হল না, সম্মেলনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল একেবারেই — তবু, আক্রমণ কী করে রোধ করা যায়,

তার বাস্তবতাসম্মত উপায়টাকে সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরল সেই সোভিয়েত প্রস্তাব।

ইউরোপে জার্মানি আর ইতালির এবং দূর প্রাচ্যে জাপানের আগ্রাসী মতলবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগ্রামের তাৎপর্যটাকে অপেক্ষাকৃত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পশ্চিমী রাজনীতিকেরা বুঝতে পেরেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের লীগ অভ্ নেশন্সের সদস্য হবার প্রশ্নটা তখন আলোচ্য বিষয় ছিল; ফ্রান্সের উদ্যোগে ১৯৩৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোয় পাঠানো একটা তারবার্তায় তিরিশটা দেশের তরফে সোভিয়েত ইউনিয়নকে লীগ অভ্ নেশন্সে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

লীগ অভ্ নেশন্সের বিভিন্ন নগ্ন দুর্বলতা সত্ত্বেও, যুদ্ধের বিপদ এড়াবার জন্যে যাবতীয় উপায়-উপাদানাদির সমাবেশ ঘটাবার চূড়ান্ত প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ সংগঠনের সঙ্গে সহযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ঐ আমন্ত্রণের উত্তরে সোভিয়েত সরকার জানিয়েছিল: 'প্রাপ্ত বার্তাটিকে সযত্নে বিবেচনা করে সে (সোভিয়েত সরকার — অনুঃ) লীগের সদস্য হতে, তার উপযুক্ত স্থানগ্রহণ করতে এবং এমন সদস্য-পদের ফলে যা দরকার সেইভাবে লীগের সমস্ত সদস্যের অবশ্যপালনীয় আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব এবং প্রস্তাবাদি মানবার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।'

লীগ অভ্ নেশন্সের ১৫শ অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন মাক্সিম লিৎভিনভ; ঐ আন্তর্জাতিক সংগঠনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য হবার বিষয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগের সমস্ত কার্যকরণ অনুমোদন করে না, 'এই সংগঠনের শামিল-হওয়া প্রত্যেকটি নতুন সদস্যের মতো সে (সোভিয়েত ইউনিয়ন — অনুঃ) কেবল সেইসব

প্রস্তাবের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, যেগুলি গৃহীত হয় তার অংশগ্রহণ এবং সম্মতি অনুসারে'।

সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগ অভ্ নেশন্সের সদস্য হয়েই নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাবলির সমাধান সহজতর করার ব্যবস্থাবলি অবলম্বন করার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। ১৯৩৫ সালে জার্মান সরকার সর্বজনীন সামরিক বৃত্তি চালু করার পরে এটা ছিল আরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে সঙ্গে ইতালি আবিসিনিয়ার সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করছিল। আক্রমণ যাতে ঘটতে না-পারে সেই উদ্দেশ্যে শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু আবিসিনিয়ার উপর ইতালি আক্রমণ চালাবার শুধু পরেই লীগ অভ্ নেশন্সের পরিষদ ইতালিকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা ক'রে তার বিরুদ্ধে আর্থ এবং আর্থনীতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তবে, ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালেই বৃটিশ প্রতিনিধিদলের উদ্যোগে লীগ ঐ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

১৯৩৬ সালের বসন্তকালে জার্মানি আর ইতালি, এই দুটো ফাশিস্ত রাষ্ট্র ইউরোপে তাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে আরম্ভ করল। ৭ই মার্চ জার্মান ফৌজ ঢুকে গেল বেসামরিকীকৃত রাইনল্যাণ্ডে; এটা হল ফাশিস্ত জার্মানির প্রথম আগ্রাসন। মনে হয়েছিল, পশ্চিমী শক্তিগুলি তখন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং যুদ্ধের পথ বন্ধ করার জন্যে লীগ অভ্ নেশন্সকে ব্যবহার করবে। জার্মান ফৌজকে বার্লিন থেকে এমন হুকুমও দেওয়া হয়েছিল যে, কোন ফরাসী সৈন্যদলের সম্মুখীন হলে তারা যেন তার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত না-হয়। কিন্তু, কোন ফরাসী সৈন্যদল সেখানে ছিল না।

১৯৩৬ সালের সেই বসন্তকালে আক্রমণকারীদের অপসারণ করাতে বাধ্য করা সহজই হত। ইউরোপ এবং সারা পৃথিবীকে

আসন্ন যুদ্ধ থেকে রক্ষা করবার জন্যে দরকার ছিল নিষ্পত্তিমূলক অবিলম্ব ব্যবস্থা। ঠিক তেমনি ব্যবস্থার কথাই তুলেছিল সোভিয়েত সরকার। কিন্তু, পশ্চিমী শক্তিগুলির শাসক মহলগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগ করতে একটুও আগ্রহান্বিত ছিল না, তাদের কার্যকরণ প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারীদের উৎসাহিতই করেছিল। এই অবস্থাটার অর্থ দাঁড়াল এই যে, লীগ অভ্ নেশন্স কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অপারগ ছিল।

সেই মুহূর্ত থেকে আক্রমণকারীদের আর ঠেকানো গেল না। ১৯৩৬ সালে ১৮ই জুলাই একটা অভ্যুত্থান ঘটল স্পেনে বিধিসম্মত সরকারের বিরুদ্ধে: ফাশিস্ত জার্মানি আর ইতালি বিদ্রোহীদের মদত দিয়ে সংঘাতে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করল। ফাশিস্ত

স্পেনে সংগ্রামী জনগণের সমর্থনে রেড স্কয়্যারে একটা সমাবেশ। মস্কো। ১৯৩৬

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্পেনের জনগণের সমর্থনে অবিচলিত কর্মনীতি অনুসরণ করেছিল একটিমাত্র দেশ — সোভিয়েত ইউনিয়ন।

পশ্চিমী শক্তিগুলি আক্রমণকারীদের পক্ষে সবকিছু সহজতর করে তুলেই চলল। ১৯৩৬ সালে বার্লিনে জার্মানি আর ইতালির মধ্যে সহযোগের বিষয়ে একটা নিয়মপত্র স্বাক্ষরিত হল — এটা 'বার্লিন-রোম অক্ষ' বলে পরিচিত হয়েছিল। জার্মানি তখন আরও এগিয়ে জাপানের সঙ্গে মিলে সম্পাদিত করল তথাকথিত কমিণ্টার্নবিরোধী চুক্তি, পরের বছর ইতালি হল এই চুক্তির তৃতীয় অংশীদার, তার মানে, এই তিনটে আগ্রাসী দেশ ভিড়ল একটা সামরিক-রাজনীতিক জোটে, এটাকে প্রায়ই বলা হয়েছে 'রোম-বার্লিন-টোকিও ত্রয়ী'। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরোধিতায় সহযোগী হবার মতলব প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রে জার্মানি, ইতালি আর জাপান ঐ কমিণ্টার্নবিরোধী চুক্তিটাকে ব্যবহার করতে থাকল তাদের বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী সম্প্রসারণাত্মক পরিকল্প হাসিল করার জন্যে।

যুদ্ধের বিপদ ক্রমাগত বেশি গুরুতর হয়ে উঠতে থাকল, বাড়তে থাকল সমরবাদবিরোধী মনোভাব — তখন, ইউরোপীয় নিরাপত্তা সংহত করার সোভিয়েত প্রস্তাবগুলিকে পশ্চিমী শাসক মহলগুলির সমানে অগ্রাহ্য করে চলার অবস্থা আর রইল না। ১৯৩৫ সালে ফরাসী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সহায়তা সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করল।

ঐ একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর-একটা পারস্পরিক সহায়তা সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করল ফ্রান্সের মিত্র চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে। সোভিয়েত-চেকোস্লোভাক চুক্তিতে এই মর্মে একটা বাধক-শর্ত থাকল যে, ফ্রান্স যদি আক্রমণের শিকারটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, একমাত্র তবেই পারস্পরিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই দুটি চুক্তির সম্পাদনা হল ইউরোপে সমষ্টিগত নিরাপত্তাব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করার একটা কার্যকর সূচনা। তবে, পশ্চিমী শক্তিগুলি সেখান থেকে আর এগোল না।

দূর প্রাচ্যে শান্তি সংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সরকার মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের সঙ্গে পারস্পরিক সহায়তার নিয়মপত্র স্বাক্ষর করল। ১৯৩৭ সালের অগস্ট মাসে চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হল অনাক্রমণ সন্ধিচুক্তি।

শান্তির জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বতঃপ্রতীয়মান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জাপানী সরকার সোভিয়েত সীমান্তে প্ররোচনায় উসকানি দেওয়া থামায় নি মুহূর্তের জন্যেও। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে জাপানী সামরিক নেতারা খাসান হ্রদের কাছে সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্রে একটা আক্রমণ চালাল। জাপানী আক্রমণকারীদের পরাস্ত-পর্যুদস্ত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইউরোপে ইতোমধ্যে নতুন নতুন আগ্রাসনের ঘটন কাছিয়ে আসছিল। ১৯৩৮ সালের বসন্তকালে জার্মানি অস্ট্রিয়া গ্রাস ক'রে চেকোস্লোভাকিয়ার একটা অংশ পাবার দাবি তুলল।

চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও যখন স্পষ্ট বোঝা গেল, ফ্রান্স ঐ দেশটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না, তখন চেকোস্লোভাক ফৌজ যদি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, আর চেকোস্লোভাক সরকার যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য চায়, তাহলে চেকোস্লোভাকিয়াকে সামরিক সহায়-সমর্থন দেওয়া হবে বলে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করল। বুর্জোয়া চেকোস্লোভাকিয়ার শাসকেরা এই প্রস্তাবের সদ্ব্যবহার করতে চাইল না। প্যারিসে আর লণ্ডনে নতুন নতুন রফা করা হল হিটলারের সঙ্গে। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে মিউনিকে ফাশিস্ত একনায়ক শাসকদ্বয় হিটলার আর মুসোলিনির বৈঠক হল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন আর ফরাসী সরকার-প্রধান দালাদিয়ের সঙ্গে। ফলে, জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়ার একটা অংশ দখল করে নিল — তাতে কোন বাধা দেওয়া হল না। অচিরেই

খাসান্ হ্রদের কাছে জাওজির্নায়া পাহাড়ে লাল
পতাকা গাড়া হল। ১৯৩৮

আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ আর বেইমানির প্রতীক হিসেবে কুখ্যাত হয়ে উঠল 'মিউনিক' শব্দটা।

বৃটেন আর ফ্রান্সের এই নতুন হিটলার-তোষণের ফলে নাৎসীরা মাঝপথে থেমে গেল না — এটা আগেই বোঝা গিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে ১৫ই মার্চ তারিখে নাৎসীরা দখল করে নিল গোটা চেকোস্লোভাকিয়া।

নাৎসী জার্মানি ইউরোপে একটার পরে একটা আগ্রাসন চালাতে থাকলে বৃটিশ আর ফরাসী সরকার শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করার একটা প্রস্তাব পেশ করল। তবে, এটা ছিল একটা চাতুরি মাত্র — এর মতলব ছিল, একদিকে, ঐ দুটি দেশের এবং সারা পৃথিবীর মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, তারা আসলে যে-রাজনীতিক পথ ধরেছিল সেটাকে ঢাকা দেওয়া, এবং, অন্যদিকে, ফ্রান্স আর বৃটেন, এই দুইই এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সমঝতার সম্ভাবনা দেখিয়ে জার্মানিকে ভয় খাইয়ে তার সঙ্গে কূটনীতিক দরকষাকষি করার আরও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা।

জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্ত ব্যবস্থার জন্যে বৃটেন আর ফ্রান্সের সঙ্গে একটা ফয়সালা করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু; ১৯৩৯ সালের অগস্ট মাসে বৃটেন আর ফ্রান্সের সঙ্গে মস্কোয় আরম্ভ করা আলাপ-আলোচনায় চূড়ান্তভাবে দেখা গেল, লন্ডন আর প্যারিসের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগ করার কোন প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল না।

বৃটেন আর ফ্রান্স উভয়েই তখনও নাৎসী আক্রমণটাকে পূর্বদিকে চালিয়ে দেবার খোয়াব দেখছিল — তারা যে-মতাবস্থানে দাঁড়াল তাতে নাৎসী জার্মানি যে-অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দিয়েছিল সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রহণ না-করে উপায় ছিল না। এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালের অগস্ট মাসে। একটা সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তির প্রধান মার্শাল ভরোশিলভ 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'র সংবাদদাতাকে বলেছিলেন: 'সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করার দরুন বৃটেন আর ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় নি — প্রসঙ্গত বলি, অনতিক্রমনীয় মতপার্থক্যের দরুন ফ্রান্স আর বৃটেনের সঙ্গে সামরিক আলাপ-আলোচনা একটা অচলাবস্থায় এসে পড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে হল।'

ঘটনাবলির সমগ্র পরবর্তী ধারা দেখিয়ে দিয়েছিল যে, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে জটিল আর উত্তেজনায় ঠাসা সেই পরিস্থিতিতে একমাত্র যা সম্ভব সেই কর্মপথই বেছে নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সেই বিশেষ কালপর্যায়ে একটার পরে একটা ঘটন চলেছিল রোমাঞ্চকর গতিতে। ১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ডে আক্রমণ-অভিযান চালাল। শুধু তার পরই বৃটেন আর ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিল — যদিও তখনও অবিলম্বে কোন বড়রকমের সামরিক ক্রিয়াকলাপে নামার অভিপ্রায় তাদের ছিল না। ইতোমধ্যে, হিটলারী বাহিনীগুলো ডেনমার্ক আর নরওয়ে দখল ক'রে ১৯৪০ সালের মে মাসে তারা ফ্রান্সে আক্রমণ-অভিযান চালাতে যাবার পথে অগ্রসর হল হল্যান্ড, বেলজিয়ম আর লুক্সেমবুর্গের ভিতর দিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ফিনল্যান্ডের মধ্যে সংঘাত বেধে গিয়েছিল ঐ সময়েই। সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড সীমান্ত ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম সোভিয়েত শহর লেনিনগ্রাদ থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে — তাই, এখানে পরিস্থিতিটা ছিল আরও বেশি উত্তেজনায়-ঠাসা। ফিনল্যান্ড ইতোমধ্যে ঐ সীমান্ত বরাবর দূরপাল্লার কামানশ্রেণীতে সজ্জিত বিশাল বিশাল সামরিক স্থাপনা খাড়া করে ফেলেছিল। বিশ্বযুদ্ধ বাধলে, সোভিয়েতবিরোধী পরিকল্পনাগুলো হাসিল করার জন্যে ফিনল্যান্ডকে পাদানি হিসেবে ব্যবহার করে লেনিনগ্রাদকে অতি গুরুতর অবস্থায় ফেলে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর পক্ষে বড় অনায়াসের ব্যাপারই হত। একটা পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি সম্পাদনের জন্যে সোভিয়েত সরকার ফিনল্যান্ডের সরকারের কাছে প্রস্তাব তুলেছিল। কিন্তু, এই প্রস্তাবটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করেছিল, সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড সীমান্তটাকে লেনিনগ্রাদ থেকে আরও দূরে

সরিয়ে নেওয়া হোক, এর বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ডকে কারেলিয়ায় দ্বিগুণ আয়তনের রাজ্যক্ষেত্র দিতে চেয়েছিল। পশ্চিমী দেশগুলির দ্বারা সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত হয়ে ফিনল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াপন্থী মহলগুলো আলাপ-আলোচনা করতে নারাজ হয়েই রইল এবং সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর প্ররোচনা উসকাতে থাকল, তার ফলে শেষপর্যন্ত বাধল সশস্ত্র সংঘাত। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি অনুসারে লেনিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্যক্ষেত্র হস্তান্তরিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে, আর কারেলিয়ার একটা বড় অংশ গেল ফিনল্যাণ্ডে।

তখনকার উত্তেজনায়-ঠাসা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষাক্ষমতা সংহত করার জন্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করতে থাকল।

তৃতীয়
পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরু

নতুন সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশন মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে। সমবেত প্রতিনিধিরা সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত করেছিল, তার নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন মিখাইল কালিনিন। তারপরে গঠিত হয়েছিল নতুন সরকার—জনকমিসার পরিষদ—তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ভিয়াচেস্‌লাভ মলোতভ। রাষ্ট্রক্ষমতার নবনির্বাচিত সংস্থাগুলির সামনে ছিল বিভিন্ন বড় বড় এবং জটিল কর্তব্য। আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ততদিনে যেসব সাফল্য অর্জিত হয়েছিল সেগুলি ছিল অবিসংবাদিত। সর্বমোট শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত

ইউনিয়নের স্থান ছিল ইউরোপে প্রথম এবং সারা পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয়। তবে, মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই নয়, বৃটেন, জার্মানি আর ফ্রান্সেরও পিছনে ছিল। বিদ্যুৎশক্তির দিক থেকে ফ্রান্স, বৃটেন আর জার্মানির উৎপাদন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে যথাক্রমে ১০০%, প্রায় ২০০% এবং ২৫০% বেশি। ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও এইসব দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল।

তবে, ইতোমধ্যে সোভিয়েত অর্থনীতি যে-মাত্রায় পেঁছেছিল তাতে, যেসব সূচক সমাজতন্ত্রের মর্মটাকে যথাসম্ভব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করতে পারে এবং পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে পারে সেগুলিতে কখন্ পেঁছন যায় সেটা বাস্তবতাসম্মত ভিত্তিতে নির্ধারণ করা তখন সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

সোভিয়েত জনগণের সামনে তখনকার কর্তব্য ছিল মাথাপিছু শিল্পোৎপাদনে সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির নাগাল ধরে তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া — যা লেনিন বলেছিলেন আগেই। সেটা তখন কার্যক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠেছিল, সেটাকে যথাযথ ভাষায় সূত্রবদ্ধ করেছিল ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির ১৮শ কংগ্রেস। দেশজোড়া আদমশুমার হয়েছিল তার একটু আগেই (১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে), তাতে তখন সোভিয়েত সমাজের নাগালের ভিতরকার সম্ভাবনাগুলির প্রত্যয়জনক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল: সোভিয়েত সমাজ তখন অমন বিরাট কাজ সম্পাদন করতে যাচ্ছিল, তার সময় তখন এসে গিয়েছিল। ১৯৩৯ সালের আদমশুমার ছিল ১৯১৭ সালের পরে দ্বিতীয় আদমশুমার, প্রথম আদমশুমার হয়েছিল ১৯২৬ সালে, তখন

অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন আরম্ভ হয়েছিল সবেমাত্র। এই দুটো আদমশুমারে সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যে তুলনা করে অন্তর্বর্তীকালে (১৯২৬—১৯৩৯) অনুসৃত কর্মনীতির ফলাফলটা মোটের উপর বেরিয়ে এসেছিল।

১৯৩৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৭,০৬,০০,০০০ — অর্থাৎ, ১৯২৬ সালের চেয়ে প্রায় ২,৪০,০০,০০০ বেশি। তাছাড়া, আলোচ্য কালপর্যায়ে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির চেয়ে বেশকিছুটা বেশি। ঐ ১২ বছরে শহরের জনসংখ্যা হয়েছিল দ্বিগুণের বেশি, ১৯৩৯ সাল নাগাত জনসংখ্যার মোটামুটি তৃতীয়াংশ ছিল শহরবাসী। মানচিত্রে দেখা দিয়েছিল নতুন নতুন শহর — যেমন, কারাগান্দা, আমুর-তীরে-কমসোমলস্ক, মাগ্নিতোগর্স্ক, মাগাদান, খিবিনোগর্স্ক (পরে কিরভ্স্ক), চির্চিক এবং আরও ডজন ডজন। এটা লক্ষণীয় যে, প্রায় সমস্ত শহরই গড়া হয়েছিল দেশের পূর্বাঞ্চলগুলিতে, যেসব অঞ্চল আগে ছিল রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর। জনসংখ্যা অসাধারণ দ্রুতগতিতে বেড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে।

শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক আর কর্মচারীরা (তাদের পরিবারগুলি সমেত) ছিল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এই আদমশুমারের আরও বিস্তর তথ্যেও জীবনযাত্রার নতুন প্রণালী প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত রাষ্ট্রের সাধনসাফল্য ফুটে উঠেছিল। চতুর্থ দশকের শেষাশেষি আট থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের একরকম সবাই পড়তে-লিখতে পারত, মধ্য কিংবা উচ্চ শিক্ষা শেষ করেছিল জনসংখ্যার মোটামুটি ষষ্ঠাংশ।

অনুরূপ অন্যান্য মালমশলার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়ে এই আদমশুমারের বিশ্লেষণ ক'রে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের দশ-পনর বছর কালপর্যায়ের

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা শুরু করা সম্ভব হল। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপের ব্যবস্থা ছিল ১৯৩৮—১৯৪২ সালের পাঁচসালা পরিকল্পনায়। এই সময়ের মধ্যে শিল্পোৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ, কৃষি উৎপাদন দেড়গুণ এবং সমগ্র জনগণের জীবনযাত্রার বৈষয়িক অবস্থা বেশকিছুটা উন্নত করার পরিকল্পনা করা হল।

এইসব লক্ষ্যসাধন করতে হচ্ছিল অত্যন্ত জটিল অবস্থার মধ্যে। চতুর্থ দশকের শেষাশেষি যেসব প্রতিবন্ধ দেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন ব্যাহত করছিল সেগুলি অতিক্রম করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করার দরকার ছিল। কৃষির নিজস্ব বিভিন্ন গুরুতর সমস্যার সমাধান করার ছিল। ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশকিছুটা কমানো হয়েছিল: ১৯৩৩—১৯৩৭ সালের কালপর্যায়ে মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলিকে ট্র্যাক্টর দেওয়া হয়েছিল বছরে গড়ে ৪৮,৫০০টা, কিন্তু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অংকটা ছিল ১৪,০০০। অজৈব সারের উৎপাদনও কমেছিল।

এর কারণ ছিল স্পষ্টই: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, সামরিক আক্রমণের আশংকার দরুন লাল ফৌজের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র আর সরঞ্জামের উৎপাদন ঢালাওভাবে বাড়ানো এবং দেশের প্রতিরক্ষাক্ষমতা দৃঢ়তর করাটা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। বহু শিল্পায়তন আর শিল্প-শাখাকে পুনঃসংগঠিত করতে হয়েছিল, — বিশেষীকরণ আর সহযোগের সুষ্ঠু-সক্রিয় প্রণালীটা বজায় রাখা যায় নি; যেসব কাঁচামাল আর সরঞ্জামের সরবরাহে ঘাটতি ছিল সেগুলির ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন সীমাবদ্ধ করতে হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় তহবিল ছিল সীমাবদ্ধ, তার উপর, সেটাকে নতুন করে বরাদ্দ করতে হয়েছিল খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে। ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত-করা নতুন প্রজাতন্ত্র আর বিভাগগুলিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির

সংগঠন আর বিন্যাসের জন্যে অতিরিক্ত মোটা মোটা পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল (পৃঃ ৩৫৬ দ্রষ্টব্য)।

সোভিয়েত সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল — সেগুলিকে কার্যে পরিণত করাটা শিল্পোৎপাদন বাড়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শিল্পক্ষেত্রে পরিচালনব্যবস্থার ধরনধারন আরও সুকর করে তোলা হয়েছিল: যেমন, অনেকটা সম্প্রসারিত ইঞ্জিনিয়রিং শিল্পের জনকমিসারিয়েতকে ভারি, মাঝারি আর সাধারণ ইঞ্জিনিয়রিং এই তিনটে জনকমিসারিয়েতে বিভক্ত করা হয়েছিল। ভারি শিল্পের জনকমিসারিয়েতকে কয়লা, তৈল, রাসায়নিক শিল্প, লৌহ ধাতুশিল্প, ইত্যাদি কতকগুলি পৃথক জনকমিসারিয়েতে বিভক্ত করা হয়েছিল। সংগঠিত করা হয়েছিল একক সারা-ইউনিয়ন নির্মাণ জনকমিসারিয়েত। মজুরি ব্যবস্থাটাকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছিল — বিশেষত ভারি শিল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে; শ্রমিকসাধারণের জন্যে বর্ধিত বৈষয়িক প্রবর্তনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে তারা কাজের ফলাফল সম্বন্ধে আরও বেশি মনোযোগী হয়। রাষ্ট্র এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি আগুয়ান শ্রমিকদের জন্যে উৎসাহন হিসেবে ছুটিযাপনকেন্দ্র আর স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসার টিকিট, উন্নততর বাসস্থান, ইত্যাদিতে সর্বাগ্রাধিকার দিত।

অর্থনীতির বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে দেশজোড়া সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযান ১৯৩৯ সালে আবার প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষ লাল পতাকা, সম্মানপ্রদ ব্যাজ, আর ডিপ্লোমা, কৃতিত্বের শংসাপত্র দেওয়া হত, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত প্রবন্ধ আর ফোটো, বেতার অনুষ্ঠান থাকত, সম্মানের বোর্ড বসানো হত, বিশেষ পদক দেবার ব্যবস্থা ছিল ('বিশিষ্ট শ্রমের জন্যে' এবং 'শ্রম-শৌর্যের জন্যে'), আর তার সঙ্গে বৈষয়িক প্রবর্তনা —এই সবকিছু শ্রমিকদের

প্রচেষ্টা প্রবলতর করার সহায়ক হত। কাজে জমকালো সাফল্যের জন্যে পুরস্কার হিসেবে দেয় একটা নতুন খেতাব চালু করা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে — সেটা হল 'সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বীর।'। যেসব নর-নারী এই খেতাব পেতেন তাঁদের 'লেনিন অর্ডার' এবং কাস্তে-হাতুড়ি খোদাই করা 'স্বর্ণ তারকা' দিয়ে সম্মানিত করা হত।

দেশের সেরা শ্রমিকদের উদ্যমকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হত, অচিরেই এইসব শ্রমিকের বহু অনুগামী দেখা দিত। ক্রিভয় রোগ-এর ড্রিলার আলেক্সেই সেমিভোলস মাত্র একটার জায়গায় আঠারোটা কয়লা-কাটা গর্তে কাজ শুরু করলে দেশের সমস্ত খনি কেন্দ্র থেকে শ্রমিক আর ইঞ্জিনিয়রেরা তাঁর কাজ দেখতে যেতে আরম্ভ করেছিল। হাজার হাজার খনি-শ্রমিক সেমিভোলসের টেকনিক ধরেছিল, তাঁর কোন কোন শিষ্য অচিরেই তাঁর রেকর্ডও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রেলপথগুলিতে বিভিন্ন ইঞ্জিন-কর্মিদল নিত্যকরণীয় মেরামতের কাজ নিজেরাই করতে আরম্ভ করেছিল। নভোসিবিস্কের ইঞ্জিন-ড্রাইভার নিকোলাই লুনিন এটা প্রথম চালু করেছিলেন, হাজার হাজার কর্মিদল তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল রেলপথে, অন্তর্দেশীয় জলপথে এবং সমুদ্রগামী নৌবহরে।

১৯৪০ সালে কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্রয়ের একটা নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। আগে কোন যৌথখামারের দেয় আবশ্যিক পরিমাণ স্থির করা হত আবাদী জমির আয়তন এবং পশুর সংখ্যা অনুসারে। তার জায়গায় চালু-করা নতুন ব্যবস্থায় কৃষিজাত দ্রব্যের দেয় পরিমাণ নির্ভর করত যৌথখামারের সর্বমোট ভূমির আয়তনের উপর। এর ফলে যৌথখামারীরা তাদের ভূমির আরও বেশি সদ্ব্যবহার করতে এবং পশুসংখ্যা বাড়াতে প্রবর্তিত হত। কৃষি উৎপাদনে আরও একটা জিনিসের অনুকূল ক্রিয়া ঘটেছিল — সেটা হল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব অনুসারে চালু-করা

উপরি পারিতোষিক আর বোনাস দেবার ব্যবস্থা। এইসব নবপ্রবর্তনা যৌথখামার ব্যবস্থাটাকে মজবুত করতে সহায়ক হয়েছিল; যৌথখামারীদের আয়ও এর ফলে বেড়েছিল।

রাষ্ট্রীয় খামারগুলি তখন কৃষি উৎপাদনে ক্রমাগত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। ১৯৪০ সালে রাষ্ট্রীয় খামারগুলি থেকে এসেছিল রাষ্ট্রের কেনা শস্যের ১০ শতাংশ, মাংসের প্রায় ১৭ শতাংশ এবং তুলোর ৬ শতাংশ।

১৯৩৯ সালে ১লা অগস্ট মস্কোয় খোলা সারা-ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনী ব্যাপক পরিসরে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এতে প্রদর্শিত হয়েছিল দেশের খামারগুলির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, তেমনি, নতুন অগ্রসর টেকনিকের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রচারকেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল এই প্রদর্শনীটা।

১৯৪০ সালের সর্বমোট অঙ্কগুলিতে সোভিয়েত অর্থনীতির আরও প্রসারের চিত্র দেখা গেল। ঐ বছরের মধ্যে মোট উৎপাদন বেড়েছিল বেশকিছুটা: লোহা আর ম্যাঙ্গানিজঘটিত আকরিক নিষ্কাশন করা হয়েছিল ১৯৩৯ সালের পরিমাণের চেয়ে তিরিশ-লক্ষাধিক টন বেশি, আর কয়লা এবং তৈলের উৎপাদন বেড়েছিল যথাক্রমে প্রায় ২ কোটি টন এবং দশ লক্ষ টনের বেশি। ঢালাই লোহা আর ইস্পাতের উৎপাদন এবং মেশিনটুল শিল্পের উৎপাদনও বাড়ছিল দ্রুত। মোট শস্য উৎপাদন হয়েছিল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার বছরগুলিতে যা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালে রাষ্ট্রের কেনা শস্যের পরিমাণ ছিল বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টন, — এই অঙ্কটা ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সালে ছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টন। চিনি-বীট, মসিনা এবং আলুর মতো শিল্পে-প্রয়োজনীয় ফসলের উৎপাদন এবং সরবরাহ বেশ বেড়েছিল। ১৯৪০ সালে তুলো ফলেছিল ১৯১৩ সালের পরিমাণের চেয়ে তিনগুণ বেশি।

জনগণের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের সাধারণ জোয়ারের সঙ্গে এবং কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত গতিশীল সাংগঠনিক আর প্রচারের কাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল এই আর্থনীতিক অগ্রগতি। শ্রমজীবীদের গণ-রাজনীতিক শিক্ষা ঐ সময়ে চলেছিল বিপুল পরিসরে। দেশের রাজনীতিক জীবন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটনগুলি সম্বন্ধে লোকে আরও ভালভাবে বুঝতে চাইছিল; বলশেভিক পার্টির মূলকৌশল আর কর্মকৌশল সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল প্রচুর। এই জানা-বোঝার জন্যে খুবই সহায়ক হয়েছিল ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'। সহজ-সরল ভাষায় লেখা এই বইখানিতে ব্যক্তি-স্তালিনের উপর বড় বেশি জোর দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমজীবী জনগণের দেশভক্তিমূলক শিক্ষাদীক্ষায় বইখানি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল; বইখানা তাদের সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণা সমর্থন করতে শিখিয়েছিল এবং নিজেদের আদর্শের ন্যায্যতা সম্বন্ধে তাদের প্রত্যয় দৃঢ়তর করতে সহায়ক হয়েছিল।

১৯৪০—১৯৪১ শিক্ষা-বর্ষে প্রাথমিক আর মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩,৫০,০০,০০০; অ-রুশ জাতিগুলির জন্যে ইস্কুলগুলিতে শিক্ষাদান করা হত পড়ুয়াদের মাতৃভাষায়। এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রজাতন্ত্রে রুশ ভাষাকে একটা পৃথক পাঠ্যধারা হিসেবে চালু করা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। ১৯৪০ সালে একটা সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত মধ্য বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শেখা আবশ্যিক করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাফল্যমণ্ডিত শিক্ষামূলক কাজের ফলে গ্রামাঞ্চলে সাত-বছরের এবং শহরে দশ-বছরের আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টা বিবেচনাধীন করা সম্ভব হয়েছিল।

উচ্চতর শিক্ষার প্রসার এবং তালিম দিয়ে বিশেষিত কর্মী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। যুদ্ধের ঠিক আগেকার তিন বছরে নতুন উচ্চতর শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়েছিল ১১৭টা। ১৯৪১ সালে ইনস্টিটিউট আর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৮১৭টা, সেগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট, ৮,১২,০০০। তাছাড়া, বিশেষিত মধ্যশিক্ষা গ্রহণ করছিল আরও মোটামুটি দশ লক্ষ জন। ১৯৪১ সালের গোড়ায় সোভিয়েত অর্থনীতিক্ষেত্রে বিশেষিত শিক্ষা-পাওয়া কর্মীদের সংখ্যা ছিল মোট ৯,০৮,০০০— এর মধ্যে ছিল ২ লক্ষ ৯০ হাজার ইঞ্জিনিয়র, ৭০ হাজার কৃষিবিৎ, পশু-বিশেষজ্ঞ আর পশুচিকিৎসক, ১,৪১,০০০ ডাক্তার (দাঁতের ডাক্তার ছাড়া), ৩,০০,০০০ শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক এবং সংস্কৃতি ফ্রণ্টের অন্যান্য কর্মী। ঐ পর্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে স্নাতক ইঞ্জিনিয়র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি।

যুদ্ধের ঠিক আগেকার এই বছরগুলিতে সোভিয়েত বিজ্ঞানেরও দ্রুত অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির শাখারূপে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মিসংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ৪,৭০০। বিজ্ঞান আকাদমির বিভিন্ন শাখা আগে থেকেই কাজ চালাচ্ছিল ট্র্যান্স-ককেশিয়া, কাজাখস্তান আর উরাল অঞ্চলে, আর ঐ সময়ে নতুন শাখা খোলা হয়েছিল উজবেকিস্তানে আর তুর্কমেনিয়ায়। তার মানে, যেসব প্রজাতন্ত্রে সবে-সম্প্রতিও জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল নগণ্য, সেগুলিতেও স্থাপন করা হতে থাকল নতুন নতুন বিজ্ঞানকেন্দ্র, যেগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান প্রধান নগরীর এবং বিদেশেরও আগুয়ান বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলির সমকক্ষ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানই বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল এবং শিল্পে আর কৃষিতে প্রধান প্রধান আবিষ্কারগুলিকে

কাজে লাগাবার সহায়ক হল। এইসব প্রতিষ্ঠান দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশ্লেষণের কাজ করল, সেগুলিকে ব্যবহার করার নতুন নতুন উপায় নির্ধারণ করল এবং তালিম দিয়ে গড়ে তুলল নতুন গবেষণাকর্মিদল।

ঐ যুদ্ধপূর্ব বছরগুলিতে নিহিত বাধাবিঘ্নগুলি অবশ্য সাংস্কৃতিক জ্ঞানালোকের সামগ্রিক প্রসার ব্যাহত করেছিল। তবু, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। শুধু কয়েকটা তথ্যের উল্লেখই যথেষ্ট হবে: ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে সাধারণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় দ্বিগুণ, সবাক চলচ্চিত্রের প্রজেক্টরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় চতুর্গুণ। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হচ্ছিল ৮,৮০৬টা সংবাদপত্র, সেগুলির মোট প্রচারসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ, আর ১,৮২২টা সাময়িক পত্রিকা, সেগুলির মোট প্রচারসংখ্যা ছিল ২৪ কোটি ৫০ লক্ষর বেশি। তখন দেশে রেডিও-লাউডস্পীকার ছিল পঞ্চাশ লক্ষর বেশি, আর রেডিও-সেট্ ছিল মোটামুটি দশ লক্ষ। টেলিভিশন-ব্যবস্থা স্থাপন করার কাজ তখন শুরু হয়েছিল।

ততদিনে সের্গেই প্রকোফিয়েভ, দ্মিত্রি শস্তাকোভিচ, তিখন খ্রেন্নিকভ এবং দ্মিত্রি কাবালেভ্স্কির সংগীত ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল, আর ইসাক্ দুনায়েভ্স্কির গানগুলি তখন গাইতে শোনা যেত দেশের সর্বত্রই। ঐ সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন মাক্সিম গোর্কি, আলেক্সেই তলস্তয়, অলেক্সান্দর ফাদেয়েভ, মিখাইল শলোখভ, দ্মিত্রি ফুরমানভ, নিকোলাই ওস্ত্রোভস্কি এবং আর্কাদি গাইদার। ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ডজন ডজন ভাষায় তাঁদের রচনাবলি অনূদিত হয়েছিল। কবি কনস্তান্তিন সিমনভ এবং আলেক্সান্দর ত্ভার্দভ্স্কি নামী হয়ে উঠেছিলেন যুদ্ধ শুরু হবার আগেই। সোভিয়েত পিয়ানো-বাজিয়ে এমিল গিলেল্স এবং ইয়াকভ ফ্লিয়ের ব্রাসেল্স্

আর ভিয়েনার আন্তর্জাতিক সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। আলেক্সান্দ্রভ (সোভিয়েত ফৌজের) নৃত্য-গীত কম্পানির অনুষ্ঠানগুলি বিপুল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নেই শুধু নয়, অন্যান্য দেশেও।

এই সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল দেশের সর্বাঙ্গীণ আর্থনীতিক সাধনসাফল্য। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাত তিন হাজারটার বেশি বড়রকমের শিল্পায়তন চালু করা হয়েছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সংসাধিত হচ্ছিল সন্তোষজনকভাবে। এখানে বলা দরকার, এইসব সাফল্য যখন অর্জিত হয়েছিল সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, তখন প্রতিরক্ষাপ্রস্তুতিতে লাগাতে হচ্ছিল-ক্রমাগত বেশি পরিমাণে সম্পদ-সংস্থান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন নতুন প্রজাতন্ত্র আর বিভাগের অন্তর্ভুক্তি

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভোরে নাৎসী জার্মানির সৈন্যদলগুলো স্রোতের মতো ঢুকে পড়ল পোল্যাণ্ডে। ১৯২০ সালে বলপূর্বক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বেলোরুশিয়া তখন ছিল পোল্যাণ্ডের অঙ্গ। পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া আর ভূস্বামীদের দ্বারা ইতোমধ্যে নিপীড়িত ঐ দুটো অঞ্চলের মানুষ ঐ পরিস্থিতিতে ফাশিস্ত শাসনের কবলে পড়তে পারত। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী জনগণ তাদের পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বেলোরুশিয়ার ভাইদের সেই নিদারুণ নিয়তি থেকে উদ্ধার না-করে সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে নি। পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বেলোরুশিয়াকে অবিলম্বে মুক্ত করাটাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করল।

১৯৩৯ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ দুটো অঞ্চলে সোভিয়েত ফৌজ প্রবেশ করল, জনসাধারণ সোৎসাহ স্বাগত জানাল লাল ফৌজকে। সদ্যমুক্ত শহর আর গ্রামগুলিতে তখন জীবনটা অনেক দিক থেকেই ছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরবর্তী কয়েক মাসে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রেরই মতো। শহরগুলিতে স্থাপিত হল শ্রমিক রক্ষীদল, গ্রামে গ্রামে — কৃষক মিলিশিয়া, আর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কমিটি — কারখানাগুলিতে। প্রাক্তন ভূস্বামীদের আর গির্জার ভূমি পুনর্বণ্টন করা হল; কুঁড়েঘরে আর মাটির তলার কুঠরিতে যারা থাকত তারা উঠে গেল আগেকার শোষকদের ঘর-বাড়িতে।

নতুন ব্যবস্থার প্রকৃতি কী হবে, সে-সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হল এই দুটি অঞ্চলের প্রত্যেকটি নাগরিককে। পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বেলোরুশিয়ার জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হল অক্টোবর মাসে। বুর্জোয়া আর ভূস্বামীদের শাসন উচ্ছেদ ক'রে সোভিয়েত রাজ কায়েম করার দাবি যারা করেছিল সেইসব প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচকমণ্ডলীর ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়ল। নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ দুটি সিদ্ধান্ত নিল — ব্যাংকগুলো আর বড় বড় কল-কারখানা হবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, বড় বড় ভূস্বামী আর মঠের ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হবে, সমস্ত ভূমি হবে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। পরিষদ-সদস্যদের নির্দেশপত্র নিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিদল পাঠানো হল মস্কোয়, — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নে যোগ দেবার জন্যে শ্রমজীবী জনগণের বিস্তৃত অংশের ইচ্ছা তাতে জানানো হল সোভিয়েত সরকারকে।

১৯৩৯ সালে ১লা এবং ২রা নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বিশেষ অধিবেশন নতুন অঞ্চলদুটিকে সরকারীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রহণ করল,

অর্থাৎ কিনা, আগে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করে ফেলা জাতিগুলির পুনর্মিলন ঘটল। ষাট লক্ষ ইউক্রেনী এবং তিরিশ লক্ষ বেলোরুশী সমেত এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ হল সোভিয়েত নাগরিক।

ঐ বছরই শরৎকালে একপক্ষে এস্তোনিয়া, লাতভিয়া আর লিথুয়ানিয়ার সরকারগুলি এবং অন্যপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন পারস্পরিক সহায়তার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এইসব সন্ধিচুক্তির উদ্যোক্তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। উভয় পক্ষ নিশ্চয়তা দিল তারা কেউ অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন মৈত্রীতে শরিক হবে না এবং তাদের কারও উপর কোন ইউরোপীয় শক্তির আক্রমণ হলে তারা তাকে সাহায্য করবে। বল্টিক দেশগুলিতে সোভিয়েত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হল — এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রণনীতিগত অবস্থানের অনেকটা উন্নতি হল।

বল্টিক দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের আর্থনীতিক অবস্থা ঐ সময়ে মোটেই অনায়াসের ছিল না। বেকারি বাড়ছিল, ছোট কৃষকদের জোতজমা নিলামে চড়ছিল হামেশা। লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া আর এস্তোনিয়ার প্রতিক্রিয়াপন্থী সরকারগুলো হিটলারের ক্ষমতার সামনে নতজানু হতে খুবই প্রস্তুত ছিল, তাদের স্বরাষ্ট্রনীতি আর পররাষ্ট্রনীতিতে শ্রমজীবী জনগণের অসন্তোষের ফলে ১৯৪০ সালের বসন্তকালে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। এই দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলন তখন ঐসব সরকারকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্য গ্রহণ করল। ঐ তিনটি দেশেই স্থাপিত হল ফাশিস্তবিরোধী জন-ফ্রণ্ট; বিশাল বিশাল ধর্মঘট আর রাজনীতিক মিছিল-সমাবেশ করে শ্রমজীবী জনগণ জন-ফ্রণ্টের সরকার কায়েম করার দাবি তুলল।

ফাশিস্ত ঘোঁটগুলো ইতোমধ্যে নিষ্ক্রিয় ছিল না। ক্ষমতা হস্তগত করে গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির উপর হিংস্র প্রতিহিংসা চালাবার জন্যে তারা প্রস্তুত হচ্ছিল। ফাশিস্তরা জার্মানির শরণ নিয়ে লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া আর এস্তোনিয়ায় নাৎসী ফৌজ আনাবার পরিকল্পনা ফাঁদছিল, এটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সেতুমুখ এইভাবে সম্প্রসারিত হতে যাচ্ছিল — সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। বল্টিক রাষ্ট্রগুলির সরকার থেকে ফাশিস্ত-সমর্থকদের বহিষ্কৃত করার জন্যে সোভিয়েত সরকার দাবি জানাল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মোতায়েন লাল ফৌজের সৈন্যদলগুলিক আরও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চালাল।

পরিস্থিতি যা ছিল তাতে শ্রমজীবী জনগণের দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তেমন কোন বাধা ছিল না। জনগণের অসন্তোষের বন্যাস্রোতে লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া আর এস্তোনিয়ার ফাশিস্ত-সমর্থক সরকার ভেসে গেল, যথাক্রমে ১৬ই, ২০এ আর ২১এ জুন তারিখে।

জনগণ যখন নিজেদের নিয়তি তুলে নিল নিজেদেরই হাতে, সেই সময়ে ঐ তিনটি প্রজাতন্ত্রে অবস্থা ছিল মোটামুটি একই রকমের: শ্রমিকদের বিশাল বিশাল মিছিল-সমাবেশ চলল, পুলিসকে নিরস্ত্র করা হল, রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। ঘটল প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে পার্লামেণ্টী নির্বাচন হল এক মাস পরে। ভোট যা পড়ল, তার সংখ্যা অভূতপূর্ব, ভোটদাতাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমর্থন করল শ্রমজীবী জনগণের দাঁড় করানো প্রার্থীদের — শ্রমিক শ্রেণী, কৃষককুল আর বুদ্ধিজীবিসমাজের প্রতিনিধিদের। লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া আর এস্তোনিয়ায় অবাধে নির্বাচিত

পার্লামেণ্টগর্লি ঘোষণা করল, তখন থেকে প্রজাতন্ত্রতিনটিতে শাসন চালাবে সোভিয়েতগর্লি। ১৯৪০ সালে অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে লিথর্য়ানিয়া, লাতভিয়া আর এস্তোনিয়ায় সরকারতিনটির অনর্রোধ অনর্সারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ঐ তিনটি প্রজাতন্ত্রকে ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নিল — এদের অধিকার থাকল অন্য এগারোটা অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রেরই মতো। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতীক-চিহ্নে সোনালী শস্যমঞ্জরীতে জড়ানো পটি হল আরও চারটে, তার প্রত্যেকটাতে নতুন অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগর্লির এক-একটির ভাষায় লেখা থাকল: 'দর্নিয়ার শ্রমিক এক হও!' এগর্লির তিনটে লেখন হল বল্টিক প্রজাতন্ত্রগর্লির প্রতীক, আর চতুর্থ লেখনটি হল মোলদাভিয়ার ভাষায়।

মোলদাভিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কীভাবে গঠিত হল, সেটা বলা হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত রর্মানিয়া রাজ্য ঐ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরর্দ্ধে চর্ড়ান্ত বৈরকার মনোভাব অবলম্বন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযর্দ্ধের গোড়ার দিকের ঘটনাবলিতে দেখা গিয়েছিল, রর্মানিয়া ক্রমাগত বেশি মাত্রায় জার্মানির আগ্রাসী কর্মনীতির কাছাকাছি চলে যাচ্ছিল। দক্ষিণ সীমান্তটাকে সর্দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার রর্মানিয়া সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছিল যে, ১৯১৮ সালে সোভিয়েত দেশ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া বেসারাবিয়াকে প্রত্যর্পণ করতে হবে, তেমনি, প্রধানত ইউক্রেনীদের অধ্যুষিত উত্তর বর্কভিনাকেও হস্তান্তরিত করতে হবে। রর্মানিয়া সরকার এই দাবি মেনে নিয়েছিল, তার ফলে মোলদাভীয় আর ইউক্রেনীয় জাতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পর্নর্মিলিত হবার সর্যোগ পেয়েছিল।

১৯৪০ সালে ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে কারেলীয় যোজক এবং আরও কোন কোন রাজ্যক্ষেত্রের অংশকে ফিনল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তরিত করেছিল: সেগুলিকে কারেলিয়া স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, পরে এটা হয়েছিল কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

এসব ব্যবস্থার ফলে সোভিয়েত সীমান্ত বেশকিছুটা পশ্চিমে সরে গেল। নতুন রাজ্যক্ষেত্রগুলিতে বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানো হতে থাকল ক্রমে ক্রমে। স্বভাবতই, এজন্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং রাষ্ট্র সেটা বরাদ্দ করেছিল। পশ্চিম বেলোরুশিয়া আর পশ্চিম ইউক্রেনে প্রথম প্রথম যৌথখামারগুলি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালের শরৎকালে, আর তারপরে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় খামার এবং মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে। এইসব রাজ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়কৃত কল-কারখানা, তৈলক্ষেত্র আর খনিগুলি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে সেগুলিতে উৎপাদন বেড়ে গেল। নিখরচা চিকিৎসাব্যবস্থা চালু হল, বিদ্যালয়ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞানালোক সংগঠনগুলি দ্রুত সম্প্রসারিত হল, নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান চালু হল — সেটা ছিল ঐসব অঞ্চলে গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। এইসব মুক্ত অঞ্চলে কল-কারখানা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করে সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় পুনঃসংগঠিত করা হল, শুধু তাই নয়, আরও স্থাপন করা হল সমবায়ী উৎপাদনব্যবস্থা, তার ফলে বহুসংখ্যক কুটিরশিল্পী আর কারিগর বিভিন্ন উৎপাদনী আর্টেলে মিলিত হতে পারল। ঐ পর্বে তখনও একটা পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষেত্রও ছিল, সেটা ছিল প্রধানত ছোট ছোট হস্তশিল্পের কারবার। তবে, সমগ্র উৎপাদনক্ষেত্রে তার কোন গুরুত্বসম্পন্ন স্থান ছিল না। আগেকার শোষক

শ্রেণীগুলোর কিছু কিছু অবশেষ এখানে-ওখানে কখনও-কখনও নাশকতামূলক এবং অন্তর্ঘাতী আর সোভিয়েতবিরোধী কার্যকলাপ চালাবার চেষ্টা করলেও, সেগুলো সমগ্র ঘটনাস্রোতের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নতুন নতুন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র আর বিভাগগুলির শ্রমজীবী জনগণ সমগ্র দেশের আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক আর সামাজিক-রাজনীতিক জীবনে ক্রমাগত বেশি সক্রিয় এবং সচেতন অংশগ্রহণ করতে থাকল। নতুন প্রজাতন্ত্রগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড-ইউনিয়ন আর কমসোমল সংগঠনগুলির সদস্যসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকল। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষককুল আর বুদ্ধিজীবিসমাজের জীবনযাত্রার মানেরও লক্ষণীয় উন্নতি ঘটল। সর্বত্র চালু হল মজুরিবৃদ্ধি এবং নারীদের জন্যে সমান হারে মজুরি, সংগঠিত হল রাষ্ট্রীয় সমাজবিমাব্যবস্থা, বাড়ি-ভাড়া কমানো হল অনেকটা। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযান বাদবাকি সোভিয়েত ইউনিয়নে গণ-পরিসরে পরিব্যাপ্ত হতে সময় লেগেছিল অক্টোবর বিপ্লবের পরে গোটা বারো বছর, কিন্তু এইসব নতুন রাজ্যক্ষেত্রে সেটা দ্রুত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছিল সেই ১৯৪০—১৯৪১ সালেই।

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর চালু করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, এইসব নতুন প্রজাতন্ত্র আর বিভাগের শ্রমজীবী জনগণ তো বহু বছর যাবত বুর্জোয়া শিল্পপতি আর ভূস্বামীদের পদানত রাজের অধীনে ছিল, তখন জাতীয়তাবাদী আর ধর্মান্ধ প্রচার ছিল লাগামছাড়া, ছিল বেকারি আর গ্রামাঞ্চলে লোকসংখ্যাধিক্য, আর সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুগামীদের উপর চলত পুলিসের নিদারুণ হয়রানি আর নির্যাতন। অতীতের সমগ্র নিদারুণ জেরটাকে চিরকালের মতো রাতারাতি উৎপাটিত করা ছিল অসম্ভব: সেজন্যে সযত্ন কষ্টসাধ্য কাজ দরকার ছিল বিস্তর, — যুদ্ধের ঝড়ে-ঠাসা মেঘ সপ্তাহে-

সপ্তাহেই দ্রুত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, তার দরুন কাজটা ছিল আরও বিশেষভাবে জটিল।

প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি

১৯৩৮ সালে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করার সময়ে নিশ্চয়ই কারও পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না যে, দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ শুরু হতে তখন বাকি ছিল মাত্র তিন বছরের একটু বেশি। এই নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল শান্তিপূর্ণ শ্রমের লক্ষ্য অনুসারে। কিন্তু, ফাশিস্ত জার্মানির আগ্রাসী কার্যকলাপগুলোর ফলে বেধে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঐসব আগ্রাসনের দরুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ঢালাও পরিবর্তন ঘটার ফলে সোভিয়েত সরকার দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের ধারায় বড় বড় পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হল। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর প্রাচ্যে (খাসান হ্রদের ধারে ১৯৩৮ সালে, আর ১৯৩৯ সালে খাল্‌খিন্‌-গল্‌ নদী বরাবর) জাপানী সমরবাদীদের উসকানো প্ররোচনা এবং ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে আর ১৯৪০ সালের গোড়ায় ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাত দেখিয়ে দিল, লাল ফৌজ আর রণনীতি অনুসারে পরিকল্পিত রিজার্ভ আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা এবং প্রতিরক্ষা শিল্পগুলিকে সংহত করার দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। অসামরিক নির্মাণকাজের জন্যে গোড়ায় পৃথক করে রাখা অর্থ নতুন করে বরাদ্দ করার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৩৮ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছিল মোট ২,৩০০ কোটি রুবল — অর্থাৎ, সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ১৮.৭ শতাংশ, আর দু'বছর পরে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছিল মোট ৫,৭০০ কোটি রুবল — অর্থাৎ, মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মোটামুটি তৃতীয়াংশ। সমগ্রভাবে শিল্পোৎপাদনবৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল ১৩ শতাংশ, কিন্তু

পৃথকভাবে প্রতিরক্ষা শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ছিল তার তিনগুণ বেশি। প্রতিরক্ষা শিল্প জনকমিসারিয়েতকে চারটে পৃথক জনকমিসারিয়েতে বিভক্ত করা হল: বিমান, জাহাজনির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা-বারুদ সংক্রান্ত জনকমিসারিয়েত।

বিশেষত যুদ্ধকালীন প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদনের জন্যে নতুন নতুন কারখানা গড়া হল উরালে, সাইবেরিয়ায় আর দূর প্রাচ্যে। গোড়ায় বেসামরিক উৎপাদনের জন্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে দেওয়া হল পুরোপুরিই কিংবা অংশত সামরিক উপকরণ উৎপাদনের কাজে। কয়েকটা মোটরযান কারখানা বিমানের ইঞ্জিন তৈরি করতে থাকল, ট্র্যাক্টর উৎপাদনের কোন কোন লাইনে তৈরি হতে থাকল ট্যাঙ্কের কাঠাম। দেশের জাহাজনির্মাণকেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন চালিয়ে দেওয়া হল মালবাহী জাহাজ থেকে যুদ্ধজাহাজের জন্যে। চতুর্থ দশকের শেষে গ্রামাঞ্চলগুলি ট্র্যাক্টর পেল অনেক কম। ঘড়ি, রেডিও-সেট, বাইসিকেল, সেলাই-কল আর ক্যামেরার খুচরো বিক্রির মজুদ অনেক কমে গেল। কথা উঠতে থাকল, দেশে কোন ধাতু নেই, নানা রকমের কাঁচামাল আর সরঞ্জামের দারুণ ঘাটতি। কিন্তু, আসলে এটা ছিল লাল ফৌজের পুনঃসজ্জা এবং তার লড়াইয়ের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার কাজ ত্বরয়িত করার ফল।

১৯৩৯ সালের গোড়ায় নতুন নতুন জঙ্গী, বোমারু আর হানাদার বিমানের ডিজাইন করা আর উৎপাদন দ্রুততর করার উপায়াদি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার একটা বিশেষ সম্মেলন বসিয়েছিল। শত্রুর ট্যাঙ্কবহর আর স্থলসৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে সের্গেই ইলিউশিন 'ইল-২' সাঁজোয়া হানাদার বিমানের ডিজাইন করেছিলেন ঐ বছরই। এই নতুন বিমান হয়েছিল সারা পৃথিবীর বিমান ডিজাইন করার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট সাধনসাফল্য। 'ইল-২' ৪০০ থেকে ৬০০ কিলোগ্রাম বোমার বোঝা বইতে পারত।

এতে বসানো থাকত দুটো কামান, দুটো মেশিনগান আর চারটে থেকে আটটা রকেটক্ষেপক। নাৎসীরা পরে এই বিমানের নাম রেখেছিল 'করাল মৃত্যু', সেটা কিছু অকারণে নয়।

১৯৪০ সালের গোড়ায় আলেক্সান্দর ইয়াকভলেভের ডিজাইন-করা নতুন জঙ্গী বিমান ফৌজে সরবরাহ করা হয়েছিল। পরে, দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পরে, 'নরমাণ্ডি-নেমান' স্কোয়াড্রনে সোভিয়েত পাইলটদের পাশাপাশি লড়েছিল ফরাসী পাইলটেরা, তখন তাদের যেকোন মার্কিন, বৃটিশ কিংবা সোভিয়েত বিমান বেছে নিতে বলা হলে, তারা একেবারে প্রত্যেকেই চাইত ইয়াকভলেভের বিমান।

সোভিয়েত 'ত-৩৪' ট্যাঙ্কও সমানই সুখ্যাতি পেয়েছিল। এর প্রথম দুটো মডেল বেরিয়েছিল ১৯৪০ সালে। এই ট্যাঙ্ক ছিল বাহুল্যবর্জিত, বেঁটে, কুশলী পরিচালনের উপযোগী, এর বর্ম ছিল পুরু। জার্মানরা যুদ্ধের বছরগুলোতেই এই ধরনের কিছু তৈরি করতে পারে নি: তাদের জেনারেলেরা স্বীকার করেছিল, রুশী 'ত-৩৪' ট্যাঙ্কের মডেল অনুসারে জার্মান ট্যাঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা বিফল হয়েছিল।

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময় আগে পার্টি এবং সরকারী নেতারা একটা নতুন অস্ত্র পরিদর্শন করেছিলেন, পরে সোভিয়েত সৈনিকেরা আদর করে এর নাম রেখেছিল 'কাতিউশা'; এই ধরনের অস্ত্র পৃথিবীতে আগে কখনও দেখা যায় নি। এই রকেটক্ষেপক নিয়ে কাজ চলছিল কিছুকাল আগে থেকে: সোভিয়েত জঙ্গী বিমানগুলির ব্যবহৃত প্রথম প্রথম বিমান-রকেটের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়েছিল খাল্‌খিন্‌-গল্‌ নদী বরাবর যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে। পরে এইসব রকেটক্ষেপক স্থাপন করা হয়েছিল লরিতে, তখনও সেগুলি খুবই বিশেষভাবে কার্যকর প্রতিপন্ন হয়।

হাতে-বওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের ডিজাইন করা, বিভিন্ন রকমের সর্বাধুনিক ভারি কামান চালু করা এবং নৌবাহিনী গড়ে তোলার দিকেও বিস্তর মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। জাহাজনির্মাণের একটা সুবিশাল কর্মসূচি চালু হয়েছিল ১৯৩৭ সালেই। প্রথমে যুদ্ধজাহাজ আর ক্রুজারের মতো বড় বড় জাহাজকে স্থান দেওয়া হয়েছিল সর্বোপরি, কিন্তু এসব জাহাজ নির্মাণ করতে সময় লাগত তিন থেকে পাঁচ বছর, আর কাজটা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল — তাই, ১৯৪০ সালের বসন্তকালে কর্মসূচিতে রদ-বদল করা হয়েছিল। স্থলবাহিনীর জন্যে সরঞ্জামের উৎপাদন দ্রুত বাড়ানো হয়েছিল, সমানেই বেড়ে চলেছিল ধাতু সরবরাহের চাহিদা। বড় যুদ্ধজাহাজ আর ক্রুজার নির্মাণ বন্ধ করে দিয়ে সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, মাইন-তোলা জাহাজ আর টর্পেডো-বোট্ নিয়ে কাজ প্রবলতর করে তোলা হয়েছিল। কেবল ১৯৪০ সালেই এমনসব জাহাজ চালু করা হয়েছিল এক-শ'খানার বেশি এবং তখন নির্মীয়মাণ ছিল আরও ২৬৯খানা। ১৯৪১ সাল নাগাত সোভিয়েত ইউনিয়নের জঙ্গী জাহাজ ছিল মোটামুটি ৬০০খানা — সেগুলির মধ্যে দশখানা বড় যুদ্ধজাহাজ আর ক্রুজার, ৫৯খানা মাইন-তোলা জাহাজ, ২১৮খানা সাবমেরিন।

সোভিয়েত সামরিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরিকল্পনার বনিয়াদ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন যে, আসন্ন যুদ্ধটা হবে ইঞ্জিনের যুদ্ধ, যন্ত্রসজ্জিত বাহিনীগুলোর যুদ্ধ। কিন্তু, মানুষ ছাড়া যন্ত্র তো অকেজো, তেমনি অন্যদিকে, অভিজ্ঞ সুদক্ষ হাতে অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এই কারণেই, সৈনিকদের তালিম আর শিক্ষা, তাদের জঙ্গী প্রস্তুতি এবং রাজনীতিক চেতনার উপর কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত সরকার সর্বক্ষণ জোর দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ঘটতে থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সশস্ত্র শক্তি সম্প্রসারিত করতে বাধ্য হল। ১৯৩৯

সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪১ সালের জুন মাসের মধ্যে সৈন্যসংখ্যা আড়াইগুণ বেড়ে হয়েছিল মোট পঞ্চাশ লক্ষ। ১৯৩৯ সালের শরৎকালে বলবৎ করা হয়েছিল সর্বজনীন সামরিক বৃত্তি আইন, তাতে ফৌজে যোগ দেবার বয়স ধার্য হয়েছিল ১৯, সামরিক বৃত্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল, সামরিক তালিকাভুক্তি এবং ফৌজে বাধ্যতামূলক যোগদানের আগেকার তালিমের ব্যবস্থার সুকরতা বাড়ানো হয়েছিল।

ফৌজের জন্যে নির্ভরযোগ্য নববল-যোগানের জমিন প্রস্তুত করা হচ্ছিল। তড়িতকর্মা শ্রমিক, আদর্শস্বরূপ ছাত্র, আর যারা সামাজিক এবং রাজনীতিক কাজে সক্রিয় অংশীদার, তাদের বিশেষ বিশেষ পাঠ্যধারা নিতে কমসোমল থেকে পাঠানো হত সামরিক তালিম বিদ্যালয়ে। কাজের দিনের শেষে কারখানার বন্দোবস্ত অনুসারে স্নাইপারের তালিম নেওয়া, কিংবা দু'মাসের জন্যে মেশিনগানারের তালিম নেওয়া, কিংবা নার্সের কাজ শেখা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে খুবই চল হয়ে উঠেছিল। 'শ্রম আর প্রতিরক্ষার জন্যে প্রস্তুত' — এই কথাটা রুশ ভাষায় যা তার আদ্যক্ষরগুলি অনুসারে 'গ. ত. ও' — ব্যাজ পাবার যোগ্যতা লাভ করা তরুণ-তরুণীদের অবশ্যকরণীয় আত্মসম্মানের কাজ হয়ে উঠেছিল, — শক্তি, তৎপরতা আর সহ্যশক্তির পরিচয় দেবার কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজ সমাধা করলে ঐ ব্যাজ দেওয়া হত।

বিশেষ পাঠচক্রে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের এবং বয়সীদের শেখানো হত রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা এবং বিমান-আক্রমণবিরোধী প্রতিরক্ষার প্রণালী — সেটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, তেমনি, বিমানে-উড়ন ক্লাবগুলিতে যোগ দেবার যথার্থই দেশজোড়া হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। তিন বার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরের' সুবর্ণ তারকা-পাওয়া বিখ্যাত পাইলট ইভান কোজেদুব এই রকমের একটা ক্লাবেই বিমানচালনা শিখেছিলেন।

লাল ফৌজের প্রতি শ্রদ্ধা, তার জন্যে গর্ববোধ এবং স্বদেশভূমিকে রক্ষা করার দেশপ্রেমিক কর্তব্যবোধ সোভিয়েত নারী-পুরুষদের মধ্যে পরিপুষ্ট করে তোলা হত ইস্কুলে গোড়াকার বছরগুলো থেকেই। চতুর্থ দশকে গড়ে-বেড়ে ওঠা পুরুষ-পর্যায়ের অন্তরে একটি বিশেষ স্থানে ছিল গৃহযুদ্ধের অন্যতম নায়ক নিকোলাই ওস্ত্রোভ্স্কির 'ইস্পাত', আর তাদের বিশেষ প্রিয় চলচ্চিত্র ছিল 'চাপায়েভ'। ঐ সময়কার বিশেষ প্রিয় একটা গানের মধ্যে ছিল এই কথাটা: 'আমরা শান্তির মানুষ, কিন্তু আমাদের সাঁজোয়া ট্রেনখানাও সাইডিংয়ে প্রস্তুত'। যুদ্ধের ঠিক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল অধিনায়ক আলেক্সান্দর সুভোরভ আর বগ্দান খ্মেল্নিৎস্কি এবং গৃহযুদ্ধের অন্যতম নায়ক নিকোলাই শ্চোর্স সম্বন্ধে চলচ্চিত্র, আর বিপ্লবী শ্রমিক মাক্সিম সম্বন্ধে বিখ্যাত তিন-সিরিজের চলচ্চিত্র। মিখাইল শলোখভের মহা উপন্যাস 'ধীরে বহে দন্' এবং আলেক্সেই তলস্তয়ের 'অগ্নিপরীক্ষা' ('রোড্ টু ক্যালভ্যারি') রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পার্খোমেঙ্কো এবং কোচুবেইয়ের মতো বিপ্লবের লোকবরেণ্য বীর-নায়কদের সম্বন্ধে উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছিল ঐ সময়েই।

এই সময়ে পত্র-পত্রিকা, রেডিও, সিনেমা আর সাহিত্য সবই পরিচালিত হয়েছিল সোভিয়েত দেশপ্রেম আর ফাশিবাদের প্রতি ঘৃণা পরিপুষ্ট করে তোলার জন্যে।

দেশের প্রতিরক্ষাক্ষমতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রচণ্ড কাজের মধ্যে বহু বাধাবিঘ্নও ছিল। বিদ্যমান কারখানাগুলোকে নতুন উৎপাদনে চালিয়ে দেওয়া এবং নতুন নতুন কারখানা গড়ার সরকারী নির্দেশাবলির সবগুলি সংসাধন করা সম্ভব হয় নি। সর্বসাম্প্রতিক বিমান, ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্কবিরোধী আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র এবং কামানশ্রেণীর কোন কোন ব্যবস্থার ব্যাপক হারে উৎপাদন সংগঠিত করার ব্যাপারটা ছিল ধীরি প্রক্রিয়া। সাঁজোয়া এবং

যন্ত্রসজ্জিত ইউনিটগুলি গড়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রধান কাজটা সবে শুরু হচ্ছিল মাত্র; বিমানবাহিত বাহিনীগুলিকে সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে সেই পর্বে কেবল প্রথম প্রথম পদক্ষেপগুলিই করা হয়েছিল।

যুদ্ধের ঠিক আগেই যে-পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তার ফলে সোভিয়েত জনগণের জীবনে এবং দেশের প্রতিরক্ষাক্ষমতা সংহত করার জন্যে পরিচালিত কর্মনীতিতে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। বহু ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করা হয়েছিল; সীমান্ত এলাকাগুলিতে সংঘর্ষ এড়ানো এবং সম্ভাব্য আক্রমণে বিলম্ব ঘটিয়ে দেবার জন্যে করা হয়েছিল সম্ভাব্য সবকিছুই। তখন হাতে যেসব কাজ ছিল সেগুলো শেষ করতে, যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছিল সেগুলি দূর করতে এবং সমস্ত সম্ভাব্য অর্থ আর সংগতি-সংস্থান জড়ো করতে সময়ের প্রচণ্ড প্রয়োজন ছিল। ইতোমধ্যে, দেশের রাজনীতির প্রধান দিকগুলো অপরিবর্তিতই ছিল: সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তির জন্যে অভিযান এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সংহত করে তোলার কাজ চালিয়েই যাচ্ছিল। যখন বিভিন্ন চরম ব্যবস্থার দরকার হয়েছিল, তখন জনগণ আস্থা আর উপলব্ধির সঙ্গেই পার্টি আর সরকারের সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করেছিল।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে দৈনিক কর্মকাল সাত থেকে বাড়িয়ে আট ঘণ্টা করা হয়েছিল, আর আগেকার ছ'দিনের জায়গায় সাত-দিনের সপ্তাহ চালু করা হয়েছিল (তার আগে প্রতি মাসে ৬ই, ১২ই, ১৮ই, ২৪এ আর ৩০এ ছিল অবসরের দিন)। তার মানে দাঁড়াল, কল-কারখানা আর আপিসের কর্মীরা কাজ করত মাসে অতিরিক্ত ৩৩ ঘণ্টা — অর্থাৎ, মাসে চার দিন বেশি, বছরে দেড় মাসের বেশি অতিরিক্ত কাজ। দেশের শিল্পশক্তি সংহত করে তুলতে এটা ছিল শ্রমজীবী জনগণের

বড়রকমের অবদান। কেবল শিল্পক্ষেত্রেই এই অতিরিক্ত ঘণ্টাগুলির ফল হল প্রায় দশ লক্ষ অতিরিক্ত শ্রমিকের কাজের শামিল!

ইতোমধ্যে মজুরি রইল অপরিবর্তিতই। শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশে একটা আবেদনে ট্রেড-ইউনিয়ন নেতারা বলেছিলেন, 'দেশের প্রতিরক্ষা গড়ে এবং বাড়িয়ে তোলার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণীকে এমন ত্যাগস্বীকার করতে হবে যা অপরিহার্য'। পার্টি আর সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে অনুষ্ঠিত শ্রমজীবীদের বহুতর সমাবেশ হল ঐ আবেদনে বিরাট সাড়া।

ঐ বছর শরৎকালে শ্রম-রিজার্ভ গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। জালের মতো বিস্তৃত বহু বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয় আর কারখানা তালিমকেন্দ্রের ভিতর দিয়ে নওজোয়ান শ্রমিকদের তালিম দেবার জন্যে দেশজোড়া পরিসরে আয়োজিত হয়েছিল একটা বিশেষ ধরনের অভিযান।

১৯৪০ সালে সরকারের আর-একটা নির্দেশনামায় শিল্প শ্রমিক আর আপিস কর্মচারিদের কাজ-বদল করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ছুটি ছাড়া গরহাজিরিতে কড়া সাজার ব্যবস্থা হয়েছিল। অল্প কিছুকাল পরেই ইঞ্জিনিয়র আর দক্ষ শ্রমিকদের নিজেদের বেশি পছন্দসই যাই হোক-না-কেন, তাদের দেশের যেকোন জায়গায় যেকোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বদলি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল জনকমিসারিয়েতগুলিকে। এসব ছিল কড়া-কঠোর ব্যবস্থা, সেগুলির তাৎপর্যটাকে বিকৃত করে দেখাবার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুরা বারবার বহু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সোভিয়েত নর-নারীরা এইসব ব্যবস্থার কারণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিল — তারা বুঝেছিল এগুলি ছিল অপরিহার্য। সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, — পুঁজিতন্ত্রের বেষ্টনীর মধ্যেই শুধু নয়, যুদ্ধের বিপদের মুখে দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে বাড়িয়ে তোলা আর নতুন সমাজ নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে এ ছিল

অত্যাবশ্যকীয় ত্যাগস্বীকারের ব্যাপার। দেশের সর্বত্র নারী-পুরুষেরা সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে কাজ করেছিল, সুশৃঙ্খল দায়িত্বশীলতা অনুসারে তারা দৈনন্দিন কর্তব্যকর্মটাকে দেখেছিল।

১৯৪০ সালে ফাশিস্ত আক্রমণ আসতে সময় বাকি ছিল এক বছরের কম, ঐ বছর আর্থনীতিক উন্নয়নক্ষেত্রে সাধনসাফল্যগুলির সার-সংক্ষেপ বিবরণ ছিল এই: ঢালাই লোহা উৎপাদন — প্রায় দেড় কোটি টন, ইস্পাত —১ কোটি ৮৩ লক্ষ টন, তৈল —৩ কোটি ১০ লক্ষ টনের বেশি, কয়লা — প্রায় ১৭ কোটি টন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঐ বছর উৎপন্ন ইস্পাত, ঢালাই ধাতু আর কয়লার তৃতীয়াংশ এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলগুলি থেকে। ভলগা আর উরাল অঞ্চলে তৈল নিষ্কাশন বেড়েছিল অনেকটা। মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান, সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যের আর্থনীতিক ক্ষমতা বাড়ছিল দ্রুত। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে রাই, গম, জই, ময়দা এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর রাষ্ট্রীয় মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৪১ সালের ৫ই জুন তারিখে মিখাইল কালিনিনের বলা এই কথাগুলি ছিল প্রগাঢ় অর্থপূর্ণ: 'আমরা জানি নে আমাদের কাছে লড়াইয়ের ডাক আসবে কখন — আগামী কাল, না, তারপরের দিন; কিন্তু, এমন পরিস্থিতিতে আজই প্রস্তুত হয়ে যাওয়া চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।' তবে, এই সমস্ত প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় নি, কেননা যুদ্ধ যখন সীমান্তগুলোর উপর দিয়ে ধেয়ে এল তখনও যথোপযুক্ত অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ফাশিস্তদের মোকাবিলা করার জন্যে দেশ প্রস্তুত হতে পারে নি। কিন্তু, প্রধান কর্তব্যগুলো সমাধা করা হয়েছিল, পার্টি আর জনগণের যুক্ত প্রচেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ সংসাধিত হয়ে গিয়েছিল, শেষপর্যন্ত, দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-নিষ্পত্তিমূলক সুবিধাটা কাজে লাগাতে পেরেছিল সেটা তাইই।

নবম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ
১৯৪১—১৯৪৫

যুদ্ধের প্রথম মাসগুলি

১৯৪১ সালের ২২এ জুন দিনটাকে দেশের ইতিহাসে একটা বাঁক হিসেবে সোভিয়েত জনগণ মনে রাখবে বরাবর।

ঐদিন ভোরে নাৎসী জার্মানির ফৌজ অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন ক'রে সোভিয়েত সীমান্ত পার হয়ে আক্রমণ-অভিযান চালিয়েছিল সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্রে। সে হল একটা ভয়ানক যুদ্ধের শুরু, তাতে সমগ্র জনগণের জীবন বদলে গেল — সেই বদলটা এই দিক থেকে যে, তাতে দরকার হয়েছিল জনগণের অকুণ্ঠ প্রচেষ্টা, বহু লক্ষ জীবন তাতে বিনষ্ট হয়েছিল, তাতে দেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এলাকা পরিণত হয়েছিল জনশূন্য ধ্বংসক্ষেত্রে।

পৃথিবীজোড়া আধিপত্যকামী আগ্রাসী নাৎসী কর্মনীতির স্বাভাবিক পরিণতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর এই আক্রমণ। ইউরোপের একটা বিরাট অংশের জাতিগুলিকে দাস বানাবার পরে হিটলার দেখেছিল, তার লুণ্ঠনধর্মী পরিকল্পগুলিকে আরও এগিয়ে সমাধা করবার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব। হিটলারের কষা হিসেবটা ছিল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাস্ত-পর্যুদস্ত হলে যেসব দেশের স্বাধীনতা তখনও খোয়া যায় নি তাদের শেষ ভরসাস্থলটা নিশ্চিহ্ন হবে, উৎপাটিত হবে সমাজতন্ত্র আর প্রগতির দৃঢ় দুর্গটা, সারা পৃথিবীকে

পদানত করতে এগিয়ে যাবার জন্যে পায়ের তলায় আসবে একটা সুবিশাল ঘাঁটি।

এই যুদ্ধের জন্যে জার্মানি চূড়ান্ত মাত্রায় সযত্ন প্রস্তুতি গড়ে তুলেছিল। ইউরোপে তখন পদানত জাতিগুলির সমেত বিপুল সম্পদ-সংস্থান ছিল জার্মানির হাতে। ষোল-আনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত

‘দেশমাতৃকার ডাক।’ ১৯৪১ সালের একখানা পোস্টার

করা, আদ্যোপান্ত তালিম-দেওয়া জার্মান বাহিনীগুলো সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল, আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ চালাবার ব্যাপারে ইতোমধ্যে তারা বিস্তর অভিজ্ঞতাও পেয়েছিল, তারা ইতালি,

ফিনল্যান্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি আর স্লোভাকিয়ার সৈন্যবাহিনীগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ-অভিযান চালাল সোভিয়েত ইউনিয়নে। ১৯৪১ সালে পশ্চিম ফ্রণ্টে কোন বড়রকমের লড়াই না-হওয়ায় নাৎসী কম্যান্ড তাদের সশস্ত্র শক্তির প্রধান অংশটাকে পূবে কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের জন্যে হিটলারের জেনারেলদের প্রস্তুত-করা ছকের সাংকেতিক নাম ছিল 'বারবারোসা পরিকল্পনা', এর বনিয়াদ ছিল ঝটিকা অভিযানের ধরন। 'সর্বোচ্চ গতিতে সামরিক অভিযান' চালিয়ে লাল ফৌজকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত ক'রে বিদ্যুৎগতিতে দেশটির ভিতর দিয়ে এগিয়ে আর্খাঙ্গেল্স্ক থেকে আস্ত্রাখান অবধি বিস্তৃত ফ্রণ্ট কায়েম করাই ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

বারেন্ৎস সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর অবধি সোভিয়েত সীমান্তগুলি বরাবর প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনীর সমাবেশ করা হয়েছিল: ৫০ হাজারের বেশি ভারি কামান, সাড়ে-তিন হাজার ট্যাংক আর পাঁচ হাজার যুদ্ধবিমানে সজ্জিত ১৯০টা ডিভিশন।

২২এ জুন ভোরের আগেই জার্মান বিমানগুলো ঘাঁটি থেকে উড়েছিল, বজ্রগর্জন করে এগোচ্ছিল কামানগুলো, আর শেষে সীমান্ত পার হয়েছিল স্থলবাহিনী। আক্রমণ-অভিযান আরম্ভ হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রথম দিনগুলিতে নাৎসী সৈন্যদলগুলো প্রচণ্ড সাফল্যলাভ করল। জার্মান বিমানবাহিনীর আক্রমণ হল সোভিয়েত বিমানশক্তির উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত: ২২এ জুন দুপুরের মধ্যে ১,২০০খানা বিমান বিধ্বস্ত হল, তার মধ্যে ৮০০খানা ভূমিত্যাগ করার আগেই।

আকাশভাগে শত্রুর শ্রেষ্ঠত্ব হল অকাট্য, উদ্যোগ তাদের হাতে রইল স্থলভাগেও। সীমান্তের ঠিক লাগোয়া এলাকাগুলিতে সোভিয়েত সৈন্যদলগুলি বহু জার্মান ডিভিশনের অগ্রগতি রুখতে

পারল না। সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্রে দ্রুত ঢুকে পড়ল সারি সারি জার্মান ট্যাঙ্ক।

এর পরের তিন সপ্তাহে নাৎসী বাহিনীগুলো এগোল ২০০ থেকে ৩৫০ মাইল, দখল করল লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া আর মোলদাভিয়ার বড় বড় অংশ। এই অগ্রগতি চলেছিল পরবর্তী সপ্তাহগুলিতেও, যদিও সেটা আরও ধীরে।

১৯৪১ সালে শরৎকাল নাগাত আক্রমণকারীরা এস্তোনিয়া দখল করে লেনিনগ্রাদের প্রবেশপথগুলোতে পেঁছে গেল; সারা বেলোরুশিয়া পার হয়ে এগিয়ে স্মোলেন্স্ক দখল করে শত্রু বাহিনীগুলো মস্কোকে বিপন্ন করে তুলল। ইতোমধ্যে তারা সারা ইউক্রেনও গ্রাস করে ফেলেছিল এবং দন-তীরে-রস্তভে পেঁছে গিয়েছিল।

এই গোড়াকার সপ্তাহগুলোতে বহু উপাদান যুদ্ধের গতিটাকে প্রভাবিত করেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা উপাদান ছিল এই যে, জার্মান আক্রমণটা ছিল অতর্কিত, তাছাড়া, জার্মান বাহিনী যুদ্ধের জন্যে ষোল-আনা প্রস্তুত এবং বিন্যস্ত ছিল, ইতোমধ্যেই তাদের ছিল আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ চালাবার অতি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা। এদিকে, বহু সোভিয়েত ডিভিশন অবস্থান নিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিল শুধু শত্রু অগ্নিবর্ষণের ভিতরে। সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তির প্রধান প্রধান অংশগুলিরও সমাবেশ ঘটানো গিয়েছিল শুধু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পরে — তার মানে, শত্রু-শক্তির সঙ্গে তুলনীয় কোন সশস্ত্র শক্তিকে অত কম সময়ের মধ্যে সমবেত করে ফেলা অসম্ভব ছিল। বহু জেনারেল, অফিসার আর সৈনিকের লড়ার অভিজ্ঞতা না-থাকার দরুনও শত্রুর সঙ্গে তুলনায় সোভিয়েত ফৌজ ছিল খুবই বেকায়দায়। তার উপর, যুদ্ধের আগে ভিত্তিহীন অভিযোগে যেসব দমন-পীড়ন চালানো

হয়েছিল তার ফলে অফিসারের সংখ্যা অনেকটা কমে গিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ততদিনে একটা পরাক্রমশালী শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি হয়ে উঠেছিল, — ফৌজকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার সংগতি-সংস্থান ছিল, অথচ, যুদ্ধ যখন বাধল তখনও ফৌজের পুনঃসজ্জা সমাধা হবার কাছাকাছিও ছিল না, নতুন ডিজাইনের ট্যাঙ্ক ছিল কম, বিমানধ্বংসী আর ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের ঘাটতি ছিল। যুদ্ধের গোড়ায় সোভিয়েত সামরিক বিমানগুলির মাত্র ১৭ শতাংশ ছিল নতুন ডিজাইনের।

১৯৩৯ সালের সীমান্তগুলি বরাবর দুর্গাদি দিয়ে সুরক্ষিত করা অবস্থানগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নতুন সীমান্তগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্যে পরিচালিত নিবিড় নির্মাণকাজ যথাসময়ে শেষ হয় নি।

আসন্ন জার্মান আক্রমণ সম্বন্ধে বিভিন্ন হুঁশিয়ারি পাওয়া সত্ত্বেও স্তালিন একেবারে শেষ মুহূর্ত অবধিও নিশ্চিত ছিলেন যে, তখনও যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব ছিল। তার ফলে সশস্ত্র শক্তিকে যুদ্ধের জন্যে সমবেত করার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তিনি নারাজ ছিলেন, কেননা তাঁর বিবেচনায় সেটা হত হিটলারকে যুদ্ধঘোষণা করার হেতু যোগানো।

সেই গোড়ার সপ্তাহগুলোর ভয়ানক অবস্থার মধ্যে লাল ফৌজের সৈনিকেরা অধিকতর শক্তিশালী শত্রু বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে লড়েছিল সাহসের সঙ্গে। শত্রু বাহিনীগুলোর অগ্রগতি রুখতে কিংবা তাদের পিছনে হটিয়ে দিতে তারা প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত উপায়েরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল। সৈনিক আর অফিসারদের গণ-পরিসরে বীরত্বপ্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনার জন্যে ঐ সময়টা বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। প্রতিরক্ষাব্যূহ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে সৈনিকেরা শেষ বারের গোলাগুলিটা থাকা অবধি লড়াই চালিয়েছিল। সাহসের সঙ্গে তারা ধেয়ে গিয়েছিল হাতাহাতি লড়াইয়ে। পিল্‌-বক্স ঘেরাও

হয়ে পড়লে তারা আত্মসমর্পণ না-করে নিজেদেরকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে পিল্-বক্সগুলো সমেত। গোলাগুলি ফুরিয়ে গেলে পাইলটেরা শত্রু বিমানের উপর নিজেদের বিমান চালিয়ে দিয়ে শত্রুকে বিধ্বস্ত করেছে। বিমান অকেজো হয়ে পড়লে পাইলটেরা প্রায়ই সুচিন্তিতভাবে নিজেদের বিমান চালিয়ে গিয়ে পড়েছে শত্রু সৈন্যদলগুলোর উপর। প্রথম যে পাইলট এটা করেছিলেন তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন নিকোলাই গাস্তেল্লো: ১৯৪১ সালে ২৬এ জুন তারিখে শত্রুর গোলার একটা টুকরো বিঁধে নিজ বিমানের পেট্রল ট্যাংক জখম হলে তিনি নিজের জ্বলন্ত বিমানখানা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুর একটা মোটরযান আর পেট্রল ট্যাংকবহরের উপর।

সোভিয়েত সৈনিকদের অসাধারণ সাহসিকতার কথা শত্রুরাও স্বীকার করেছিল। জার্মান মিলিটারির অনেকের চিঠিপত্র আর রোজনামচা এবং যুদ্ধের পরে লেখা স্মৃতিকথায় সেটা দেখা যায়।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে আর শরতে বহু আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈনিকেরা শত্রুকে হয়রান করে দেবার জন্যে অনেককিছু করেছিল এবং ফাশিস্ত সামরিক শক্তির বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়েছিল: কতকগুলি ক্ষেত্রে তারা সাফল্যমণ্ডিত পালটা-আক্রমণও চালিয়েছিল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন ছিল দু'মাসের স্মোলেন্স্কের লড়াই, ৭৩-দিনের কিয়েভের লড়াই এবং লেনিনগ্রাদের প্রবেশগুলিতে লড়াইয়ের সময়ে।

কতকগুলি শহর আর নগর-দুর্গ শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে রক্ষাকারীরা যে-দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ চালিয়েছিল সেটা ছিল যুদ্ধের প্রথম মাসগুলির একটা বিশেষক উপাদান। এই ধরনের প্রতিরোধ যথার্থই বীরত্বপূর্ণ বলে অভিহিত হবার যোগ্য। এইসব পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সৈনিকদের প্রদর্শিত বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা আর মৃত্যুকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা অতি বিরল। ব্রেস্তে

সীমান্তবর্তী দুর্গের গ্যারিসন গোটা এক মাস ধরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, যদিও জার্মান সামরিক শক্তির প্রধান অংশটার দ্রুত অগ্রগতির দরুন এই দুর্গটি অচিরেই পড়ে গিয়েছিল শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের অনেকটা ভিতরে।

ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের উত্তরী প্রবেশপথরক্ষী হাঙ্কো উপদ্বীপে নৌঘাঁটির ২৫,০০০ সৈনিকের গ্যারিসন প্রতিরোধ চালিয়েছিল ১৫০ দিন ধরে। কৃষ্ণ সাগরের ধারে ওদেসা বন্দরটি একেবারে ঘেরাও হয়ে পড়ার পরেও ১৮টা রুমানীয় আর জার্মান ডিভিশনকে লড়াইয়ে আটকে রেখেছিল। নাবিক, সৈনিক আর শহরবাসীরা শহরটিকে রক্ষা করেছিল ১৯৪১ সালে ১০ই অগস্ট থেকে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত।

১৯৪১ সালে গ্রীষ্মে আর শরতে নাৎসী বাহিনীগুলো বড় বড় সাফল্যলাভ করলেও, তারা তাদের সামগ্রিক রণনীতিগত পরিকল্পনাটাকে সংসাধিত করে উঠতে পারে নি। সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তির প্রধান অংশটা পরাস্ত-পর্যুদস্ত হয় নি, ঝটিকা অভিযানে কেল্লা-ফতে হয় নি। বহু দীর্ঘ আর কঠোর পরীক্ষার লড়াই লড়তে শত্রু বাধ্য হয়েছিল — এর ফলে যুদ্ধের পরবর্তী ধারায় ঘটেছিল বুনিয়াদী পরিবর্তন।

এইসব লড়াই চলতে থাকার সময়ে সমস্ত প্রাপ্তিসাধ্য সম্বল-সংস্থান জড়ো করার জন্যে সোভিয়েত সরকার একটা দেশজোড়া অভিযান চালিয়েছিল — তাতে সোভিয়েত সমাজে নিহিত সুবিধাগুলোর ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল, আর আক্রমণকারীকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করার জন্যে জনগণের যে-অটুট সংকল্প তার উপর নির্ভর করা হয়েছিল।

এই শক্তিসমাবেশ আর যুদ্ধকালীন সংগঠনের কাজে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা পালন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। যুদ্ধের প্রথম ছ'মাসে ফৌজে আর নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল মোটামুটি

দশ লক্ষ কমিউনিস্ট। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের প্রায় তৃতীয়াংশ ছিলেন ফ্রন্টে। ব্রেজনেভ, বুলগানিন, ভরোশিলভ, জ্দানভ, ইগ্নাতভ, কাল্ন্বের্জিন, কুজ্নেৎসভ, মানুইল্স্কি, সুস্লভ, খ্রুশ্চভ এবং শ্চের্বাকভ সমেত বিভিন্ন বিশিষ্ট পার্টি নেতা সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যেসব পার্টি কর্মী পশ্চাদভাগে ছিলেন তাঁরা ফ্রন্টের সৈনিকদের জন্যে উপযুক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্যে কমিউনিস্টদের সংগঠিত শৃঙ্খলা, নিঃস্বার্থ ঐকান্তিকতা আর যুক্ত প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করাতে সর্বপ্রযত্নে কাজ করেছিলেন।

১৯৪১ সালের ৩০এ জুন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী এবং জনকমিসার পরিষদের যুক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্থাপিত হল রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি — স্তালিন তার প্রধান। আপৎকালীন সংস্থা হিসেবে এই কমিটির হাতে ন্যস্ত হল সমস্ত ক্ষমতা, — সরকারী আর সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি, পার্টি আর অন্যান্য সংগঠনের কাজ এল এই একই কমিটির অধীনে।

স্থাপিত হল সর্বোচ্চ সদরঘাঁটি — ৮ই অগস্ট তারিখে স্তালিন নিযুক্ত হলেন সর্বাধিনায়ক।

অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে দাঁড় করাতে প্রচণ্ড প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়েছিল। কল-কারখানাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া হতে থাকল যুদ্ধকালীন উৎপাদনের ধারায়, সেগুলিতে কাজ চলতে লাগল যথাসম্ভব বেশি সময় ধরে। যেসব শ্রমিক ফ্রন্টে চলে গিয়েছিল তাদের জায়গায় কারখানায় কাজ নিতে থাকল নারী, বার্ধক্যের পেনশনভোগী আর বিশের-কমবয়সী কিশোর-কিশোরীরা।

শত্রু-সৈন্যরা এগোতেই থাকল, তারা দখল করল বড় বড় শিল্প এলাকা, আর ফ্রন্ট থেকে দূরে, আরও দূরে পূব দিকে যেতে থাকল ট্রেনের পর ট্রেন বোঝাই মানুষ, যন্ত্রপাতি আর শিল্প-

সরঞ্জাম, তার শেষ ছিল না। শিল্প-অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সুবিশাল পরিসরে। ১৯৪১ সালে জুলাই থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে ১,৫২৩টা শিল্প প্রতিষ্ঠান অপসারিত করা হয়েছিল, এ কাজে দরকার হয়েছিল মোট পনর লক্ষখানা লরি। নিকোলাই শ্‌ভের্নিক এবং তাঁর সহকারী আলেক্সেই কসিগিনের নেতৃত্বে গড়া একটা বিশেষ 'অপসারণ পরিষদ' এই কাজের বন্দোবস্ত করেছিল।

পুবে দূর-দূর জায়গা ছিল এইসব ট্রেনের গন্তব্যস্থল: উরাল অঞ্চল, ভলগা অঞ্চল, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান — এইসব জায়গায় নতুন নতুন ক্ষেত্রে শিল্পায়তনগুলিকে আবার দাঁড় করিয়ে ফেলা হয়েছিল অবিলম্বে। শ্রমিকদের প্রায়ই কাজ করতে হত খোলা জায়গায় — বৃষ্টি আর তুষারপাতের মধ্যে, থাকতে হত ট্রেঞ্চে আর তাঁবুতে। কল-কারখানাগুলো পুনঃস্থাপনের কাজ চলত সারা দিন-রাত ধরে। এইসব শিল্পায়তনের অনেকগুলিই তিন-সপ্তাহের মতো আশ্চর্য কম সময়ের মধ্যে আবার চালু হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সময়ে শিল্পক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল চূড়ান্ত মাত্রায় কঠোর। বড় বড় শিল্পকেন্দ্র শত্রুর হাতে চলে যাবার ফলে যুদ্ধের প্রথম মাসগুলিতে উৎপাদন কমে গিয়েছিল, এটা ছিল অনিবার্য। তবে, উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাবলির ফলে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাত ঐ কমতি রুখে দেওয়া গিয়েছিল, শিল্পোৎপাদনে সামগ্রিক বৃদ্ধি আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে।

যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্বে যাবতীয় বাধাবিঘ্ন আর বিপত্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত কিংবা হতাশ হয়ে পড়ে নি। চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে সোভিয়েত নর-নারীদের বিশ্বাস ছিল, সেই বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্যে তারা করেছিল সাধ্যায়ত্ত সবকিছুই। 'সবকিছু ফ্রন্টের জন্যে! সবকিছু বিজয়ের জন্যে!' — পার্টির এই স্লোগানটিকে গ্রহণ করেছিল সমগ্র জনগণ।

ফ্রণ্টে সোভিয়েত সৈনিকেরা লড়েছিল আত্মোৎসর্গ করে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলিতে শামিল হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। মস্কোয় তাদের সংখ্যা অচিরেই দাঁড়িয়েছিল ১,২০,০০০, লেনিনগ্রাদে —১,৬০,০০০।

যুদ্ধকালীন উৎপাদনের শিল্পগুলিতে শ্রমিকেরা ফ্রণ্টে সৈনিকদের জন্যে সরবরাহের ফরমাশ পূরণ করতে গিয়ে কাজের সময়ের কোন্ হিসেব রাখে নি। কারখানার শ্রমিকেরা তাদের নির্দিষ্ট কোটার দ্বিগুণ কিংবা আরও বেশি কাজ করতে থাকল। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান উঠেছিল — 'কাজে লাগো লড়াইয়েরই মতো!' কিংবা 'কাজ করতে হবে নিজেরটা, আর যে-সাথী ফ্রণ্টে গেছে তারটাও!'

যেসব উপাদান শেষপর্যন্ত যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছিল সেগুলি পশ্চাদপসরণ আর বিপত্তির নিদারুণ মাসগুলোতেই এই রকমের বিভিন্নভাবে প্রকটিত হচ্ছিল। জার্মান সৈন্যরা তখনও এগোচ্ছিল, সাম্প্রতিক সাফল্যগুলো দিয়ে ঠাসা থাকত নাৎসীদের প্রচার — তবু, সেই ১৯৪১ সালেই ১১ই অগস্ট তারিখে নাৎসী স্থলবাহিনীগুলোর সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক জেনারেল হাল্ডেরকে সখেদে বলতে হয়েছিল: 'সাধারণ পরিস্থিতি থেকে ক্রমাগত বেশি মাত্রায় স্বতঃপ্রতীয়মান আর স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ভীমকায় রাশিয়াকে আমরা খাটো করে দেখছি। একথা প্রযোজ্য দেশটির অর্থনীতি আর সাধারণ সংগঠনের সমস্ত দিক সম্বন্ধে, যোগাযোগের উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে এবং, বিশেষত, নিছক সামরিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে।'

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে হিটলারের ভরসা ছিল, কিন্তু সে-আশা মিটল না। স্বভাবতই, পশ্চিমে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর বৃটেনে প্রতিক্রিয়াপন্থী মন্তব্যাদির কোন অভাব ছিল না, তারা বড় আশা করেছিল,

সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাস্ত হবে কিংবা, অন্তত, দেশটির শক্তি খর্ব হয়ে যাবে অনেকাংশে। যিনি পরে হয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান তিনি একজন সেনেটর থাকাকালে ১৯৪১ সালের ২৪এ জুন যা বলেছিলেন সেটা বিস্তর কুখ্যাতি লাভ করেছিল: 'আমরা যদি দেখি জার্মানি জিতছে, তাহলে আমাদের সাহায্য করা উচিত রাশিয়াকে, আর জার্মানিকে সাহায্য করা উচিত যদি রাশিয়া জিততে থাকে, এইভাবে ওরা পরস্পরের যতগুলোকে সম্ভব নিধন করুক।'

তবে, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে ফাশিস্ত বিপদ ছিল অতি স্বতঃপ্রতীয়মান আর বিরাট — তাই, পশ্চিমী রাজনীতিকদের মধ্যে যারা একটু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের নিজ নিজ দেশে ফাশিস্তবিরোধী আর সোভিয়েতসমর্থক মেজাজই ছিল প্রধান — সেটাও ঐ রাজনীতিকদের বিবেচনায় রাখতে হয়েছিল। এর ফলে, জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট।

ফাশিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান ধাক্কাটা সামলাতে হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে; সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক ফাশিস্তবিরোধী আন্দোলনের আগুয়ান বাহিনী।

মস্কোর লড়াই

১৯৪১ সালের শরৎকাল নাগাত সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল আরও গুরুতর। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে শত্রু বাহিনীগুলি দখল করে নিয়েছিল বিশাল বিশাল রাজ্যক্ষেত্র — এইসব অঞ্চল যুদ্ধের আগে ছিল জনসংখ্যার ৪১

শতাংশের বাসভূমি এবং দেশের কয়লার ৬৩ শতাংশ আর ইস্পাতের ৫৮শতাংশের যোগানদার। সোভিয়ত সশস্ত্র শক্তিকে দেশের অভ্যন্তরভাগে বহু দূরে ঠেলে দিয়ে জার্মান সৈন্যদলগুলি শীতকাল পড়বার আগেই সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নিষ্পত্তিকর আঘাতের পর আঘাত হেনে মস্কো আর লেনিনগ্রাদ দখল করে নিতে চেয়েছিল। জার্মান হাইকম্যাণ্ড মনে করেছিল, এই লক্ষ্য হাসিল করার জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সম্বল-সংস্থানাদিই তাদের ছিল, যুদ্ধে জয় একরকম সমাধা হয়ে গিয়েছিল বলেই তারা ধরে নিয়েছিল।

জার্মান সশস্ত্র শক্তির প্রধান অংশটাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল মস্কোর প্রবেশপথগুলোতে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি, জার্মান 'মধ্য' আর্মি গ্রুপের অধিনায়ক ফীল্ড-মার্শাল ফন্ বক্-এর হাতে ছিল ৮০টা ডিভিশন — সেগুলির মধ্যে ১৪টা ট্যাঙ্ক ডিভিশন এবং মোটরসজ্জিত ডিভিশন ৮টা। বক্-এর অধীনে ছিল সোভিয়েত পক্ষের চেয়ে বেশি সৈনিক এবং ঢের বেশি ট্যাঙ্ক, সামরিক বিমান, কামান আর মর্টার।

১৯৪১ সালের শরৎকালে মস্কো দখল করার জার্মান পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন টাইফুন'। একই সময়ে, কালিনিন, ক্লিন্ আর দ্মিত্রভের ভিতর দিয়ে উত্তর থেকে, ওরেল, তুলা আর কাশিরার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ থেকে, এবং ভিয়াজ্মা, মজাইস্ক আর ভলোকলাম্স্কের ভিতর দিয়ে পশ্চিম থেকে ত্রিমুখী অভিযানে রাজধানী নগরীটিকে আচ্ছন্ন করাই ছিল মতলব।

৩০এ সেপ্টেম্বর জেনারেল গুদেরিয়ানের পরিচালিত দ্বিতীয় জার্মান ট্যাঙ্ক গ্রুপ আক্রমণ শুরু করেছিল ব্রিয়ান্স্কের দক্ষিণে— সবলে ওরেলে ঢোকাই ছিল তার উদ্দেশ্য। জার্মান বাহিনীর প্রধান অংশটা এগোতে শুরু করে ২রা অক্টোবর। সেই হল মস্কোর দিকে

অভিযানের সূচনা। অক্টোবর মাসে জার্মান ডিভিশনগুলো বড় বড় সাফল্যলাভ করল। মস্কো-লেনিনগ্রাদ রেলপথে কালিনিন শহর দখল করে তারা মস্কোকে ঘেরাও করতে আরম্ভ করল উত্তর দিক থেকে। ওরেল আর কালুগা জার্মানদের হাতে চলে যাবার পরে মস্কো দক্ষিণ থেকে সরাসরি বিপন্ন হয়ে পড়ল। ঐ ফ্রন্টের মধ্যভাগ বরাবর এগিয়ে জার্মানরা মস্কোর খাস প্রবেশপথ অবধিই পৌঁছে গেল। ভিয়াজ্‌মার কাছে এবং ব্রিয়ান্‌স্কের দক্ষিণে কয়েকটা সোভিয়েত বাহিনী শত্রুর বেষ্টনীর ভিতরে পড়ে গেল।

রিজার্ভ থেকে নতুন সৈন্য আনিয়ে জার্মান হাইকম্যান্ড একটা নতুন আক্রমণ আরম্ভ করল ১৫ই-১৬ই নভেম্বর। জার্মান ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসতে থাকল মস্কোর আরও আরও কাছে, ভয়ঙ্কর লড়াই চলল রাজধানীর সহজ নাগালের পাল্লায় মস্কোবাসীদের গ্রীষ্ম কাটাবার পল্লিভবনগুলির মধ্যে। কোন কোন জায়গায় জার্মানরা এসে পড়েছিল রাজধানী থেকে কুড়ি মাইলের মধ্যে।

দিনগুলো ছিল সারা দেশের পক্ষে মহা-উদ্বেগজনক, ভয়ানক। দেশের এত বড় বিপদ আসে নি আগে আর কখনও, তার মুখে সারা দেশের মানুষ রুদ্ধশ্বাসে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তবু, এই মুহূর্তেই সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা আর সাহসিকতা দেখা দিল পূর্ণ মাত্রায়, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশভূমির প্রতি তাদের ঐকান্তিক আনুগত্যবোধ ফুটে উঠল প্রকটিত হয়ে, দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে তারা সমস্ত বিপদ-বিপত্তি উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে গেল। সোভিয়েত ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিষ্পত্তিমূলক মুহূর্তে সমস্ত চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন সহায়-সম্বল সমবেত করতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতাও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এই সময়েই।

মস্কোর কাছে আত্মরক্ষামূলক লড়াইগুলোতে সোভিয়েত অফিসার আর সাধারণ সৈনিকদের গণ-পরিসরে বীরত্ব আরও

বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিল — আগে বহু ক্ষেত্রে যা দেখা গেছে তার চেয়েও বেশি মাত্রায়। এমন বীরত্বের বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা হল মস্কো থেকে মাইল-ষাটেক উত্তর-পশ্চিমে দুবোসেকভো রেল-স্টেশনের লড়াই। ১৬ই নভেম্বর তারিখে, সাবমেশিনগানারদের মদত-পাওয়া ৫০টা জার্মান ট্যাঙ্কের আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল ৩১৬তম পদাতিক ডিভিশনের ২৮ জন সৈনিক (মস্কোর লড়াইয়ে সমরশায়ী ঐ ডিভিশনের অধিনায়ক জেনারেল পানফিলভের নাম অনুসারে পরে এর নাম হয়েছিল পানফিলভ ডিভিশন)। রাজনীতিক শিক্ষাগুরু ভাসিলি ক্লোচ্‌কভের পরিচালিত ঐ সৈনিকেরা কোট বজায় রেখেছিল। ক্লোচ্‌কভ তাঁর সৈনিকদের বলেছিলেন: ‘রাশিয়া বিশাল, কিন্তু আমাদের পশ্চাদপসরণ করে যাবার মতো কোন জায়গা নেই, কেননা আমাদের পিছনেই যে মস্কো!’ মস্কোরক্ষাকারী প্রত্যেকেরই মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল এই কথাগুলি। ঐ লড়াই চলেছিল চার ঘণ্টা ধরে — তারই মধ্যে নিহত হয়েছিলেন ক্লোচ্‌কভ। কতকগুলো গুরুতর জখমের পরে তিনি একগুচ্ছ হাতবোমা নিয়ে শত্রুর একটা ট্যাঙ্কের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিজেদের জীবন দিয়ে শত্রুর ১৮টা ট্যাঙ্ক আর কয়েক ডজন সৈন্যকে খতম করার পরে তাঁর বাদবাকি প্রায় সমস্ত সৈনিকই নিহত হয়েছিলেন।

ব্রিয়ান্‌স্কের কাছে এবং ভিয়াজ্‌মার দক্ষিণে শত্রু-বেষ্টনীর ভিতরে পড়ে-যাওয়া সৈন্যদলগুলি প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালিয়েছিল। জার্মান বাহিনীর বেশ একটা অংশকে লড়াইয়ে আটকে রেখে তাদের হয়রান করে ফেলে তারা শেষে লড়তে লড়তে সেই বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল জার্মান সৈন্যদলগুলোর। কেবল ১৬ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যেই তাদের ৫৫,০০০

সৈন্য খতম হয়েছিল, তাছাড়া, জখম হয়ে কিংবা তুষার প্রদাহের দরুন অকেজো হয়ে গিয়েছিল আরও ১,00,000 জন। ঐ একই সময়ে তাদের খোয়া গিয়েছিল ৭৭৭টা ট্যাঙ্ক, ৩000টা কামান আর মর্টার। এতে করে জার্মান রেজিমেণ্ট আর ব্যাটালিয়নগুলি বেশখানিকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল, তাদের অগ্রগতি ধীরি হয়ে পড়েছিল তার ফলে, তাদের অফিসার আর সৈনিকদের মনোবলের উপরও তার গুরুতর ক্রিয়া ঘটেছিল।

ইতোমধ্যে, যৎপরোনাস্তি গোপনভাবে সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড নতুন সামরিক শক্তি পাঠাল মস্কো এলাকায়। বেশ বড়-বড়রকমে নববল যোগানো হল তিনটে ফ্রণ্টে: কালিনিন ফ্রণ্টে (ফ্রণ্টের অধিনায়ক জেনারেল কোনেভ), পশ্চিম ফ্রণ্টে (ফ্রণ্টের অধিনায়ক জেনারেল জুকভ), আর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে (ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল তিমোশেঙ্কো)। ব্যারিকেড আর ট্যাঙ্কবিরোধী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা খাড়া করা হল খাস মস্কোয় আর শহরতলিগুলিতে। নগরীর রক্ষাব্যূহগুলি গড়ে তুলতে কাজ করেছিল পাঁচ লাখের বেশি মস্কোবাসী, গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন স্বেচ্ছাসৈনিক ব্যাটালিয়ন। ক্রমাগত বেশি ঘন ঘন বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও মস্কোর কল-কারখানাগুলি সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কাজ চালিয়ে ফ্রণ্টে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের ২৪তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে, মস্কো পাতাল রেলপথের একটা স্টেশনের হল্-এ মস্কো নগরী সোভিয়েতের সমারোহ-সভায় স্তালিন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তৃতা করেছিলেন।

তার পরদিন, ৭ই নভেম্বর রেওয়াজী সামরিক কুচকাওয়াজ হয়েছিল রেড স্কয়্যারে। ক্রেমলিন দুর্গ প্রাকারের সামনে বরফে-ঢাকা স্কয়্যার পার হয়ে গিয়েছিল পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার ইউনিটগুলি, কামানশ্রেণী আর ট্যাঙ্কগুলি। লেনিন স্মৃতিসৌধ

থেকে স্তালিন সৈনিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাদের নির্দিষ্ট মহান কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্যে, আক্রমণ-অভিযানকারীদের পরাস্ত-পর্যুদস্ত করার জন্যে, ইউরোপের পদানত জাতিগুলিকে মুক্ত করার জন্যে।

কনকনে ঠাণ্ডা নিষ্করুণ হাওয়া অস্থির করে তুলেছিল লাল পতাকাগুলিকে। এই কুচকাওয়াজে অংশীদার সৈনিকরা পুরো রণক্ষেত্রের সাজেই সজ্জিত ছিল, তারা ফ্রণ্টে চলে গিয়েছিল সোজা রেড স্কয়্যার থেকেই।

১৯৪১ সালের ৭ই নভেম্বর রেড স্কয়্যারে সামরিক কুচকাওয়াজ

মস্কোরক্ষাকারী সোভিয়েত সৈন্যদলগুলি একটা পালটা-আক্রমণ চালাতে পেরেছিল ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে। ৫ই ডিসেম্বর সকালে সোভিয়েত কামানশ্রেণীগুলি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল কালিনিন ফ্রণ্টে বরফে জমাট-বাঁধা ভলগা

নদীর পাড় বরাবর। এই গোলাবর্ষণের পরে পদাতিক ডিভিশনগুলি বরফ পার হয়ে শত্রুর অবস্থানগুলোর উপর গিয়ে পড়ল। ৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম ফ্রন্ট আর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের ডাইনের পার্শ্বভাগের সৈন্যদলগুলি আক্রমণ আরম্ভ করল।

মস্কোর তিন দিকে কালিনিন থেকে ইয়েলেৎস্ অবধি শত শত মাইলজোড়া বিশাল বক্রপৃষ্ঠ ফ্রণ্টে ভয়ঙ্কর লড়াই বেধে গেল। উদ্যোগ এবার সোভিয়েত বাহিনীর হাতে। কতকগুলো গুরুতর বিপর্যয় ঘটল জার্মান সামরিক শক্তির। এই আক্রমণের মধ্যে সোভিয়েত বাহিনীগুলি ১৯৪২ সালের বসন্তকাল নাগাত কতকগুলো জায়গায় জার্মানদের পুরো ২০০ মাইল পিছনে ঠেলে দিতে পেরেছিল। জার্মান বাহিনীগুলির সৈন্যক্ষয় হয়েছিল লাখ-পাঁচেক। 'মধ্য' আর্মি গ্রুপের অস্ত্রশস্ত্র আর সরঞ্জাম খোয়া গিয়েছিল ৮০ শতাংশ রকম। পরিত্যক্ত জার্মান মোটরযান, ট্যাঙ্ক আর কামানে বরফে জমাট-বাঁধা রাস্তাগুলো গিজগিজ করছিল।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, মস্কোর কাছে এই পালটা-আক্রমণে সোভিয়েত সৈন্যদলগুলির সংখ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। তাদের সৈনিক, অফিসার, কামানশ্রেণী, মর্টার আর ট্যাঙ্ক ছিল শত্রুর চেয়ে কম। সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যান্ড তার বাহিনীগুলিকে দিতে পেরেছিল শুধু কিছু বেশি বিমানশক্তি। মস্কোর লড়াইয়ে জয় অর্জিত হয়েছিল প্রথমত এবং সর্বোপরি সোভিয়েত সৈনিকদের আত্মোৎসর্গ-করা সাহসিকতার জোরে — তাদের মনোবল ছিল আক্রমণ-অভিযানকারী বাহিনীগুলোর চেয়ে অতুলনীয় উঁচু পর্যায়ে। সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যান্ডের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য: এই পালটা-আক্রমণের পরিকল্পনাটি তাঁরা রচনা এবং সংসাধিত করেছিলেন দেদীপ্যমান দক্ষতা সহকারে।

সবচেয়ে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল রকোসভ্স্কি, গোভরভ, লেলিউশেঙ্কো, ইয়েরেমেভ, বোল্দিন এই জেনারেলদের পরিচালিত

বাহিনীগুলি। বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন সাফল্য অর্জন করেছিল জেনারেল বেলোভ আর জেনারেল দোভাতরের পরিচালিত ঘোড়সওয়ার বহিনীদুটি এবং কর্নেল কাতুকভ আর জেনারেল গেৎমানের অধীন ট্যাঙ্কশ্রেণীদুটি। সবচেয়ে সুবিখ্যাত কোন কোন বাহিনী, ডিভিশন, বিগ্রেড আর রেজিমেণ্টকে তাদের সরকারী আখ্যার সঙ্গে সম্মানসূচক 'গার্ড্‌স' খেতাব জুড়বার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

মস্কোর লড়াইটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন ছিল সামরিক দিক থেকেই শুধু নয়, রাজনীতিক দিক থেকেও। জার্মান বাহিনীগুলোকে রুখে দেওয়া হল শুধু তাই নয়, তাদের পশ্চাদপসরণ করতে এবং বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতেও বাধ্য করা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সেই প্রথম। সবে সম্প্রতিও যাদের অপরাজেয় মনে হয়েছিল সেই জার্মান সামরিক শক্তিকে পরাস্ত করা যায়, সেটা তখন স্পষ্ট হয়ে গেল। এটা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক নতুন পর্বের সূচনা।

তাদের এই বিপর্যয়ের আরও অর্থ হল এই যে, হিটলারের যা ছিল রণনীতিগত মূল লক্ষ্য — ঝটিকা আক্রমণে কেল্লা-ফতে করা, শীত পড়ার আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করা — সেটা ভেস্তে গেল। তখন স্পষ্টই বোঝা গেল, যুদ্ধটা হবে দীর্ঘ-বিলম্বিত — সেটা নাৎসী জার্মানির পক্ষে মোটেই উৎসাহনের ব্যাপার ছিল না।

১৯৪১—১৯৪২ সালে শরতে আর শীতকালে মস্কোর কাছে এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের অন্যান্য জায়গায়ও যুদ্ধবিগ্রহগুলোর কোন নিষ্পত্তিমূলক ফলাফল হয় নি। ১৯৪১ সালে শরৎকালে জার্মান বাহিনীগুলো ইউক্রেনের ভিতর দিয়ে আরও পূবে এগিয়ে উত্তর ককেশাস অবধি পেঁছে দন-তীরে-রস্তভ দখল করতে পেরেছিল। কিন্তু, ঐ বছরই নভেম্বর আর ডিসেম্বর

মাসে দক্ষিণ ফ্রণ্টের সোভিয়েত বাহিনী একটা প্রচণ্ড পালটা-আঘাত হেনে রস্তভ মুক্ত করেছিল।

প্রায় গোটা ক্রিমিয়া উপদ্বীপটিকেও জার্মানরা দখল করেছিল। ঐ সময় অবধিও কার্যকর প্রতিরোধ চালাচ্ছিল কেবল সেভাস্তপোলের বন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিটি। সেভাস্তপোলের অবরোধ চলেছিল ২৫০ দিন ধরে: দীর্ঘ কঠোর লড়াইয়ের পরে ফীল্ড-মার্শাল ফন মানস্টেইনের অধীন ১১শ জার্মান আর্মি এই নগরীটিকে দখল করতে পেরেছিল শুধু ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে।

যুদ্ধের এই পর্বে লেনিনগ্রাদের চারপাশের অবস্থাও ছিল চূড়ান্ত মাত্রায় উত্তেজনায় ঠাসা। অগস্ট মাসের শেষের দিকে আর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ফীল্ড-মার্শাল লীব্-এর পরিচালিত 'উত্তর আর্মি গ্রুপে'র সৈন্যদলগুলো এসে পড়েছিল এই নগরীর সহজ নাগালের মধ্যে: গুরুত্বে এবং জনসংখ্যায় লেনিনগ্রাদ হল মস্কোর পরে দ্বিতীয় প্রধান নগরী। ৩০এ অগস্ট জার্মানরা ম্গা রেল-স্টেশন দখল ক'রে বাদবাকি দেশের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের রেলপথে যোগাযোগের শেষ সূত্রটিকে ছিন্ন করেছিল। নেভা নদী যেখানে উঠেছে লাদোগা হ্রদ থেকে সেখানে অবস্থিত শ্লিসেলবুর্গ কেল্লাটাকে তারা দখল করেছিল ৮ই সেপ্টেম্বর। সেদিন থেকে লেনিনগ্রাদে পেঁছবার সমস্ত স্থলপথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তার অর্থ হল, বিশাল নগরীটি তখন অবরুদ্ধ এবং কার্যত সব দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন। প্রচণ্ড লড়াই চলছিল নগরীটির ঠিক বাইরেই। বিজয়-পুরস্কার তাদেরই হাতে এসে যাচ্ছে, তাতে জার্মান হাইকম্যাণ্ডের লেশমাত্র সংশয়ও ছিল না। লেনিনগ্রাদের 'আস্তোরিয়া' হোটেলে সমারোহ-ভোজের তারিখও স্থির হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা হবার ছিল না। জার্মান ফৌজ লেনিনগ্রাদে ঢুকতে পারে নি। গোড়ায় মার্শাল ভরোশিলভের এবং পরে ১৩ই

সেপ্টেম্বর থেকে ৭ই অক্টোবর জেনারেল জুকভের পরিচালিত সোভিয়েত সামরিক শক্তি এবং অ্যাডমিরাল ত্রিবুৎস্-এর পরিচালিত বল্টিক নৌবহরের নাবিকেরা শত্রুকে ঠেলে রাখতে পেরেছিল। সশস্ত্র শক্তিকে বিস্তর সাহায্য দিয়েছিল শহরবাসীরা — তাদের নেতা আর প্রেরণাস্থল ছিল প্রথম সম্পাদক আন্দ্রেই জ্দানভের পরিচালিত লেনিনগ্রাদ পার্টি সংগঠন। জন-স্বেচ্ছাসৈনিক ডিট্যাচমেণ্টগুলিতে সমবেত অযুত অযুত লেনিনগ্রাদবাসী লড়েছিল নিয়মিত ফৌজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি নির্মাণের কাজ করেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। লেনিনগ্রাদের কারখানাগুলির শ্রমিকেরা কামান আর কামানবাহী মঞ্চগুলিকে সোজা কর্মশালা থেকে ফ্রণ্টে পেঁছে দিয়েছিল, তারা অস্ত্রশস্ত্র আর সরঞ্জাম মেরামত করেও দিয়েছিল সরাসরি ঘটনাস্থলেই।

ঝটিকা আক্রমণে লেনিনগ্রাদ দখল করে নেবার চেষ্টা ফলবতী হবার নয়, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি, তখন জার্মানরা শহরটিকে অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লেনিনগ্রাদের অবরোধ চলেছিল ৯০০ দিন ধরে — এটা হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সবচেয়ে নাটকীয় একটা অধ্যায়। লেনিনগ্রাদের বেশকিছুসংখ্যক মানুষকে অবরোধের গোড়ার দিকে অপসারিত করা গিয়েছিল — তবু, সেখানে থেকে গিয়েছিল পঁচিশ লক্ষ মানুষ, তাদের মধ্যে চার লক্ষ শিশু।

লেনিনগ্রাদে যাবার একটামাত্র রাস্তাকে শত্রু বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি — সেটা ছিল লাদোগা হ্রদের দক্ষিণাংশ হয়ে। তিখ্ভিন দখল করে এই শেষ যোগপথটাকেও বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেছিল জার্মান হাইকম্যাণ্ড, কিন্তু ১৯৪১ সালে নভেম্বরের শেষে ডিসেম্বরের গোড়ায় সোভিয়েত সামরিক শক্তি শত্রুকে পিছনে গুটিয়ে দিয়ে তিখ্ভিন মুক্ত করেছিল।

খাদ্যসামগ্রী, জালানি আর গোলাবারুদ লেনিনগ্রাদে নেওয়া হত লাদোগা হ্রদের পথে। শত্রুর বিমানগুলো থেকে অগ্নিবর্ষণের মধ্যে হ্রদের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জলরাশির উপর দিয়ে চলত অতি-বোঝাই করা বজরাগুলি। নভেম্বর মাসের শেষে হ্রদ বরফে জমাট বেঁধে গেলে বরফের উপর দিয়ে চলত লরি, এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বরফ-পথ, তাকে লেনিনগ্রাদের মানুষে বলত 'জীবন-শরণি'। বহু ফাটলে ভরা উঁচু-নিচু বরফের উপর দিয়ে লরিগুলিকে কয়েক ডজন মাইল পথ চলতে হত শীতের রাত্রির অন্ধকারে। লাদোগা হ্রদে ঝড় উঠে প্রায়ই বরফ স্থানচ্যুত করে গড়ে তুলত ঢিবি আর মাঝে মাঝে জমাট-ভাঙা: কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় দিকচিহ্নগুলো নষ্ট হয়ে যেত, গাদা গাদা হয়ে উঠত বরফপুঞ্জ। তবু, শত প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে সারি সারি লরি অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে ঢুকত অবিরাম।

এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এই পথ দিয়ে লেনিনগ্রাদকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য আর জালানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি, ১৯৪১—১৯৪২ সালের শীতকালটা হয়েছিল অবিশ্বাস্য রকমের দুর্গতির সময়। বাড়িগুলি তাপনের জন্যে যথেষ্ট জালানি ছিল না, সাধারণের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অচল হয়ে গিয়েছিল প্রধান জল-নলগুলো আর ময়লা-নিষ্কাশনব্যবস্থা। দৈনিক রেশন ছিল ছোট একখানা রুটি — তার অর্ধেকটা বদলি জিনিস। পুষ্টিহীনতা আর স্কার্ভির অবাধ প্রাদুর্ভাব। ডিসেম্বর মাসে অনাহারে-মৃত্যু ঘটেছিল আরও ঘন ঘন। লোক মারা গিয়েছিল একরকম প্রত্যেকটি পরিবারেই। এই নিদারুণ দুর্গতির মধ্যে যারা ছিল তাদের অনেকের অযত্ন অযত্ন চিঠি, রোজনামচা আর কাহিনীতে জানা যায় সেই মর্মন্তুদ পরিস্থিতির কথা: অসহায়া মায়ের চোখের সামনে সন্তানের মৃত্যু, মৃত বাপ-মায়ের পাশে অসহায় কচি শিশু — তার অসংখ্য ঘটনা। আর সেই সময়েই

নগরীর বসত এলাকাগুলিতে চলেছিল জার্মানদের অবিরাম গোলাবর্ষণ।

১৯৪২ সালের প্রথম ছ'মাসে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে মানুষ মারা গিয়েছিল ছ'লক্ষর বেশি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে নি নগরীটি। লেনিনগ্রাদের ভুখা শুকিয়ে-যাওয়া মানুষ বলেছিল: 'আমরা চালিয়ে যাব প্রতিরোধ! আমরা আত্মসমর্পণ করব না। জয় হবে আমাদেরই!' প্রতিরক্ষার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কারখানাগুলিকে চালু রাখা হয়েছিল, গড়ে তোলা হয়েছিল নতুন নতুন সুরক্ষিত কেন্দ্র। জার্মান ডিভিশনগুলোর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে যেসব দৃঢ় দুর্গ কোট বজায় রেখেছিল সেগুলিরই একটি হল বীর লেনিনগ্রাদ।

স্তালিনগ্রাদের লড়াই

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে এল সোভিয়েত জনগণের নতুন নতুন শক্তিপরীক্ষা আর দীর্ঘ কঠোর লড়াই। তখনকার সামরিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অত্যন্ত জটিল এবং নানা পরস্পরবিরোধী উপাদানে ভরা।

একদিকে, আন্তর্জাতিক হিটলারবিরোধী মেল বাড়ছিল, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে পার্ল হারবারে মার্কিন নৌঘাঁটিতে জাপানী আক্রমণের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান, জার্মানি আর ইতালির সঙ্গে যুদ্ধরত হয়ে পড়ল। ফাশিস্ত রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল অন্যান্য দেশও। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাত হিটলারবিরোধী মেলে শামিল হয়েছিল ২৮টা রাষ্ট্র। ১৯৪২ সালের মে মাসে ইং-সোভিয়েত মৈত্রী গড়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল লণ্ডনে, তার এক মাস পরে সোভিয়েত-মার্কিন মৈত্রী-চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিমান, ট্যাঙ্ক, অন্যান্য ধরনের অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে বলে কথা দিয়েছিল। এদিক থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান আরও মজবুত হল, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্যে হিটলারের আশায় ছাই পড়ল। তার উল্টো, ঢের বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ফাশিস্ত জোট।

কিন্তু, ইতোমধ্যে, অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ রেখে এবং — যা ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন — দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন না-করে, বৃটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কপটাচার কিছু কম করে নি, তার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থানটা বেশকিছুটা জটিল হয়ে পড়েছিল। ১৯৪২ সালের ১৩ই অগস্ট স্তালিন চার্চিলের কাছে লিখেছিলেন: 'ইউরোপে ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হবে, এই প্রত্যয় অনুসারেই সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যান্ড তার গ্রীষ্ম আর শরতের পরিকল্পনা রচনা করেছিল।

'এটা সহজেই বোধগম্য হবে যে, ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে বৃটিশ সরকারের নারাজ হওয়াটা সোভিয়েত জনমত যা আশা করেছিল দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হবে, তার উপর একটা নৈতিক আঘাত হয়ে পড়েছে, ফ্রন্টে লাল ফৌজের অবস্থাটাকে জটিল করে তুলেছে এবং সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যান্ডের পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।'*

শীতকালীন সামরিক অভিযানে বিভিন্ন পরাজয় সত্ত্বেও, দ্বিতীয় ফ্রন্ট না-থাকার সুযোগে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপুল পরিমাণ সামরিক শক্তি সমবেত করতে পেরেছিল। ১৯৪২ সালের

* '১৯৪১—১৯৪৫ সালের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আর গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পত্রালাপ,' প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৭, ৬১ পৃঃ

১লা মে নাগাত সোভিয়েত ফ্রণ্টে ছিল জার্মানির ১৭৭টা ডিভিশন, ৯টা ব্রিগেড আর ৪টে বিমানবহর, তাছাড়া, জার্মানির মিত্রদের দেওয়া আরও ৩৯টা ডিভিশন, ১২টা ব্রিগেড এবং বেশকিছু পরিমাণ বিমানবাহিনী। এর সঙ্গে একটা তুলনা থেকে অনেককিছু নজরে আসে: ১৯৪১ আর ১৯৪২ সালে উত্তর আফ্রিকা অভিযানের বহুলাংশে না-নিষ্পত্তিমূলক লড়াইগুলোতে ব্যবহৃত ইতালীয় আর জার্মান ডিভিশন ছিল ১০-১২টার বেশি নয়।

১৯৪২ সালে গ্রীষ্মকালীন অভিযানে সমগ্র সোভিয়েত ফ্রণ্টে আক্রমণ চালাবার অবস্থা জার্মান হাইকম্যাণ্ডের ছিল না, তারা প্রধান সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিল ফ্রণ্টের দক্ষিণ ভাগে — ভরোনেজ, স্তালিনগ্রাদ আর উত্তর ককেশাসের বিরুদ্ধে। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড লড়াইগুলোতে জার্মান বাহিনীগুলো আরও কয়েকটা বড়রকমের সাফল্যলাভ করেছিল। অগস্ট মাসে ফীল্ড-মার্শাল ফন পাউলুসের পরিচালনাধীন জার্মান ৬ষ্ঠ আর্মি স্তালিনগ্রাদ থেকে অনতিদূরে ভলগা-তীরে এসে গেল। ঐ গ্রীষ্মে আর শরতে জার্মান বাহিনী উত্তর ককেশাসের একটা বড় অংশ দখল করেছিল, যুদ্ধ চলেছিল প্রধান ককেশীয় পর্বতমালার গিরিদ্বারগুলিতেও। জার্মানরা এর চেয়ে বেশি দূর এগোতে পারে নি; তাদের ট্র্যান্স-ককেশিয়ায় সবলে ঢুকে পড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

ইতোমধ্যে ভলগার ধারে লড়াইটা ক্রমাগত বেশি রণনীতিগত গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠছিল। স্তালিনগ্রাদের (এখন ভলগোগ্রাদ) কাছাকাছি এলাকাগুলোতে লড়াই হচ্ছিল বিলম্বিত এবং বিশেষভাবে হিংস্র।

অগস্ট মাসের শেষের দিকে জার্মান বিমানবাহিনী কয়েকশ' বোমারু বিমান পাঠাল স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করার জন্যে। কয়েক ঘণ্টা ধরে বোমাবর্ষণের পরে ছয় লক্ষ মানুষের এই শহরটি একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। মানুষের ঘর-বাড়ি জিনিসপত্র

কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না, — জ্বলন্ত রাস্তাগুলো দিয়ে সবাই ছুটছিল ভলগার দিকে। শত্রুর অবিরাম অগ্নিবর্ষণের মধ্যে তাদের অপসারিত করা হয়েছিল। তিন লক্ষর বেশি মানুষকে নদীর ওপারে সরিয়ে নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু, ততক্ষণে জার্মান ব্যাটালিয়নগুলো শহরে ঢুকে পড়ছিল — লড়াই চলছিল শহরের রাস্তায়-রাস্তায়।

স্তালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের পরে নগরীতে বড়
একটাকিছু অবশিষ্ট ছিল না

ভলগার পশ্চিম পারে ৪০ মাইল ধরে একটা সংকীর্ণ ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল এই শহর — তার ফলে স্তালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষা আরও জটিল হয়ে পড়েছিল। লড়াই চলেছিল প্রচণ্ড — তার একটা দৃষ্টান্ত: রেল-স্টেশনটা হাত-বদল হয়েছিল তেরো বার। সেপ্টেম্বর মাস নাগাত জার্মানরা শহরের বেশির ভাগ দখল করে নিতে পেরেছিল, জায়গায়-জায়গায় তারা নদী অবধি পেঁছে গিয়েছিল। নদীর ধারে একটা সংকীর্ণ ভূখণ্ড ছিল সোভিয়েত রেজিমেণ্টগুলির হাতে, সেটাকেও শত্রু কোথাও-কোথাও বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে

পেরেছিল। সেই প্রতিরক্ষা বলয়টা চওড়ায় ছিল ২০০ গজ থেকে মাইল-খানেক অবধি। প্রতি ইঞ্চি জমি ছিল শত্রুর অগ্নিবর্ষণের মুখে উন্মুক্ত। তখন মনে হতে পারত, এমন অবস্থায় প্রতিরোধ একদিনের বেশি চালানো অসম্ভব, কিন্তু স্তালিনগ্রাদের রক্ষকেরাই জয়ী হয়েছিল!

খাস স্তালিনগ্রাদে লড়াইয়ের প্রধান ধাক্কাটা সামলেছিল জেনারেল চুইকভের অধীন ৬২তম আর্মি; এই আর্মি ছিল জেনারেল ইয়েরেমেঙ্কোর অধীন স্তালিনগ্রাদ ফ্রণ্টের একটা অংশ। বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল জেনারেল বাতিউক, কর্নেল গুর্তিয়েভ, জেনারেল লুদ্নিকভ এবং জেনারেল রদিমৎসেভের পরিচালিত রেজিমেণ্ট আর ডিভিশনগুলি।

কি দিনে, কি রাতে, এক মুহূর্তের জন্যেও এই হিংস্র লড়াইয়ে বিরতি ছিল না। শহরের প্রবেশপথগুলিতে লড়াই সমেত স্তালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষার লড়াই চলেছিল ১২৫ দিন ধরে, শহরের রাস্তায়-রাস্তায় লড়াই চলেছিল ৬৮ দিন।

শহরটিকে রক্ষা করার জন্যে সোভিয়েত সৈনিকেরা লড়েছিল ভলগার খাড়াই পাড়ে খোঁড়া ট্রেঞ্চগুলোতে, খাতগুলোর মধ্যে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাড়িগুলির কাঠামের ভিতরে-ভিতরে, বোমায় বিধ্বস্ত ইমারতের মাটির তলার কুঠরিগুলোতে। জার্মান সামরিক শক্তি ৭০০টা আক্রমণ চালিয়েছিল, তাদের অগ্রসর হবার প্রতি পদে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল প্রচণ্ড। ফ্রণ্ট-লাইনের দু'দিক থেকে কামাননির্ঘোষ, মাথার উপর দিয়ে মর্টারের গোলার হিসহিসানি, ট্যাঙ্কের গুরুগুরু আওয়াজ, আকাশে বিমানের গর্জন অবিরাম (জার্মানরা দিনে ১০০ থেকে ২৫০০ বার হানা দিত)। স্তালিনগ্রাদের লড়াই শেষ হবার পরে এই লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র মামাই টিলার ঢালুতে বোমা, গোলা আর হাতবোমার টুকরো ছিল প্রতি বর্গমিটারে ৫০০ থেকে ১,২০০টা।

সোভিয়েত সৈনিকদের বীরত্ব আর সহ্যশক্তি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের। কারখানার কর্মশালা আর বোমায় বিধ্বস্ত বাড়িগুলোর ভিতরে মরিয়া লড়াই চলেছিল কয়েক দিন ধরে। প্রত্যেকটা কামরা, প্রত্যেকটা তহখানা আর প্রত্যেকটি সিঁড়ি দখল করার জন্যে লড়াই চলেছিল।

'পাভলভ ভবনের' জন্যে লড়াই পরে লোক-কাহিনীর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। জার্মান ব্যূহগুলোর ভিতরে একটা গোঁজের মতো দাঁড়ানো এই অর্ধ-বিধ্বস্ত চারতলা বাড়িটাকে সার্জেণ্ট পাভলভের অধীন একদল সোভিয়েত সৈনিক দখল করেছিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। এই সৈনিকেরা বাড়িটাকে হাতে রেখেছিল ৫৮ দিন, — জার্মানরা অসংখ্য আক্রমণ চালিয়ে শেষে বাড়িটাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিল।

আত্মোৎসর্গ-করা সাহসিকতা, সহনশীলতা আর সামরিক দক্ষতার অসংখ্য দৃষ্টান্তে স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের কাহিনী ভরা। সমস্ত সৈনিক আর অফিসারের মুখেই উচ্চারিত হতে পারত স্নাইপার জাইৎসেভের এই কথাটা: 'আমাদের জন্যে ভলগার ওপারে কোন ভূমি নেই। আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছি, আর শক্ত হয়ে দাঁড়াবও শেষ অবধি!'

জার্মান সামরিক শক্তি স্তালিনগ্রাদে যেন পাঁকে পড়ে গিয়েছিল, সাফল্য ছিল না তাদের নাগালের মধ্যে। স্তালিনগ্রাদে এবং তার চারপাশে তাদের সেরা সেরা ডিভিশনগুলোর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল অজস্র; এই মহারণের জন্যে জড়ো-করা বিপুল সামরিক শক্তি আটক পড়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত সৈনিকদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকলাপ জার্মান হাইকম্যাণ্ডের সমস্ত পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড করে দিল, — তখন সোভিয়েত বাহিনীগুলির উদ্যোগী আক্রমণে এগিয়ে যাবার সময় হল।

সেভাস্তপোল, ভরোনেজ আর স্তালিনগ্রাদের কাছে এবং ককেশাসে

বিরাট লড়াইগুলো চলবার সময়ে দেশের বাদবাকি সমস্ত জায়গায় যুদ্ধপ্রচেষ্টায় মুহূর্তের জন্যেও বিরাম ছিল না। যুদ্ধ শিল্প সম্প্রসারিত করার জন্যে পৃথক করা ছিল সমস্ত সংগতি-সংস্থান। আগে বলা হয়েছে, কতকগুলি প্রধান আর্থনীতিক এলাকা শত্রুর দখলে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত শিল্পোৎপাদনে সামগ্রিক বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। দেশের ঐ বছর বৃদ্ধির হার বিস্তর ত্বরায়িত হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলগুলিতে — উরালে, ভলগা অঞ্চলে আর মধ্য এশিয়ায় — যুদ্ধ শিল্পে উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। উরাল অঞ্চলে শিল্পোৎপাদন দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধের আগেকার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি; ভলগা অঞ্চলে আর পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ঐ অনুপাতটা ছিল যথাক্রমে ৯:১ আর ২৭:১। পশ্চিম থেকে সরিয়ে আনা ১,২০০টা কারখানা ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাত চালু হয়ে গিয়েছিল, নতুন নতুন কারখানাও তৈরি করা হচ্ছিল অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে। ১৯৪২ সালে দশ হাজারের বেশি নির্মাণ প্রকল্পে কাজ চলছিল।

১৯৪২ সালে তৈরি করা হয়েছিল ২৫ হাজারের বেশি বিমান, ২৪,০০০ ট্যাঙ্ক আর মোটামুটি ৫৭,০০০ কামান। ১৯৪২ সালের শরৎকাল নাগাত ফৌজে সৈনিক আর অফিসারের সংখ্যা ছিল যাট লক্ষর বেশি — তখন তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-গুলির যথেষ্ট যোগানের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে অর্থনীতিকে যুদ্ধের ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত ক'রে আসন্ন পালটা-আক্রমণের জমিন তৈরি করা হয়েছিল — সেই পালটা-আক্রমণ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

সর্বাধিনায়ক স্তালিন, তাঁর সহকারী জেনারেল জুকভ এবং সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক ভাসিলেভ্স্কি স্তালিনগ্রাদ এলাকার উদ্যোগী আক্রমণ-অভিযানের পরিকল্পনা রচনা করতে শুরু করেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসেই। স্তালিনগ্রাদে সমানে সুতীব্র

আত্মরক্ষামূলক লড়াই চলতে থাকল দিনের পর দিন, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে পালটা-আক্রমণের পরিকল্পনাও দানা বেঁধে উঠতে থাকল। সংশ্লিষ্ট ফ্রণ্ট আর আর্মিগুলির প্রতিনিধিরা এই পরিকল্পনা রচনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন, শেষে 'উরান্' পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছিল নভেম্বর মাসে।

ভলগার পূবে স্তেপভূমিতে, দন্-এর পাড়ে আর স্তালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে নতুন নতুন কোর আর ডিভিশন আনানো হল। সৈন্যচলাচল সহজতর করার জন্যে কোথাও-কোথাও তৈরি করা হল বিশেষ বিশেষ নতুন রেলপথ। ২০০ থেকে ২৫০ মাইল পথ পার হয়ে সমাবেশের এলাকায় এল অন্যান্য ইউনিট। সৈন্যদলগুলি চলেছিল রাত্রে, মোটরযানগুলির হেডলাইট জ্বালা হত না। ভলগা নদী পার করে স্তালিনগ্রাদের উত্তরে আর দক্ষিণে ট্যাঙ্ক আর মোটরযান নেবার জন্যে বিশেষ বিশেষ নদী-পারপথ তৈরি করা হয়েছিল রাত্রে কাজ করে।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাত স্তালিনগ্রাদ এলাকায় শত্রুকে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত সৈন্যসমাবেশ করা হয়েছিল লাখ-দশেক, শত্রু-সৈন্য ছিল দশ লাখের কিছু বেশি।

১৯৪২ সালে ১৯এ নভেম্বর সকালে স্তালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে দন্ নদীর পাড় বরাবর স্তেপভূমি ছিল ঠাণ্ডা কুয়াশায় ঢাকা। সকাল সাড়ে-সাতটায় সেই কুয়াশা ভেদ করে শত শত রকেট ছুটল শত্রুর অবস্থানগুলোর দিকে। এইসব 'কাতিউশা' রকেটক্ষেপক সোভিয়েত ফৌজ প্রথম ব্যবহার করেছিল ১৯৪১ সালে, দেখা গিয়েছিল এগুলি খুবই কার্যকর। একঝাঁক এই রকেট বর্ষণ করেই শুরু হল স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েত পালটা-আক্রমণ। 'কাতিউশার' পরে চলল ভারি কামান আর মর্টারের অগ্নিবর্ষণ, এক-ঘণ্টা কুড়ি মিনিট পরে শুরু হল ট্যাঙ্ক আর পদাতিকদের অভিযান।

খাস স্তালিনগ্রাদে এবং তার ঠিক বাইরে ছিল জার্মান, ইতালীয় আর রুমানীয় ফৌজের বড় বড় সমাবেশ: ফীল্ড-মার্শাল ফন পাউলুসের অধীন জার্মান ৬ষ্ঠ আর্মি, জার্মান ৪র্থ ট্যাঙ্ক আর্মি, ইতালীয় ৮ম আর্মি, আর রুমানীয় ৩য় আর্মি। স্তালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে আর দক্ষিণে প্রধান বাহিনীগুলোর পার্শ্বদেশে ছিল ইতালীয় আর রুমানীয় আর্মি।

শত্রুর উপর তিন দিক থেকে যুগপৎ আঘাত হানার সিদ্ধান্ত করেছিল সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যান্ড: উত্তর পার্শ্বদেশে জেনারেল ভাতুতিনের অধীন দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সৈনিকদের আক্রমণ, দন্ ফ্রন্টে জেনারেল রকোসভ্স্কির সৈন্যদের আক্রমণ, আর স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের সৈনিকদের আক্রমণ দক্ষিণ পার্শ্বদেশে, — এইভাবে শত্রুর প্রধান সামরিক শক্তিটাকে বাইসের মতো পাক দিয়ে এঁটে ঘেরাও করে ফেলার ব্যবস্থা ছিল।

এই পরিকল্পনাটিকে সার্থকভাবে কার্যে পরিণত করা হয়েছিল: উত্তর আর দক্ষিণ দু'দিকেই শত্রুর রক্ষাব্যূহগুলো ভেঙে এগিয়ে গিয়ে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক-সৈনিকেরা আর ঘোড়সওয়ারেরা মিলিত হল শত্রুর পিছনে। ২৩এ নভেম্বর বিকেল চারটেয় এই বেষ্টনীটা পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল: বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর সরঞ্জাম সমেত তিন লাখের বেশি শত্রু-সৈন্য আটক পড়ে গেল সেই বিশাল 'কটাহটা'র মধ্যে।

এই ঘেরাও হয়ে পড়া সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে চাইল না — হিটলারের ব্যক্তিগত নির্দেশ অনুসারে, যদিও অনশনে, ঠান্ডায় আর বোমার আক্রমণে তারা মরছিল শ'য়ে শ'য়ে। রকোসভ্স্কি আর ভোরনভ এই দুই জেনারেলের অধীন সোভিয়েত ফৌজ খাস জার্মান অবস্থানগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেছিল। এই লড়াইয়ের শেষ গুলিগুলো ছোঁড়া হয়েছিল ২রা ফেব্রুয়ারি। মানবজাতির ইতিহাসের বৃহত্তম লড়াইগুলির একটা শেষ হল।

বরফে-ঢাকা স্তেপভূমির ভিতর দিয়ে দেশের ভিতর দিকে বন্দীরা চলল সারি-সারি, তার যেন শেষ ছিল না, তারা সংখ্যায় ছিল ৯০ হাজারের বেশি।

ভলগার তীরে এই বিজয়ের ফলে যুদ্ধস্রোতের মোড় ঘুরে গেল। জার্মানির যা প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি হল তাতে তার সামরিক শক্তি খর্ব হল গুরুতরভাবে। রণনীতিগত উদ্যোগ আর রইল না জার্মান হাইকম্যান্ডের হাতে।

স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকৃত হয়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট লিখেছিলেন, 'তাদের গৌরবোজ্জ্বল জয় আক্রমণ-অভিযানের স্রোতটাকে থামিয়ে দিল এবং সেটা হল আগ্রাসনের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মিত্র শক্তিগুলির যুদ্ধে মোড় ঘুরে যাবার সূচনা'।

ভলগার ধারে লড়াইয়ের পরে লাল ফৌজ বৃহৎ পরিসরে উদ্যোগী অভিযান চালাল উত্তর ককেশাসে, ফ্রন্টের মধ্যভাগ বরাবর এবং লেনিনগ্রাদ এলাকায়। শত্রুর ১১৩টা ডিভিশনকে পরাস্ত করল সোভিয়েত ফৌজ, বহিরাক্রমণকারীদের সমস্ত সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্র থেকে খেদিয়ে দেবার জন্যে ব্যাপক পরিসরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। কতকগুলো জায়গায় সোভিয়েত সৈন্যদলগুলি এগোল ৪০০-৪৫০ মাইল অবধি — পথে তারা মুক্ত করল গোটা গোটা প্রদেশ আর বহু বড় বড় শহর।

তবে, তখনও বিস্তর সামরিক শক্তি ছিল জার্মানির হাতে, প্রায় গোটা পশ্চিম আর মধ্য ইউরোপ ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। শত্রুর হাতে তখনও ছিল বিভিন্ন বিশাল সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্র। নাৎসী জার্মানির উপর বিজয়ের জন্যে তখনও সামনে ছিল দীর্ঘ কঠিন পথ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ফাশিস্ত আক্রমণ-অভিযান শুরু হবার পিঠাপিঠিই সমস্ত দখল-করা রাজ্যক্ষেত্রে জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল: এটা ছিল ফ্রণ্ট-লাইন ছাড়া যুদ্ধ — কিন্তু প্রধান যুদ্ধবিগ্রহেরই মতো ভয়ানক আর উত্তেজনায় ঠাসা। যেসব সোভিয়েত নর-নারী জার্মানদের দখল-করা এলাকাগুলোতে পড়ে গিয়েছিল তারা তাদের দেশ, সোভিয়েত রাজ আর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অনুরক্তির প্রচুর প্রমাণ দিয়েছিল।

সোভিয়েত জনগণের পরিচালিত প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্রটা পাঠকদের কাছে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্যে, নাৎসীরা কী রকমের শাসন চালাচ্ছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া দরকার ভূমিকা হিসেবে। সেটা ছিল অতি নির্মম নৃশংস হিংস্রতা আর সন্ত্রাসের রাজ। সমস্ত কমিউনিস্ট, কমসোমল সদস্য এবং স্থানীয় সোভিয়েত আর ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনগুলির নেতাদের খতম করে দিতে তারা মনস্থ করেছিল। ইহুদীদের নারী শিশু আর বৃদ্ধ সমেত প্রত্যেকটি মানুষকে তারা বধ করেছিল। শুধু কিয়েভেই নিহত হয়েছিল লাখ-দুয়েক বেসামরিক নাগরিক।

যুদ্ধের বছরগুলিতে সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্রেই নাৎসীরা প্রায় এক কোটি বেসামরিক নাগরিক আর যুদ্ধবন্দীকে বধ করেছিল কিংবা নির্যাতন করে খুন করেছিল। দখল-করা এলাকাগুলোতে ছড়ানো ছিল বন্দিশিবিরগুলো — সেখানে অনশন কিংবা মারপিট আর নির্যাতনে মৃত্যু অবধারিত ছিল প্রত্যেকেরই। শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে মানুষকে বধ করা হত গণ-পরিসরে। সামান্যতম অবাধ্যতারও সাজা ছিল কঠোরতম, প্রকাশ্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সেটা ছিল

আরও মাত্রা-ছাড়া, — অমন ঘটনার পরে গ্রামকে-গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া হত, বন্দীদের হত্যা করা হত।

দখল করা এলাকাগুলোতে লুটতরাজ চলত প্রণালীবদ্ধভাবে। নিয়মিতভাবে ট্রেনের পর ট্রেন বোঝাই করে মাংস, রান্নার জন্যে প্রস্তুত করা চর্বি, শস্য আর চিনি চলে যেত জার্মানিতে। বিভিন্ন শিল্পায়তন আর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সরঞ্জাম, আর তার সঙ্গে কয়লা, ধাতু আকরিক, দারু, ইত্যাদি তারা নিয়ে যেত দেশের বাইরে। জার্মানিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বহু মূল্যবান আর্ট সম্পদ আর ঐতিহাসিক পুরানিদর্শনও।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে জার্মানরা সুস্থদেহ নারী-পুরুষদের (বিশেষত তরুণ-তরুণীদের) নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল — তাদের কলে-কারখানায়, খেতে-খামারে খাটাবার জন্যে। দখলের আমলে এইভাবে জার্মানিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাখ-পঞ্চাশেক মানুষ।

নাৎসী দখলদাররা আশা করেছিল, এই সন্ত্রাসের রাজ কায়েম করে তারা ভেঙে দেবে জনসাধারণের মনোবল আর প্রতিরোধস্পৃহা। তবে, এই নৃশংস দমন-পীড়ন জনসংখ্যার বেশির ভাগকে সন্ত্রস্ত করতে পারে নি, শুধু তাই নয়, সেটা বরং বহিরাক্রমণকারীদের উপর মানুষের ঘৃণাটাকে আরও শানিয়েই তুলেছে।

এইসব এলাকায় দখলদারদের বিরুদ্ধে বাসিন্দাদের লড়াইয়ের কায়দা-করণ খুবই বিবিধ রকমের। প্রতিরোধের কেন্দ্রী উপাদান ছিল পার্টিজান আন্দোলন। যুদ্ধের প্রথম বছর কেটে যাবার আগেই শত্রুর পশ্চাদভাগে পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্টগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইস্কুলের মেয়ে জোয়া কস্‌মোদেমিয়ান্‌স্কায়া, তরুণী কমসোমল সদস্যা লিজা চাইকিনা এবং তরুণ পার্টিজান আলেক্সান্দর চেকালিন যুদ্ধের প্রথম ক'মাসের মধ্যেই শত্রুর

পশ্চাদভাগে ল'ড়ে এবং পরে নাৎসীদের নির্যাতনে নিহত হয়ে সারা দেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন অচিরেই।

১৯৪২—১৯৪৪ সালে পার্টিজান আন্দোলন সুবিশাল রূপ ধারণ করেছিল। ১৯৪৩ সালের শেষাশেষি পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্টগুলিতে লোক ছিল মোটামুটি আড়াই লক্ষ।

ছোট ছোট পার্টিজান দলগুলি ছাড়াও, বেশকিছু সংখ্যক উঁচু মাত্রায় সংগঠিত পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্ট গড়ে উঠেছিল। এক হাজার কিংবা আরও বেশি মানুষের কোন কোন বড় পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্ট শত্রুর পশ্চাদভাগে বড় বড় রকমের হানা দিত। ১৯৪২ সালের শরৎকালে সাবুরভ এবং বোগাতিরের পরিচালনায় ১,৬০০ মানুষের জিতোমির পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্ট ব্রিয়ান্‌স্কের বনভূমি থেকে ৪০০ মাইল দূরে নীপারের পশ্চিম পারে পেঁছেছিল — সারা পথ তারা গিয়েছিল লড়াই করতে করতে। কোভ্‌পাক এবং রুদ্‌নেভের পরিচালিত ১,০০০ জনের সুমি পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্ট ঐ সময়েই দেস্‌না, নীপার আর প্রিপিয়াৎ নদী আর পোলেসিয়ে এলাকা পার হয়ে গিয়ে সার্নি রেল-জংশনে হানা দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের গোড়ার ক'মাসে কোভ্‌পাকের পার্টিজানরা কিয়েভের কাছে শত্রু-শক্তির উপর আঘাত হেনেছিল, ঐ বছর গরমকালে তাদের ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রীভূত ছিল কার্পাথিয়ায়। বিশেষত এই পার্টিজান হানাটা ছিল সবচেয়ে দুঃসাহসী। মোট ১,৫০০ মাইল পথ পাড়ি দেবার সময়ে শত্রুর সঙ্গে তাদের লড়তে হয়েছিল প্রায় প্রতিদিনই। শত্রুর সতরটা বড় গ্যারিসন তারা খতম করেছিল, তাদের হাতে শত্রুর সৈন্য আর অফিসার নিহত হয়েছিল পাঁচ হাজারের বেশি। পথে প্রত্যেকটি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই চালিয়ে কোভ্‌পাকের পার্টিজানরা শেষ পর্যন্ত সবলে পথ করে কার্পাথিয়ার তৈলক্ষেত্রে পেঁছেছিল।

'দ্রগোবিচ্‌-এর তৈল — অবশেষে!' লিখেছিলেন কোভ্‌পাক।

'পথে ছোট-বড় ডজন ডজন লড়াই চালিয়ে অত দূর পৌঁছতে আমাদের লাগল একমাসের বেশি — কিন্তু অবশেষে আমরা পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। ঐভাবে জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করতে হলে বুকটা দমে যায়, কিন্তু যুদ্ধের নিয়মকানুন নির্মম। কাজটা এখন করতে হবে — যাতে শত্রু দুর্বল হয়ে পড়ে, আর কাছিয়ে আসে আমাদের বিজয়। বিৎকুভ-ইয়াব্লুনভ তৈলক্ষেত্রে সেই বিরাট অগ্নিকান্ড চলার সময়ে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ঐ পর্বত কখনও অন্ধকারে থাকে নি।'

ইউক্রেনীয় স্তেপভূমিতে নাউমভ আর আনিসিমেঙ্কোর অধীন ঘোড়াসওয়ারেরা এবং মেল্নিকের অধীন ভিন্নিৎসা ডিট্যাচমেণ্টের মতো ইউনিটগুলিও অন্যান্য দুঃসাহসিক হানা দিয়েছিল।

কতকগুলি এলাকায়, জার্মান গ্যারিসন আর প্রশাসনকেন্দ্র নিশ্চিহ্ন ক'রে পার্টিজানরা কার্যত সোভিয়েত শাসন পুনঃস্থাপন করতে পেরেছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে পার্টিজানদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলির মোট আয়তন ছিল প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল।

কারেলিয়া আর বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি থেকে উত্তর ককেশাস অবধি শত্রুর দখল-করা সমস্ত এলাকায় শত শত পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্ট জার্মান সৈনিকদের বুকে প্রাণভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। পার্টিজানরা শত্রুর গ্যারিসনগুলোর উপর হানা দিত, পুল উড়িয়ে দিত, সৈন্যবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করত, বড় বড় সদর সড়ক বরাবর ওত পেতে থেকে শত্রুর উপর অতর্কিত হামলা চালাত।

১৯৪৩ সালের অগস্ট মাসে একটা পার্টিজান ক্রিয়াকলাপ চালু হয়েছিল, পরে সেটার নাম হয়েছিল 'রেলের যুদ্ধ'। কতকগুলো অঞ্চলে, বিশেষত বেলোরুশিয়ায় পার্টিজানরা ব্যাপক পরিসরে শত্রুর ট্রেনচলাচল বিপর্যস্ত করে দিতে আরম্ভ করেছিল: স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা কেবল বেলোরুশিয়ায়ই ২,১১,০০০টা

রেল-লাইন উড়িয়ে দিয়েছিল। পার্টিজানদের তৎপরতার ফলে শত্রুর ট্রেন বিধ্বস্ত হয়েছিল ন'হাজারখানার বেশি। ছ'হাজার ইঞ্জিন আর হাজার-চল্লিশেক ট্রাক্ অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল। নষ্ট করা হয়েছিল ৫·৫ হাজার রাস্তার পুল আর প্রায় ২২ হাজার মোটরযান। এইসব বীরকীর্তি সম্পাদনের জন্যে কত জীবন দিতে হয়েছিল, কত ভয়ানক লড়াই করতে হয়েছিল, তাতে প্রয়োজন হয়েছিল কত প্রচেষ্টা আর ক্ষয়-ক্ষতি, সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে!

১৯৪৪ সালে বেলোরুশী পার্টিজানরা কতকগুলো মেইন লাইনে ট্রেনচলাচল লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। একটা তথ্য থেকে পার্টিজান আন্দোলনের তাৎপর্যটাকে স্পষ্ট বোঝা যায়: ১৯৪৩ সালে জার্মান হাইকম্যাণ্ড পার্টিজানদের বিরুদ্ধে লাগিয়েছিল তাদের নিয়মিত ফৌজের ২৫টা ডিভিশন, তার উপর ছিল পুলিস এবং বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ইউনিট।

নাৎসীবিরোধী প্রতিরোধের আর-একটা রূপ ছিল শহর, শিল্পকেন্দ্রের বসতি এলাকা আর গ্রামগুলিতে গুপ্ত আন্দোলন। ফাশিস্তবিরোধী গুপ্ত সংগঠন গড়া হয়েছিল প্রায় সমস্ত দখল-করা শহরে আর জেলায়, এইসব সংগঠনের ক্রিয়াকলাপের পরিধিও ছিল বিস্তৃত। এই গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীরা স্থানীয় নাৎসী কর্তৃপক্ষের খাদ্যসামগ্রী আর নানা মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করে জার্মানিতে পাঠাবার কাজটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিত, কলে-কারখানায় আর পরিবহন ব্যবস্থায় তারা অন্তর্ঘাত চালাত, পার্টিজানদের সাহায্য করত, বেসামরিক সোভিয়েত নাগরিকদের দেশের বাইরে নিয়ে যাবার কাজে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করত, নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপ চালাত, বিভিন্ন সোভিয়েত পুস্তিকা আর সংবাদপত্র ছেপে বিলি করত, জার্মান সৈন্যদলগুলোর গতিবিধি সম্বন্ধে খবরাখবর যোগাড় করত।

এইসব গুপ্ত সংগঠনের কোন-কোনটি সম্বন্ধে এখনও অবধি বিশেষকিছু জানা নেই, কেননা নাৎসীরা বধ করেছিল তাঁদের সবাইকেই। গুপ্ত প্রতিরোধের ইতিহাসে আত্মোৎসর্গ-করা বীরত্বের দৃষ্টান্ত রয়েছে অসংখ্য। পূব ইউক্রেনে খনি শিল্পের ছোট শহর ক্রাস্নদনে সক্রিয় ছিল 'ইয়াং গার্ড' নামে গুপ্ত সংগঠন। এর নেতৃত্বে ছিলেন এইসব কমসোমল সদস্য-সদস্যা: ওলেগ কোশেভই, ইভান তুর্কেনিচ, ভিক্তর ত্রেতিয়াকেভিচ, উলিয়ানা গ্রোমভা, ইভান জেম্নুখভ, সের্গেই তিউলেনিন এবং লিউবভ শেভ্ৎসভা — এঁদের সবার উপর নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে অত্যাচার চালাবার পরে নাৎসীরা তাঁদের জীবন্ত অবস্থায় খনির খাদে ফেলে দিয়েছিল।

ইউক্রেনের নাৎসী রাইখ্স্কমিসার এরিক কোখ্-এর সরকারী বাসস্থান রভ্নো শহরে গুপ্ত প্রতিরোধের কর্মীরা ইউক্রেনে মোতায়েন বিশেষ পিটুনী বাহিনীর অধিনায়ক জার্মান জেনারেল ফন্ ইল্গেনকে হরণ করে নিয়েছিল। এটা সংগঠিত করেছিলেন নিকোলাই কুজনেৎসভ, — ইউক্রেনে প্রধান নাৎসী বিচারপতি আলফ্রেড ফুঙ্ক এবং কোখ্-এর সহকারী জেনারেল হের্মান ক্লুৎকেও তিনি সাবাড় করেছিলেন।

১৯৪৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসের এক রাত্রে, বেলোরুশিয়ায় হিটলারের হাইকমিশনার ভিলহেল্ম কুবে'র মিন্স্কের বাসভবনটাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিলেন মাজানিক নামে এক নারী প্রতিরোধ-যোদ্ধা।

নাৎসী দখলদারেরা যতদিন সোভিয়েত ভূখণ্ডে ছিল তার সর্বক্ষণই প্রাণভয়ে তাদের বুক দুরদুর করত। তাদের গ্যারিসন, সদরঘাঁটি, ডিপো, বিমানবন্দর আর যোগাযোগব্যবস্থা, সবকিছুর উপরই অবিরাম হামলা চলত পার্টিজানদের আর গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীদের। এতে অবাক হবার তেমন কিছু নেই, কেননা নাৎসী আক্রমণ-অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে

অংশগ্রহণ করেছিল লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত বেসামরিক নাগরিক। কেবল বেলোরুশিয়ায়ই তাদের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি।

শত্রুর পশ্চাদভাগে ফাশিবাদের বিরুদ্ধে এই যথার্থই দেশজোড়া লড়াইয়ের নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট সংগঠনগুলিই। শত্রুর দখল-করা প্রায় প্রত্যেকটি এলাকা আর শহরেই পার্টি কমিটি আর প্রাথমিক পার্টি সংগঠন স্থাপন করা হয়েছিল, — সেগুলি প্রতিরোধ সংগঠিত করার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুদ্ধের বছরগুলিতে দখল-করা এলাকাগুলিতে বহু সহস্র নর-নারী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিল।

বহিরাক্রমণকারীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত হল

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে অল্প সময়ের শান্ত অবস্থার পরে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে আর-একটা বিশাল লড়াই হয়েছিল।

গ্রীষ্মে আর-একটা আক্রমণ-অভিযান চালাতে মনস্থ করেছিল জার্মান হাইকম্যাণ্ড। জার্মানিতে একটা 'পূর্ণাঙ্গ' সমাবেশ ঘটিয়ে তারা ফৌজে আরও কুড়ি লক্ষ সৈন্য ভরতি করিয়েছিল। ইতোমধ্যে, জার্মান শিল্পেও যুদ্ধোৎপাদন বেড়ে চলছিল। ফ্রণ্টে দেখা দিতে থাকল নতুন নতুন শক্তিশালী 'টাইগার' আর 'প্যান্থার' ট্যাঙ্ক এবং 'ফার্দিনান্দ' নামে চল-কামান। তবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির অবস্থার অবনতি ঘটছিল স্পষ্ট-নির্দিষ্টভাবেই। বৃটিশ আর মার্কিন ফৌজ উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করেছিল ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে, তারপরে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে তারা অবতরণ করেছিল সিসিলিতে — তার ফলে ফাশিস্ত জোটের অবস্থান গুরুতরভাবে খর্ব হয়েছিল। তবু,

জার্মান ফৌজের শুধু একটা নগণ্য অংশকেই ভিন্নমুখ করতে পেরেছিল এইসব যুদ্ধবিগ্রহ। আগেরই মতো তখনও জার্মান ডিভিশনগুলোর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে। সেখানে তাদের ছিল ২৩২টা ডিভিশন — সেগুলো দিয়ে কৃতকার্য হতে পারবে বলে আশা করেছিল জার্মান হাইকম্যান্ড। তবু, এই নতুন আক্রমণ-অভিযানটার পরিকল্পনা তারা করেছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ পরিসরে। 'অপারেশন সিটাডেলে'র উদ্দেশ্য ছিল কুস্কর্ অঞ্চলে সোভিয়েত বাহিনীগুলিকে ঘেরাও করে ফেলে তারপরে অভ্যন্তরভাগে আরও এগিয়ে যাওয়া। ঐ অঞ্চলে যে-ভূখণ্ডটায় সোভিয়েত বাহিনীগুলি জমায়েত হয়ে ছিল সেটা জার্মান ফ্রণ্ট-লাইনের ভিতরে অনেকটা ঢুকে গিয়েছিল — সেটাকে বলা হত 'কুস্কের্র হাঁসুলিবাঁক'।

জার্মান বাহিনীগুলো আক্রমণ শুরু করেছিল ১৯৪৩ সালে ৫ই জুলাই ভোরে। সোভিয়েত রক্ষাব্যূহগুলির ভিতরে ঢুকে পড়ার আশায় তারা লড়াইয়ে নামিয়েছিল শত শত ট্যাঙ্ক, কিন্তু সেটা হবার ছিল না। আগেভাগে সুপ্রস্তুত রক্ষাব্যূহগুলির সদ্ব্যবহার ক'রে জেনারেল রকোসভ্স্কির অধীন মধ্য ফ্রণ্ট এবং জেনারেল ভ়াতুতিনের অধীন ভরোনেজ ফ্রণ্টের সোভিয়েত সৈনিকেরা প্রবল প্রতিরোধ চালিয়েছিল। বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে জার্মান ডিভিশনগুলো এগোতে পেরেছিল এক সপ্তাহে মাইল-দশেক।

এই লড়াই চরমে পৌঁছেছিল ১২ই জুলাই তারিখে। সেদিন সরাসরি মুখোমুখি ট্যাঙ্কের লড়াই শুরু হয়েছিল কুস্কের্র দক্ষিণে প্রখোরভ্কার কাছে। শত্রুর সেরা সেরা ট্যাঙ্ক ডিভিশন — 'টোটেনকপ্ফ্', 'রাইখ্' আর 'আদল্ফ হিটলার' — এগিয়েছিল ঢিবিতে ভরা একটা সমভূমির ভিতর দিয়ে। তাদের মোকাবিলা করতে গেল জেনারেল রোত্মিস্ত্রভের ৫ম গার্ড্স আর্মির

ট্যাঙ্কগুলি — অচিরেই শুরু হয়ে গেল ১,১০০ ট্যাঙ্কের জীবন-মরণ প্রশ্নের লড়াই। 'দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের' ছ'খণ্ডের সরকারী ইতিহাসে এই লড়াইয়ের বর্ণনা আছে এইভাবে: 'রণক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক ট্যাঙ্ক গিজগিজ করছিল। দু'পক্ষেরই ফারাক হয়ে যাওয়া কিংবা পুনর্বিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ার কোন জায়গা কিংবা ফুরসত ছিল না। খুব কাছাকাছি থেকে ছোঁড়া গোলা ট্যাঙ্কের সামনের কিংবা পাশের বর্ম ভেদ করছিল — তার ফলে অনেক সময়ে গোলাবারুদের বিস্ফোরণের দরুন ট্যাঙ্কের কামান-মঞ্চ উড়ে গিয়েছিল বিধ্বস্ত যন্ত্রটা থেকে ডজন-ডজন গজ দূরে... জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপগুলো থেকে ঘন ধোঁয়ার মেঘ উঠে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল অচিরেই। কালো পোড়ামাটির পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছিল জ্বলন্ত ট্যাঙ্কগুলোর অগ্নিশিখা।'

কুর্স্কের হাঁসুলিবাঁকে জার্মানদের মতলব হাসিল হবার ছিল না। ইতোমধ্যে, শত্রুকে দম ফেলার একটুও ফুরসত না-দিয়ে উদ্যোগী আক্রমণে এগিয়ে গেল সোভিয়েত ফৌজই। বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ করল জার্মান বাহিনীগুলো: অগস্ট মাসে তারা ছেড়ে গেল ওরেল, বেলগোরদ আর খারকভ — এইসব জায়গা থেকেই তারা কুর্স্কের আক্রমণ-অভিযান শুরু করেছিল। সোভিয়েত সামরিক শক্তির মহাদেদীপ্যমান জয় হল কুর্স্কের হাঁসুলিবাঁকে। ৫০ দিনের লড়াইয়ে জার্মানদের হতাহত আর নিখোঁজ হল পাঁচ লক্ষর বেশি (এটা জার্মান সরকারী তথ্য)। কুর্স্কে আক্রমণ-অভিযানে লাগানো সত্তরটা জার্মান ডিভিশনের তিরিশটা খতম হয়ে গিয়েছিল।

তখন থেকে যুদ্ধের একেবারে শেষ অবধি রণনীতিগত উদ্যোগ থেকে গিয়েছিল লাল ফৌজের হাতে। বিরাট আক্রমণ-অভিযান চালানো হয়েছিল ১,৫০০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত ফ্রণ্ট বরাবর। অগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে জেনারেল মালিনভ্স্কি আর

জেনারেল তোল্‌বুখিনের ফৌজ মুক্ত করেছিল কয়লা আর ধাতু শিল্পে দেশের একটা প্রধান কেন্দ্র — দনেৎস অববাহিকা।

সবলে নীপার নদী পার হওয়াটা ছিল সোভিয়েত আক্রমণ-অভিযানে আরও বড় নিদর্শনস্তম্ভবিশেষ। নাৎসী হাইকম্যান্ড ইতোমধ্যে মূলকৌশল বদ্‌লে ধরেছিল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ আর আত্মরক্ষামূলক মূলনীতিগত রণকৌশল — এতে তারা নীপার লাইন আকড়ে থাকতে পারবে বলে ভরসা করেছিল। কিন্তু, লড়ে পথ করে নীপার নদীতে পেঁাছে সোভিয়েত বাহিনীগুলি সেই খরস্রোতা চওড়া নদী পার হবার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। রাতের অন্ধকারে আর দিনের বেলায় ধূম্র-যবনিকার আড়ালে ছোট ছোট ঝটিতি-হানাদার গ্রুপ আর ব্যাটালিয়নগুলি নদী পার হয়েছিল। নীপার নদীতে সমস্ত সোভিয়েত জাহাজ আর লঞ্চ জার্মানরা ডুবিয়ে দিয়েছিল কিংবা হস্তগত করেছিল বলে নদী পার হবার জন্যে সোভিয়েত সৈনিকদের ব্যবহার করতে হয়েছিল হরেক রকমের উপায়-উপকরণ: মাছধরা নৌকো, কিংবা কাঠের গুঁড়ি, তক্তা, খালি পিপে, বিধ্বস্ত বাড়ির দরজা দিয়ে তৈরি আনাড়ী ভেলা, খড়ে-ঠাসা জলাভেদ্য কেপ্‌। তাদের পরে গিয়েছিল ইঞ্জিনিয়রিং কোরের ইউনিটগুলি — তারা ট্যাঙ্ক, কামানশ্রেণী আর মোটরযান পার করাবার নির্ভরযোগ্য পণ্টুন-সেতু তৈরি করে ফেলেছিল। নীপার নদী বরাবর ৫০০ মাইল বিস্তৃত লাইন ধরে পরিচালিত এই দুঃসাহসী অতর্কিত আক্রমণে জার্মানরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত সৈনিকেরা নদী পার হবার সময়ে তারা অবিরাম প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করেছিল, সমস্ত সোভিয়েত ডিট্যাচমেণ্টের বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছিল, কিন্তু সেই পরিস্থিতিকে তারা সামাল দিতে পারল না কিছুতেই।

সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর মাসে নীপার নদীর পশ্চিম পারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেতুমুখ গাড়া হল। পরবর্তী আক্রমণ-

অভিযান চালাবার জন্যে সমবেত করা হল সোভিয়েত ঝটিতি-হানাদার ইউনিটগুলিকে। জেনারেল ভাতুতিন তাঁর বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে দাঁড় করালেন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের উত্তরে। আক্রমণ-অভিযান শুরু হল ৩রা নভেম্বর সকালে। এই লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈনিকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছিল কর্নেল লিউদ্‌ভিগ স্‌ভোবোদার পরিচালিত ১ম স্বতন্ত্র চেকোস্লোভাক ব্রিগেডের সৈনিকেরা। স্‌ভোবোদা তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশে 'কিয়েভের জন্যে লড়তে হবে' বলে আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, এমনভাবে লড়তে হবে যে, 'তারা যেন লড়ছে প্রাগ কিংবা ব্রাতিস্লাভার জন্যে'।

শত্রু জোর প্রতিরোধ চালিয়েছিল, তখন সোভিয়েত পক্ষ থেকে নামানো হয়েছিল জেনারেল রিবাল্‌কোর পরিচালিত ৩য় গার্ড্‌স ট্যাংক আর্মি। একদিন রাত্রিকালীন ট্যাঙ্কের হামলায় এই বাহিনী শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেঙে ঢুকে পড়ল। সোভিয়েত সৈনিকেরা কিয়েভের উপকণ্ঠে পেঁাছল ৫ই নভেম্বর তারিখে, সেদিন রাত্রেই রাস্তায়-রাস্তায় লড়াই বেধে গেল খাস শহরের ভিতরেই। ৬ই নভেম্বর সকাল চারটে নাগাত লড়াই শেষ হল, অবশেষে মুক্ত হল ইউক্রেনের রাজধানী — 'রুশী নগরীগুলির জননী'।

১৯৪৩ সালে সোভিয়েত সৈনিকেরা নতুন নতুন বড়রকমের সাফল্য অর্জন করল। যুদ্ধে ভাগ্যদেবী হিটলারের প্রতি আর সুপ্রসন্ন নন, সেটা ততদিনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত আরও দ্রুতবেগে বহিরাক্রমণকারীরা সোভিয়েত ভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছিল। পশ্চিম দিকে শত শত মাইল এগিয়ে লাল ফৌজ জার্মানদের দখল-করা অঞ্চলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইতোমধ্যে মুক্ত করে নিয়েছিল।

পালিয়ে যেতে থাকবার সময়ে জার্মানরা সুপরিকল্পিতভাবে 'পোড়া মাটির' নীতি চালিয়েছিল। কল-কারখানা আর

বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেল-স্টেশন, গবেষণাকেন্দ্র আর সাধারণ ঘর-বাড়ি তারা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিল, জ্বালিয়ে দিয়েছিল গোটা গোটা গ্রাম। পালাবার পথে পিছনে সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে যাবার জন্যে তাদের বিশেষভাবে গড়া ধ্বংসকারী দঙ্গলগুলো বাড়ি-ঘরে বিস্ফোরক লাগিয়ে, পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তাদের হাতে তখন ট্রেন যা ছিল সেগুলোতে যতখানি সম্ভব যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম আর কাঁচামাল ভরতি করে তারা নিয়ে গিয়েছিল জার্মানিতে।

তখন বিশাল বিশাল ভূখণ্ড সম্পূর্ণত বিধ্বস্ত। এইসব অঞ্চলের মানুষ দখল আমলের যাবতীয় দুর্ভোগে ক্লিষ্ট হয়েছিল আগেই, এখন তাদের দশা দাঁড়াল অতি সুকঠিন। ট্রেঞ্চে আর জঘন্য কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিতে হল বহু বহু লক্ষ মানুষকে — তাদের শহরগুলোতে না-ছিল জল, না-ছিল বিদ্যুৎ।

মুক্ত এলাকাগুলির মানুষকে সম্ভাব্য যাবতীয় সাহায্য দেবার জন্যে সোভিয়েত সরকার তৎপর ব্যবস্থা অবলম্বন করল। 'জার্মান দখল থেকে মুক্ত এলাকাগুলিতে পুনর্বাসনের অবিলম্ব ব্যবস্থাবলি সম্বন্ধে' একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ১৯৪৩ সালের অগস্ট মাসে। খাদ্যসামগ্রী আর শিল্পের জন্যে মালমশলা সরবরাহের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হল এইসব অঞ্চলকে। কল-কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, খনি, ফার্নেস আর ঘর-বাড়ি পুনঃসংস্থাপনের কাজ শুরু হয়ে গেল। ট্র্যাক্টর, অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং পশুপালের যোগান দেওয়া হতে থাকল গ্রামাঞ্চলে। পথে বড়-বড়রকমের বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ক্রমে ফিরে আসছিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।

সোভিয়েত সৈনিকদের ১৯৪৩ সালের সাফল্যগুলির ফলে ফাশিস্ত জোটের অবস্থাটার অবনতি ঘটতে থাকল ক্রমাগত। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে ইতালির সেরা সেরা ডিভিশনগুলো

পরাস্ত-পর্যুদস্ত হবার ফলে আরও সঙ্গিন হয়ে উঠল মুসোলিনির ফাশিস্ত একনায়কত্বের সংকট। তার ফলে, সিসিলিতে এবং পরে (১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম) খাস ইতালীয় উপদ্বীপে বৃটিশ আর মার্কিন ফৌজের অবতরণ সহজতর হল, — ইতালিকে আত্মসমর্পণ করতে হল অচিরেই। কিন্তু, জার্মান সৈন্যদলগুলো তখনও দেশটির একটা বিরাট অংশ দখলে রাখতে পেরেছিল এবং ইতালির ফাশিস্ত ইউনিটগুলোর মদতে ইং-মার্কিন অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখছিল।

ইতোমধ্যে, আরও মজবুত হয়ে উঠছিল হিটলারবিরোধী মেলের শক্তি — তার কারণ, যুক্ত কার্যক্রমের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঢের ঘনিষ্ঠতর মতৈক্য স্থাপিত হয়েছিল ততদিনে। তেহেরানে ত্রিশক্তি সম্মেলনের ফলাফলের মধ্যে সেটা দেখা গিয়েছিল বিশেষভাবে। ইরানের রাজধানীতেই স্তালিন, চার্চিল আর রুজভেল্ট সম্মেলনে মিলিত হলেন সেই প্রথম বার (১৯৪৩ সালে ২৮এ নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর)। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা, অর্থাৎ ফ্রান্সে বৃহদায়তনের সামরিক শক্তি আনাবার ব্যাপারটাকে চার্চিল এই পর্বেও দেরি করিয়ে দিতে চাইছিলেন, তিনি পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ তীব্রতর করার জন্যে জিদ করছিলেন — যদিও, মূল রণনীতিগত বিবেচনায় তার গুরুত্ব হত গৌণ রকমের। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল জোর দিয়ে বলেছিলেন, ফ্রান্সে ফৌজ নামানো চাই ১৯৪৪ সালের মে মাসের মধ্যেই ,যুদ্ধ শেষ করবার জন্যে এটা ছিল অপরিহার্য। তেহেরান সম্মেলনে দেশতিনটি শেষে এই বিষয়েই একমত হয়েছিল — সেটা লিপিবদ্ধ হয়েছিল এই সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে।

ফাশিস্ত জোটটাকে সম্পূর্ণত পরাস্ত-পর্যুদস্ত করার সামগ্রিক পরিকল্পনাটি ত্রিশক্তি ঘোষণাপত্রে এইভাবে বিবৃত হয়েছিল:

তেহেরান। ১৯৪৩

'স্থলে জার্মানদের বাহিনীগুলোকে, সাগরে তাদের ইউ-বোটগুলোকে এবং আকাশ থেকে তাদের যুদ্ধ শিল্পের কারখানাগুলোকে আমরা বিনষ্ট করব — সেটা পৃথিবীতে কোন শক্তি রোধ করতে পারবে না। আমাদের আক্রমণ হবে কঠোর এবং ক্রমবর্ধমান।'

বেসামরিক জনগণের আত্মোৎসর্গ করা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কল্যাণে ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে লাল ফৌজের ভারি কামান, ট্যাঙ্ক আর বিমান ছিল জার্মানদের চেয়ে বেশি। তবু, জার্মান বাহিনী তখনও খুবই শক্তিশালী ছিল: ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল অবধিও জার্মানি তার যুদ্ধ শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছিল। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে তাদের ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ সৈনিক আর অফিসার — তারা প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। জার্মানি আর তার মিত্রদের প্রধান সামরিক শক্তিটা — মোটামুটি ৭০ শতাংশ — তখনও ছিল সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্রে। তখনও

সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টই ছিল প্রধান এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন যুদ্ধক্ষেত্র।

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ফৌজ কতকগুলো বড়রকমের আক্রমণ-অভিযান চালিয়েছিল। শত্রুর ফৌজ ১৯৪১ সালের শরৎকাল থেকে গেড়ে বসে লেনিনগ্রাদ অবরোধ করেছিল — সেখানে তাদের পরাজয়টা হল সোভিয়েত ফৌজের জয়ের পথে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে বহু জীবন বলি দিয়ে সোভিয়েত ফৌজ পাঁচ-ছ'মাইল চওড়া একটা সংকীর্ণ ভূখণ্ড দখল করতে পেরেছিল — সেটা হল অবশেষে লাদোগা হ্রদের দক্ষিণে শহরে যাবার স্থলপথ। এটা হল নগরীটিকে রক্ষা করার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কিন্তু তার ফলে অবরোধের অবসান ঘটল না কোনক্রমেই। শহরের বসত মহল্লাগুলোতে জার্মান কামানশ্রেণীর গোলাবর্ষণ চলতেই থাকল সমানে। জেনারেল কিউখলেরের অধীন 'উত্তর' জার্মান আর্মি গ্রুপ নগরীর ঠিক প্রান্তেই ধাতু, কনক্রিট আর পাথর দিয়ে সুরক্ষিত বহু প্রতিরোধকেন্দ্র গ'ড়ে শক্তিশালী আত্মরক্ষাব্যবস্থা স্থাপন করেছিল। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষার জন্যে তারা রেলপথের বাঁধ, জাঙাল, খাল, পাথরের বাড়ি, এই সবই ব্যবহার করেছিল। এই রক্ষাব্যূহটাকে জার্মানরা বলত 'উত্তরী প্রাচীর', 'ইস্পাত বলয়'।

জার্মানদের এতসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও, জেনারেল গোভরভ এবং জেনারেল মেরেৎস্কভের পরিচালিত লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্ট আর ভল্খভ ফ্রণ্টের সৈন্যদলগুলি ১৪ই জানুয়ারি আরম্ভ করা আক্রমণ-অভিযানে শত্রুর রক্ষাব্যূহগুলো ভেঙে এগিয়ে গিয়েছিল। নিদারুণ দুর্ভোগ আর দুর্গতি এনেছিল সেই ৯০০ দিনের অবরোধ — সেটা অবশেষে ভেঙে গেল।

ইতোমধ্যে, ফ্রণ্টের দক্ষিণ ভাগে জেনারেল কোনেভ এবং জেনারেল ভাতুতিনের ফৌজ শত্রুর উপর দুঃসাহসিক আঘাত

হেনে হেনে শেষে কিয়েভের দক্ষিণে কর্সুন-শেভচেঙকভ্স্কির কাছে একটা প্রকাণ্ড জার্মান বাহিনীকে ঘেরাও করে খতম করে দিয়েছিল। শত্রুর হতাহত আর বন্দী হয়েছিল ৭০ হাজার জনের বেশি। তখন বসন্তের ঢল নেমে গিয়েছিল, — খরস্রোতা আর আধা-গলা বরফে ভরা অসংখ্য ছোট-বড় নদী পার হতে হয়েছিল সোভিয়েত সৈনিকদের, কিন্তু সেই কঠোর অবস্থার মধ্যেই তারা ইউক্রেন আর মোলদাভিয়ার ভিতর দিয়ে আরও পশ্চিমে এগিয়ে যেতে পেরেছিল। আঙুরের খেতে ভরা কাছাকাছি পাহাড় থেকে ২৬এ মার্চ আগুয়ান ইউনিটগুলির দৃষ্টিগোচর হল প্রশস্ত প্রুৎ নদী। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত পড়েছে এই নদী বরাবর।

এপ্রিল মাসের গোড়ায় কামানশ্রেণী গর্জে উঠল ক্রিমিয়ায়। ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে মুক্ত করতে এগোল জেনারেল ইয়েরেমেঙ্কো আর জেনারেল তোলবুখিনের বাহিনী এবং অ্যাডমিরাল ওক্তিয়াব্র্স্কির অধীন কৃষ্ণ-সাগরীয় নৌবহর আর অ্যাডমিরাল গোর্শকভের অধীন আজোভ সাগরের ফ্লোটিলার জাহাজগুলি। কয়েক দিনের মধ্যেই ক্রিমিয়া উপদ্বীপের প্রধান অংশটা তাদের হাতে এসে গিয়েছিল, আর শত্রু বাহিনীগুলো রক্ষাব্যূহ তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল সেভাস্তপোলে। আদ্যোপান্ত প্রস্তুতির পরে সোভিয়েত ফৌজের চূড়ান্ত আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল। ৭ই মে ভয়ানক লড়াই চলেছিল সেভাস্তপোলের প্রবেশপথে সাপুন পাহাড়ের জন্যে: জার্মানদের এই প্রধান প্রতিরোধ-ঘাঁটিটা ছয়-স্তরের ট্রেঞ্চ, মাইনক্ষেত্র এবং কয়েক সারি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের মতো গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে সোভিয়েত সৈনিকেরা এগিয়ে গিয়েছিল লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে। প্রথম প্রথম পতাকাবাহীরা সমরশায়ী হয়েছিলেন, কিন্তু সে পতাকা তুলে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্যান্য সৈনিকেরা। দিনের

শেষেই সেসব পতাকা উড়েছিল সাপ্‌ন পাহাড়ের শীর্ষে। সেভাস্তপোলের অবরোধ শেষ হয়েছিল ৯ই মে।

সোভিয়েত ফৌজের অর্জিত সাফল্যগ্‌লি থেকে অবিসংবাদিতভাবে প্রদর্শিত হল যে, নাৎসী জার্মানির চরম পরাজয় তখন আর বেশি দ্‌রে ছিল না, তেমনি, সম্প্‌র্ণতই নিজস্ব সংগতি-সংস্থানের উপর নির্ভর করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই পরাজয় ঘটাতে এবং ইউরোপের পদানত জাতিগ্‌লিকে ম্‌ক্ত করতে পারে। কেবল তখনই মার্কিন য্‌ক্তরাষ্ট্র এবং ব্‌টেনের রাজনীতিক আর সামরিক নেতারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার ব্যাপারে আর দীর্ঘস্‌ত্রতা না-করতে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। জেনারেল আইজেনহাওয়ারের পরিচালনায় ব্‌টিশ আর মার্কিন ফৌজ নরমাণ্ডিতে (উত্তর ফ্রান্স) অবতরণ করল ৬ই জ্‌ন তারিখে। শরৎকাল নাগাত তারা ফরাসী প্রতিরোধ-শক্তির সাহায্যে জার্মান ফৌজকে খেদিয়ে দিতে পারল ফ্রান্স থেকে এবং তারপরে বেলজিয়ম, ল্‌ক্সেমব্‌র্গ এবং হল্যাণ্ডের বেশ একটা অংশ থেকে। তারা প্রায় ৯০টা জার্মান ডিভিশনের সম্ম্‌খীন হয়েছিল, আর সেই সময়ে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে ২২৮টা জার্মান আর তাঁবেদারদের ডিভিশন এবং ২২টা ব্রিগেড।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত আক্রমণ-অভিযান অতি দ্‌র্বার গতিতে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছিল। উত্তর-পশ্চিমে একটা ব্‌হদায়তনের অভিযানে সোভিয়েত ফৌজ দ্‌ঢ়ভাবে স্‌রক্ষিত ‘মানেরহেইম লাইন’ ভেঙে এগিয়ে ফিনল্যাণ্ডের ফৌজকে পরাস্ত করল। তখন ফিনল্যাণ্ড য্‌দ্ধবিরতি চাইল, — ঐ ফ্রণ্টে য্‌দ্ধবিগ্রহ শেষ হল ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

য্‌দ্ধের ঐ পর্বের একটা বড়রকমের সামরিক ক্রিয়াকলাপ হল ১৯৪৪ সালের জ্‌লাই-অগস্ট মাসে বেলোর্‌শিয়ায় আক্রমণ-অভিযান। এখানে ফ্রণ্ট ছিল প্রায় ৩৭০ মাইল। বাগ্রামিয়ান,

চের্নিয়াখভ্স্কি, জাখারভ এবং রকোসভ্স্কি, এই চার জন জেনারেলের পরিচালিত সোভিয়েত সৈন্যদলগুলি একটা শক্তিশালী জার্মান বাহিনীকে খতম করল — সেটা হল ফীল্ড-মার্শাল মোদেলের অধীন 'মধ্য' আর্মি গ্রুপ। সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্রে গড়া জেনারেল বের্লিংয়ের অধীন প্রথম পোলীয় আর্মি এই যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিল। শত্রুর ৫,৪০,০০০ সৈনিক খোয়া গিয়েছিল। ঐ সময় নাগাত গোটা বেলোরুশিয়া এবং লিথুয়ানিয়ার একটা বড় অংশ মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই জয়ের পরে সোভিয়েত ফৌজ ঢুকেছিল পোল্যাণ্ডে।

ঐ বছর গ্রীষ্মে আর শরতে লাল ফৌজ তিনটি বল্টিক প্রজাতন্ত্রকেই মুক্ত করেছিল; অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ইয়াসি-কিশিনেভের যুদ্ধবিগ্রহে সাফল্যের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল। জেনারেল মালিনভ্স্কি এবং জেনারেল তোল্বুখিনের পরিচালিত ফৌজ ইয়াসি-কিশিনেভ এলাকায় ২২টা জার্মান ডিভিশনকে ঘেরাও করে বিধ্বস্ত করেছিল, তার ফলে গোটা মোলদাভিয়াকে মুক্ত করে তারা রুমানিয়ার অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়ার অবাধ রাস্তা পেয়ে গেল। ২৩এ অগস্ট তারিখে রুমানিয়ার ফাশিস্তবিরোধী শক্তিগুলি আন্তোনেস্কুর ফাশিস্ত একনায়কত্ব উচ্ছেদ করল, তার স্থলাভিষিক্ত নতুন রুমানীয় সরকার নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল।

রুমানিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়ে সোভিয়েত বাহিনীগুলি ঢুকল বুলগেরিয়ায়। গেওর্গি দিমিত্রভের পরিচালনায় বুলগেরিয়ার কমিউনিস্টরা যে জন-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল, সেটা তার থেকে নতুন প্রেরণা পেল। বুলগেরীয় পার্টিজান ডিট্যাচমেণ্টগুলি পর্বত থেকে নেমে এসে শহরের পরে শহর আর গ্রামের পরে গ্রাম দখল করতে থাকল। ৯ই সেপ্টেম্বর সোফিয়া রেডিও জানাল, অভ্যুত্থান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, কায়েম হয়েছে 'পিতৃভূমি ফ্রণ্টের'

সরকার। ব্লগেরিয়াও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল।

যুগোস্লাভিয়ার বৈপ্লবিক সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত অনুসারে ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েত পদাতিক রেজিমেণ্টগুলি যুগোস্লাভ সামরিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হল দানিউব উপত্যকায়। তিন বছরের বেশি কাল ধরে যুগোস্লাভিয়ায় জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন দখলদার জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিল; কমিউনিস্টদের পরিচালনায় মেহনতী জনগণ বেশকিছু সাফল্য অর্জন করেছিল। তবু, যুগোস্লাভিয়ায় চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন অবস্থানগুলো তখনও ছিল জার্মান ফৌজের হাতে, — জার্মানদের শেষ প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্যে সোভিয়েত বাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। পাহাড়ে-পর্বতে লড়াই চালিয়ে এবং দানিউব আর মোরাভা এই দুটো গভীর নদী পার হয়ে সোভিয়েত ডিভিশনগুলি ইওসিপ তিতোর পরিচালিত যুগোস্লাভ জাতীয় মুক্তিফৌজের ইউনিটগুলির পাশাপাশি এগোল বেলগ্রেডের দিকে — এই রাজধানী শহর মুক্ত হল ২০এ সেপ্টেম্বর।

ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডে ঘটছিল বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনা। আক্রমণ-অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালাচ্ছিল পোল্যাণ্ডের জনগণ। পোল্যাণ্ডের শ্রমিকেরা নিজেদের বিভিন্ন সশস্ত্র ডিট্যাচমেণ্ট এবং গুপ্ত রাজক্ষমতা সংস্থা স্থাপন করেছিল। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে পূর্ব পোল্যাণ্ড মুক্ত হবার পরে 'ক্রাইওভা রাদা নারোদভা' (জাতীয় পরিষদ) স্থাপন করেছিল 'পোল্যাণ্ডের জাতীয়-মুক্তি কমিটি' — এই কমিটি পরে পুনর্গঠিত হয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে। বিভিন্ন প্রগতিশীল পার্টি এবং সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছিল এই কমিটিতে। জনগণের মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে দৃঢ়মূল এই প্রধান নির্বাহী সংস্থাটির ঘনিষ্ঠ জনসংযোগ ছিল। তবে, ঐ একই সময়ে ছিল আর-একটা পোলীয় সরকার — লণ্ডনে প্রবাসী সরকার।

লণ্ডনে অবস্থিত এই সরকার পোল্যাণ্ডে নিজস্ব গুপ্ত সামরিক শক্তি গড়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থীরা, তারা ফাশিস্তবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রসার ব্যাহত করছিল, তারা শক্তি জমিয়ে রাখছিল পরেকার কোন সময়ের জন্যে। 'সোভিয়েত সৈনিক আর পোল্যাণ্ডের পার্টিজানরা জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রক্তক্ষয় করুক। ওরা জার্মানদের খেদিয়ে দিলে আমরা এগিয়ে আসব ক্ষমতা হাতে নিতে — তখন আমরা থাকব তাজা, আমাদের শক্তি থাকবে অক্ষুণ্ণ' — এমনই ছিল ঐ প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিকদের চিন্তাধারা।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে তারা স্থির করল, সময় হয়েছে: সোভিয়েত বাহিনী তখন পোল্যাণ্ডে ঢুকে এগোচ্ছিল ওয়ারসর দিকে। ১লা অগস্ট তারিখে লণ্ডনের প্রবাসী সরকারের তরফে জেনারেল বুর-কমারভ্স্কি ওয়ারসয় অভ্যুত্থানের জন্যে হুকুম জারি করলেন। এই অভ্যুত্থান সংগঠিত করার পিছনে আসল মতলবটা কী, সে-সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের রাজধানীর মানুষের কোন ধারণা ছিল না — তারা শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শুরু করল। তারা লড়ল দু'মাস ধরে, কিন্তু তাদের পথে বাধা-বিপত্তি ছিল বড় বেশি। হিটলারের বিশেষ-নির্দিষ্ট হুকুম অনুসারে জার্মানরা বিমান আর কামান থেকে বোমা-গোলা বর্ষণ করে রাজধানী শহরটিকে ধূলিসাৎ করে দিল, নৃশংসভাবে হত্যা করল ওয়ারসর মানুষকে। ওয়ারসর এই মর্মন্তুদ ঘটনায় পোল্যাণ্ডের প্রায় দুই লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাল।

অভ্যুত্থানের বিষয়ে জেনারেল বুর্-কমারভ্স্কি সর্বোচ্চ সোভিয়েত কম্যাণ্ডের সঙ্গে পরিকল্পনা মিলিয়ে নেন নি, এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে তিনি কিছু জানানও নি — তবু, বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যে সোভিয়েত ফৌজ সাধ্যায়ত্ত সবকিছুই করেছিল। সোভিয়েত বিমান থেকে জার্মান

অবস্থানগুলোর উপর বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল, বিমান থেকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ আর চিকিৎসার উপকরণ নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিদ্রোহীদের জন্যে। সামরিক পরিস্থিতিটা চূড়ান্ত মাত্রায় জটিল থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত ডিভিশনগুলি লড়তে লড়তে এগোচ্ছিল। চল্লিশ দিনের মধ্যে এই অভিযানে কোন ক্ষান্তি ছিল না, সোভিয়েত বাহিনী লড়তে লড়তে এগিয়েছিল ৩৫০ থেকে ৫০০ মাইল, তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, সংভরণ আর কামানশ্রেণীর ইউনিটগুলি তখনও তাদের নাগাল ধরতে পারে নি। পদাতিক বাহিনীর গোলাগুলির ঘাটতি ছিল ভীষণ, ট্যাংকগুলির জালানি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাদের জন্যে বিমানবাহিনীর মদত তখনও পোল্যাণ্ডের নতুন বিমানক্ষেত্রগুলোতে পুনর্বিন্যস্ত হবার সুযোগ পায় নি। অন্যদিকে, জার্মান হাইকম্যান্ড ওয়ারসর প্রবেশপথে ভিস্তুলা নদীর পাড় বরাবর শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে ফেলেছিল, ঐ এলাকায় তারা নতুন নতুন সৈন্য আমদানি করেছিল, কতকগুলো পালটা-আক্রমণও চালিয়েছিল। এইসব কারণে সোভিয়েত বাহিনী তখন ওয়ারসয় ঢুকে পড়তে পারে নি। তাদের বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল; ১৯৪৪ সালের অগস্ট মাসে আর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে ১ম বেলোরুশী ফ্রণ্টের ১,৬৬,০০০ সৈনিক পোল্যাণ্ডে হতাহত হয়েছিল, কেবল অগস্ট মাসেই ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের এক লক্ষ বাইশ হাজারের বেশি সৈনিক হতাহত হয়েছিল, — তারা শেষপর্যন্ত আত্মরক্ষামূলক রণকৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। লড়াইয়ের ঐ পর্বে নতুন আক্রমণ-অভিযানের প্রস্তুতির জন্যে অনেক সময় দরকার ছিল।

১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক বড় বড় জয় হয়েছিল — এই বছরের শেষাশেষি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র রাজ্যক্ষেত্রই নাৎসী কবল থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল (কেবল

মস্কোয় জার্মান যুদ্ধবন্দীরা। ১৯৪৪

পশ্চিম লাতভিয়ায় শুধু একটা অবশিষ্ট অবরুদ্ধ জার্মান বাহিনী সমুদ্রের ধারে টিকে ছিল যুদ্ধের একেবারে শেষ অবধি)।

মুক্তিদাতার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সোভিয়েত ফৌজ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি দেশ থেকে ফাশিস্তদের খেদিয়ে দিয়েছিল। ফাশিস্ত জোটটা কার্যত ভেঙেই গিয়েছিল।

এইসব জয় লাভ করতে সোভিয়েত ফৌজের বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। শত্রুর প্রতিরোধ ছিল খুবই কঠিন। ফাশিস্ত প্রচার বেশির ভাগ জার্মান সৈনিক এবং অফিসারদের প্রত্যয় জন্মাতে পেরেছিল যে, জার্মানি পরাস্ত হলে সোভিয়েত ভূমিতে তারা যে-ধ্বংসকাণ্ড আর হিংস্রতা চালিয়েছে তার প্রতিহিংসায় তাদের একেবারে প্রত্যেককেই খতম করা হবে। ফাশিস্তরা ইতোমধ্যে সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টায় তাদের সন্ত্রাসের রাজটাকে অভূতপূর্ব চরম মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ চূড়ান্ত বিজয়, ফাশিবাদকে নিশ্চিহ্ন করা এবং হিটলারের অত্যাচার থেকে ইউরোপের জাতিগুলিকে মুক্ত করার জন্যে সোভিয়েত বাহিনীর সংকল্পের দৃঢ়তা, আর, অন্যদিকে, অবধারিত বিনাশের মুখে ফাশিস্ত বাহিনীর নৃশংসতা — কী সুতীব্র বৈসাদৃশ্য! এরই থেকে বোঝা যায়, যেমন যুদ্ধের গোড়ার দিকে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে, তেমনি পরে আক্রমণ-অভিযানে সোভিয়েত সৈনিকেরা অমন বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারল কেন। বহু ক্ষেত্রে সোভিয়েত সৈনিকেরা শত্রুর মেশিনগানের স্লিট আটকে দিয়েছে নিজেদের দেহ দিয়ে (এমন একটি বীরকীর্তি করেছিলেন সাধারণ সৈনিক আলেক্সান্দর মাত্রোসভ), কিংবা নিজেদের জীবন দিয়ে শত্রুর ট্যাংক আর কামানশ্রেণী উড়িয়ে দিয়েছে। পদাতিক আর স্যাপার, ট্যাংকের কর্মিদল আর পাইলট, গোলন্দাজ আর নাবিক — সোভিয়েত ফৌজের সমস্ত শাখার প্রতিনিধিদের আত্মোৎসর্গ-করা অসংখ্য অসাধারণ অবিস্মরণীয় বীরকীর্তি দিয়ে ভরা রয়েছে যুদ্ধের ইতিহাস।

যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্ব

আক্রমণকারীরা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত-পর্যুদস্ত হল — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১৯৪৫ সালে। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে লড়াই অতি সুকঠোর ছিল একেবারে শেষ অবধিই। শেষের লড়াইগুলোও ছিল আগেকার লড়াইগুলোরই মতো প্রচণ্ড, হিংস্র, সেগুলিতে উভয় পক্ষে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক সোভিয়েত আক্রমণ-অভিযান শুরু হয়েছিল জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে। গোড়ায় যা পরিকল্পনা ছিল তার চেয়ে কয়েক দিন আগেই এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল — পশ্চিমী ফ্রন্টে বৃটিশ আর মার্কিন ফৌজের

অবস্থায় আনুকূল্য করার জন্যে; ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আর্দেন্নেসে (বেলজিয়ম) তারা ফীল্ড-মার্শাল মোদেলের অধীন ২৫টা ডিভিশনের চাপে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে ৬ই জানুয়ারি চার্চিল স্তালিনকে জানিয়েছিলেন, 'পশ্চিমে লড়াইটা বড় প্রচণ্ড', এই বলে তিনি মিত্রদের জন্যে সাহায্য চেয়েছিলেন। স্তালিন অবিলম্বে তার উত্তরে জানিয়েছিলেন: 'পশ্চিমী ফ্রণ্টে আমাদের মিত্রদের অবস্থান বিবেচনা ক'রে সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের মূল সদরঘাঁটি সিদ্ধান্ত করেছে যে, প্রস্তুতি শেষ করে... সমগ্র মধ্য ফ্রণ্ট বরাবর বৃহদায়তনের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করা হবে...'

এই উদ্যোগী আক্রমণ-অভিযান চালানো হয়েছিল অভূতপূর্ব পরিসরে। বল্টিক থেকে কার্পাথিয়া অবধি বিস্তৃত ৮০০ মাইলের ফ্রণ্টে মোটামুটি যুগপৎই চালানো হয়েছিল এই অভিযান। জুকভ, কোনেভ, রকোসভ্স্কি এবং চের্নিয়াখভ্স্কি, এই চার জেনারেলের পরিচালিত সোভিয়েত ফৌজ নির্মম-ক্ষান্তিহীনভাবে দ্রুত পশ্চিমে এগিয়ে ১৭ই জানুয়ারি তারিখে ওয়ারস মুক্ত করেছিল।

যুদ্ধে-বিধ্বস্ত পোল্যাণ্ডে ফাশিস্ত যুদ্ধাপরাধের নতুন নতুন অকাট্য প্রমাণ পেল সোভিয়েত বাহিনী। অস্ভেন্ৎসিম শহরের ঠিক বাইরে একটা বন্দিশিবিরে ঢুকে সোভিয়েত সৈনিকেরা অবিশ্বাস্য রকমের সব বিভীষিকার সম্মুখীন হয়েছিল। গ্যাস কুঠরিগুলোকে নষ্ট করে যাবার সময় পায় নি নাৎসীরা — তারা সেখানে প্রতিদিন হাজার-দশেক মানুষকে বধ করত। যে-দাহনচুল্লিতে তারা লাসগুলিকে পোড়াত সেটা তখনও গরম ছিল। গুদামঘরগুলোয় অযুত-অযুত নারীর মাথা থেকে নেওয়া চুল ছিল সাত টন, মানুষের হাড়ের গুঁড়ো ভরতি পিপে ছিল বহু — এসবই ছিল জার্মানিতে চালান করার জন্যে। ১৯৪০ সালের মে

মাস থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি সময়ে নাৎসীরা এই ‘অস্‌ভেনৎসিম’ মৃত্যু-শিবিরে হত্যা করেছিল চল্লিশ লক্ষর বেশি মানুষকে — তাদের মধ্যে ছিল বহু সোভিয়েত নাগরিক।

পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করে সোভিয়েত বাহিনী সীমান্ত পার হয়ে গিয়েছিল জার্মানির বিভিন্ন অংশে — পূর্ব প্রাশিয়ায়, পোমেরানিয়ায়, সাইলেসিয়ায়। জেনারেল মালিনভ্‌স্কি এবং জেনারেল তোল্‌বুখিনের পরিচালিত অন্যান্য সোভিয়েত বাহিনী বুদাপেস্ট মুক্ত করে চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং অস্ট্রিয়ায় গিয়ে ব্রাতিস্লাভা এবং ভিয়েনাকে মুক্ত করেছিল।

এই অগ্রগতি রুখবার জন্যে জার্মান হাইকম্যাণ্ড পালটা-আক্রমণ চালিয়ে, পশ্চিম ফ্রণ্ট থেকে পুবে নতুন নতুন ডিভিশন পাঠিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে বৃটিশ আর মার্কিন ফৌজ পশ্চিমে আক্রমণ-অভিযান শুরু করবার সময়ে তারা সুইজারল্যাণ্ড থেকে উত্তর সাগর অবধি বিস্তৃত ফ্রণ্টে ছড়ানো মাত্র ৩৫টা উন-লোকবলের ডিভিশনের সম্মুখীন হয়েছিল। মিত্র শক্তিগুলি অচিরেই সবলে রাইন্‌ নদী পার হয়ে জার্মানির অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়েছিল দ্রুত।

এই পর্বে চলছিল যুদ্ধের শেষ লড়াইগুলি। নাৎসী জার্মানির চূড়ান্ত পরাস্ত-পর্যুদস্ত হবার দিন ঘনিয়ে এল। যেসব সোভিয়েত বাহিনী ওদের আর নেইসে নদী পার হয়ে এসেছিল তারা তখন চূড়ান্ত মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত – সেটা হল বার্লিন দখল করা, বার্লিন তখন ৪০-৫০ মাইল দূরে।

নাৎসীদের পরাজয় তখন আসন্ন — তবু, তাদের নেতারা অর্থহীন প্রতিরোধ চালাতে থাকে। যুদ্ধটাকে বিলম্বিত করে তারা শুধু জার্মান জনগণের আরও ক্ষয়-ক্ষতি আর দুর্গতিই বাড়াচ্ছিল। বার্লিনে শক্তিশালী রক্ষাব্যবস্থা ছিল আগে থেকেই, তার মধ্যে প্রায় ১০০ ফুট গভীরে বহু বাংকার, তার উপর সৈনিক

আর বেসামরিক নাগরিকদের লাগিয়ে তারা গড়তে থাকল সব ট্রেঞ্চ, ব্যারিকেড আর পিল্-বক্স। বসতবাড়িগুলোকে তারা কামান স্থাপনের মঞ্চে পরিণত করতে থাকল।

তারা কাজে লাগাল বৃদ্ধদের এবং তরুণদের, তাদের অনেকেই তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের। হিটলারের হুকুম ছিল, 'শেষ মানুষটা আর শেষ বার ছুঁড়বার গোলাগুলি থাকা অবধি প্রতিরোধ', এর পিছনকার নিদারুণ অশুভ সত্যটা ফুটে উঠেছিল তার একখানা শেষের ফোটোতে। এই ফোটোতে হিটলারের গাল বসে গেছে, কাঁধ কুঁজো, তার কোটের কলার উলটানো, চুড়োওয়ালা টুপিটা চোখের উপর নামানো — তার সামনে 'ফোল্ক্স্স্টুর্মের' উর্দি পরা বিশৃঙ্খল এক-সারি ছেলে। ফাশিস্ত একনায়ক তার নিজের সর্বনাশে একটু বিলম্ব ঘটাবার জন্যে এই ছেলেগুলিকে বলি দিতে মনস্থ করেছিল।

১৫ই এপ্রিল রাত্রে বার্লিনের পূবে জার্মান অবস্থানের উপর ফেটে পড়ল গোলার রীতিমতো একটা ধস। কামানশ্রেণীর এই অগ্নিবর্ষণের পরে জ্বলে উঠল বহুসংখ্যক সার্চলাইট, — রাতের অন্ধকার চেরা সেই চোখ-ধাঁধানো আলোর মধ্যে এগিয়ে চলল সোভিয়েত ট্যাংক আর পদাতিক বাহিনী। এই হল বার্লিনে আক্রমণ-অভিযানের শুরু। জার্মানির রাজধানীতে চলল মার্শাল জুকভের বাহিনী; তার একাংশ শহরের উপর এসে পড়তে থাকল উত্তর দিক থেকে: লড়তে হল প্রত্যেকটা সুরক্ষিত ঘাঁটির জন্যে, সারা রাস্তায় লড়াই হল প্রচণ্ড। মার্শাল কোনেভের বাহিনী বার্লিনে আসছিল দক্ষিণ দিক থেকে। ২৫এ এপ্রিলের মধ্যে বেষ্টনীটা ষোল-কলা পূর্ণ হল — কিন্তু নাৎসী নেতারা তখনও প্রতিরোধ থামাতে চায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে মতভেদ শেষ মুহূর্তে উদ্ধার পাবার উপায় হবে বলে তারা আশা করেছিল।

খাস বার্লিনে লড়াই চলেছিল দশ দিন ধরে — তাতে উভয় পক্ষে হতাহত হয়েছিল বহু। এই লড়াইয়ের মধ্যে অসংখ্য ইমারত ধ্বংস হয়েছিল। বার্লিনের একেবারে কেন্দ্রেই লড়াই হয়েছিল সবচেয়ে প্রচণ্ড — সেখানে সোভিয়েত সৈনিকেরা দখল করেছিল প্রধান সরকারী ভবনগুলি, যেখানে হিটলার লুকিয়ে ছিল সেই রাইখ্‌স্‌কানৎস্‌লাই, আর রাইখ্‌স্টাগ। ৩০এ এপ্রিল রাত্রে রাইখ্‌স্টাগের উপরে লাল ঝাণ্ডা — বিজয় পতাকা — উড়ালেন সার্জেণ্ট ইয়েগোরভ এবং সাধারণ সৈনিক কান্তারিয়া।

'জয়। রাইখ্‌স্টাগ আমাদের দখলে!'

তার কয়েক ঘণ্টা আগে রাইখ্‌স্‌কানৎস্‌লাইয়ের তলায় একটা বহু-তলা বাঙ্কারে ফাশিস্ত জার্মানির ফিউরের আত্মহত্যা করেছিল। বার্লিন গ্যারিসনের একেবারে মনোবল-ভাঙা অবশেষগুলো আত্মসমর্পণ করতে থাকল। বাঙ্কার আর বিধ্বস্ত বাড়িগুলো থেকে দলে দলে জার্মান সৈনিক শাদা নিশান তুলে বেরিয়ে এল বার্লিনের রাস্তায়-রাস্তায়।

চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ্‌কে মুক্ত করার জন্যে হয়েছিল ইউরোপে যুদ্ধের শেষ লড়াই। চেকোস্লোভাকিয়ার বেশির ভাগকে সোভিয়েত ফৌজ মুক্ত করেছিল তার আগেই, কিন্তু তখনও মোটামুটি নয় লক্ষ সৈনিকের একটা দুর্দান্ত জার্মান বাহিনী ছিল চেকোস্লোভাক ভূখণ্ডে। ৫ই মে প্রাগে আরম্ভ হল ফাশিস্তবিরোধী জন-অভ্যুত্থান, আর জার্মান কম্যাণ্ড পিটুনি অভিযান চালাল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। তৎক্ষণাৎ প্রাগ্‌কে সাহায্য করতে পাঠানো হল সোভিয়েত ট্যাঙ্ক বাহিনীকে। দীর্ঘকালের অব্যাহত লড়াইয়ে ট্যাঙ্ক সৈনিকেরা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, বহু ট্যাঙ্কের মেরামতের দরকার ছিল — তবু, চেক্ ভাইদের সাহায্য করার জন্যে তাদের আগ্রহ সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করল। জেনারেল রিবাল্‌কো এবং জেনারেল লেলিউশেঙ্কোর পরিচালিত ট্যাঙ্ক বাহিনী সর্বোচ্চ গতিতে উত্তর থেকে ড্রেসডেন আর আকরিক পর্বত হয়ে চলল প্রাগের দিকে। তারা প্রাগে ঢুকেছিল ৮ই মে তারিখে — পরদিন সকালে চেকোস্লোভাকিয়া ষোল-আনা মুক্ত হয়ে গেল। কার্পাথিয়া পর্বতের দুক্‌লা গিরিদ্বার, স্লোভাকিয়া আর মোরাভিয়া এবং প্রাগের প্রবেশপথগুলিতে লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈনিক আর অফিসার নিহত হয়েছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের বেশি।

১৯৪৫ সালের ৮ই মে বিধিবদ্ধভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। সেদিন বার্লিনের শহরতলি কার্ল্‌স্‌হর্স্টে স্বাক্ষরিত হয়েছিল 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিহিতক'। এই স্বাক্ষর-অনুষ্ঠান হয়েছিল একটা দোতলা বাড়িতে — সেটা আগে ছিল সামরিক ইঞ্জিনিয়রদের একটা বিদ্যালয়ের মেস্‌-বাড়ি। এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের তরফে মার্শাল জুকভ, আর মিত্রদের সশস্ত্র শক্তির তরফে ছিলেন বৃটেনের এয়ার চীফ মার্শাল টেডার, মার্কিন বিমানবাহিনীর

অধিনায়ক জেনারেল স্পাৎস্ এবং ফরাসী বাহিনীর সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়ক জেনারেল দেলাৎর দে তার্সিনি।

'স্থলে জলে আকাশে সমস্ত জার্মান সামরিক শক্তির অবিলম্ব নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বিহিতকে' সই দিয়েছিলেন জার্মানির সশস্ত্র শক্তির তিন জন অধিনায়ক — ফীল্ড-মার্শাল কাইটেল, অ্যাডমিরাল ফ্রিদেবুর্গ এবং কর্নেল-জেনারেল শ্তুম্ফ্।

পরদিন সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্যাপিত হল 'বিজয় দিবস'। যুদ্ধ শেষ! — তাই আনন্দ প্রকাশ করার জন্যে সমস্ত শহরে আর গ্রামে সোভিয়েত দেশের মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ১,৪১৮ দিন ধরে সোভিয়েত নারী-পুরুষেরা ফ্রণ্টে আর বেসামরিক পশ্চাদভাগে সহ্য করেছে কঠোর দুর্দশা, তারা লড়েছে আর কাজ করেছে, বিপত্তি আর পরাজয়ের নিদারুণ দিনগুলোতেও তারা কখনও ভগ্নহৃদয় হয় নি, বিজয়ের জন্যে কর্মপ্রচেষ্টায় তারা লেশমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নি। যুদ্ধে প্রিয়জনকে হারায় নি, এমন পরিবার সোভিয়েত দেশে নেই বললেই চলে। তাই, প্রত্যেকের আনন্দ আরও বেশি, কেননা তারা দেখল এত আত্মবলিদান বৃথা যায় নি: চূড়ান্ত বিজয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হলেও, তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকূলের বাইরে তখনও লড়াই চলছিল একদিকে জাপান এবং অন্যদিকে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং তাদের মিত্রদের বাহিনীগুলোর মধ্যে। ১৯৪৫ সাল নাগাত জাপানের কতকগুলো গুরুতর পরাজয় ঘটলেও, তখনও জাপানের শক্তিশালী স্থলবাহিনী ছিল। জাপানের নেতারা যুদ্ধটাকে বিলম্বিত করে আপসের শান্তি পাবার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৪৫ সাল অবধি সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। তবে, সাম্রাজ্যবাদী জাপান বহু বছর যাবত সোভিয়েত ইউনিয়নের

বিরুদ্ধে বৈরকার কর্মনীতি নিয়ে চলছিল। মাঞ্চুরিয়া দখল করে নিয়ে জাপানী সমরবাদীরা সেখানে প্রকাণ্ড বাহিনী মোতায়েন ক'রে দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সীমান্তে সমানে সামরিক সংঘর্ষ উসকাচ্ছিল। দূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত নির্গম-পথ জাপান বস্তুত রোধ করে রেখেছিল। জাপানী জেনারেল স্টাফ তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিল। এইসব কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এই আগ্রাসনের উৎপত্তিস্থল জাপানী সমরবাদের বিলুপ্তি ঘটাতে আগ্রহান্বিত ছিল। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটাতে, বিশ্বব্যাপী শান্তি স্থাপন করতে এবং এই পথে মানবজাতির দুর্গতি-দুর্দশার অবসান ঘটাতে, জার্মান ফাশিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থক মিত্রদের সাহায্য করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্‌গ্রীব ছিল।

এইসব কারণেই ১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্‌তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ত্রিশক্তি সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিল — সেটা জার্মানির আত্মসমর্পণের মাত্র দু'-তিন মাস পরেই; ইয়াল্‌তা সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি ছিলেন ঐসব সরকারের প্রধানেরা — স্তালিন, চার্চিল এবং রুজভেল্ট। এই তিন নেতার স্বাক্ষরিত একটা বিশেষ চুক্তিতে কড়ার ছিল যে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় কাছ থেকে কেড়ে- নেওয়া সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নির্গম-পথের সংরক্ষণকর কুরিল দ্বীপপুঞ্জ সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রত্যর্পণ করা হবে।

১৯৪৫ সালে ৮ই অগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিল। ঐদিন রাত্রে ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ ফ্রণ্ট বরাবর পনর লক্ষর বেশি সোভিয়েত সৈনিক আক্রমণ-অভিযান

শুরু করেছিল। এই লড়াই পরিচালনা করেছিলেন মার্শাল ভাসিলেভ্স্কি, — কয়েক বছর ধরে মজবুত করে তোলা শত্রুর শক্তিশালী সুরক্ষিত অবস্থানগুলোকে ভেঙে এগিয়ে গিয়েছিল তাঁর সৈনিকেরা। কয়েক দিনের মধ্যেই সোভিয়েত সৈনিকেরা কোয়াণ্টুং আর্মির প্রধান সৈন্যদলগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল। কয়েকটা গভীর নদী পাড়ি দিয়ে, বিভিন্ন শৈলশিরা আর মরুভূমি পার হয়ে তারা শত শত মাইল পথ অতিক্রম করেছিল, তারা মুক্ত করেছিল উত্তর-পূব চীনের বিশাল রাজ্যক্ষেত্র এবং উত্তর কোরিয়া।

সৈনিক আর বেসামরিক নাগরিক সবাই আসন্ন বিজয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কথা ভেবে তখন মহা উল্লসিত, এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটল, যা মানবজাতির ইতিহাসে একটা মহা কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিয়েছে। ৬ই অগস্ট সকালে দুখানা মার্কিন ‘বি-২৯’ বোমারু বিমান দেখা দিল জাপানের হিরোশিমা শহরের আকাশে, সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে তার একখানা বিমান প্যারাশুটে করে একটা বোমা নামিয়ে দিল, কয়েক মিনিট পরে ঘটল বিস্ফোরণ, ছুটল চোখ-ধাঁধানো আলোকশিখা, শহরের আকাশে ফুলে উঠল একটা বিশাল ভীমদর্শন মেঘের কুণ্ডলী। তিন দিন পরে, ৯ই অগস্ট আর একটা অ্যাটমবোমা ফেলা হল নাগাসাকি শহরে। এই দুটো বোমার বিস্ফোরণে মারা গেল আর অক্ষম-পঙ্গু হয়ে গেল ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার বেসামরিক নাগরিক। সামরিক প্রয়োজনের বিবেচনায় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায় না। এটা হল বেসামরিক জনসাধারণের উপর অমার্জনীয় নৃশংসতার কাজ, আর মার্কিন পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলের কর্মনীতির প্রথম ধাপ।

সোভিয়েত সৈনিকেরা কোরিয়ায় আর মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বাহিনীকে পরাস্ত করার পরে জাপানের আর-কোন আশা-

ভরসাস্থল ছিল না। ২রা সেপ্টেম্বর টোকিও উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'মিসুরি'তে স্বাক্ষরিত হল জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিহিতক। পাঁচ কোটি মানুষের জীবননাশা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল।

এই যুদ্ধে নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আসল ধাক্কাটা সামলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভয়ানক একক লড়াইয়ে শত্রুর বাহিনীগুলোর বেশির ভাগটাকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত ক'রে মানবজাতির উপর ফাশিস্ত দাসত্বের যে-বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল সেটাকে দূর করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা কঠিন সময়ে এসেছিল এই যুদ্ধ, এটা সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার একটা কঠোর অগ্নিপরীক্ষা, সে-পরীক্ষায় প্রকটিত হল সোভিয়েত সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বল আর প্রাণশক্তি, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব।

যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তি আর বেসামরিক জনগণ উভয়েই যে-গণ-পরিসরে বীরত্ব প্রদর্শন করল তাতে ফুটে উঠল সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেম এবং সমাজতান্ত্রিক স্বদেশভূমির প্রতি তাদের গভীর অনুরক্তি। শৌর্যের জন্যে সম্মানচিহ্ন পেয়েছিলেন সত্তর লক্ষর বেশি সোভিয়েত অফিসার আর সৈনিক।

যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে আগ্রাসী শক্তিগুলোর আক্রমণ পরাস্ত করল শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ অবস্থানটাকেও সংহত করে তুলল। এত দীর্ঘকাল যাবত বিপুল প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিল এই যুদ্ধের জন্যে, এতে দেশে ক্ষয়-ক্ষতি আর ধ্বংস হয়েছিল অপরিমেয় — তাই যুদ্ধটা হয়েছিল দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা মস্ত বাধা, তা অনস্বীকার্য। তবে, এত তকলিফ আর ক্ষতি সত্ত্বেও, যুদ্ধের বছরগুলিতে সোভিয়েত সমাজের বনিয়াদ আরও মজবুত হয়ে

উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালকের ভূমিকাটা খুবই স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে গেল, পার্টির কর্তৃত্ব বেড়ে গেল বিপুল মাত্রায়। ফ্রণ্টে আর পশ্চাদভাগে উভয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে আয়াসসাধ্য কাজগুলি সব সময়েই হাতে নিয়েছিল কমিউনিস্টরাই। বহিরাক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে সমরশায়ী হয়েছিলেন তিরিশ লক্ষর বেশি পার্টি সদস্য। প্রতিমাসেই পার্টিতে নতুন সদস্য সমাগম হয়েছিল ব্যাপকতর পরিসরে, ফ্রণ্টে অবস্থা যত বেশি কঠিন হয়ে উঠেছিল; ততই বেশি মানুষ পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধের সমগ্র কালপর্যায়ে পঞ্চাশ লক্ষ জন হয়েছিল প্রার্থী সদস্য, আর পূর্ণ সদস্য হয়েছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ জন।

প্রধান প্রধান লড়াইয়ের প্রাক্কালে হাজার হাজার অফিসার আর সৈনিক পার্টিতে দেওয়া দরখাস্তে লিখে যেত, 'আমি লড়াইয়ে চললাম, কমিউনিস্টদের তালিকায় আমার নাম লেখাতে অনুরোধ জানাচ্ছি',এটা হল কঠোর সংগ্রামের বছরগুলিতে জনগণের পরিচালক পার্টির কর্তৃত্বের একটা প্রত্যয়জনক নিদর্শন।

এই যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের জয় একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন বীরকীর্তি। প্রথম যে-দেশটিতে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয়েছিল সেই স্বদেশভূমির সাফল্যমণ্ডিত প্রতিরক্ষার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত জনগণ পৃথিবীর প্রগতির কেন্দ্রী ঘাঁটিটিকে বজায় রেখে আরও সংহত করে তুলল। ফাশিবাদকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করায় এবং পদানত জাতিগুলিকে মুক্ত করায় সোভিয়েত জনগণ নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করল, এটা সারা পৃথিবীতে মেহনতী জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে প্রবলভাবে সামনে এগিয়ে দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে অভিযান ১৯৪৬—১৯৫৮

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বুনিয়াদী পরিবর্তন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটে গেল। সেগুলির বিশেষক উপাদান হল, শান্তি গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির প্রসার এবং সংহতি, আর পুঁজিতন্ত্রের শক্তিগুলির দুর্বলতাবৃদ্ধি। যুদ্ধের পরে আরম্ভ হল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন — সেটা হল পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার উপর একটা প্রবল আঘাত।

ইউরোপে জার্মান আর ইতালীয় ফাশিস্তদের এবং দূর প্রাচ্যে জাপানী সমরবাদের উপর বিজয়ের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শক্তিগুলির বর্ধিত ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং যুগোস্লাভিয়ার আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক জীবনে বিভিন্ন মূলগত পরিবর্তনের ফলে এইসব দেশে জনগণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা সম্ভব হল। ১৯৪৯ সালে অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হল জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র — এই নতুন রাষ্ট্রটি শুরু থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরল।

কোরিয়া এবং ভিয়েৎনামের এক-একটা অংশেও জনগণতন্ত্র জয়যুক্ত হল: যুদ্ধের অল্প কিছুকাল পরেই প্রতিষ্ঠিত হল

জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্র। চীনে বৈপ্লবিক আন্দোলনে জয়ের ফলে ১৯৪৯ সালে অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত হল চীন গণপ্রজাতন্ত্র।

এইসব জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা। এই নতুন পরিস্থিতিতে শান্তি আন্দোলন এবং প্রগতি আর গণতন্ত্র অগ্রসর করাবার সমস্ত প্রচেষ্টার পক্ষে আরও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘেরা পুঁজিতান্ত্রিক বেষ্টনী হয়ে পড়ল অতীতের ব্যাপার।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনগুলির বিপুল প্রভাব পড়ল পৃথিবীর সমস্যাগুলোর শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ক্ষেত্রে। এইসব সমস্যা নিয়ে যেমন যুদ্ধের সময়ে তেমন বিভিন্ন যুদ্ধোত্তর সভা-সম্মেলনে আলোচনা চলতে থাকল।

বার্লিনের ঠিক বাইরে পট্‌স্‌ডামে তিন বৃহৎ শক্তির সরকার-প্রধানদের বৈঠকটি হল যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলির পটভূমিতে একটা অতীব তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটন। ১৯৪৫ সালে ১৭ই জুলাই থেকে ২রা অগস্ট অবধি অনুষ্ঠিত পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্তালিন, ট্রুম্যান এবং চার্চিল (বৃটিশ পার্লামেণ্ট নির্বাচনের পরে চার্চিলের স্থলে অ্যাটলি)। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং চীন, এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিত্ব অনুসারে একটা স্থায়ী সংস্থা — পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ — স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে, — নাৎসী জার্মানির ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে শান্তি সন্ধিচুক্তির খসড়া রচনা করা, ইউরোপে যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত এবং তখনও অমীমাংসিত বিভিন্ন রাজ্যক্ষেত্র-সংক্রান্ত বিষয় নিয়মনের প্রস্তাব প্রস্তুত করা এবং জার্মানির জন্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার শর্তাদি নির্ধারণ করাও ছিল এই 'পরিষদের' জন্যে নির্দিষ্ট কাজ। জার্মানি প্রসঙ্গে মিত্র শক্তিগুলির সাধারণ কর্মনীতির বুনিয়াদী

রাজনীতিক আর আর্থনীতিক মূলনীতিগুলি স্থির করেছিল ঐ সম্মেলন — সেগুলি ছিল গণতন্ত্রীকরণ, বেসামরিকীকরণ এবং নাৎসীমুক্তকরণের ব্যবস্থাবলি। ত্রিশক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, আর্থনীতিক আর রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানিকে ধরতে হবে একই সত্তা হিসেবে।

একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে। যেসব ভূখণ্ডে পোল্যান্ডের স্বাধিকার, যেগুলি জার্মান আক্রমণকারীরা গ্রাস করেছিল, সেগুলি পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

ইতালি, ফিনল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া এই যেসব দেশ জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে শরিক হয়েছিল, তাদের সঙ্গে শান্তি সন্ধিচুক্তি করার প্রারম্ভিক কাজ শুরু হল পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে। সোভিয়েত প্রস্তাবগুলি তোলা হয়েছিল এইসব বিবেচনা অনুসারে: প্রত্যেকটি পৃথক দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদানগুলি বিবেচনায় থাকা, চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ; এইসব দেশের মানুষকে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলার এবং আর্থনীতিক বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া দরকার। পশ্চিমী শক্তিগুলি তার উল্টো, এইসব শান্তি সন্ধিচুক্তিতে এমনসব শর্ত জুড়তে চেয়েছিল, যাতে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালি, রুমানিয়া এবং ফিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হত এবং পশ্চিমী শক্তিগুলি এইসব দেশের আর্থনীতিক আর রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারত। তবে, পশ্চিমী শক্তিগুলির এই চেষ্টায় কোন ফল হল না। উত্তপ্ত আলোচনার পরে শেষে ১৯৪৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তি সন্ধিচুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এইসব সন্ধিচুক্তি হল প্রকৃত শান্তির পথে একটা তাৎপর্যসম্পন্ন পদক্ষেপ। মোটের উপর, এইসব দলিল হল স্বাক্ষরকারীদের

স্বার্থের পরিপূরক এবং ইউরোপে শান্তি আর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংহত করার সহায়ক।

তবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে, এর থেকে যা আশা করা গিয়েছিল, সেই আন্তর্জাতিক প্রশমন ঘটল না এই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির ফলে।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে নিউ ইয়র্কের লেক সাকসেসে বসেছিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন। শান্তি- বজায় রাখা এবং সংহত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাসংঘ হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল এই সংগঠনটি। এর প্রথম অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সর্বজনীন অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাব তুলেছিল, কিন্তু ওয়াশিংটন আর লণ্ডন প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবের পথরোধ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় অ্যাটমবোমা ছিল কেবল তাদেরই — তারা সেই একচেটে বজায় রাখতে চেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নই তুলেছিল পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন — তারও কোন মীমাংসা হল না। পশ্চিমী শক্তিগুলি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুদ্ধের ঠিক পর থেকেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রসঙ্গে কর্মনীতির বনিয়াদ হিসেবে ধরল 'বলের অবস্থান' সংক্রান্ত নীতি। পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনেই এবং বিজিত শক্তিগুলির সঙ্গে শান্তি সন্ধিচুক্তিগুলির জন্যে প্রস্তুতিকালেও এই কর্মনীতি অনুযায়ী আচরণ দেখা গিয়েছিল। যাকে বলা হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিগুলির পরিচালিত 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ', ঐ হল তার সূত্রপাত। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুলটন শহরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সাক্ষাতে চার্চিলের কুখ্যাত বক্তৃতায় ঠাণ্ডা যুদ্ধের একটা কর্মসূচিই তুলে ধরা হয়েছিল।

এই ফুলটনের বক্তৃতার পরে অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির বিরুদ্ধে কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করল, সেগুলোর লক্ষ্য হল — ইউরোপীয় জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের পুনঃস্থাপন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐসব দেশের সহযোগ রোধ করা এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে, বিশেষত ফ্রান্সে আর ইতালিতে প্রগতিশীল শক্তিগুলির পরবর্তী প্রসার আর সংহতি রোধ করা।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে একটা সামরিক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় — এটা হল সারা পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য কায়েম করার মতলবে একগুচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রথম ধাপ। বৃটিশ কূটনীতিকদের চেষ্টায় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ব্রাসেল্‌সে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম এবং লুক্সেমবুর্গের মধ্যে আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর সামরিক সহযোগের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হল।

১৯৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল ওয়াশিংটনে ১২টা দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, লুক্সেমবুর্গ আর পোর্তুগাল)* একটা সন্ধিচুক্তি করে গড়ল উত্তর অ্যাটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন (ইংরেজী আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে — ন্যাটো)। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবেই পরিকল্পিত এবং স্থাপিত হয় এই জোটটা। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্যক্ষেত্রে অবরোধ চাপাবার ব্যবস্থা এবং পুঁজিতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক

---

* এই সংগঠনে পরে আরও ঢুকেছিল তুরস্ক, গ্রীস আর জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র (পশ্চিম জার্মানি)।

দেশগুলির মধ্যেকার ব্যবসা-বাণিজ্যিক আর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ভেঙে দেবার নানা চেষ্টাও ঠাণ্ডা যুদ্ধ কর্মনীতিরই ব্যাপার।

তবে, সাম্রাজ্যবাদীদের কোন চক্রান্ত আর ফন্দিই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সংহতির প্রক্রিয়াটিকে রুখে দেবার ক্ষমতা রাখে না। ইউরোপ আর এশিয়ার যেসব দেশ সমাজতন্ত্র গড়ার পথ ধরেছিল তারা রাজনীতিক, আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বড় সাফল্যলাভ করল স্বল্পকালের মধ্যেই।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস প্রায় এক-শ' বছর আগে লক্ষ্য করেছিলেন: 'আর্থনীতিক দারিদ্র্য আর রাজনীতিক বাতুলতার পুরন সমাজের বিরুদ্ধে জন্মলাভ করছে এক নতুন সমাজ, যার আন্তর্জাতিক মূলনীতি হবে শান্তি, কেননা প্রত্যেকটা জাতির শাসক হবে একই — শ্রম।'*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এবং যুদ্ধোত্তর প্রথম প্রথম বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে কতকগুলি পারস্পরিক সুবিধাজনক চুক্তি আর সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী সন্ধিচুক্তিতে পারস্পরিক সহায়তা এবং যুদ্ধোত্তর সহযোগের ব্যবস্থা ছিল। যুগোস্লাভিয়া আর পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনুরূপ সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে পরস্পরের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা এবং পরস্পরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে না-হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ব্যবস্থা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেকার এইসব সন্ধিচুক্তিতে। জার্মানি কিংবা

* কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স, **রচনাবলি**, রুশ সংস্করণ, ১৭শ খণ্ড, ৫ পৃঃ

আক্রমণের উদ্দেশ্যে জার্মানির সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ যেকোন রাষ্ট্র থেকে আক্রমণ ঘটলে এইসব সন্ধিচুক্তির স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের সহায়তায় দাঁড়াবে বলেও অঙ্গীকার ছিল।

পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তি সম্পাদন করেছিল অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে: আলবানিয়া (নভেম্বর, ১৯৪৫), মঙ্গোলিয়া (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬), রুমানিয়া (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮), হাঙ্গেরি (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮), বুলগেরিয়া (মার্চ, ১৯৪৮), চীন (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০)। এগুলির পাশাপাশি, কতকগুলি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে — যেমন, পোল্যান্ড আর চেকোস্লোভাকিয়া এবং বুলগেরিয়া আর রুমানিয়ার মধ্যে। গোড়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেকার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সংহত হচ্ছিল দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে। কিন্তু, প্রথম প্রথম যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতেও তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি সমষ্টিগত কার্যকরণ চালিয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ গড়ে-বেড়ে চলছিল বাণিজ্যক্ষেত্রেও। তাদের মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগের পরবর্তী সম্প্রসারণের ধারায় ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে স্থাপিত হল 'পারস্পরিক আর্থনীতিক সহায়তা পরিষদ' (পা. আ. স. প)। এই 'পরিষদ' তার কর্তব্য হিসেবে ধরল — সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক টেকনিকাল সহায়তা সংগঠিত করা এবং কাঁচামাল, খাদ্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিল্প সরঞ্জামের দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় সরবরাহ নিয়মন।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়ন পা. আ. স. প'র কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দু'-একটা তথ্যের উল্লেখই যথেষ্ট। ১৯৫০—১৯৫৫ সালে পোল্যান্ড আর চেকোস্লোভাকিয়ার যত লোহা দরকার হয়েছিল তার যথাক্রমে ৬৪ আর ৭৪ শতাংশ গিয়েছিল সোভিয়েত

ইউনিয়ন থেকে। বহু নতুন শিল্পায়তন গড়তে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশকে সাহায্য করেছে — তার ফলে এইসব দেশের শিল্পের প্রসার ঘটেছিল দ্রুত। ১৯৫৬ সাল নাগাত পোল্যাণ্ডের শিল্পোৎপাদন হয়েছিল যুদ্ধপূর্ব মাত্রার চেয়ে চারগুণ বেশি; বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার বেলায় ঐ অঙ্কটা ছিল যথাক্রমে ৫-গুণের বেশি, ৩·৫-গুণ, প্রায় ৩-গুণ এবং দ্বিগুণের বেশি।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির সাধনসাফল্যগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের শঙ্কিত করে তুলল। তাদের চোখের সামনেই, এবং তাদের বিপরীতমুখী চেষ্টা সত্ত্বেও, শান্তির জন্যে সংগ্রামী শক্তিগুলি বেড়ে চলছিল দ্রুত। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর সর্বত্র উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পদানত জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামও ক্রমাগত ব্যাপকতর হয়ে উঠছিল। ঐ সময়েই — পঞ্চম দশকের শেষ আর ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে — পশ্চিমের বেশ কয়েক জন বিশিষ্ট রাজনীতিক আর সামরিক নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির তুলেছিল প্রকাশ্যেই। ন্যাটোয় শরিকদের সঙ্গে মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত বরাবর বহুতর সামরিক ঘাঁটির বেষ্টনী গড়ে তুলে পশ্চিম জার্মানির পুনঃসামরিকীকরণে লেগে গেল।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলো ১৯৫০ সালের গ্রীষ্মকালে জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগাল। মার্কিন শাসক মহলগুলো তখন যেসব কর্মনীতি অনুসরণ করছিল, তাতে এটা স্থানীয় যুদ্ধ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে এক-দেশের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বহু দূরে বিস্তৃত হয়ে পড়ার বিপদ ছিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করানো এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়া প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে সোভিয়েত সরকার অবিলম্বে প্রস্তাব তুলল।

কিন্তু, আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল মাত্র ১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে, আর কেবল মার্কিন আর দক্ষিণ-কোরীয় প্রতিনিধিদের মতাবস্থানের দরুনই কোরিয়ায় যুদ্ধ শেষ হতে লেগেছিল আরও দু'বছর।

ওদিকে, পশ্চিমী শক্তিগুলি পশ্চিম জার্মানির পুনঃসামরিকীকরণের নতুন নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করছিল। ১৯৫৪ সালের শরৎকালে লন্ডনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, ইতালি, বেলজিয়ম, হল্যান্ড, লুক্সেমবুর্গ আর কানাডা, এই নয় শক্তির সম্মেলন একতরফা সিদ্ধান্ত নিল যে, পশ্চিম জার্মানি পাঁচ লক্ষ সৈনিকের ফৌজ, ১৫০০ যুদ্ধবিমানের বিমানবাহিনী এবং নিজস্ব নৌবাহিনী গড়তে পারবে। ১৯৫৫ সালের বসন্তকালে ফেডারেল জার্মানি ন্যাটোতে যোগ দিল।

সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিরক্ষাক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্যে পালটা-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ঘটল। এই উদ্দেশ্যে, ১৯৫৫ সালের মে মাসে ওয়ারসয় একটা সম্মেলন বসল — তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি এবং আলবানিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল। এই সম্মেলনে যথাবিধি স্বাক্ষরিত হয় ওয়ারস সন্ধিচুক্তি, তাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির একটি প্রতিরক্ষামূলক সামরিক পরিমেল গড়ার ব্যবস্থা হয়। সরকারী ঘোষণায় জানানো হয়েছিল, এই সন্ধিচুক্তিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, অন্যান্য দেশও এতে যোগ দিতে পারে, তাছাড়া, ইউরোপে সমষ্টিগত নিরপত্তাব্যবস্থা স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সন্ধিচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এর থেকেও সন্ধিচুক্তিটির ষোল-আনা প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতি প্রতিপন্ন হয়।

১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলম্বন-করা কয়েকটা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিকাশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

প্রতিপন্ন হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ছিল সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস এবং বিভিন্ন নতুন প্রস্তাব — যেমন, অস্ত্রসজ্জাহ্রাস এবং অ্যাটম আর হাইড্রোজেন অস্ত্রশস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞার জন্যে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের জন্যে।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের যেকোন প্রস্তাবে পশ্চিমী শক্তিগুলির মনোভাব সব সময়েই প্রতিকূল কেন, সেটা একেবারে চাক্ষুষ হয়ে গেল ১৯৫৬ সালের ঘটনাবলিতে। ১৯৫৬ সালের ২৬এ জুলাই মিসর সরকার সুয়েজ খাল কম্পানিটাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করল। সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ এই কাজে পুঁজিতান্ত্রিক একচেটে কারবারগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, — বৃটেন, ফ্রান্স আর ইস্রায়েল তো মিসরী জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ-অভিযানই শুরু করে দিল।

ঐ একই সময়ে হাঙ্গেরিতে স্থানীয় এবং বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াপন্থীরা মিলে একটা প্রতিবৈপ্লবিক বিদ্রোহ শুরু করেছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা হাঙ্গেরিতে শ্বেত সন্ত্রাস চালু করে দিয়েছিল। কিন্তু, অচিরেই দেখা গেল, এক্ষেত্রে হিসেবে ভুল ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলোর। হাঙ্গেরির শ্রমজীবী জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য চাইল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে গেল তার আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালন করতে: হাঙ্গেরীয় ফৌজের বিভিন্ন ইউনিট এবং শ্রমজীবীদের সশস্ত্র ডিট্যাচমেণ্টের সঙ্গে একত্রে সোভিয়েত বাহিনী বিদ্রোহীদের দমন ক'রে আইন এবং শৃঙ্খলা স্থাপন করল।

মিসরী জনগণকেও কার্যকর সাহায্য দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, তার ফলে মিসরবিরোধী আক্রমণের কলঙ্ককর পরিণতি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

ষষ্ঠ দশকের শেষাশেষি এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণাত্মক কর্মনীতিতে কোন ফয়দা

হচ্ছিল না। ঠাণ্ডা যুদ্ধের কর্মনীতি অকার্যকর প্রতিপন্ন হয় কেন? মধ্য প্রাচ্য নিয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের পরিকল্পনা, ভেস্তে গেল কেন? প্রতিবৈপ্লবিক শক্তিগুলোর সঙ্গে মোকাবিলায় হাঙ্গেরীয় জনগণ জয়যুক্ত হতে পারল কী কারণে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একই: বিভিন্ন বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, — পুঁজিতন্ত্র নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিবারই তখন মানবজাতির বিষয়াবলির ক্ষেত্রে ক্রমাগত বেশি নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করছিল।

আবার শান্তিকালীন নির্মাণকাজে

ফাশিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের পরিচালিত দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ দেশের জীবনটাকে দুটো কালপর্যায়ে ভাগ করে দিল। বিভিন্ন ঘটনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হতে থাকল সেটা যুদ্ধের আগে কিংবা পরে। সেই স্মরণীয় দিনগুলির পরে পঁচিশ বছরের বেশি কেটে গেলেও, গত পঁচিশ বছরকে প্রায়ই যুদ্ধোত্তর কালপর্যায় বলে উল্লেখ করতে শোনা যায়। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনের বিশেষক সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করার জন্যে ঐ কালপর্যায়টার উপর দৃষ্টিপাত করলে দুটো প্রধান পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটা হল ১৯৪৬—১৯৫৮ সালের কালপর্যায় — তখন দরকার ছিল যুদ্ধপূর্ব আর্থনীতিক মাত্রায় আবার পেঁছে সেটাকে বহুলাংশে ছাড়িয়ে যাওয়া। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার স্থাপন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক আর প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সংহত হবার ফলে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পারস্পরিক অনুপাত বদলে গিয়েছিল সমাজতন্ত্রের অনুকূলে, তাতে প্রবল নিশ্চয়তা সৃষ্টি হল পুঁজিতন্ত্রের

পুনঃস্থাপনের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হল।

ষষ্ঠ দশকের শেষাশেষি স্পষ্ট দেখা গেল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক বিকাশের একটা নতুন পর্ব এসে গেছে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২১তম কংগ্রেস এই থিসিসটাকে সংজ্ঞাবদ্ধ ক'রে সেটাকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। একথা মনে রেখে আমরাও একবার তাকিয়ে দেখতে পারি, ঐ সময়ে সোভিয়েত জন-জীবনের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনাগুলি কী এবং শান্তিকালীন বিকাশের ঐ বারো বছরে দেশটি কী পথ অতিক্রম করল।

* * *

'শেষ! যুদ্ধ শেষ!' — সরকারী ঘোষণার আগেই, ১৯৪৫ সালে ৮ই মে রাত্রে এই সুসংবাদটা ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল লোকের মুখে-মুখে, বাড়ি থেকে বাড়িতে। প্রত্যেকেই, অধীর প্রতীক্ষায় তার লাউডস্পীকারে কান পেতেছিল, কখন্ শুনতে পাবে এতদিনের আশা-করা কথাটা — 'জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছে!...' তার কয়েক মুহূর্ত পরেই শুরু হয়ে গেল দেশজোড়া আনন্দোৎসব। সমস্ত বাতি জ্বলে উঠল প্রত্যেকটা বাড়িতে, রাস্তায়-রাস্তায় জনস্রোত। মস্কোর মানুষ ভিড় করে গেল রেড স্কয়্যারে — তখন সূর্য উঠছে। সেদিনটাকে করা হয়েছিল জাতীয় উৎসবের দিন, দিনটা যা সমারোহ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তেমনটা আগে আর কখনও দেখা যায় নি। শুধু রাজধানীতে নয়, সেই একই দৃশ্য একেবারে সর্বত্রই। লেনিনগ্রাদের আকাশে বিমান থেকে সমারোহের লিফলেট বৃষ্টি। কিয়েভে, মিন্স্কে, অন্যান্য অসংখ্য শহরে, ছোট বড় সব গ্রামে সমারোহ-সমাবেশ, শোভাযাত্রা, উচ্ছল হর্ষোচ্ছ্বাস।

১৯৪৫ সালের ২৪এ মে সোভিয়েত ফৌজের অধিনায়কদের সম্মানার্থে সোভিয়েত সরকার ক্রেমলিনে একটা রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তার ঠিক এক মাস পরে মস্কোয় হয়েছিল বিজয় প্যারেড। ২৪এ জুন রবিবার দিন সমস্ত ফ্রন্টের প্রতিনিধি সৈনিকেরা রেড স্কয়্যার দিয়ে কুচকাওয়াজ করে গিয়েছিল। সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরে (এরপরে হবার ছিল অসামরিক নাগরিকদের মিছিল, সেটা বন্ধ রাখতে হয়েছিল), কিন্তু মঞ্চ থেকে কেউই চলে যায় নি। মস্কোর হাজার-হাজার নর-নারী রাজধানীর স্কয়্যার আর সড়কগুলিতে এসে বিজেতাদের অভিবাদন জানিয়েছিল।

কুচকাওয়াজের মাঝামাঝি সময়ে অর্কেস্ট্রা হঠাৎ থেমে গেল, তখন আনুষ্ঠানিক ঢাক বাজনার তালে তালে সোভিয়েত সৈনিকেরা লড়াইয়ে কেড়ে আনা শত্রুর ধ্বজাগুলোর ২০০ টাকে নিয়ে এল। তারা লেনিন সমাধিসৌধ অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই ধ্বজাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। বৃষ্টি হচ্ছিল মুষলধারে, ফাশিস্ত স্বস্তিকাগুলো অচিরেই লেপটে গেল কাদাজলে — সেটা হল পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত প্রতীকী পরিণতি।

শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে লোকে সন্ধ্যায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল আর-একবার উৎসব অনুষ্ঠান করতে। মস্কোয় বিজয় প্যারেডের পরে দেশজুড়ে চলেছিল উৎসবের সমারোহ। এরপরে সবাই বিজয়ীদের ঘরে ফেরার জন্যে পথচেয়ে ছিল।

দৈনন্দিন জীবনের বহু ক্ষেত্রেই তখনও যুদ্ধের ক্রিয়া লক্ষণীয় ছিল: হিটলারের দস্যুদলগুলোর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবশিষ্ট সব দঙ্গল তখনও অস্ত্র ছাড়ে নি। 'সোভিনফর্মব্যুরোকে' যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হয়েছিল আরও কয়েকটা। বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি, পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বেলোরুশিয়ার কোন কোন অংশে দলে-দলে জাতীয়তাবাদী দেশদ্রোহীরা তখনও সক্রিয়

হিটলারের আক্রমণের কলঙ্ককর পরিণতি

ছিল। দুর্গতি দুর্দশা আর ধ্বংসের অসংখ্য চিহ্ন চোখে পড়ত তখনও, কিন্তু সমস্ত চিন্তা তখন শান্তিকালীন শ্রমের উপর কেন্দ্রীভূত।

কল-কারখানা আর খামারের জীবন নিয়ে প্রবন্ধ সংবাদপত্রগুলিতে আরও বেশি বেশি জায়গা জুড়ে আসছিল, সর্বদিক থেকে আসছিল অর্থনীতির দ্রুত পুনঃস্থাপনের আহ্বান। বিমান-আক্রমণের বিপদ আর ছিল না, ব্ল্যাকআউট উঠে গেল। যেসব তহখানাকে করা হয়েছিল গ্যাসাভেদ্য আর বিমানহানার সময়কার আশ্রয়স্থল সেগুলিকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হল কারখানা আর আপিসগুলির হাতে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ আর তুলার উপকণ্ঠে এবং আরও বহু শিল্পকেন্দ্র ঘিরে গড়া ট্যাঙ্কধ্বংসী

কনক্রিটের ব্লক্‌গুলোকে উড়িয়ে দেওয়া হল, রাবিশ পরিষ্কার করা হল, ট্রেঞ্চগুলোকে বুজিয়ে দেওয়া হল। আরও বেশি বেশি মানুষ শান্তিকালীন কাজে লাগতে পারল আবার।

ভেঙে-দেওয়া সৈন্যদলগুলির প্রথম প্রথম সৈনিকদের মস্কোয় স্বাগত জানানো হয়েছিল ১৯৪৫ সালে ১৭ই জুলাই। ঘরে ফিরে আসছিল ডজন ডজন সৈন্যবাহী ট্রেন, তারা সর্বত্র পেয়েছিল বীর-সংবর্ধনা, তাদের কাছে ছুটে গিয়েছিল সমস্ত মানুষের অন্তর। তবে, এই হর্ষের মধ্যেও শোকের বিষাদ, দেশের জন্যে সমরশায়ী আত্মীয়-প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় কাতর ছিল একরকম প্রত্যেকটি পরিবারই।

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে জয়ের জন্যে সোভিয়েত জনগণকে মূল্য দিতে হয়েছিল সুবিপুল। ১৯৪০ সালে ১লা জানুয়ারি তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যা ছিল মোট ১৯,৪১,০০,০০০, আর ১৯৪৫ সালে — ১৭ কোটির কম। জনসংখ্যা যুদ্ধপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছিল পুরো দশ বছর পরে — ১৯৫৫ সালে। ইউক্রেনের সময়টা লেগেছিল ১২ বছর, ১৮ বছরের বেশি লেগেছিল বেলোরুশিয়ার। ১৯৫৯ সালে আদমশুমারের সময়েও লেনিনগ্রাদ, নভোরসিইস্ক, স্মোলেন্‌স্ক, কের্চ, ভিতেব্‌স্ক, রু্জেভ, ক্রেমেন্‌চুগ, ইত্যাদি শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৯৩৯ সালের অঙ্কের চেয়ে কম।

সমরশায়ী হয়েছিলেন এবং ফাশিস্ত দখলের এলাকায় কিংবা জার্মান বন্দিশিবিরে প্রাণ হারিয়েছিলেন সোভিয়েত দেশের দুই কোটির বেশি মানুষ। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ হয়েছিল আরও অসংখ্য মানুষ।

নাৎসী আক্রমণকারীদের নৃশংসতা সম্বন্ধে বিশেষ রাষ্ট্রীয় কমিশনের একটা বিজ্ঞপ্তি 'প্রাভ্‌দা'য় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর। এই কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদিতে দেখা

যায়, আক্রমণকারীরা ধ্বংস করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে লুট করেছিল ১,৭১০টা সোভিয়েত শহর আর শিল্প বসতি এবং ৭০ হাজারের বেশি গ্রাম, পুরোপুরি কিংবা অংশত ধ্বংস করেছিল ৩১,৮৫০টা শিল্পায়তন আর ৪৫,০০০ মাইল রেলপথ, লুট করেছিল ৯৮,০০০ যৌথখামার, ১৮,০৭৬ রাষ্ট্রীয় খামার আর ২,৮৯০টা মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন। নাৎসী অপরাধের তালিকার জন্যে লেগেছিল খবরের কাগজের কয়েকটা পৃষ্ঠা। মানবজাতির ইতিহাসে কোন একটা দেশের এমন বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি আর কখনও। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষতির পরিমাণ মোটামুটি ২,৬০,০০০ কোটি রুবল (যুদ্ধপূর্ব মূল্য অনুসারে)। এই অঙ্কটাকে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্যে একটা তুলনা দেওয়া যায়: ১৯৪০ সালে মোট রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ছিল ১৮,০০০ কোটি রুবল, অর্থাৎ কিনা, যুদ্ধপূর্ব শেষ বাজেট (১৯৪০) যা ছিল সেটার হিসেবে ধরলে ক্ষতির পরিমাণ রাষ্ট্রের বার্ষিক আয়ের প্রায় ১৫-গুণ।

যেসব রাজ্যক্ষেত্র শত্রুর দখলে পড়েছিল সেগুলিতে যুদ্ধের আগে হত দেশের শিল্পোৎপাদনের তৃতীয়াংশ এবং কৃষি উৎপাদনের অর্ধেক। দখলের দরুন দেশের অর্থনীতিতে অতি নিদারুণ বাধা পড়েছিল: সিমেণ্ট উৎপাদন আর দারু রপ্তানির পরিমাণ নেমে গিয়েছিল ১৯২৮—১৯২৯ সালের মাত্রায়; ট্র্যাক্টর উৎপাদন, তৈল নিষ্কাশন আর ঢালাই লোহার পরিমাণ নেমে গিয়েছিল ১৯৩০—১৯৩৩ সালের মাত্রায়; ১৯৩৪—১৯৩৭ সালের মাত্রায় চলে গিয়েছিল কয়লা, ইস্পাত লৌহ ধাতুশিল্পের উৎপাদন। অর্থাৎ কিনা, যুদ্ধের দরুন সোভিয়েত অর্থনীতি পিছিয়ে গিয়েছিল কমসে-কম দশ বছর। যথাসম্ভব দ্রুত সোভিয়েত অর্থনীতিকে আবার দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় কোন্ উপায়ে; কী সংগতি-সংস্থান দিয়ে, এটাই ছিল সবার চিন্তার বিষয়।

পশ্চিমী দেশগুলিতে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলো বলছিল, মার্কিন ঋণ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুরো দশ বছরেও সম্বন্ধে কথা বলছিল, সেটা তারা বোঝে নি, তা স্পষ্ট। কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় এবং সম্পূর্ণত নিজস্ব সংগতি-সংস্থানের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটি আর্থনীতিক পুনঃসংস্থাপনের কাজ স্বাধীনভাবেই সমাধা করেছিল আশ্চর্য স্বল্প সময়েই।

সোভিয়েত ফৌজ থেকে সৈন্যদের ছাড়ান দেওয়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালেই। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমরবাদী জাপানের পরাজয়ের পরে কাজটা চলেছিল আরও জলদি, ঐ বছরের শেষাশেষি তিরিশ লক্ষর বেশি মানুষ অসামরিক কাজে ফিরে এসেছিল। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিক নাগাত ফৌজ থেকে ছাড়ান পেয়েছিল মোট পাঁচাশি লক্ষ জন। ততদিনে সোভিয়েত ফৌজে সৈন্যসংখ্যা ফিরে এসেছিল যুদ্ধপূর্ব মাত্রায়, সংখ্যাটা ১৯৪৫ সালের মে মাসে ছিল ১,১৩,০০,০০০।

ফৌজ থেকে ছাড়ান-পাওয়া সৈনিকেরা যাতে কাজ পায়, সেজন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন সৈনিক আর অফিসারদের বেসামরিক কাজে আর পেশায় তালিম দেওয়া কিংবা তাদের জানা বেসামরিক কাজে যোগ্যতা বাড়াবার জন্যে বহুসংখ্যক পাঠ্যধারা খোলা হয়েছিল।

শিল্পকে শান্তিকালীন ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনার জন্যেও কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন কমিয়ে দেবার সঙ্গে শিল্পর পুনর্বিন্যাসের জন্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৪৫ সালের মে মাসে। বহু কারখানাকে অস্ত্রশস্ত্র আর সামরিক সাজসজ্জা উৎপাদন থেকে বেসামরিক উৎপাদনে চলে আসতে

নির্দেশ দেওয়া হল। ভারি শিল্পের বিভিন্ন শিল্পায়তনে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের কর্মশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হল। বেসামরিক চাহিদা মেটাবার উৎপাদনের পরিমাণ সামরিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ১৯৪৫ সালের শরৎকালেই।

বিভিন্ন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল জাতীয় বাজেটে। ১৯৪৬ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছিল বাজেটের ২৪ শতাংশ — এটা শেষ যুদ্ধপূর্ব বছর, ১৯৪০ সালের চেয়ে অনেক কম।

শিল্পের যুদ্ধোত্তর বিন্যাস, গবেষণা আর পরিচালনের ব্যাপারে বিস্তর মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে, ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাত স্তালিনগ্রাদে অ্যাসেম্বলি লাইন থেকে বেরিয়ে এল ৫০০তম 'স. ত. জ' ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর, লেনিনগ্রাদে 'ক্রাস্নি অক্তিয়াবর্' কারখানায় ব্লুমিং মিল্গুলি আবার চালু হল, কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হতে থাকল তুলা বিভাগে ইয়েফ্রেমভে, ল্ভোভ থেকে সরবরাহ হতে থাকল বিজলী আলোর বাল্ব, পোল্তাভা বিভাগের ক্রিউকভ থেকে ট্রেনের কামরা আর ট্রাক, খারকভ থেকে চূর্ণন-যন্ত্র, ইত্যাদি।

শান্তিকালীন উৎপাদনে ফিরে আসার কাজটা কঠিন হয়েছিল। অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগসূত্র পুনঃস্থাপন করতে হয়েছিল, পুনঃসংগঠিত করতে হয়েছিল উৎপাদনে বিশেষীকরণ আর সংযোগস্থাপনা, মালমশলা আর যন্ত্রপাতির নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মুখ্য লক্ষ্যটা ছিল যুদ্ধপূর্ব উৎপাদন-বন্দোবস্তটাকে তার আদিরূপে না-গড়ে উচ্চতর পর্যায়ে গড়া, তাতে কাজে লাগাতে হবে শিল্পক্ষেত্রে ইতোমধ্যে পাওয়া অভিজ্ঞতা এবং সর্বসাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত সাধনগুলি। অবস্থাটা আরও বেশি জটিল ছিল এই কারণে যে, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের একটা মোটারকমের অংশই হয় অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল, নইলে সেগুলির মেরামত দরকার

ছিল অনেক আগে থেকেই, তাছাড়া, বাতিল সেকেলে হয়েও পড়েছিল বিস্তর যন্ত্রপাতি।

আশু পুনঃসংস্থাপনের কাজে একটা প্রধান ভূমিকায় ছিল নির্মাণ শ্রমিকেরা। নির্মাণের মালমশলার গুরুতর ঘাটতির দরুন তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঢের বেশি কঠিন। ১৯৪৫ সালে সিমেণ্টের উৎপাদন নেমে গিয়েছিল ১৯২৮ সালের মাত্রায়; ইঁটের বেলায় অবস্থা ছিল আরও গুরুতর; কাচ উৎপাদন কমে চলে গিয়েছিল প্রাক্‌বিপ্লব মাত্রারও নিচে।

যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামও ছিল অতি দুর্লভ। এক্ষেত্রে ব্যাপক হারে উৎপাদন তখনও সংগঠিত হয় নি। টাওয়ার ক্রেন তখন দেখা যেত কালেভদ্রে। ১৯৪৫ সালে জোটান গিয়েছিল মোট দশটা এক্সক্যাভেটর আর সতরটা মোটরযানে বসানো ক্রেন। পোঁচড়া লাগানো আর রঙ করার কাজ তো বটেই, খোঁড়া আর কনক্রিট মেশাবার কাজেরও বেশির ভাগ করতে হত হাত দিয়ে।

সবচেয়ে প্রচণ্ড ঘাটতি ছিল শ্রম-বলের। যুদ্ধের ঠিক আগেকার সময়ের সঙ্গে তুলনায় শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল পঞ্চাশ লক্ষর বেশি — অর্থাৎ, ১৯৪০ সালের ৩ কোটি ৩৯ লক্ষর জায়গায় ১৯৪৫ সালে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ। সংখ্যাহ্রাস শিল্পে ছিল প্রায় ১৪ শতাংশ, আর পরিবহনক্ষেত্রে ৯ শতাংশ। কৃষক জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল ১৫ শতাংশ, বেশির ভাগ কৃষিকাজ করছিল নারী, বৃদ্ধ আর কিশোর-কমবয়সীরা।

শিল্পে নিযুক্ত মানুষের যোগ্যতার মানও অনেকটা নেমে গিয়েছিল। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিশিয়ন ১৯৪৫ সালে ছিল ১৯৪০ সালের চেয়ে ১,২৬,০০০ জন কম। শিল্প শ্রমিকদের অর্ধেকের বেশি ছিল মেয়েরা, বেশ একটা অংশ ছিল কিশোর-কমবয়সী।

যুদ্ধোত্তর শিল্প পুনঃসংঠনের পথে এসব অবস্থা ছিল গুরুতর বাধা। ১৯৪৬ সালে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ শুধু নয়, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিও নেমে গিয়েছিল, আর উৎপাদন-পরিব্যয় গিয়েছিল বেড়ে। নতুন শ্রমিকদের ট্রেনিং দিয়ে যোগ্যতা বাড়িয়ে তাদের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আর কৃৎকৌশল ব্যবহার করতে পারার যোগ্য করে তুলতে সময় আর অতিরিক্ত ব্যয় এবং জীবনযাত্রার মানে সর্বজনীন উন্নতির দরকার ছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস অবধিও যুদ্ধের সময়কার মতোই শহরে খাদ্যসামগ্রী এবং বহুসংখ্যক ভোগ্য পণ্যের রেশনিং চালু ছিল। এর ফলে শ্রমিক আর কর্মচারীদের পরিবারগুলির অত্যাবশ্যক জিনিসগুলির যোগান নিশ্চিত ছিল (তাও আবার, সরকারী যুদ্ধপূর্ব দামে), কিন্তু ভোগ-ব্যবহারের মান ছিল খুবই গণ্ডিবদ্ধ।

বাসগৃহের নিদারুণ ঘাটতি ছিল সারা দেশে। ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে কুজনেৎস্ক অববাহিকায় শ্রমিকদের বেশ একটা অংশ থাকত হস্টেলে, তারা ঘুমত দুই-স্তরের বাঙ্কে, মাথাপিছু বসতস্থল গড়ে দুই বর্গগজের বেশি ছিল না। মাগ্‌নিতোগর্স্ক, নিজনি তাগিল এবং আরও অনেক শহরেও অবস্থা এর চেয়ে ভাল ছিল না, আর যেসব এলাকা পড়েছিল নাৎসীদের দখলে, সেখানে লোকে তখনও বাস করছিল অর্ধবিধ্বস্ত বাড়িতে কিংবা ট্রেঞ্চে।

সোভিয়েত দেশের মানুষ এই যুদ্ধোত্তর ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল অবস্থার কষ্টকাঠিন্যের মোকাবিলা করেছিল ধীরস্থিরভাবে। এইসব বাধাবিঘ্নের পিছনকার কারণগুলো সম্বন্ধে তারা সম্যক অবহিত ছিল।

মোটামুটি এই সময়ে মস্কোর মোটর কারখানার বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়ে এসেছিল একটা বৃটিশ প্রতিনিধিদল। এই বিদ্যালয়ের একটা শ্রেণীতে ঐ আগন্তুকেরা পড়ুয়াদের এইসব প্রশ্ন করেছিল:

'আপনাদের ফ্ল্যাটে কলে গরম জলের ব্যবস্থা আছে?'

'আপনার বাবার স্যুট আছে ক'টা?'

'আপনাদের ফ্ল্যাটে গ্যাসের ব্যবস্থা আছে?'

এর পরে, যাদের বাবা ফ্রণ্টে মারা গেছেন তাদের দাঁড়াতে বলেছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালক। একজন ছাড়া দাঁড়াল ক্লাসের সবাই। ভয়ানক হকচকিয়ে গিয়ে বিদেশীরা জিজ্ঞাসা করল যে বসে ছিল তাকে:

'আপনার বাবা কি যুদ্ধে লড়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার বাবা বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর দু'খানা পা-ই গেছে যুদ্ধে।'

বাড়ির সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আর-কোন প্রশ্ন করা হয় নি এর পরে।

সোভিয়েত নর-নারীরা জানত, যত শীঘ্র সম্ভব অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে পার্টি আর সরকার বিভিন্ন দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করছিল, যাতে শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হয় এবং যুদ্ধের সমস্ত পরিণতি অতিক্রম করা যায়। যুদ্ধোত্তর প্রথম বছরে আট-ঘণ্টার কর্মদিন আবার চালু হয়েছিল, আবশ্যিক ওভারটাইম কাজের সঙ্গে শ্রমসমাবেশ তুলে দেওয়া হয়েছিল, আবার চালু হয়েছিল নিয়মিত এবং পরিপূরক ছুটি, কমবয়সীদের রুটির রেশন বাড়ানো হয়েছিল। ১৯৪৩ সালেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, স্তালিনগ্রাদ, দন্-তীরে-রস্তভ, স্মোলেন্স্ক, ওরেলের মতো প্রধান কেন্দ্রগুলিকে যুদ্ধ শেষ হলেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে আবার গড়ে তোলা হবে। দনেৎস্ অববাহিকার পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে এবং লেনিনগ্রাদ পুনরুদ্ধারের জরুরী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। তার মানে, পুনঃস্থাপনের কাজে সুষ্ঠু সূচনা হয়েছিল যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হবার আগেই।

যুদ্ধোত্তর পুনঃসংস্থাপন এবং আর্থনীতিক সম্প্রসারণের জন্যে পার্টির তুলে-ধরা কর্মসূচিটিকে সারা দেশ স্বাগত জানিয়েছিল সত্যিকারের উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রথম যুদ্ধোত্তর নির্বাচন হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি, এই উপলক্ষে ৯ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে স্তালিনের বক্তৃতায় এই কর্মসূচির প্রধান বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছিল।

পনর বছরের দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত জনগণের কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল অর্থনীতির বহুবিস্তৃত সম্প্রসারণ সংগঠিত করা, যার ফলে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ তোলা যায় যুদ্ধপূর্ব মাত্রার চেয়ে তিনগুণ উপরে। এই কর্মসূচি রূপায়ণের প্রথম ধাপ ছিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৪৬—১৯৫০)।

যুদ্ধটা অর্থনীতিকে পুরো দশ বছর পিছনে ঠেলে দিয়েছিল, সেই অবস্থায় ১৯৪০ সালের শিল্পের মাত্রা ধরে ফেলে আরও বেশকিছুটা এগিয়ে যাবার চিন্তাটা সমগ্র জনসংখ্যার মনে ছাপ ফেলল, তাদের অনুপ্রাণিত করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের তখনকার চলতি অধিবেশনে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা গৃহীত হতে যাচ্ছিল, — তখনকার পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত মানুষ স্বভাবতই অসীম আগ্রহ সহকারে এই অধিবেশনের কাজ লক্ষ্য করছিল।

সর্বোচ্চ সোভিয়েতের এই অধিবেশনটি ছিল দ্বিতীয় সমাবর্তনের প্রথম অধিবেশন। এটা চলেছিল ১৯৪৬ সালে ১২ই থেকে ১৮ই মার্চ। এতে নির্বাচিত হয়েছিলেন সভাপতিমণ্ডলী এবং তার নতুন সভাপতি — তখন গুরুতরভাবে অসুস্থ মিখাইল কালিনিনের স্থলে — নিকোলাই শ্ভের্নিক। সর্বোচ্চ সোভিয়েতে

পাস-করা একটা বিধান অনুসারে জনকমিসার পরিষদের নাম বদলে করা হয়েছিল মন্ত্রিপরিষদ, তেমনি, ইউনিয়ন আর প্রজাতন্ত্র পর্যায়ে সমস্ত জনকমিসারিয়েত হয়েছিল বিভিন্ন মন্ত্রক। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন স্তালিন। নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন বাইবাকভ, ভান্নিকভ, ভাখ্রুশেভ, ইয়েফ্রেমভ, লোমাকো, মালিশেভ, পেরভুখিন, তেভোসিয়ান, উস্তিনভ এবং সোভিয়েত অর্থনীতির আরও বহু অভিজ্ঞ সংগঠক। এঁরা সবাই গোড়ায় তালিম পেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন আর কৃষি যৌথকরণের বছরগুলিতে, তাঁরা সবাই এসেছিলেন দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধরূপী কঠোর পাঠশালার ভিতর দিয়ে। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ ক্ষেত্রে চমৎকার পারদর্শী, তাঁদের কাজে সহায় ছিল বহু রকমের নির্ভরযোগ্য আর্থনীতিক আর জন সংগঠন।

১৯৪৬—১৯৫০ সালে সোভিয়েত অর্থনীতির পুনঃসংস্থাপন এবং সম্প্রসারণের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা, যা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন (গস্প্লান) রচনা করেছিল এবং মন্ত্রিপরিষদে পাস হয়েছিল, সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে ১৮ই মার্চ।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার গোড়ার কালপর্যায় নির্দিষ্ট ছিল পুনঃসংস্থাপনের কাজের জন্যে। ১৯৪৬—১৯৫০ সালের কালপর্যায়ের জন্যে বিনিয়োগ-করা সমস্ত পুঁজির প্রায় অর্ধেক পৃথক করা ছিল যুদ্ধে-বিধ্বস্ত এলাকাগুলির অর্থনীতি পুনঃসংস্থাপনের জন্যে।

অর্থের প্রধান অংশটা বরাদ্দ করা হয়েছিল শিল্পকেন্দ্রগুলির পুনঃসংস্থাপনের জন্যে এবং প্রথমত আর সর্বোপরি, জালানি আর শক্তি সরবরাহ সম্প্রসারিত করার জন্যে। কয়লা আর তৈলের গুরুতর ঘাটতির দরুন বিদ্যুৎ

উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল। শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার এবং সর্বসাধারণের জন্যে তার সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে সর্বনিম্ন মাত্রায় নিতে হয়েছিল। কতকগুলি শহরে আর শিল্প বসতিতে বিদ্যুৎ পাওয়া যেত দিনে অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে মাত্র।

জালানির প্রচণ্ড ঘাটতি পার হবার জন্যেও দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। যুদ্ধের আগেকার মতো তখনও সোভিয়েত জালানির সর্বপ্রধান উৎস ছিল কয়লা শিল্প — এটাকে দেওয়া হল অগ্রাধিকার। দেশের প্রধান কয়লা খনিকেন্দ্র দনেৎস্ অববাহিকার পুনঃসংস্থাপন হল পয়লা নম্বরের কাজ। ঐ এলাকা থেকে জার্মানদের খেদিয়ে দেবার একরকম পিঠাপিঠিই সেখানে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল পুনর্নির্মাণের কাজ। ঐ সময়ে ডজন ডজন খনি জলে ডোবা ছিল — তাই, অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা ছিল পাম্প করে ৬০ কোটি ঘনমিটার জল বের করা। এই পরিমাণ জল সারা পৃথিবী ঘিরে পনর ফুট চওড়া আর দশ ফুট গভীর একটা খাল ভরতি করার জন্যে যথেষ্ট। এই অবস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্যে দরকার ছিল একটা বিরাট অসাধারণ কাজ, — তা করা হয়েছিল। কাজ চলল সারা দিন-রাত; কাজের দিন ১৯৪৫ সালে আবার ৬-৮ ঘণ্টায় ফিরিয়ে আনা হলেও, ঐকান্তিক উৎসাহীরা এগিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে আর কিশোর-কমবয়সীদের ভূগর্ভে কাজ করা আইন দিয়ে নিষিদ্ধ থাকলেও শ্রমের ঘাটতি থেকে উদ্ভূত জরুরী অবস্থার দরুন, ঐ যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে, হাতে ভারি গাঁইতি এবং খনি-শ্রমিকের হেলমেট আর বুট-পরা কচি মুখ আর মেয়ে খনিতে দেখা যেত বিস্তর — যুদ্ধের সময়েরই মতো। লোকে কাজ করল সমস্ত শক্তি দিয়ে, কোন প্রচেষ্টায় তারা কুণ্ঠিত হল না, কাজ করল কত ঘণ্টা সেটা তাদের খেয়াল থাকত না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত চালু করেছিল একটা বিশেষ মেডেল — 'দনবাস কয়লা খনিগুলির

পুনঃসংস্থাপনের জন্যে', সে মেডেল পেয়েছিল বহু শ্রমিক।

নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্রের কঠিন নির্মাণকাজ চালাতে হয়েছিল। যেটা তখন ছিল ইউরোপের সর্ববৃহৎ, সেই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে শত্রু পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারে নি; সোভিয়েত সামরিক-ইঞ্জিনিয়রিং ইউনিটগুলিকে সেখান থেকে টেনে বের করতে হয়েছিল কয়েক-শ' টন বিস্ফোরক। বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে আবার চালু করার জন্যে স্বেচ্ছায় গিয়ে কাজে সাহায্য করেছিল হাজার হাজার মানুষ। এদের অনেকেই পুরন বন্ধুত্ব আবার জাগিয়ে তুলেছিল: মূল প্রকল্প নির্মাণের সময়ে তারা এখানে কাজ করেছিল একত্রে।

পুনর্নির্মিত এই বিদ্যুৎ-দৈত্যের প্রথম টারবাইনটি আবার চালু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ৪ঠা মার্চ। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের পুরো ক্ষমতায় কাজ চলেছিল তিন বছর পরে। ১৯৫০ সাল নাগাত এই বিদ্যুৎকেন্দ্র পুনর্নির্মিত হয়ে গিয়েছিল শুধু তাই নয়, লেনিনগ্রাদে উৎপন্ন আরও শক্তিশালী টারবো-জেনারেটর দিয়ে এটাকে আধুনিক করেও তোলা হয়েছিল।

একটা ইণ্টিরেস্টিং কথা: ১৯৪৩ সালে নীপারের ধারে সোভিয়েত ফৌজের হাতে পরাস্ত-পর্যুদস্ত জার্মান বাহিনীর নাৎসী অধিনায়ক জেনারেল স্টিউল্‌প্‌নাগেল নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে হিটলারের কাজে জবাবদিহি করবার সময়ে বলেছিল: 'আমরা যাকিছু ধ্বংস করেছি তা পুনরুদ্ধার করতে রুশীদের লাগবে পঁচিশটা বছর।'

ধাতুশিল্পের বিশাল বিশাল কারখানা আবার চালু করা হয়েছিল এত দ্রুত যে, অতি অভিজ্ঞ পারদর্শী বিশেষজ্ঞরাও এই কৃতিত্ব প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পায় নি। তারা বেশ ভালভাবেই জানত এইসব কারখানা চালু করার জন্যে দখলদারেরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিল — যেমন, দ্‌নেপ্রদ্‌জের্‌জিন্‌স্ক নাৎসীদের হাতে ছিল ৬২৯ দিন, কিন্তু ঐ সময়ে সর্বক্ষণ চেষ্টা করেও তারা

স্থানীয় ইস্পাত ঢালাইঘর ঠিকমতো চালিয়ে উঠতে পারে নি। সোভিয়েত শ্রমিক আর ইঞ্জিনিয়ররেরা কিন্তু সেই ঢালাইঘর পুনঃসংস্থাপন করতে আরম্ভ করার পরে ছাব্বিশ-দিনের-দিন সেখানে ইস্পাত উৎপাদন চালু করেছিল।

জালানি আর শক্তি উৎপাদনকেন্দ্রগুলি, ধাতু শিল্পায়তনগুলি এবং সড়ক আর রেলপথগুলি আগে-আগে পুঃসংস্থাপিত হবার ফলে সামগ্রিক আর্থনীতিক অগ্রগতি ত্বরয়িত হল — আগেকার নাৎসী দখলে-পড়া এলাকাগুলিতেই শুধু নয়, সেটা সারা দেশেই, নতুন নতুন কল-কারখানা, খনি আর তৈলক্ষেত্রও নির্মিত হতে থাকল সঙ্গে সঙ্গে। পুনঃসংস্থাপনের কাজ আর নতুন নতুন নির্মাণ প্রকল্প ছিল একই অখণ্ড শিল্প সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ। এমনকি বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত বাধাবিঘ্নও দ্রুত অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারে নি।

১৯৪৬ সালে দেশে যে-প্রচণ্ড খরা হয়েছিল, অমনটা অন্তত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশে আর ঘটে নি। ইউক্রেনে, ক্রিমিয়ায়, মোলদাভিয়ায় আর ভলগা অঞ্চলে হাজার হাজার যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামার তাতে প্রপীড়িত হয়েছিল। তারা সরকারী কোটা দিতে তো পারলই না, তাদের বরং নিজেদেরই বাইরে থেকে সরবরাহের দরকার ছিল। খাদ্যের রেশনিং আরও এক বছর চালু রাখা আবশ্যক হয়েছিল এই খরার দরুন। কাঁচামালের ঘাটতির দরুন টেক্সটাইল মিল্ এবং খাদ্য আর জুতো কারখানাগুলিতে ঘন ঘন কাজ বন্ধ রাখতে হত। অতীতে যেমন হত সেইভাবে খরার ফলে যাতে মহামারী না দেখা দেয়, খরাক্লিষ্ট এলাকা থেকে যাতে ব্যাপক বাস্তুত্যাগ না-ঘটে, তার ব্যবস্থা করার জন্যে দরকার ছিল অতিরিক্ত অর্থ আর প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যবহার করতে হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সোভিয়েত দেশের মানুষ এই পরিস্থিতিও কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

আর-একটা বিপর্যয় ঘটল ১৯৪৮ সালের শরৎকালে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আশখাবাদের একটা প্রকাণ্ড অংশ বিধ্বস্ত হল। তবে, পরদিনই সকালে বিমানগুলিতে করে অন্যান্য প্রজাতন্ত্র থেকে চিকিৎসা কর্মিদলগুলি পেঁছিতে আরম্ভ করেছিল তুর্কমেনিয়ার রাজধানীতে। সাহায্য এসেছিল চারদিক থেকেই। ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া, জর্জিয়া আর উজবেকিস্তান থেকে পাইওনিয়র আর কমসোমল সদস্যরা আশখাবাদের শিশু আর তরুণদের জন্যে পাঠাতে থাকল বই, এক্সারসাইজ বুক এবং হরেক রকমের উপহার। লেনিনগ্রাদ আর স্ভের্দলভস্কের যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের শ্রমিকেরা আশখাবাদের কল-কারখানার জন্যে ফরমাশ নির্দিষ্ট সময়ের আগে পূরণ করার প্রতিজ্ঞা নিল। ভূমিকম্পের অকুস্থলে ছুটে গিয়েছিল বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকেরা — তারা নিজেরাই আবার কার্যক্ষেত্রেই দেখল সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের সে কী অভিব্যক্তি।

জনগণের চাহিদাগুলো সম্বন্ধে পার্টি আর সরকারের উৎকণ্ঠা এবং যুদ্ধোত্তর বছরগুলির প্রথম প্রথম সাফল্যগুলি আরও কৃতিত্বপূর্ণ শ্রম-বীরত্বে সোভিয়েত জনগণকে অনুপ্রাণিত করল, তাদের উৎসাহ যোগাল, সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কাজে যুক্ত প্রচেষ্টায় তাদের আশা আর আস্থায় ভরপুর করে তুলল, তাদের একই পতাকাতলে সমবেত করল আগের চেয়েও বেশি করে। তার সোচ্চার প্রমাণ হল — সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলির সমস্ত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচন, রাষ্ট্রীয় ঋণে জনগণের সাগ্রহে চাঁদা দেওয়া, সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে এবং প্রতিদিনকার আরও হাজার হাজার ছোট-বড় কাজে জনগণের সর্বজনীন সমর্থন। কল-কারখানা আবার চালু করার কাজ, কাঁচামাল আর অন্যান্য জিনিসে ব্যয়সংকোচ, ইত্যাদিতে প্রতিযোগিতা অচিরেই ছড়িয়ে পড়তে থাকল সারা দেশে। 'পাঁচসালা পরিকল্পনা সংসাধন

করো চার বছরে!' — এই স্লোগান গোড়ায় তুলেছিল লেনিনগ্রাদ পুনরুদ্ধারের কর্মীরা, সেটা অচিরেই গৃহীত হল দেশজোড়া পরিসরে।

শিল্পোৎপাদনের মাত্রা যুদ্ধপূর্ব অঙ্কের নাগাল ধরে ফেলেছিল ১৯৪৮ সালেই, যদিও, সমাজতন্ত্রের শত্রুরা বলত, পুনঃসংস্থাপনের কাজে লাগবে অন্তত দশ বছর, তাও মার্কিন ঋণ ছাড়া কল্পনা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে, একটা তথ্য থেকে অনেককিছু বুঝতে পারা যায়: পশ্চিম ইউরোপে শিল্প তখনও যুদ্ধপূর্ব মাত্রায় পৌঁছয় নি — যদিও তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল সোভিয়েত শিল্পের চেয়ে অপরিমেয়রূপে কম, তার উপর, মার্কিন ব্যাঙ্কগুলো থেকে পশ্চিম ইউরোপ দরাজ-হাতের ঋণ পেয়েছিল, আর মার্কিন রাষ্ট্রপতি তখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে যেকোন ক্রেডিট দেওয়া নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। আগে সম্পাদিত একটা চুক্তি লঙ্ঘন করে মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ সোভিয়েত ইউনিয়নে টেকনিকাল সরঞ্জাম পাঠানো বন্ধ করে দিল, পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কাঁকড়া এবং কোন কোন রকমের ফার কেনা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করল।

স্বদেশে এতসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, সোভিয়েত সরকার কিন্তু ফ্রান্সে বেশ মোটা পরিমাণ শস্য পাঠানো সম্ভব বলে মনে করেছিল। ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত জনগণ চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করেছিল ছয় লক্ষ টন শস্য দিয়ে। প্রাগের সংবাদপত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল যে, এই শস্য বিক্রি করা হয়েছিল পৃথিবীতে তখনকার অন্য যেকোনটার চেয়ে কম দামে। ফাশিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে যারা দুর্দশা-দুর্গতি ভোগ করেছিল, এমন আরও কতকগুলি দেশকেও সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ মোটারকম সহায়তা দিয়েছিল — যেমন, খুবই অনুকূল ব্যবস্থা অনুসারে একটা মোটা ঋণ দেওয়া হয়েছিল চীনকে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত জনগণকে তাদের অর্থনীতি পুনঃসংস্থাপন করতে হচ্ছিল এই দ্বিতীয় বার, প্রথম বার করা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী গৃহযুদ্ধ এবং বহিরাক্রমণের ক্ষত নিরাময় করার জন্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুনঃসংস্থাপন সমাধা করা হয়েছিল আগের বারের চেয়ে অর্ধেক সময়ের মধ্যে, ঐ সময় নাগাত সোভিয়েত শিল্পের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ এবং খাস সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণী, দুইই বদলে গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে কেবল উরাল অঞ্চল আর পশ্চিম সাইবেরিয়ায়ই ইস্পাত উৎপাদিত হচ্ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সারা রাশিয়ায় যা হত তার প্রায় ডবল, আর দুটি অঞ্চলে ধাতু-কাটা লেদ্ উৎপন্ন হচ্ছিল গোটা রুশ সাম্রাজ্যের প্রাক্‌বিপ্লব আমলের চেয়ে মোটামুটি সাড়ে-চারগুণ বেশি।

তৃতীয় দশকের গোড়ায় দনেৎস্ অববাহিকায় ধাতুশিল্প কারখানা আর খনিগুলির পুনঃসংস্থাপনের কাজ হয়েছিল প্রচণ্ড জটিল ব্যাপার, ভল্‌খভ বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার কাজ চলেছিল শোচনীয় ধীরগতিতে — এসব তো কিছু গোপন কথা নয়। ঐ সময়ে দেখা দিচ্ছিল সবে প্রথম প্রথম সোভিয়েত ট্র্যাক্টর, মোটরগাড়ি আর রেল-ইঞ্জিনই শুধু নয়, প্রথম প্রথম 'লাল পরিচালক'ও দেখা দেয় সবে তখন, তাদের তখন ঐ নামে উল্লেখ করা হত। এইসব পরিচালকের না-ছিল বিশেষ জ্ঞান আর দক্ষতা, না-ছিল কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা, তাদের অধ্যয়নেরও সময় ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল তাদের অল্প কয়েক জনের মাত্র।

তার দুই দশক পরে চিত্রটা ছিল খুবই পৃথক। বাধাবিঘ্ন তো ছিলই, কিন্তু সেগুলিকে স্বল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করতে পারার মতো যথেষ্ট সংগতি-সংস্থান ততদিনে ছিল সোভিয়েত অর্থনীতিক্ষেত্রে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন অভিযানের সময়ে প্রথম প্রথম প্রকল্পগুলিতে কাজ করতে করতে যারা গোড়াকার

অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, কমিউনিস্ট পার্টি শান্তিকালীন শ্রম ফ্রণ্টের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন বিভাগগুলি তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিল সেইসব নর-নারীর উপর। মাগ্নিতোগর্স্কে বহু সুপারইণ্টেণ্ডেণ্টের একজন ছিলেন তরুণ দ. রাইজের — তিনি যুদ্ধের পরে হলেন ভারি শিল্প নির্মাণ মন্ত্রী। ভ. দিমশিৎস এবং ই. কোমাজিনও চতুর্থ দশকে অনুরূপ পথ ধরে এসেছিলেন, ১৯৪৫ সালে আগের জনকে জাপোরজিয়ের বিশাল শিল্পায়তনগুলির পুনঃসংস্থাপনের ভার দেওয়া হল, আর সেভাস্তপোল নতুন করে গড়ার ভার পড়ল ঐ পরে-উল্লেখিত ব্যক্তির উপর।

১৯৪৭ সালে নিকোলাই দিগাই ছিলেন নির্মাণ-সংক্রান্ত একটা মন্ত্রকের প্রধান। তার আগে এই তরুণ ইঞ্জিনিয়র কাজের ভিতর দিয়ে উঠে একটা প্রকাণ্ড শিল্প ট্রাস্টের ম্যানেজার হয়েছিলেন, তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল সাধারণ শ্রমিক হিসেবে। আলেক্সান্দর জাসিয়াদ্কো একটা মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হবার সময়ে তাঁর বয়স ছিল আরও কম। তাঁর জন্ম হয় একটি শ্রমিক পরিবারে ১৯১০ সালে, পরে ফিটার হিসেবে কাজ করার সময়ে তাঁর পার্টি সেল্ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্যে মনোনীত করে। স্নাতক ইঞ্জিনিয়র হয়ে তিনি জন্মস্থান দনেৎস্ অববাহিকায় ফিরে যান, যুদ্ধ শেষ হবার অল্পকাল পরেই তাঁকে কয়লা শিল্প মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়।

চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময়ে আরম্ভ হয়েছিল স্তাখানভ আন্দোলন — তার পথিকৃৎদের কর্মজীবনও কিছু কম লক্ষণীয় নয়। তাঁতিনী মারিয়া ভিনোগ্রাদভা কারখানা ছেড়ে গিয়ে শিল্প আকাদমিতে একটা পাঠ্যধারা শেষ করেছিলেন, পরে তিনি হয়েছিলেন একটা টেক্সটাইল মিলের সহকারী ডিরেক্টর। ইঞ্জিন-ড্রাইভার ভ. বোগদানভ পরে ইঞ্জিনিয়র হয়ে শেষে মস্কো-কিয়েভ রেলওয়ের সুপারভাইজর নিযুক্ত হন। খনি-শ্রমিক আলেক্সেই

স্তাখানভ এবং ইঞ্জিন-ড্রাইভার পিয়ৎর ক্রিভোনস্‌ও পরিচালন-সংক্রান্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে নবপ্রবর্তকদের একটা সম্মেলনে আলেক্সান্দর বুসিগিন বলেছিলেন: 'আমি লেখাপড়া করেছি অতি সামান্যই... পড়াশুনা যদি করতে পারি — তার চেয়ে বড় আকুল আকাঙ্ক্ষা আমার আর-কিছুর জন্যেই নয়। আমি নিছক কামার হয়ে থাকতে চাই নে — আমি জানতে চাই কী করে হাতুড়ি তৈরি করতে হয়, তা আমি তৈরি করতে চাই নিজেই।' ইনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন। গোর্কির মোটরযান কারখানার যে-কর্মশালায় তিনি মার্কিন কামারদের রেকর্ড ছাড়িয়ে কাজ করতেন, তারই ভারপ্রাপ্ত কর্মী হয়েছিলেন পঞ্চম দশকের শেষের দিকে।

পঞ্চম দশকের শেষাশেষি নাগাত শিল্পে ব্যবস্থাপনের সমস্ত কর্মীরই বেশকিছুটা অভিজ্ঞতা জমেছিল। জনগণেরই রাজনীতিক আর শ্রম অভিজ্ঞতার সামগ্রিক মাত্রা উন্নীত হয়েছিল আশ্চর্য পর্যায়ে।

তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে, প্রথম পুনঃসংস্থাপন অভিযানকালে আর্থনীতিক ভাঙাচোরা অবস্থার নানা সমস্যা ছাড়াও, শ্রমিক শ্রেণীকে বেকারির মোকাবিলা করতে হয়েছিল, যদিও বেকারি কমে আসছিল। ঐ সময়ে ব্যক্তিগতভাবে জন খাটানোয় সরকারী অনুমতি ছিল, কোন কোন কারখানায় উত্তেজনাপূর্ণ শ্রম-সম্পর্ক থেকে ধর্মঘটও হয়েছিল। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর মেনশেভিক সংগঠনগুলির অবশেষ তখনও বৈধ থেকে কাজ চালাচ্ছিল; মধ্য এশিয়া আর কাজাখস্তানের কোন কোন জায়গায় ধনী ভূস্বামী বা বাইদের পয়মন্ত অবস্থাই ছিল।

১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র সাত লক্ষর একটু বেশি, কমসোমল সদস্যদের সংখ্যা তখনও আড়াই-

লক্ষেও পেঁছয় নি। স্থানীয় সোভিয়েতগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত ভোটাধিকারীদের মাত্র অর্ধেক, কখনও কখনও আরও কম লোক।

কিন্তু, পঞ্চম দশক নাগাত অবস্থা বদলে গিয়েছিল মূলগতভাবেই, ততদিনে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ সমাধা হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত সমাজের আগুয়ান বাহিনী সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণী. দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময়ে, বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশভূমিরক্ষার লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে আরও শক্তিশালী, আরও মজবুত হয়ে উঠেছিল। ঐ সময় নাগাত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল ষাট লক্ষ, প্রায় এক কোটি তরুণ-তরুণী যোগ দিয়েছিল কমসোমলে। নির্বাচকমণ্ডলীর শতকরা ৯৯ জনের বেশি সমস্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছিল নিয়মিতভাবে।

এই সবকিছুর ফলে দেখা দিয়েছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনপ্রচেষ্টার জোয়ার। এগুলি থেকে বোঝা যায় কোথা থেকে এল জনগণের দেশপ্রেমিক ঐকান্তিকতার মনোভাব, যা যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে সমগ্র সোভিয়েত জনগণমনে ছেয়ে গিয়েছিল, যার জন্যে তারা অমন সব স্মরণীয় সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল।

চতুর্থ পাঁচসালা কালপর্যায়ে (১৯৪৬—১৯৫০) পুনঃসংস্থাপিত এবং নতুন গড়া হয়েছিল মোট ৬,২০০টা কারখানা — অর্থাৎ, গড়ে তিনটে করে বড়রকমের প্রকল্প নির্মাণ শেষ হয়েছিল প্রতিদিন। ঐ সময়ে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক আর কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছিল তিরিশ লক্ষ। শ্রমিক শ্রেণীর গড়নে বিভিন্ন বিশিষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল' বহু প্রবীণ অভিজ্ঞ শ্রমিক অবসর নিলেন, তাঁদের জায়গায় ভরতি হলেন যুদ্ধের পরে ছাড়ান পাওয়া সৈনিকেরা। শিল্পে নারী আর ইস্কুল-শেষকরাদের অনুপাত কমে গেল, খনিতে আর খাতে, লরি আর ট্রেন চালানোর

কাজে তাদের দেখা যেতে থাকল ক্রমাগত কম সংখ্যায়। যোগ্যতা উন্নীত কিংবা বিস্তৃততর করতে যারা পাঠ্যধারা নিতে চায় তাদের জন্যে বিস্তৃত পরিসরে সুযোগ-সম্ভাবনা খুলে ধরা হল। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি চালু করার ফলে অপেক্ষাকৃত নতুন নতুন বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়ল।

জাতীয় প্রজাতন্ত্র আর অঞ্চলগুলিতে শিল্পোন্নয়নের দিকে বিস্তর মনোযোগ দেওয়া হতে থাকল আগের মতোই। প্রথম প্রথক জলবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি গড়া হল আর্মেনিয়ায় সেভান হ্রদে, জর্জিয়ায় খ্রামি আর সুখুমিতে, উজবেকিস্তানের ফারহাদে। ট্র্যান্স-ককেশিয়া আর মধ্য এশিয়ায় স্থাপিত হল প্রথম প্রথম ধাতু শিল্পায়তন।

ভলগা আর উরাল অঞ্চলের মাঝখানে গড়ে উঠতে লাগল যেন তৈল ডেরিকের বনভূমি। সোভিয়েত অর্থনীতিতে তৈল শিল্পের সর্বজনস্বীকৃত স্বদেশভূমি আজারবাইজানেরই মতো গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকায় এসে যেতে থাকল এই তৈলকেন্দ্রটি।

ঐ সময়ে পাতা হয়েছিল প্রথম প্রথম দূরপাল্লার গ্যাসবাহী নলপথগুলি, — মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ এবং আরও কতকগুলি কেন্দ্রে এই জ্বালানির নির্ভরযোগ্য যোগানের ব্যবস্থা হল।

ঐ সময়ে শিল্পের সম্প্রসারণ সবচেয়ে দ্রুত চলেছিল ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া আর মোলদাভিয়ার পশ্চিমাংশগুলিতে এবং বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে — এইসব অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ হয়েছিল ১৯৪০ সালে। এগুলি সবই ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল, প্রধান শিল্প ছিল হস্তশিল্প, বেকারি ছিল লাগামছাড়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে শিল্পের মাত্রা ছিল রুশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য বহু অংশের চেয়ে উপরে, কিন্তু সেগুলিতেও বুর্জোয়া আর ভূস্বামীদের পার্টিগুলি ক্ষমতায় থাকার সময়ে শিল্পের অধোগতি ঘটেছিল, শিল্পোন্নয়নের মাত্রা অনেক নেমে গিয়েছিল।
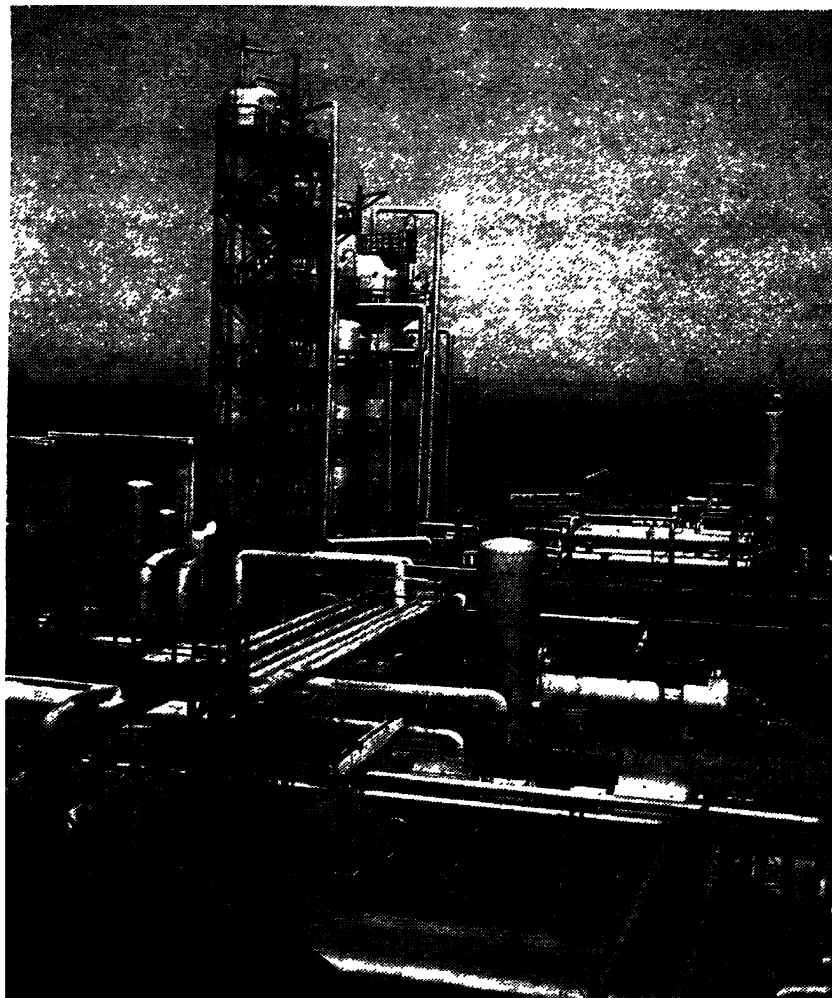
বাশ্‌কিরিয়ায় তৈলশোধনাগার

এইসব নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র আর অঞ্চল থেকে ফাশিস্ত দখলদারেরা বিতাড়িত হবার ঠিক পরেই আবার শুরু হয়ে গিয়েছিল শিল্পের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ, যাতে ছেদ পড়েছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের ফলে। অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে এইসব জাতি আর্থনীতিক অনগ্রসরতা ঘুচিয়ে দিতে পেরেছিল স্বল্প সময়ের মধ্যেই। এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল বিস্তর প্রচেষ্টা আর অতিরিক্ত অর্থ, সেটা দিয়েছিল দেশ সমগ্রভাবে। প্রথম প্রথম যুদ্ধোত্তর পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির সময়ে পরিস্থিতির চূড়ান্ত জটিলতা সত্ত্বেও, কেবল বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির অর্থনীতির নিবিড় সম্প্রসারণের বাবত বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯১৮ থেকে ১৯৩২ সালে সমগ্র মধ্য এশিয়া আর কাজাখস্তানের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ-করা অর্থের চেয়ে অনেকটা বেশি। তেমনি, গোটা যুদ্ধপূর্ব কালপর্যায়ে সোভিয়েত আর্মেনিয়ার জন্যে যত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি পুঁজি এস্তোনিয়ার শিল্প পেয়েছিল ১৯৪৬—১৯৫০ সালে। ইউক্রেনের প্রাচীন শহর ল্‌ভোভ হয়ে উঠল একটা প্রধান শিল্পকেন্দ্র। পশ্চিম মোলদাভিয়ার অর্থনীতিও সম্পূর্ণত রূপান্তরিত হয়ে গেল।

যুদ্ধের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি মিটিয়ে দেবার অভিযানে সোভিয়েত সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছিল যে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ দেশের সমস্ত অংশে একটা সুষম মাত্রায় রাখা দরকার।

বিশাল বিশাল জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করাটা ছিল ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিককার আর্থনীতিক অগ্রগতির বিশেষক উপাদান। কামা, ভলগা, দন আর নীপার নদীতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি গড়ার কাজ সর্বাগ্রাধিকার পেয়েছিল। ভলগা আর দন নদীকে

সংযুক্ত করার একটা জাহাজ চলাচলের খাল কাটা এবং কুইবিশেভে আর স্তালিনগ্রাদে বিশাল বিশাল জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিষয়ে সরকারের কয়েকটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্যে সোভিয়েত কারখানায় তৈরি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির অব্যাহত যোগান নিশ্চিত করা হল। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল — ২৫ টন অবধি বোঝা বইবার টিপ্-আপ্ লরি, বুলডোজার আর চোষণ ড্রেজ, সমস্ত রকমের ক্রেন্, অন্যান্য যন্ত্রপাতি। এই সময়কার একটা বিশেষ যুগান্তকারী নবপ্রবর্তনা হল স্ভের্দ্লভ্স্কে 'উরালমাশ' কারখানায় ডিজাইন-করা এবং উৎপন্ন চল-এক্সক্যাভেটর। এর প্রত্যেকটা পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু; ১০০ মিটার লম্বা উত্তোলননিয়ন্ত্রক বুম্ থাকায় এই এক্সক্যাভেটর দিনে ১৫,০০০ ঘনমিটার মাটি খুঁড়তে এবং অপসারিত করতে পারত। এইসব যন্ত্র-দৈত্যকেই ব্যবহার করা হয়েছিল ভলগা-দন খাল কাটতে। অর্থনীতিবিদেরা হিসেব কষে দেখেছিল, এমনি একটা এক্সক্যাভেটর নিয়ে ১৭ জন শ্রমিকের একটি কর্মিদল এক বছরে যে-পরিমাণ কাজ করতে পারে, সেটা হাত দিয়ে করতে গেলে সময় লাগে ৫০০ বছর।

৬৩ মাইল লম্বা সেই ভলগা-দন খাল খোলা হয়েছিল ১৯৫২ সালে। দন্ স্তেপভূমিতে জলসেকের কাজে লেগেছে শুধু তাই নয়, শ্বেত ,বল্টিক, আজোভ, কৃষ্ণ, ক্যাস্পিয়ান, এই পাঁচ সাগরকে সংযুক্ত করে একটা সমগ্র জল-পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এই খাল।

দেশের মধ্য অঞ্চলগুলিতে আর মধ্য এশিয়ায় নানা খাল কেটে এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খেতরক্ষী বন-বলয় রচনা ক'রে অবশেষে খরা রোধ করা এবং স্তেপভূমির বাতাস আর মাটির অবক্ষয়ের হানিকর ক্রিয়ার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থনীতির কৃষি শাখাটা পুনরুন্নীত করতে যা মনে করা গিয়েছিল

তার চেয়ে বেশি সময় লাগছিল ব'লে সোভিয়েত কৃষির উন্নয়ন নিবিড়তর করার প্রয়োজনবোধটা হয়ে উঠেছিল আরও প্রবল। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে আবার দাঁড় করানোর কাজটা দেখা গেল বেশ শক্ত। যুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত পড়েছিল গ্রামগুলির উপর। যুদ্ধকালের উদ্বাসনের পরে বিখ্যাত নারী-ট্র্যাক্টরচালিকা প্রাস্কোভিয়া আঙ্গেলিনা যখন ইউক্রেনে ফিরেছিলেন তখন তাঁর খামারে চাষ হচ্ছিল বলদ দিয়ে, খেতগুলো ট্রেঞ্চ দিয়ে ছেঁড়াখোঁড়া। মগিলেভ বিভাগের আর-একটা খামারে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ক. ওর্লোভ্স্কি যুদ্ধের পরে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন তার সভাপতি হিসেবে, সে-খামারে তখন না-ছিল ঘোড়া, না-ছিল গরু, না-ছিল বীজ। এই দুটি খামারই যুদ্ধের আগে ছিল আদর্শস্বরূপ; খামারদুটি ছিল যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এবং যৌথখামারীদের মোটা আয়ের জন্যে বিখ্যাত।

যুদ্ধের সময়ে যেসব এলাকা শত্রুর দখলে পড়েছিল, সেগুলি ১৯৪১ সালের আগে যোগাত দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের অর্ধেক, কিন্তু, যা আগেই বলা হয়েছে, ফাশিস্ত দস্যুবাহিনী ৯৮,০০০ যৌথখামার, ১৮,০৭৬টা রাষ্ট্রীয় খামার আর ২,৮৯০টা মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন লুট করেছিল। পশুসংখ্যাও কমে গিয়েছিল ভীষণ।

শিল্পে তখনও শান্তিকালীন অবস্থার উপযোগী পুনর্বিন্যাস চলছিল, সে-শিল্প অবিলম্বে খামারগুলির প্রয়োজনমতো যন্ত্রপাতি, সার এবং রাসায়নিক আগাছানাশক আর কীটঘ্ন পদার্থের যোগান দিতে অপারগ ছিল। যেমন, ১৯৪৫ সালে শস্য-ফসলতোলা যন্ত্র উৎপন্ন হয়েছিল মাত্র ৩০০টা, সংখ্যাটা ১৯৩৭ সালে ছিল প্রায় ৪৪,০০০, আর ট্র্যাক্টর উৎপন্ন হয়েছিল ১৯৩৬ সালের মোটামুটি ১,১৩,০০০টার জায়গায় মাত্র ৭,৭০০টা। বীট, আলু, ভুট্টা, শণ আর তুলো ফসলতোলা কোন যন্ত্রই উৎপন্ন হচ্ছিল না। মোটরযান

আর অজৈব সারের উৎপাদন কমে গিয়েছিল ৫০ থেকে ৬৫ শতাংশ।

সর্বাগ্রাধিকার পাবে কী? — এই চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নটার মীমাংসা দরকার ছিল সর্বপ্রথমে। আঙ্গেলিনা আর ওর্লোভ্স্কির মতো কমিউনিস্ট এবং অভিজ্ঞ কৃষি-সংগঠকেরা তাঁদের কর্মিসমষ্টির সদস্যদের জড়ো করা দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। যেসব সমস্যা অতিক্রম করতে হবে সেগুলোকে তাঁরা খাটো করে দেখেন নি, তাঁরা সামনেকার কর্তব্যগুলো সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করলেন, দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ঐকান্তিক আত্মনিয়োগের। যৌথখামারীরা দেখল, ক্লান্তি যেন আঙ্গেলিনার পক্ষে নিতান্তই বিজাতীয় কিছু, তারা দেখল, কীভাবে তিনি খামারের নওজোয়ানদের শেখাতে থাকলেন ট্র্যাক্টর চালাতে, চাষ করতে, কীভাবে রাত্রে তিনি ট্র্যাক্টর মেরামত করতেন। ওর্লোভ্স্কির প্রবল কর্মতৎপরতা অচিরেই অন্যান্য খামারীর মধ্যেও দেখা দিল। লড়াইয়ে তাঁর একখানা হাত গিয়েছিল, কিন্তু অফিসারের পেনশন পেয়ে মস্কোয় আরামে দিন কাটাবার চিন্তাটায়ও তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। এমনি মেক্দারের সংগঠক ছিলেন আরও বহু, খামারীরা তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল সোৎসাহে — শিগগিরই বেশকিছুসংখ্যক খামার পুনরুন্নীত হতে থাকল।

এমনটা কিন্তু ছিল না সর্বত্রই। আবার চালু হবার জন্যে হাজার আর্টেলের বাইরের সাহায্য দরকার ছিল। একই সময়ে সমস্ত যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারকে বেশকিছুটা সাহায্য দিতে পারার মতো অর্থ কিংবা সম্বল-সংস্থান তো ছিলই না দেশের হাতে। আগে ঠেলে বাড়ানো দরকার ছিল শিল্প, উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন। খামারগুলির যথার্থই যা দরকার ছিল তার চেয়ে ঢের কমই বরাদ্দ হয়েছিল রাষ্ট্রীয় বাজেটে। ১৯৪৬—১৯৫০ সালের পরিকল্পনা অনুসারে, কৃষি খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ছিল প্রায় ২,০০০ কোটি

রুবল — অর্থাৎ, শিল্পে বিনিয়োগ-করা অর্থের প্রায় আট ভাগের একভাগ। যৌথখামারগুলির নিজেদের বিনিয়োগ-করা পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩,৮০০ কোটি রুবল।

অভিজ্ঞ কৃষিকর্মীর অভাব ছিল নিদারুণ। ১৯৪৬ সালে যৌথখামারগুলির সভাপতি, ব্রিগেড-নেতা আর ডেয়ারি তত্ত্বাবধায়কদের প্রায় অর্ধেক তাদের এইসব পদে কাজ করছিল এক বছরেরও কম সময় যাবত। যৌথখামারের সভাপতিদের মধ্যশিক্ষা কিংবা উচ্চশিক্ষা ছিল গড়ে ২৫ জনে মাত্র একজনের; ব্রিগেড-নেতা, ইত্যাদিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লেখাপড়া করেছিল ইস্কুলে চার বছর মাত্র।

সোভিয়েত কৃষি তো আগেই ছিল সংকটের অবস্থায়, তার উপর আর-একটা বড়রকমের প্রতিহতি ঘটল ১৯৪৬ সালের খরার দরুন।

সোভিয়েত কৃষিক্ষেত্রে ঐ বছরগুলিতে পরিচালনের গৃহীত চলিতকর্ম নানা দিক দিয়ে ছিল অসন্তোষজনক। পরিকল্পনা কেন্দ্রে রচনা করে সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হত, — এ কাজে বিভিন্ন এলাকার নিজ নিজ ক্ষমতা আর বৈশিষ্ট্যের দিকে প্রায়ই যথেষ্ট নজর দেওয়া হত না। বৈষয়িক প্রবর্তনা নীতির অপব্যবহার ঘটত ঘন ঘন।

সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্যে পার্টি আর সরকার অবিলম্ব ব্যবস্থাবলির একটা বিস্তৃত কর্মসূচি হাতে নিল। খামারগুলিতে যন্ত্রপাতি আর মালমশলার যোগান উন্নততর করা এবং তাদের অভিজ্ঞ আর উপযুক্ত তালিম-পাওয়া কর্মী দেবার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হল। কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশ বেড়ে গেল শিগগিরই। যুদ্ধের আগে ট্র্যাক্টর উৎপন্ন হত তিনটে কারখানায় — স্তালিনগ্রাদ, খারকভ আর চেলিয়াবিন্স্কে, তার উপর যোগ হল আরও কয়েকটা — তার মধ্যে লিপেৎস্ক, ভ্লাদিমির আর

রুবৎসভস্কের কারখানা। ১৯৫০ সালে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছিল যুদ্ধের আগেকার যেকোন বছরের চেয়ে বেশি। খেতগুলিতে দেখা দিল নতুন নতুন ডিজাইনের ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য যন্ত্র — যেমন, বীট আর আলু, তুলো আর শণ ফসলতোলা কম্বাইন।

কৃষিক্ষেত্রে আগুয়ান কর্মীদের জন্যে বিভিন্ন সম্মানচিহ্ন চালু করল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী। সবচেয়ে সেরা কর্মীদের পুরস্কার দেওয়া হল 'সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বীর' খেতাব।

এইসব ব্যবস্থা ক্রমে ফলপ্রসূ হতে থাকল। আরও বেশি জমিতে ফসল ফলল, শস্য আলু এবং শিল্পে-প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বাড়ল। তার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর খাদ্যের রেশনিং তুলে দেওয়া গেল: যুদ্ধকালের আর-একটা ভীষণ অবশেষ দূর হল।

পঞ্চম দশকের শেষ নাগাত যৌথখামারগুলিতে উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব মাত্রা ধরে ফেলল, রাষ্ট্রীয় খামারগুলি সেটা ছাড়িয়ে গেল — যদিও, তখন যৌথখামারগুলিতে কর্মিসংখ্যা ছিল ১৯৪০ সালের চেয়ে কম। রাষ্ট্রীয় খামারগুলির কর্মীরা তখন পাচ্ছিল রাষ্ট্র থেকে বেঁধে-দেওয়া নিম্নতম মজুরি এবং পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়ানো হলে আরও অনেক বেশি। রাষ্ট্রীয় খামারগুলির যন্ত্রসজ্জা ছিল আরও ভাল, সেখানে শ্রম-সংগঠনের মানও ছিল যৌথখামারগুলির চেয়ে উন্নততর।

বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি এবং ইউক্রেন, বেলোরুশিয়া আর মোলদাভিয়ার পশ্চিমাঞ্চলগুলির কৃষিক্ষেত্রে ঐ সময়ে বিভিন্ন বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটেছিল, — এইসব অঞ্চলে পঞ্চম দশকের দ্বিতীয়ার্ধে খামারগুলিকে আবার সমাজতান্ত্রিক ধারায় পুনঃসংগঠিত করার কাজ শুরু হয়েছিল — যে-কাজে ছেদ

পড়েছিল নাৎসী আক্রমণ-অভিযানের দরুন। এইসব অঞ্চলের নবীন রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারগুলিকে রাষ্ট্র থেকে দেওয়া হয়েছিল বিস্তর যন্ত্রপাতি আর গৃহনির্মাণের মালমশলা এবং অতিরিক্ত ক্রেডিট আর বীজ। স্থানীয় জাতীয়তাবাদী আর কুলাকেরা, প্রাক্তন পুলিসের লোক আর আমলারা কৃষি যৌথকরণ অভিযানের বিরোধিতা করেছিল। যে-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটা অনেক দিক থেকে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সময়কারই মতো। যেসব সংঘর্ষ ঘটেছিল তাতে নিহত হয়েছিলেন বহুসংখ্যক পার্টি আর কমসোমল কর্মী এবং যৌথখামারের কাজে স্থানীয় পথিকৃৎ। কিন্তু, এইসব বাধাবিপত্তি নতুন জীবনযাত্রাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা রোধ করতে পারে নি। অনগ্রসর পৃথক পৃথক জোতজমার জায়গায় এল বড় বড় যৌথখামার। সমাজতান্ত্রিক কৃষির বিভিন্ন রেওয়াজ যা ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছিল, যৌথখামারগুলিতে জীবনের সমগ্র ধারা এবং পূবদিকের সন্নিহিত এলাকাগুলির অভিজ্ঞতা যে-প্রবল প্রভাব ফেলেছিল সেটা ছিল শ্রেণী-শত্রু আর সাবেকী ঐতিহ্যের প্রভাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। ১৯৫০ সাল নাগাত যৌথকৃত কৃষির জয়জয়কার হয়েছিল সমস্ত নতুন অঞ্চলে। এটা হল সমাজতান্ত্রিক কৃষির সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা জয় — এই জয় অর্জিত হল সেই কঠিন বছরগুলিতে, যখন প্রত্যেকটা ট্র্যাক্টর আর কম্বাইন-হার্ভেস্টার, প্রতি-পাউন্ড শস্য আর তুলো ছিল মহামূল্যবান।

ঐ বছরগুলিতে সবচেয়ে জমকালো সাধনসাফল্য হয়েছিল তুলো-খামারীদের। মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি, কাজাখস্তান আর আজারবাইজানের শত শত খামারে তুলো ফসল হয়েছিল রেকর্ড-ভাঙা। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রের কাছে তুলো বিক্রি করা হয়েছিল ৩৭,০০,০০০ টন — পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬,৫০,০০০ টন বেশি। এর কারণ কেবল এই নয় যে, তুলো ফসলের এলাকাগুলিতে যুদ্ধের সময়ে শত্রুর দখলে পড়া প্রজাতন্ত্র আর

অঞ্চলগুলির মতো অত দুর্গতি-দুর্দশা ভোগ করতে হয় নি, এর আরও কারণ এই যে, যেসব খামারে বিশেষভাবে শস্য ফলানো কিংবা পশুপালন করা হয় সেগুলির চেয়ে তুলো-খামারীদের আয় ছিল বেশি। ট্র্যান্স-ককেশিয়ায় প্রধানত আঙুর আর লেবু উৎপাদনের যৌথখামারীদেরও আয় হয়েছিল গড় জাতীয় পরিমাণের চেয়ে বেশকিছুটা বেশি।

যেসব খামারের কাছ থেকে রাষ্ট্র কিনেছিল শস্য, মাংস, আলু, তাদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ, কেননা এইসব জিনিসের দাম অনেক সময়ে শ্রম-পরিব্যয়ের অনুযায়ী ছিল না। কৃষিজাত দ্রব্যের দামে এইসব অসামঞ্জস্য উৎপাদনবৃদ্ধির পরিপন্থী ছিল; যৌথ বিভাগে যথাসম্ভব কম কাজ ক'রে বাড়ির লাগোয়া ব্যক্তিগত জমিখণ্ডে কাজে যথাসম্ভব বেশি সময় দেবার ঝোঁক হয়েছিল বহু যৌথখামারীর।

কিন্তু, প্রায়ই নানা দ্বন্দ্বে ভরা সেই যুদ্ধোত্তর কালপর্যায়ের কঠোর অবস্থার মধ্যেও, স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি, কৃষির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সাধারণের সংস্থাগুলি এবং আগুয়ান কৃষি সংগঠকেরা অক্লান্তভাবে অভিযান চালিয়েছিল উন্নততর কৃষি উৎপাদনের জন্যে, বৈষয়িক আর নৈতিক প্রবর্তনার মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্যের জন্যে, আধুনিক কৃষি কৃৎকৌশল চালু করার জন্যে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে বহু যৌথখামারকে মিলিয়ে আরও অনেক বড় বড় খামার গড়া হয়েছিল — তাতে খামারের মোট সংখ্যা ২,৫৪,০০০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ৯৩,০০০। ছোট ছোট আর্টেল একত্রে মেলাবার ফলে কৃষি যন্ত্রপাতির আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার হল এবং পরিচালন-সংক্রান্ত ব্যয় কমানো গিয়েছিল। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, সমগ্র অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদনের যে প্রবল বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল, সেটা ঘটানো যায় নি। অগ্রগতি ঘটেছিল বিস্তর, কিন্তু প্রয়োজন ছিল ঢের বেশি। পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছন

যায় নি — বিশেষত পশুপালনের ক্ষেত্রে। যৌথকৃত কৃষিতে বিপুল সম্ভাবনার সুযোগ তখনও সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো হয় নি। শিল্প পরিচালন এবং সমগ্র জনসাধারণের জন্যে বিভিন্ন জিনিস আর খাদ্যসামগ্রীর যোগানের ক্ষেত্রে তার হানিকর ক্রিয়া ঘটেছিল।

তবে, মোটের উপর, শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার মান এই সময়ে বাড়ছিল সমানে। সর্বসাধারণের ভোগ্য পণ্য আরও সস্তা হচ্ছিল প্রতি বছরই, সর্বক্ষণই উন্নততর হয়ে উঠছিল কর্মস্থান আর জীবনযাত্রার অবস্থা। গ্রামাঞ্চলে যেসব বাড়ি উঠছিল তা বাদেই, শহরগুলিতে বসতস্থল নির্মিত হচ্ছিল বছরে মোটামুটি ২ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গগজ করে। স্বাস্থ্যনিবাস, অবসরযাপন ভবন, হাসপাতাল, প্রসূতি-হাসপাতাল, কিণ্ডারগার্টেন আর শিশুশালার সংখ্যাও বেড়ে চলছিল দ্রুত। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা আর পোলিও রোগ অনেক কমে গিয়েছিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধির (জনসংখ্যার প্রতি হাজার জন হিসেবে) হার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, বৃটেন আর পশ্চিম জার্মানির চেয়ে বেশি, কেননা রোগ আর অপুষ্টি নিবারণ করতে সোভিয়েত মেডিক্যাল সার্ভিস কাজ করেছিল প্রচুর।

যুদ্ধের আগে যত বিদ্যালয় ছিল সবই আবার খুলে গিয়েছিল ১৯৪৫—১৯৪৬ শিক্ষা-বর্ষের মধ্যেই। এর পরে, শহরে আর গ্রামেও বিদ্যালয়ে সাত-বছরের আবশ্যিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। যারা বিদ্যালয়ে দশ-বছরের শিক্ষালাভ করে তাদের জন্যে বিদ্যালয় শেষ করার শংসাপত্র এবং যারা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তাদের জন্যে সোনার মেডেল চালু করা হয়েছিল — এদের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হত না।

১৯৫০ সালে সারা দেশে উচ্চশিক্ষায়তন ছিল ৮৮০টা, সেগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২,৪৭,০০০— অর্থাৎ, যুদ্ধের ঠিক আগে যা ছিল তার চেয়ে দেড়গুণ বেশি। ঐ বছরগুলিতে প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল অসংখ্য — তাদের মধ্য থেকে এসেছিলেন

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আকাদমিশিয়ন নিকোলাই বাসোভ, মহাকাশচর কনস্তান্তিন ফেওক্তিস্তভ, ডি. এস-সি, চলচ্চিত্র প্রযোজক গ্রিগোরি চুখরাই।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক জীবন প্রতিবছরই হয়ে উঠছিল আরও বেশি সমৃদ্ধ। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের বীরদের
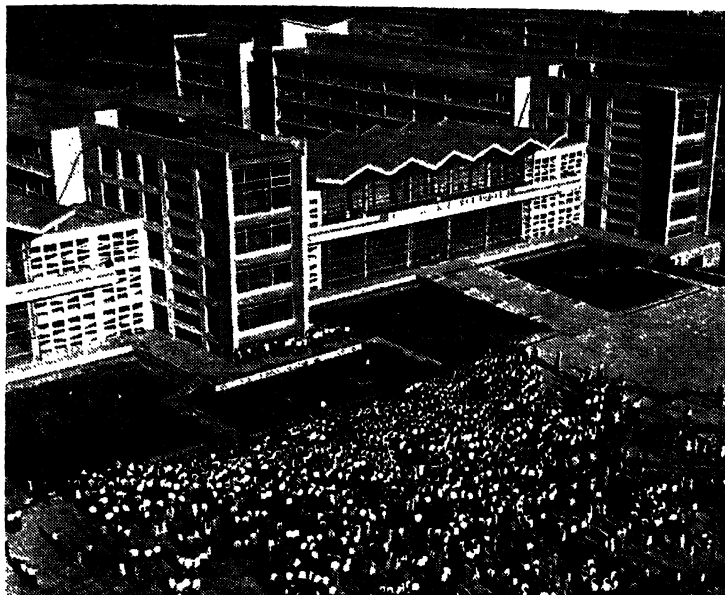
তাশখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

কীর্তিবন্দনা করে রচিত আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ, বরিস পলেভয় এবং এমানুইল কাজাকেভিচের রচনা তখন প্রকাশিত হচ্ছিল বিরাট বিরাট সংস্করণে। ঐ সময়ে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্র জুড়ে থাকত যুদ্ধ-সংক্রান্ত আখ্যানবস্তু। সোভিয়েত শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত দক্ষতা আর প্রতিভা নিয়োগ করতেন ফাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের

বীরত্বপূর্ণ দিনগুলিকে অমর করে তোলার জন্যে — যাতে সেগুলি জাগ্রত থাকে উত্তরপুরুষের অন্তরে। ঐ সময়কার সমস্ত বড় বড় সাংস্কৃতিক অবদান — তা সেটা হোক কনস্তান্তিন সিমনভের কবিতাগুচ্ছ, বরিস ইয়েফিমভ আর কুক্রিনিক্সি-শিল্পীত্রয়ের কার্টুন, ইয়েভগেনি ভুচেতিচের ভাস্কর্য, দ্মিত্রি শস্তাকোভিচের সংগীত, কিংবা ইলিয়া এরেনবুর্গের উপন্যাস গল্প আর প্রবন্ধ — সবই ছিল সোচ্চার শান্তির সপক্ষে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক আর ডিজাইনারেরাও শান্তি-সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষাক্ষমতা দৃঢ়তর করার জন্যে তাদের শ্রম উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের বসন্তকালে প্রথম প্রথম সোভিয়েত জেট জঙ্গী বিমান পরখ করা হয়েছিল; ১৮ই অগস্ট 'নভশ্চরণ দিবসের' বিশেষ সমারোহ প্যারেডে হাজার হাজার মানুষ সেগুলিকে এক-নজর দেখতে পেয়েছিল। বৈদেশিক পর্যবেক্ষকরা খোলাখুলিই বলেছিল তারা স্তম্ভিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন অচিরেই অ্যাটমবোমার রহস্যটা আয়ত্ত করে ফেলবে, তাও বৈদেশিক বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। তবে, ইগর কুর্চাতভের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কাজের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং ইউরোপের প্রথম পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর চালু হয়েছিল ১৯৪৬ সালেই। ১৯৪৯ সাল নাগাতই সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়েছিল নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র; প্রথম সোভিয়েত হাইড্রোজেনবোমার পরীক্ষা হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। সোভিয়েত ফৌজকে সর্বসাম্প্রতিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়েছিল, কিন্তু এই সবকিছুই করা হয়েছিল কেবল দেশের প্রতিরক্ষাক্ষমতা সংহত করার জন্যেই।

১৯৫০ সালে শান্তি আন্দোলনের কর্মীরা গ্রহণ করেছিলেন সেই বিখ্যাত 'স্টকহোল্‌ম আবেদন', তাতে নিঃশর্তে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ করার আবেদন জানানো হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক

দলিলে সই দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাড়ে-এগারো কোটির বেশি মানুষ — অর্থাৎ, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোক। ১৯৫১ সালে ১২ই মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে গৃহীত হয়েছিল 'শান্তিরক্ষা বিধি', তাতে প্রতিফলিত হয়েছিল দেশের শ্রমজীবী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই বিধিতে যুদ্ধপ্রচারকে মানবজাতির বিরুদ্ধে জঘন্য মহাপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এইভাবে দেখা যায়, শান্তিকালীন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন সমাধা ক'রে সোভিয়েত জনগণ নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে চালিয়ে গিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ, যা নাৎসী আক্রমণ-অভিযানের দরুন বিপর্যস্ত হয়েছিল।

সোভিয়েত সমাজ-জীবনে লেনিনীয় নিয়মাবলির অবিচলিত প্রতিপালন

ষষ্ঠ দশকের শুরু নাগাত আর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান যুদ্ধপূর্ব সূচকগুলিকে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফাশিস্ত আক্রমণ-অভিযানের সমস্ত বিপর্যয়কর পরিণতি মুছে ফেলে সোভিয়েত ভূমি যেসব বিজয়সাফল্য অর্জন করল, তেমনটা করতে পারে কেবল দেহে-মনে শক্তিশালী জনগণই।

সাফল্যগুলি ছাড়াও, ঐ সময়কার বিভিন্ন কষ্ট-কাঠিন্য আর প্রতিহতিগুলোর কথা ধরা না-হলে ঐ কালপর্যায়ে পাওয়া অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিল্পের বেশির ভাগ শাখায়ই পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রাগুলি ছাড়িয়ে গেলেও (যেমন, ধাতু, তৈল, কয়লা আর বিদ্যুৎ শিল্পে), কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রায় পেঁছিন যায় নি — যেমন, ডিজেল ইঞ্জিন, রেলগাড়ির কামরা, মোটরযান, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি আর টারবাইনের বেলায়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের যুদ্ধপূর্ব মাত্রাগুলোয় পেঁছিন গেল, কিন্তু ১৯৪০

সালের মাত্রাগুলোর চেয়ে ২৭ শতাংশ বেশি করার দ্বিতীয় লক্ষ্যটি সাধিত হল না। তার ফলে হালকা আর খাদ্য শিল্পে ব্যাহতি ঘটল, বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা সংসাধন করা অসম্ভব হল, পাইকারী আর খুচরা বাণিজ্যে কোন কোন জিনিসের ঘাটতি পড়ল।

বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল খাস পরিকল্পনায়ই। প্রথমে স্থির করা হয়েছিল বহুসংখ্যক কম-ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। আধুনিক রসায়নের নিহিত ক্ষমতাটাকেও পরিকল্পনারচয়িতারা খাটো করে দেখেছিল — সেটা বিশেষত প্ল্যাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু আর কৃত্রিম রবার উৎপাদন-সংক্রান্ত গবেষণাক্ষেত্রগুলি প্রসঙ্গে। স্বভাবজ রবার আর ভূগর্ভে কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত।

পরিকল্পনে এইসব দুর্বলতার দরুন অর্থের অপবরাদ্দ ঘটেছিল স্বভাবতই। শিল্পের কোন শাখায় উৎকর্ষ ঘটার অনুকূল পূর্বলক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাতে অর্থ-বিনিয়োগ করা হল অপ্রতুল পরিমাণে, অথচ, উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত কম ফলপ্রসূ শাখায় টাকা খরচ করা হল বিস্তর, এমনটা ঘটেছিল একাধিক বার।

প্রাক্তন আর্থনীতিক পরিচালকদের কেউ কেউ এমনসব ব্যাপারের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, পরিবহনব্যবস্থার ভার ছিল লাজার কাগানোভিচের উপর — তিনি বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল ইঞ্জিন চালু করার বিরোধিতা করেছিলেন। এমনকি ১৯৫৪ সাল অবধিও তিনি বলেছিলেন: 'আমি স্টীম ইঞ্জিনের পক্ষে, যারা মনে করে, এই ইঞ্জিন ছাড়া আমাদের কখনও চলতে পারে, আমি তাদের বিরোধী।'

পার্টি আর জনগণের কাছ থেকে সত্য গোপন করতে চেষ্টা করেছিলেন আরও কেউ কেউ। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়াবলির ভার-পাওয়া

গেওর্গি মালেনকভ ১৯৫২ সালে সরকারীভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে শস্য সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে — যদিও, প্রকৃতপক্ষে, শস্যের মোট ফলন হয়েছিল ১৯৪০ সালের চেয়ে কম, দেশের প্রয়োজন মেটে নি আদৌ।

বিজ্ঞানে আর প্রযুক্তিবিদ্যাক্ষেত্রে সোভিয়েত সাধনসাফল্য হয়েছিল একটুখানি নয়, সেগুলিকে খাটো করে দেখাবার যেকোন চেষ্টা তিরস্কৃত হয়েছিল, এটা স্বাভাবিকই। তবে, সোভিয়েত সাফল্যগুলির এইসব পক্ষসমর্থকেরা কখনও-কখনও অন্যান্য দেশের সাফল্যকে অযথা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলেন। সাইবারনেটিক্স ইত্যাদির মতো বিষয় নিয়ে গবেষণায় তখন উৎসাহ দেওয়া হয় নি — এটাকে এখন তো অদ্ভুতই মনে হবে। সুপ্রজননবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় গবেষণায়ও কমবেশি অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থবিদ্যাক্ষেত্রে বিভিন্ন গাণিতিক প্রণালী চালু করার দিকেও গুরুত্ব দিয়ে নজর দেওয়া হয় নি। সোভিয়েত গবেষণা বিজ্ঞানীরা এসব ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগে কাজ আরম্ভ করে খুবই সুফল পেয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের পরে প্রথম বছরগুলিতে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য সহায়-সমর্থন দেওয়া হয় নি।

অন্যান্য দিক থেকে দ্রুত সম্প্রসারণশীল সোভিয়েত অর্থনীতিতে এই সবকিছুর ফলে বাধা পড়েছিল, তার দরুন দেখা দিয়েছিল কিছুটা অসামঞ্জস্য, সেটা কাটাতে পরে বেগ পেতে হয়েছিল।

অর্থনীতির যুদ্ধোত্তর পুনঃসংস্থাপন এবং নতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধ করে শান্তি সংহত করার ক্লান্তিহীন অভিযান চালাবার প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত বাস্তব কষ্ট-কাঠিন্য ছিল খুবই প্রকাণ্ড, তা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় বাজেটের যে পরিমাণ ছিল, সেটা দিয়ে তখন দেশের সামনেকার সমস্ত জরুরী কর্তব্য একই সঙ্গে সমাধা করার উপায় ছিল না। তার উপর, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতিগুলি থেকে বিচ্যুতির ফলে সামাজিক জীবনের কোন কোন

নীতির লঙ্ঘন কখনও-কখনও চলছিল ঐসব বাস্তব সমস্যার পাশাপাশি — তাই, পরিস্থিতিটা হয়ে উঠেছিল আরও জটিল।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান সমস্যা পার্টির কংগ্রেস, প্লেনারী বৈঠক আর সম্মেলনে আলোচিত হতে শুনতে সোভিয়েত নর-নারীরা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু, কারখানা, এলাকা, বিভাগ আর প্রজাতন্ত্রের স্তরে পার্টির সভা আর সম্মেলন মোটামুটি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হলেও, সর্বজনগৃহীত নিয়মগুলি জাতীয় স্তরে লঙ্ঘিত হত, সেটা হয়ে উঠেছিল স্বতঃপ্রতীয়মান। পার্টির ১৮শ কংগ্রেস হবার কথা ছিল ১৯৩৭ সালে, কিন্তু সেটা হয়েছিল মাত্র ১৯৩৯ সালে, আর পরবর্তী পার্টি কংগ্রেস হয়েছিল তার তেরো বছর পরে।

অবশেষে ১৯৫২ সালে অক্টোবর মাসে পার্টির ১৯শ কংগ্রেস বসলে দেশের মানুষ তার কাজ লক্ষ্য করে তৃপ্তি পেয়েছিল। ১৯৩৯ সালের পরবর্তী ঘটনাবলির সার-সংক্ষেপ করে এই কংগ্রেস ১৯৫১— ১৯৫৫'র পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্দেশনামা অনুমোদন করেছিল। আরও আর্থনীতিক সম্প্রসারণ, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির ব্যবস্থা তাতে ছিল। এই কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি এবং দেশের সমগ্র জীবনযাত্রাপ্রণালী ছিল শ্রেণীহীন সমাজের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বার অগ্রগতির খুবই প্রবল নিদর্শন।

ন.আ.ক'র গোড়ার বছরগুলো থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি কমিউনিস্ট পার্টির নিয়মাবলিতে পার্টি সদস্য হবার কড়ার শ্রমিক এবং শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য স্তরের মানুষের জন্যে অভিন্ন ছিল না। ১৯শ কংগ্রেস অবধি 'নিয়মাবলিতে' পার্টির সংজ্ঞা ছিল 'সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণীর আগুয়ান সংগঠিত বাহিনী, তার শ্রেণী-সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ'; কিন্তু, সমাজতন্ত্র ইতোমধ্যে শহরে আর গ্রামাঞ্চলেও জয়যুক্ত হবার ফলে দেখা দিয়েছিল

সামাজিক আর রাজনীতিক দিক দিয়ে সম্মিলিত সমাজ, তাই, ১৮শ পার্টি কংগ্রেসের সময়ে ব্যক্তির সামাজিক উদ্ভব কিংবা পর্যায় নির্বিশেষে পার্টি সদস্য হতে পারবার একই প্রণালী স্থির করা হয়েছিল। শ্রমজীবী জনগণের অপ্রলেতারীয় অংশগুলির জীবনে সংঘটিত বুনিয়াদী পরিবর্তনগুলি ছিল কেবল সামাজিক-রাজনীতিক উপাদানগুলিতেই নয়, সেটা ছিল তাদের নতুন করে গড়ে-ওঠা মনোবৃত্তিতেও — এটাই প্রতিফলিত হল ঐ সিদ্ধান্তের মধ্যে। এই সবই হল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয় এবং সেই জয় সংহত হবার প্রত্যক্ষ ফল।

সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর নতুন নিয়মাবলি এবং পার্টির নাম বদলে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি' — সো. ই. ক. পা — করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ১৯শ পার্টি কংগ্রেসে। একই সঙ্গে 'কমিউনিস্ট' আর 'বলশেভিক' এই দুটো শব্দ রাখার গোড়াকার তাৎপর্য আর ছিল না, কেননা দেশে কোন মেনশেভিক ছিল না, কোন নতুন মেনশেভিক আন্দোলন লাগার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ যখন চলছিল তখন সোভিয়েত দেশে শ্রমিক শ্রেণীর বৈরকার মতাদর্শওয়ালা বিভিন্ন শ্রেণী আর সামাজিক গ্রুপ এবং শ্রমিক শ্রেণী আর বুর্জোয়াদের মধ্যে দোদুল্যমান অন্যান্য স্তর ছিল। ঐ সময়ে পার্টি ছিল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত অবস্থানের মূর্তপ্রতীক, সেই অবস্থানে সমগ্র জনগণকে টেনে আনার জন্যে পার্টি তখন কঠিন আপসহীন সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই অভিযান ক্রমাগত সাফল্যমণ্ডিত হতে থাকবার প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমে হয়ে উঠল সমগ্র জনগণের পার্টি।

সো.ই.ক.পা'র ১৯শ কংগ্রেসের অল্পকাল পরেই, ১৯৫৩ সালে ৫ই মার্চ স্তালিন মারা গেলে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা বড় আশা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি এবং জনগণের মধ্যে ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল

অবস্থা দেখা দেবে, সো.ই.ক.পা'র কর্মনীতির সাধারণ কর্মধারার বাস্তবায়নে দোদুল্যমানতা ঘটবে। তাদের এই মনোবাসনা থেকে আবারও বোঝা গেল, সমাজতান্ত্রিক সমাজের মর্ম তারা বোঝে না, এই সমাজ এগিয়ে কায়েম করবে কমিউনিজম, সেটা রোখা অসম্ভব, তা তারা বুঝতে পারে না। তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে এঁটে উঠতে এবং সেই বিশেষ পর্বে যেসব কর্তব্য সামনে ছিল সেগুলি সম্পাদন করতে পার্টি সক্ষম হয়েছিল।

পার্টি জীবনের লেনিনীয় নিয়মগুলি পুনঃস্থাপন করে সেগুলিকে আরও বিশদ করে তোলা এবং পার্টি আর সরকারের সমস্ত স্তরে সমষ্টিগত নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতি পুনঃস্থাপন করার অভিযান ঐ সময়ে বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৩ সালের গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রীয় কমিটি লাভ্রেন্তি বেরিয়া আর তার দুষ্কর্মে সহচরদের অপরাধজনক ক্রিয়াকলাপের অবসান ঘটিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ভারপ্রাপ্ত থাকাকালে এরা নিজেদেরকে পার্টি আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে এবং দেশের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে চেষ্টা করেছিল। এইসব বিবেকবর্জিত হঠকারীদের বিরুদ্ধে অবলম্বিত চূড়ান্ত ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী জনগণ অনুমোদন করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি থেকে সমস্ত বিচ্যুতি যথাসম্ভব দ্রুত দূর করা যাতে নিশ্চিত হয় তদনুযায়ী পথে চলতে থাকল সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী বৈঠক হতে থাকল নিয়মিতভাবে; শিল্প, কৃষি আর সংস্কৃতি উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনার জন্যে সারা-ইউনিয়ন আর প্রজাতন্ত্র স্তরে সভা হতে থাকল আরও ঘন ঘন। সমস্ত স্তরে সোভিয়েতগুলির কাজে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হল, ঢের বেশি সক্রিয় হয়ে উঠল ট্রেড ইউনিয়নগুলি আর কমসোমলও।

যেসব নাগরিকের উপর অন্যায় দমন-পীড়ন চলেছিল তাদের মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল অল্প সময়ের মধ্যেই। চেচেনেৎস আর ইঙ্গুশ, কালমিক, বালকার, কারাচায়েভীদের জাতীয় স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, — পঞ্চম দশকের গোড়ায় তাদের বৃহত্তর জাতীয় ইউনিটের ভিতরে সাধারণ প্রশাসনিক অঞ্চল করে দেওয়া হয়েছিল। ইসাক বাবেল, মিখাইল কল্ৎসভ এবং ব্রুনো ইয়াসেন্স্কির বই আবার প্রকাশিত হল, তেমনি ন. ভাভিলভ আর ন. তুলাইকভের মতো বিজ্ঞানী এবং শিল্পকলা আর বিজ্ঞান জগতের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনা — সেগুলি দীর্ঘকাল যাবত নিষিদ্ধ ছিল। মিখাইল তুখাচেভ্স্কি, ভার্সিলি ব্লিউখের, ইওনা ইয়াকির এবং লাল ফৌজের অন্যান্য অধিনায়ক আবার গৃহযুদ্ধের জনবন্দিত বীরদের মধ্যে ন্যায্য স্থান পেলেন — তাঁদের বিরুদ্ধে চলেছিল কুৎসা আর নির্যাতন।

১৯৫৭ সালে সরকার লেনিন পুরস্কার পুনঃপ্রবর্তন করল, — প্রথমে ১৯২৫ সালে এই পুরস্কার চালু করা হয়েছিল বিজ্ঞানে আর প্রযুক্তিবিদ্যায়, আর্টে আর সাহিত্যে বিশিষ্ট সাধনসাফল্যের জন্যে। ১৯৩৯ সালে চালু-করা স্তালিন পুরস্কারের নতুন নাম হল রাষ্ট্রীয় পুরস্কার।

স্তালিনের ভুলভ্রান্তির কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করতে বিরাট সাহসের দরকার হত, কেননা পার্টি আর রাষ্ট্রকে তিনি পরিচালিত করেছিলেন তিরিশ বছরের বেশি কাল ধরে, লেনিনের শিষ্য আর বিশ্বস্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে, সমস্ত রকমের প্রতিপক্ষের আপসহীন শত্রু আর পার্টির মূল কর্মধারার ঐকান্তিক উৎসাহী ধারক-বাহক হিসেবে তিনি নাম করেছিলেন।

এইসব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় তিক্ততাবোধ, গভীর আক্ষেপ এবং কখনও-কখনও ক্লান্তিকর চর্বিতচর্বণ ঘটেছিল — এটা না-হওয়াটা হত অস্বাভাবিকই। ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার

সময়ে অতীতের ঘটনাবলির কিছু কিছু ভ্রান্ত মূল্যায়নও হয়েছিল, তেমনি, কোন কোন ক্ষেত্রে আগে-অর্জিত অভিজ্ঞতার সাবুদ-না-করা সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছিল।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সো.ই.ক.পা'র ২০শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক নিকিতা খ্রুশ্চভ। পার্টি জীবন এবং সোভিয়েত সমাজের বিকাশের একটা নতুন গুরুত্বপূর্ণ পর্বের সূচনা করল এই কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে পার্টির ৭২ লক্ষর বেশি সদস্যের প্রতিনিধিদের গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে এই জিনিসটার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল যে, সমসাময়িক বিকাশের সেই নির্দিষ্ট পর্বের বিশেষক উপাদানটা এই: সমাজতন্ত্র আর একটিমাত্র দেশে গণ্ডিবদ্ধ নয় — তা হয়ে উঠেছে একটা বিশ্বব্যবস্থা। বিশ্বযুদ্ধ রোধ করার বাস্তবতাসম্মত উপায়াদির উপরও পার্টি জোর দিল। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন রূপ, যা বিভিন্ন দেশ ধরতে পারে, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে লেনিনের মতটিকে এই কংগ্রেসে আরও বিশদ করে তোলা হয়েছিল।

সো.ই.ক.পা'র ২০শ কংগ্রেস আগেকার পাঁচ বছরের আর্থনীতিক উন্নয়নের ধারাটাকে সযত্নে বিশ্লেষণ ক'রে ষষ্ঠ পাঁচসালা (১৯৫৬ — ১৯৬০) পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিল।

স্তালিনের ব্যক্তিতন্ত্রের কুফলগুলি দূর করার জন্যে রচিত ব্যবস্থাবলি এই কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়েছিল। এর অল্পকাল পরেই কেন্দ্রীয় কমিটি একটা বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তাতে দেখানো হয়েছিল, ব্যক্তিতন্ত্র দেখা দিয়েছিল কী অবস্থায়, কেন, এবং কোন্ কোন্ পথে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে আরও বিবৃত করা হয়েছিল স্তালিনের ক্রিয়াকলাপের কোন্‌গুলি ইতিবাচক, আর কোন্‌গুলি নেতিবাচক।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর বৈধতার সঙ্গে যা খাপ খায় না, নেতৃত্বের সেই আগেকার পদ্ধতিটাকে যাঁরা তখনও সমর্থন করছিলেন, তাঁরা সো.ই.ক.পা'র ২০শ কংগ্রেসে ঘোষিত কর্মধারার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা বহু বছর যাবত পার্টি আর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন — যেমন, ভিয়াচেস্লাভ মলোতভ, লাজার কাগানোভিচ, গেওর্গি মালেনকভ। তবে, তাঁরা মাত্র নগণ্যসংখ্যক সমর্থকই পেয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের কর্মধারার নিন্দা করেছিল, তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

অতীতের ভুলভ্রান্তি আর বিকৃতি সংশোধন করা এবং ভবিষ্যতে সেগুলির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা রহিত করার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত এইসব ব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্যটাকে সোভিয়েত জনগণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিল। এই হিতকর নতুন যাত্রারম্ভের ফলে অচিরেই আর্থনীতিক উন্নয়নের গতি ত্বরয়িত হয়েছিল, শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি ঘটেছিল লক্ষণীয় মাত্রায়, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ঘটেছিল গুরুত্বসম্পন্ন নতুন নতুন সাধনসাফল্য।

আর্থনীতিক অগ্রগতি। অহল্যাভূমি উন্নয়ন

মিখাইল কালিনিনকে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল: 'সোভিয়েত সরকারের কাছে কার তাৎপর্য বেশি — শ্রমিক, না, কৃষক?' তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'মানুষের কাছে কোন্‌টার তাৎপর্য বেশি — ডান পা, না, বাঁ পা? আমি বলি, আমাদের দেশে কৃষকের চেয়ে শ্রমিককে বিপ্লবের পক্ষে বেশি তাৎপর্যসম্পন্ন বলা, আর কোন মানুষের বাঁ পা কিংবা ডান পা কেটে ফেলা একই ব্যাপার।'

কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত রাষ্ট্র শ্রমিক আর কৃষকের মৈত্রীকে যা তাৎপর্যসম্পন্ন মনে করে সেটা একেবারে ছবির মতো ফুটে উঠেছে ঐ উপমাটিতে। এই কারণেই, পঞ্চম দশকের শেষে আর ষষ্ঠ দশকের গোড়ায় কৃষি পিছিয়ে পড়ছিল দেখে কমিউনিস্টরা উদ্বিগ্ন না-হয়ে পারে নি, এবং যত শীঘ্র সম্ভব কৃষি উন্নয়ন ঠেলে এগিয়ে নেবার প্রয়োজনীয় কর্মসূচি রচনা করা হয়েছিল। কৃষি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোয় কেন্দ্রীয় কমিটির একটা প্লেনারী বৈঠক হয়েছিল। ঐ সময়ে করা বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, দীর্ঘকাল যাবত সরকার ভারি আর হালকা শিল্প এই দুইয়েরই সম্প্রসারণের জন্যে যত অর্থ পৃথক করে রেখেছিল, ততটা কৃষি উন্নয়নের জন্যে করে উঠতে পারে নি। গণ-পরিসরে যৌথকরণ আরম্ভ হবার বছর ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে রাষ্ট্র বুনিয়াদী নির্মাণকাজ আর ভারি শিল্পের সরঞ্জামের জন্যে খরচ করেছিল ৩৬,৮০০ কোটি রুবল, পরিবহনক্ষেত্রে আর হালকা শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল যথাক্রমে ১৯,৩০০ আর ৭,২০০ কোটি রুবল, আর কৃষির জন্যে বরাদ্দ করেছিল মাত্র ৯,৪০০ কোটি রুবল — অর্থাৎ, শুধু ভারি শিল্পের জন্যে মোট ব্যয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। মোটামুটি ঐ একই সময়ে মোট শিল্পোৎপাদন মূল্যের হিসেবে বেড়েছিল ১৬-গুণ, আর কৃষি উৎপাদন রয়ে গিয়েছিল কমবেশি একই। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুদ্ধের হানিকর ক্রিয়াও ছিল বিশেষভাবে গুরুতর, তার উপর, পরিচালনায় ঘন ঘন ত্রুটি এবং পরিকল্পনারচয়িতাদের ভুল হিসেবের দরুন পরিস্থিতিটা হয়ে উঠেছিল আরও জটিল।

১৯৫৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসের প্লেনারী বৈঠকের পরে কৃষি উৎপাদন ঠেলে বাড়াবার অভিযান চলল দেশজোড়া পরিসরে। খামারগুলিকে দেওয়া হল বেশ মোটা টাকার সরকারী সাহায্য

আর অভূতপূর্ব পরিমাণে যন্ত্রপাতি। কৃষির পরিকল্পনপ্রণালীও সংশোধন করে যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অধিকার দেওয়া হল। কৃষিজাত দ্রব্যের দামও রাষ্ট্র বাড়িয়ে দিল, শহর থেকে বহু অভিজ্ঞ পরিচালক পাঠানো হল গ্রামে কাজ করার জন্যে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে যৌথখামারগুলিতে পার্টি সদস্য বেড়েছিল প্রায় আড়াই লক্ষ জন। তখন পার্টি সংগঠন হল প্রত্যেকটা খামারে — যদিও, যুদ্ধের আগে পার্টি সংগঠন ছিল প্রতি আটটা যৌথখামারের মধ্যে মাত্র একটায়।

একই সময়ে ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের একটা বড় অংশের জায়গায় নতুন এবং আবও হাল মডেলের জিনিস শিল্প দিতে পেরেছিল। ১৯৫৮ সালে ব্যবহৃত হচ্ছিল দশ লক্ষর বেশি ট্র্যাক্টর আর পাঁচ লক্ষর বেশি হার্ভেস্টার। কৃষিকর্মীদের মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ ততদিনে দাঁড়িয়েছিল ১৯৪০ সালের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। এই সময়ে যৌথখামারগুলির প্রায় অর্ধেক বিদ্যুৎসজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

এইসব ব্যবস্থার উৎসাহজনক ফল পাওয়া যেতে থাকল অচিরেই। ১৯৫৭ সাল নাগাত গড় ধরনের যৌথখামারগুলির নগদ আয় দাঁড়িয়েছিল ১৯৪৯ সালের ১,১১,০০০ রুবলের জায়গায় ১২,৫০,০০০ রুবল। শিল্পের জন্যে কৃষিজাত কাঁচামাল আর জনসাধারণের জন্যে খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ বেড়েছিল বেশকিছুটা।

আরও একটা ব্যবস্থা — মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন পুনঃসংগঠিত করার ১৯৫৮ সালের বসন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত — যৌথখামার ব্যবস্থাকে মজবুত করে তুলতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চতুর্থ দশকে (কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চম দশকে) মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি ছিল গ্রাম্য লোকসমাজগুলির টেকনিকাল অগ্রগতির কেন্দ্রী উৎসস্থল, বৃহদায়তনের যৌথখামার-কাজ সংগঠনে সেগুলি

ছিল একটা প্রধান ভূমিকায়। যেসব সময়ে কৃষি পুনঃসংগঠিত হচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক ধারায়, আর নতুন যৌথখামারগুলি যখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন এইসব স্টেশনের রাজনীতিক ভূমিকাও ছিল সমানই গুরুত্বসম্পন্ন। তবে, ষষ্ঠ দশক নাগাত সমাজতান্ত্রিক কৃষির উন্নয়ন একটা নতুন পর্বে পেঁছলে, ক্রমাগত বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, কৃষি যন্ত্রপাতি পৃথক পৃথক খামারের হাতেই তুলে দেওয়া দরকার। শহরে আর গ্রামাঞ্চলে এটা নিয়ে শ্রমজীবীদের বিস্তৃত আলোচনা চলেছিল, শেষে ১৯৫৮ সালে মার্চ মাসে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্টেশনগুলিকে পুনঃসংগঠিত করে সেগুলির যন্ত্রপাতি সরাসরি যৌথখামারগুলির কাছে বিক্রি করে দিতে বলা হয়। সর্বোচ্চ সোভিয়েত এই অধিবেশনেই নিকিতা খ্রুশ্চভ সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হন. সঙ্গে সঙ্গে তিনি সো. ই. ক. পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদকও থেকে যান, এই পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু, পরবর্তী ঘটনাবলিতে দেখা গিয়েছিল, এই দুটি প্রধান পদে একই ব্যক্তির থাকাটা অনুপযোগী এবং অবাঞ্ছিত। এর ফলে এক-ব্যক্তির হাতে বড় বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, আর তার ফলে আবার ঘটেছিল সমষ্টিগত নেতৃত্ব-সংক্রান্ত নীতির লঙ্ঘন এবং গোটা একগুচ্ছ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৫৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত গ্রাম-জীবনে বড় বড় পরিবর্তন ঘটেছিল। ততদিনে বেশির ভাগ যৌথখামারের নিজ নিজ কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল, যেগুলি আগে ছিল মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির জিনিস, অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। এই পরিবর্তনের ফলে স্টেশনগুলির দশ লক্ষর বেশি মেকানিক আর ইঞ্জিনিয়র যৌথখামারগুলির স্থায়ী সদস্য হয়ে গেল।

এই সময়ে চালু করা আর-একটা পরিবর্তন হল কৃষিজাত দ্রব্য আসাদনের ব্যবস্থায়। রাষ্ট্র তখন জাতদ্রব্য কিনতে আরম্ভ করল সরাসরি যৌথখামারগুলি থেকে।

কৃষিক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতিতে দেশের পূর্বাঞ্চলগুলি একটা বেশ বড়রকমের ভূমিকায় আসতে থাকল এই সময়েই: এইসব অঞ্চলে অহল্যাভূমি উন্নয়নের অভিযান শুরু হল। দেশের পূর্বভাগে, বিশেষত সাইবেরিয়ায় আর কাজাখস্তানে, বহুবিস্তীর্ণ প্রায়-বসতিবিহীন এলাকা ছিল, সেগুলিতে কখনও চাষআবাদ হয় নি। তার কারণ, এইসব এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থা মোটেই আদর্শরকমের ছিল না। এলাকাগুলি ছিল বসতিকেন্দ্র থেকে দূরে-দূরে, দুরধিগম্য, সেগুলিতে জল ছিল দুষ্প্রাপ্য। এইসব ভূমি উন্নয়ন করতে বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল, একমাত্র বিরাট পরিমাণ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই সেটা করা সম্ভব ছিল।

সাইবেরিয়া আর কাজাখস্তানের সেই বিশাল উন্মুক্ত এলাকাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করল জরিপের দলগুলো। অর্থনীতিবিদ, কৃষি বিশেষজ্ঞ আর পার্টি কর্মীরা প্রকল্পটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করল। ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, ঐসব অঞ্চলে বহুবিস্তীর্ণ অহল্যাভূমিগুলিকে উন্নতি করা হলে জমকালো সুফলই পাওয়া যাবে, আর সোভিয়েত অর্থনীতির সামগ্রিক অগ্রগতির দিক থেকে সেটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ৩ কোটি ২০ লক্ষ একরে চাষআবাদ করার সিদ্ধান্ত হল। স্বল্পকালের মধ্যে এমন আয়তনের ভূমি উন্নয়ন করতে প্রয়োজন ছিল একেবারে দৈত্যের মতোই অসাধ্যসাধন, তা ঘটেও ছিল অচিরেই।

কমিউনিস্ট পার্টি আহবান জানিয়েছিল প্রথমত দেশের নওজোয়ানের কাছে, কিন্তু ডাকে সাড়া দিয়েছিল শুধু তারা নয়। ১৯৫৪—১৯৫৫ সালে অহল্যাভূমিগুলিতে গিয়েছিল কয়েক লক্ষ

লোক — তাদের মধ্যে মোটামুটি সাড়ে-তিন লক্ষ জনকে পাঠিয়েছিল কমসোমল। তাদের অহল্যাভূমিতে যাবার ভাড়া, সেখানে তাদের খরচখরচা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের থাকার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল আগেভাগেই। গোড়ায় বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার পরে এইসব বহুবিস্তীর্ণ ভূমিতে চাষআবাদ করা গিয়েছিল। থাকবার ব্যবস্থা যা ছিল, কর্মিসংখ্যা তার চেয়ে বেশি ছিল কখনও-কখনও, রাস্তা তৈরির কাজ চলেছিল বড় ধীরে, মাঝে মাঝে জলের অভাব হত। খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা, দোকানপাট, সিনেমা, ক্লাব, গ্রন্থাগার, ইত্যাদি বসাবার কাজ ছিল। আর প্রকৃতি নিজেই যেন ছিল এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে: গরমকালে তাপ একরকম অসহ্য, শীতকালে ঠাণ্ডা অতি নিদারুণ — প্রধানত খেপা হাওয়ার দরুন।

ঐসব অহল্যাভূমি উন্নয়ন করতে গিয়েছিল যেসব উৎসাহী অগ্রগামী, তারা ঐসব বাধাবিঘ্ন ক্রমে অতিক্রম করে এইসব অঞ্চলকে বাসযোগ্য করে তুলবার কাজ শুরু করেছিল। আগের পুরুষ-পর্যায় মহাসাহসিকতার সঙ্গে দেশসেবা করার সুযোগ পেয়েছিল — তারা খিবিনির মণিক সম্পদ উন্নয়ন করেছিল, নীপার নদীকে বাগ মানিয়েছিল, নির্মাণ করেছিল মাগনিতোগর্স্ক, জনমানবহীন তাইগার মধ্যে গড়েছিল আমুর-তীরে-কমসোমল্স্ক শহর, তাদের অনেক সময়ে হিংসে করেছিল নতুন পুরুষ-পর্যায়, কিন্তু এবার এল এদের নিজেদেরকে লোককাহিনীর বিষয়বস্তু করে তোলার পালা। অহল্যাভূমিগুলিতে তরুণ-তরুণীরা সেই একই বৈপ্লবিক প্রাণোচ্ছ্বাসের ধারায় শ্রম-বীরত্বের নতুন নতুন সাধনসাফল্য লাভ করল। ঐসব পুব অঞ্চলে দেখা দিল একটার পরে একটা রাষ্ট্রীয় খামার। অহল্যাভূমি উন্নয়ন প্রকল্পে এই খামারই সবচেয়ে উপযোগী বিবেচিত হয়েছিল। গড়ে উঠল সব সুপরিকল্পিত বসতবাড়ি আর খামারের কাজের বাড়ি-ঘর। ফসল তোলার সময়ে দেশের প্রধান শহরগুলির ছাত্ররা আর ইউক্রেন থেকে মেকানিকরা গেল

স্থানীয় খামারীদের সাহায্য করতে। ১৯৫৫ সালে সেই প্রথম অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকেও ছাত্র-ছাত্রী কর্মিদলগুলি সেখানে গিয়ে কাজ করল সোভিয়েত নওজোয়ানের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অচিরেই নতুন খামারগুলি হয়ে উঠল এইসব বিদেশাগতদের শ্রমের বীরকীর্তি, মৈত্রী আর সৌভ্রাত্রের ক্ষেত্র।

অহল্যাভূমি উন্নয়নের গোড়ার লক্ষ্যমাত্রাগুলি কয়েকগুণ ছাপিয়ে সংসাধিত হয়ে গিয়েছিল শিগগিরই, এটা হল একটা বড়রকমের সাফল্য, কিন্তু, শুধু তাই নয়, কতকগুলো কষ্ট-কাঠিন্যও দেখা দিয়েছিল। দেখা গেল, পরিকল্পনারচয়িতাদের বেশ কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল হড়বড়িয়ে, গুরুত্ব দিয়ে না-ভেবেচিন্তে — এমন বিরাট প্রকল্পের জন্যে যা দরকার ছিল, স্থানীয় অবস্থার যথোপযুক্ত বিচার-বিবেচনা করা হয় নি, এইসব এলাকায় পশুপালনের বিষয়ে তেমন নজর দেওয়া হয় নি, এইসব খামারে কাজের মরশুমী প্রকৃতিটা যে খুবই প্রবল তার উপর তেমন লক্ষ্য রাখা হয় নি — এসবের ঠেলা পরে সামলাতে হয়েছিল। তবে, অহল্যাভূমিকে বশে আনার বিরাট সাধনসাফল্য তাতে কোনক্রমেই খাটো হয় না।

সবচেয়ে বড় কথাটা হল এই যে, শস্য উৎপাদন বাড়ানো গেল, যেটা কিনা যাবতীয় সোভিয়েত কৃষি উৎপাদনের মূল জিনিসটা। ১৯৫৬—১৯৫৮ সালে রাষ্ট্রের কেনা সমস্ত শস্যের অর্ধেকের বেশি এসেছিল এইসব এলাকা থেকে। অহল্যাভূমি দেশের উপকার করল শুধু শস্য দিয়ে নয়, — লাখ লাখ তরুণ-তরুণী সেখানে পেল অমূল্য অভিজ্ঞতা, জীবনের শিক্ষা। অহল্যাভূমি উন্নয়নের কাজে ভূমিকার জন্যে সরকার ১৯৫৭ সালে কমসোমলকে 'লেনিন অর্ডার' দিয়েছিল। সেবা-কাজের জন্যে সম্মানচিহ্ন পেয়েছিল তিরিশ হাজারের বেশি তরুণ-তরুণী, ২৬২ জন পেয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বীর' খেতাব।

১৯৫৮ সালে শস্য উৎপাদন হয়েছিল বিপ্লবের পরেকার আমলে সবচেয়ে বেশি — প্রায় ১৩,৪০,০০,০০০ টন। রাষ্ট্র কিনেছিল ১৯৫৩ সালের চেয়ে প্রায় ডবল। মাংস আর দুধ উৎপন্ন হয়েছিল যথাক্রমে ৭৭,০০,০০০ টন আর ৫,৮৭৭,০০,০০০ টন — দুইই ১৯৫৩ সালের চেয়ে বেশকিছুটা বেশি। সব মিলিয়ে, ঐ পাঁচ বছরে সোভিয়েত কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল ৫১ শতাংশ।

সমস্ত ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রে কৃষির সম্প্রসারণ-সাফল্য এবং সমগ্র সোভিয়েত কৃষককুলের জীবনযাত্রার উন্নততর মানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল এই বিরাট জয়। যৌথখামারে আর ব্যক্তিগত জমিখণ্ডে কাজ থেকে কৃষকদের মাথাপিছু আয় হয়েছিল ১৯৫৩ সালের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ আর ১৯৪০ সালের চেয়ে ১২০ শতাংশ বেশি। আগে, বার্ষিক হিসাবনিকাশ শেষ হলে, রাষ্ট্রকে যা দেয় সেটা মিটে গেলে, একমাত্র তখন যৌথখামারীরা পেত তাদের নগদ প্রাপ্য। ১৯৫৬ সাল থেকে যৌথখামারীরা মাসের কিংবা পাদের শেষে নিয়মিত মজুরি পেতে আরম্ভ করল,— তাদের মোট হিসাব করা হত কৃষি-বর্ষের শেষে, ফলাফল অনুসারে।

তবে, কৃষিকে ঠেলে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে সমস্ত সিদ্ধান্তই উপযুক্ত প্রতিপন্ন হয় নি — কোন-কোনটা অর্থনীতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অহল্যাভূমি প্রকল্পের জন্যে অতি বিপুল পরিমাণ অর্থ আর যন্ত্রপাতি বরাদ্দ করার ফলে দেশের মধ্য অঞ্চলে, বরাবরকার চাষআবাদ আর পশুপালনের কেন্দ্রগুলিতে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল সামান্যই। পশু, পোলট্রি, দুধ, মাখন, তরিতরকারি, শস্য আর শিল্পে-প্রয়োজনীয় ফসলের জন্যে রাষ্ট্রের কেনার দাম প্রায় তিনগুণ বাড়ানো হলেও, পশুজাত দ্রব্যসামগ্রীর দাম উৎপাদন-পরিব্যয়ের চেয়ে কম থেকে গিয়েছিল। এসব সত্ত্বেও, কৃষি পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতি ছিল অনস্বীকার্য। ফসল হয়েছিল আরও ভাল,

ঢের বেশি নিয়মিত হয়েছিল পশুখাদ্যের যোগান, পশুর সংখ্যা বেশ বেড়েছিল, তেমনি বেড়েছিল মাংস, দুধ আর মাখনের উৎপাদন।

সমগ্রভাবে দেশের জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি, রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খুবই স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল কৃষির এই অগ্রগতিতে। কৃষি সম্প্রসারণের অভিযানকে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হলেও, শিল্প যাতে সম্প্রসারিত হতেই থাকে সেদিকেও ভালভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছিল। অর্থনীতির এই দুটো শাখায় সাফল্যগুলি পরস্পরের পরিপূরক — তার ফলে ঘটে সামগ্রিক আর্থনীতিক অগ্রগতি।

ততদিনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আরও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ, বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতির পিছনকার কারণ বের করা এবং নতুন নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আর সরকার ১৯৫৫ সালের গ্রীষ্মকালে নির্মাণকর্মী, শিল্প সংগঠক আর আগুয়ান শ্রমিকদের একটা সম্মেলন বসিয়েছিল। কয়েকটা মন্ত্রক আর সরকারী বিভাগের কাজে নানা ত্রুটিবিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। প্রধান কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল ত্বরয়িত টেকনিকাল অগ্রগতিকে; র‍্যাশানালাইজার আর উদ্ভাবকদের এবং সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের সৃজনশীল উদ্যমে উৎসাহনের ব্যবস্থা হয়েছিল। উৎপাদনের নতুন নতুন কৃৎকৌশল চালু করা সহজতর করার জন্যে সরকার নতুন নতুন প্রনিয়ম বেঁধে দিয়েছিল। সারা-ইউনিয়ন উদ্ভাবক আর র‍্যাশানালাইজার সমিতি স্থাপন করা হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে।

ইতোমধ্যে, আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের আরও বেশি ফলপ্রসূ রূপ আর প্রণালী নির্ধারণের চেষ্টা চলতে থাকল। ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে এই প্রসঙ্গে 'প্রাভদা'য় কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল — তাতে বিষয়গুলি ছিল: শিল্প আর

নির্মাণকাজে ব্যবস্থাপনের উন্নতিসাধন, পরিকল্পনের সাধারণ ব্যবস্থায় সংশোধনী ঢুকানো, আর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনায় আর বাস্তবায়নে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের ভূমিকাটাকে আরও বড় করে তোলা। ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রগুলির আর্থনীতিক অধিকার সম্প্রসারিত করে এবং শিল্পের কতকগুলি শাখার তত্ত্বাবধান তাদের হাতে তুলে দিয়ে (এই হস্তান্তরণ হয়েছিল ১৯৫৪—১৯৫৬ সালে) সুফল পাওয়া গিয়েছিল। তবে, প্রয়োজন ছিল আরও বেশি মূলগত ব্যবস্থা। ১৯৫৭ সালে দেশে রাষ্ট্রীয় শিল্পায়তন ছিল দু'লাখের বেশি, আর এক-লাখের বেশি ছিল নির্মাণ প্রকল্প। এমন বিশাল ভূভাগে অমন বিপুল পরিসরে পরিচালিত কাজের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পক্ষে ক্রমাগত বেশি কঠিন হয়ে উঠছিল। মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ স্থানীয় ম্যানেজারদের উদ্যমের গতিরোধক হয়ে উঠেছিল।

এক্ষেত্রে সংস্কারের বনিয়াদ হিসেবে মন্ত্রক তুলে দিয়ে 'সোভনারখোজ' (জাতীয় আর্থনীতিক পরিষদ) বসাবার বিষয়ে ১৯৫৭ সালে দেশজুড়ে আলোচনা চলেছিল। কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছিল, কোন কোন মন্ত্রক তুলে দেওয়া ঠিক নয় — যেমন, আকাদমিশিয়ন ভিন্তের মনে করেছিলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্র, কৃষি আর যোগাযোগ মন্ত্রকগুলিকে বজায় রাখা উচিত। অন্য কোন কোন প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে স্থাপন করা হোক কয়েকটা পরীক্ষামূলক আর্থনীতিক পরিষদ (যেমন, মস্কোয়, লেনিনগ্রাদে আর স্ভের্দলভ্স্কে)। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠের যা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেটা ছিল বিপথগামী, সেটা পরে দেখা যাবে। ১৯৫৭ সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে গৃহীত একটা আইন অনুসারে শিল্প আর নির্মাণকাজের পরিচালন পুনঃসংগঠিত হয়েছিল

আঞ্চলিক ভিত্তিতে — এজন্যে দেশকে বিভিন্ন আর্থনীতিক-প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছিল। আগেকার বেশির ভাগ মন্ত্রক তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির এক্তিয়ারের শিল্পায়তন আর নির্মাণ প্রকল্পগুলি গিয়েছিল আর্থনীতিক পরিষদগুলির হাতে।

পরিকল্পনের কাজে অংশগ্রহণ এবং বুনিয়াদী নির্মাণকাজ আর আর্থিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করতে দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজারদের অধিকার সম্প্রসারিত করাটা শিল্প আরও স্বচ্ছন্দে পরিচালনের সহায়ক হয়েছিল অচিরেই। নতুন পরিকল্পের ফলে শ্রম-সংগঠন আর মজুরি পরিকল্পন ব্যবস্থার কল্যাণ হয়েছিল মোটের উপর।

জনসংগঠনগুলির কাজে, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার অভিযানে, যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ মাত্রায় সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে এবং সর্বসাধারণের সাংস্কৃতিক আর জীবনযাত্রার মান বাড়াবার প্রচেষ্টায় শ্রমজীবী জনগণের বিস্তৃততর অংশকে জড়াবার উপায়াদি নিয়ে ১৯৫৪ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ১১শ কংগ্রেসে আর ১২শ কমসোমল কংগ্রেসেও আলোচনা হয়েছিল।

আরও ব্যাপক পরিসরে গড়ে উঠছিল সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার আন্দোলন। নতুন নতুন নবপ্রবর্তকদের কাজ আর আগুয়ান শ্রমিকদের সাধনসাফল্য সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হত প্রায় প্রতিদিনই। সদ্য-উন্নীত এলাকাগুলোতে নির্মাণকাজ দ্রুত এগোবার মধ্যে শ্রম-কৃতিত্ব আরও বেশি বেশি মাত্রায় সোভিয়েত জনগণের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছিল। ভলগা, নীপার আর কামা নদীতে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিষয়ে রেডিও আর পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে সংবাদাদি দেওয়া হত। ব্রাৎস্কে একটা বিশাল নির্মাণ প্রকল্প-সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রথম খবর আসছিল তখন।

এর আগে ঐ জায়গাটা সম্বন্ধে লোকের জানা ছিল সামান্যই। বৃহৎ সোভিয়েত জ্ঞানকোষের ১৯৫১ সালের সংস্করণে এই তথ্য ছিল: 'ব্রাৎস্ক হল আঙ্গারা নদীর পশ্চিম ধারে একটা গ্রাম। ১৯৫১ সালে এটা স্থাপিত হয়েছিল একটা দুর্গ হিসেবে — ব্রাৎস্ক কারাগার।' ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রাৎস্ক হয়ে উঠল পরবর্তী শিল্পযোজনের একটা যাত্রাকেন্দ্র, যে-শিল্পযোজন পরে সাইবেরিয়াকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। মস্কো থেকে ২,৫০০ মাইল দূরে তাইগার মধ্যে অবস্থিত এই গ্রামটার কথা আগে শুনেছিল খুব অল্প লোকেই, কিন্তু এবার তার নাম শোনা যেতে থাকল ঘরে-ঘরে। ১৯৫৫ সালে সেখানে আরম্ভ হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিম ভাগে চেরেপভেৎস্-এ নতুন ধাতুশিল্পকেন্দ্র নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছিল এই সময়ে। দক্ষিণ উরাল আর ট্র্যান্স-ককেশিয়া অঞ্চলে ধাতু কারখানাও আরম্ভ হচ্ছিল তখন সবেমাত্র। ইয়াকুতিয়ায় লেনা নদীর ধারে ভূবিজ্ঞানীরা বিশাল তৈল সম্পদ আবিষ্কার করল, আর সেখানকার হীরকক্ষেত্র ট্রান্সভাল আর অরেঞ্জ রিভারের সম্পদরাশিকেও ম্লান করে দিল।

শিল্পক্ষেত্র থেকে চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিন-পর-দিন আসতে থাকল স্রোতের মতো। স্তাভ্রোপোল আর মস্কোর মধ্যে চালু হয়ে গেল ইউরোপের সবচেয়ে বড় গ্যাসবাহী নলপথ। সমারোহ অনুষ্ঠান করে উদ্বোধন করা হল ভলগা নদীতে লেনিন বিদ্যুৎকেন্দ্র — এটা তখন ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম। দেশের মানচিত্রে দেখা দিতে থাকল নতুন নতুন সাগর, খাল, মোটরপথ আর রেলপথ, খোলা হতে থাকল নতুন নতুন বিমানপথ।

এই সময়ে শিল্পক্ষেত্রে নাম করল একটা নতুন ধরনের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা। ১৯৫৬ সালে দনেৎস্ অববাহিকায়

নিকোলাই মামাই নামে খনি-শ্রমিক নিজ ব্রিগেডের অন্যান্য সদস্যর সঙ্গে মিলে বললেন, প্রত্যেকটি খনি-শ্রমিক প্রতিদিন তার বাঁধা কোটা থেকে এক-টন বেশি কয়লা তুলুক, তাহলে কোন খনিতে যত শ্রমিক আছে প্রতিদিন তত টন কয়লা উৎপন্ন হবে পরিকল্পিত পরিমাণের উপরে। প্রস্তাবটাকে লুফে নিল দনেৎস্ অববাহিকার শ্রমিকেরাই শুধু নয়, আর কেবল খনি-শ্রমিকেরাই নয়। বহু বিভিন্ন বৃত্তির এবং অর্থনীতির সমস্ত শাখার শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট কোটার উপরে অতিরিক্ত টন আর মিটার উৎপন্ন করতে থাকল, আর চাষ হতে থাকল জমির অতিরিক্ত একরে-একরে।

এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অনুগামী জুটল বহুসংখ্যক। আ. কোলচিকের ব্রিগেডের খনি-শ্রমিকেরা একটা প্রস্তাব তুললেন আরও এগিয়ে — সেটা হল, প্রত্যেক বাড়তি টন কয়লা উৎপন্ন করতে হবে সর্বোচ্চ মাত্রায় দক্ষতার সঙ্গে, যাতে প্রতি-টনে রাষ্ট্রের সাশ্রয় হয় অন্তত এক রুবল। অর্থাৎ কিনা, উৎপাদনের উঁচু মাত্রার সূচকের সঙ্গে এল আরও ফলপ্রদ উৎপাদনপ্রণালী।

মামাই, কোলচিক এবং তাঁদের সহকর্মীদের উদ্যোগে আরম্ভ-করা অভিযানগুলি ছিল জনগণের প্রবল সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের সর্বব্যাপী জোয়ারেরই একটা অঙ্গ, — জনগণের শিক্ষা আর টেকনিকাল যোগ্যতার মান তখন সমানে বেড়ে চলছিল। নবপ্রবর্তকেরা অর্থনীতির সমস্ত শাখার উৎপাদন পরিকল্পনাগুলির সযত্ন বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাপ্তিযোগ্য শ্রম-বল আর বিভিন্ন রকমের মালমশলার সর্বোচ্চ পরিমাণ সদ্ব্যবহার করার উপায় সম্বন্ধে সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত নিতে থাকল। শ্রমিকেরা নিজেদের বৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজও শিখতে থাকল; নিজেদের নির্দিষ্ট শিল্প-শাখার অর্থবিদ্যা তারা বিচার-বিশ্লেষণ করল যত্ন-কষ্ট করে। উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহণের মধ্যে প্রতিফলিত হল সবকিছুতে শামিল হবার এই সোৎসাহ

প্রচেষ্টা, তার থেকে দেখা গেল দেশের মর্যাদা আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যক্তি-শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান দায়িত্বজ্ঞান। ঐ সময়ে অবস্থাটা যা দাঁড়াচ্ছিল তার একটা স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি থেকে: যুদ্ধের ঠিক আগে অবধি টেকনিকে র‍্যাশানালাইজেশনের প্রস্তাব আর নবপ্রবর্তনা এসেছিল মোট ৫,২৬,০০০টা, আর তার পরের আট বছরে ঐ সংখ্যাটা তিনগুণের বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৭,২৫,০০০। এর প্রত্যেকটা প্রস্তাবকে বিশেষভাবে তুলে ধরে বৈষয়িক পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন প্রস্তাবগুলিকে নতুন টেকনিক চালু করার পরবর্তী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করাটাকে রাষ্ট্র শিল্পায়তনের ম্যানেজারদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিল।

১৯৫৮ সালে সোভিয়েত শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী ছিল প্রায় দুই কোটি, ১৯৪০ সালে ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষর কম। তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের বেশির কাজের রেকর্ড ছিল দশ বছরের বেশি, তার মানে, দেশে শিল্পক্ষেত্রে শ্রম-লোকবল ছিল উঁচু দরের যোগ্যতাসম্পন্ন। তাদের বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল উঁচু মাত্রায়, — পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে শিল্পযোজন অভিযানের নায়কদের, যুদ্ধের বছরগুলির আর যুদ্ধোত্তর পুনঃসংস্থাপনের বছরগুলির আগুয়ান শ্রমিকদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল তারা। সোভিয়েত শিল্পের অর্জিত সাফল্যগুলি হল শ্রমিক শ্রেণীর সুপরিণত হয়ে ওঠা আর তাদের বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ঐকান্তিকতার প্রত্যয়জনক প্রমাণ। সাধনসাফল্যগুলির জন্যে দেশের গর্ববোধ করার সংগত কারণই ছিল।

মস্কোর কাছে ওব্নিন্স্কে পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক স্টেশনে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। আরও অনেক বড় একটা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম পর্যায় চালু করা হয়েছিল তার চার বছর পরে। তার অল্পকাল আগেই জলে

ভাসানো হয়েছিল 'লেনিন' নামে পৃথিবীর প্রথম নিউক্লীয় বরফকাটা জাহাজ।

এই কালপর্যায়ে বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিজয়-অভিযানের শিরোমণি হল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণ — পৃথিবীতে সেই প্রথম। একবছর পরে পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমা করল ১·৩ টনের বেশি ওজনের তৃতীয় সোভিয়েত 'স্পুৎনিক', তাতে ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ল্যাবরেটরি।

দ্রুততর টেকনিকাল অগ্রগতি, কৃষির যৌথখামার ব্যবস্থার সংহতি আর অহল্যাভূমি উন্নয়ন, এবং — যা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন — জনগণের প্রবলতর সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ আর ধরে-ফেলা ভুলভ্রান্তিগুলোর নিরসনের সঙ্গে জড়িত ছিল সোভিয়েত অর্থনীতির ত্বরয়িত অগ্রগতি, ঐ সবকিছুর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈষয়িক জীবন আর মনোরাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন পরিবর্তনের পথ প্রশস্ততর হয়ে গেল।

যেসব বিদেশী পঞ্চম দশকের শেষে আর ষষ্ঠ দশকের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিল, এবং পরে আবার এসেছিল ১৯৫৮ সালে, তারা লক্ষ্য করেছিল নানা চোখা-চোখা পরিবর্তন।

'তু-১০৪' বিমানখানা মস্কোর কাছে ভ্নুকভো বিমানবন্দরে নামলে ষষ্ঠ দশকের শেষের দিকে প্রথম যে-জিনিসটা আগন্তুকের মনোযোগ টানত সেটা হল 'ইল-১৮', 'আন্-১০' আর 'তু-১৪৪' বিমানগুলোর প্রকাণ্ড গুচ্ছটা — যদিও, তার অল্প কয়েক বছর আগেও সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন জেট্ যাত্রিবিমান ছিল্ না।

নবাগতেরা গাড়ি করে রাজধানীতে ঢুকতে-ঢুকতে চারদিকে দেখতে পেত ফ্ল্যাটবাড়ির প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ব্লক্, পার্ক, আর গাছের সারি দেওয়া সব রাস্তা, সুন্দর সুপরিকল্পিত সব বসতমহল্লা; সেখানে ১৯৫০ সালেও ছিল শুধু ফাঁকা ফাঁকা জমিখণ্ড আর

ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, আর একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে শুধু ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচতলা বাড়িটা। কিন্তু, ষষ্ঠ দশকের শেষের দিকে অসংখ্য বহুতলার বাড়ির মধ্যে সেই বাড়িটা আর চোখে পড়ে নি, এবং নগরীর সীমান্ত প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল আরও বহু মাইল বাইরের দিকে।

১৯৫৮ সালে আগন্তুকেরা দেখতে পেত মস্কোর প্রথম প্রথম বেশ উঁচু বাড়িগুলি. সেগুলোর ভিত্তিস্থাপন করা হয়েছিল ১৯৪৯ সালে, দেখতে পেত লক্ষাধিক আসনের লুজনিকি স্টেডিয়াম — পঞ্চম দশকের শেষের দিকে তার পরিকল্পনাও করা হয় নি। পঞ্চম দশকের শেষ ভাগ আর ১৯৫৮. সালে দেখা চিত্রের মধ্যে তুলনা করলে, নতুন নতুন ইমারতের সংখ্যা আর রাজধানীর মানুষের বেশভূষা ইত্যাদি সমেত চেহারা দেখে আগন্তুকেরা বিস্মিত হত সংগত কারণেই। ষষ্ঠ দশকের শেষের দিকে মস্কোর রাস্তাগুলোকে দেখা যেত সুসজ্জিত মানুষে ভরতি — তাদের পরনে নানা রঙ আর প্যাটার্নের সরেস কাপড়ের ফ্যাশনমাফিক স্যুট আর পোশাক এবং কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি নানা বেশবাস। বেসামরিক নাগরিকদের পরনে যুদ্ধের আগেকার জামাকাপড়, ফৌজী নিমা আর ওভারকোট, বুট আর প্যাড্‌লাগানো জ্যাকেটের কোন চিহ্নও তখন আর নজরে পড়ত না।

দশ বছর আগে যারা মস্কোয় এসেছিল তারা ১৯৫৮ সালে এসে দেখেছিল নগরীর অনেকছুই এত বদলে গেছে যে, আর চেনাই যায় না। কিয়েভ আর মিন্‌স্ক, ভলগোগ্রাদ আর নভোসিবিস্ক, তাশখন্দ আর আশখাবাদ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যেখানেই তারা যেত তাদের দেখানো হত নতুন নতুন বসতমহল্লা, হাসপাতাল, থিয়েটার, বিদ্যালয়, সংস্কৃতিকেন্দ্র। সবে গড়ে উঠছিল নতুন নতুন শহর — আঙ্গার্স্ক, ব্রাৎস্ক, ভলজ্‌স্কি, দুব্‌না, জিগুলেভ্‌স্ক — সেসব জায়গায় শত শত টাওয়ার ক্রেনের ভিড়।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের দ্বিতীয় পাতাল রেলপথ ১৯৫৮ সাল নাগাত চালু হয়েছিল লেনিনগ্রাদে, আর কিয়েভে পাতাল রেলপথ তখন তৈরি হচ্ছিল। ১৯৫৮ সাল নাগাত টেলিভিশনের এরিয়াল দেখা যেত হামেশাই, ততদিনে দেশে টেলিসেণ্টার হয়েছিল ৭০টার বেশি (যদিও ১৯৫০ সালে তা ছিল মাত্র দুটো, আর তখন অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হত সপ্তাহে মাত্র দুই সন্ধ্যায়)। নতুন নতুন নাট্যাভিনয় আর খেলাধুলার খবর ছড়ানো চকচকে ঝকঝকে পোস্টারে-পোস্টারে রাস্তাগুলোতে ফুটত খুশির আমেজ; বিদেশের নানা অপেরা

কম্পানি, অর্কেস্ট্রা আর থিয়েটার সফর নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল; দেশের ক্রীড়া জীবনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল রেওয়াজী। আধুনিক সাহিত্য, আগামী দিনের মানুষ, সাইবারনেটিক্স, অর্থবিদ্যাক্ষেত্রে বিভিন্ন গাণিতিক প্রণালীর প্রচলন, ইত্যাদি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা ছিল তখনকার দিনে পত্র-পত্রিকাগুলির এবং অসংখ্য সংস্কৃতিকেন্দ্রের একটা বিশেষক উপাদান।

কীভাবে ক্রেমলিন দেখা যায়, এ নিয়ে প্রশ্ন করে বিদেশী আগন্তুকেরা জানতে পেত সেখানে অবাধে প্রবেশ করা যেতে পারে। ছেলেদের কিংবা মেয়েদের একটা ইস্কুল দেখতে যাওয়া যায় কিনা, এ প্রশ্ন করে শুনত, ১৯৫৪ সাল থেকে সব ইস্কুলেই সহশিক্ষা চলে আসছিল।

ঐ সময়কার সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক আর আর্থনীতিক অগ্রগতির প্রতীক ছিল 'স্পুৎনিক'। অক্টোবর বিপ্লবের চল্লিশতম বার্ষিকীর প্রাক্কালে প্রথম 'স্পুৎনিক' ক্ষেপণের অবিস্মরণীয় দিনটি থেকে শব্দটাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত জাতি। আগন্তুকেরা সোভিয়েত ইউনিয়নে যেকোন দেশ থেকেই আসুক না কেন, আর যা-ই হোক না কেন তাদের বিশেষ-নির্দিষ্ট আগ্রহের বিষয়, প্রথম সোভিয়েত 'স্পুৎনিকের' মডেলটি দেখতে যাওয়াটা ছিল তাদের সবারই অপরিহার্য প্রোগ্রাম। তার মানে, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক সাধনসাফল্য প্রদর্শনী'তে দর্শক সমাগম বেড়ে চলেছিল দ্রুত। মহাকাশে উড্ডয়নের পথে প্রথম প্রথম পদক্ষেপগুলি হয়েছিল পৃথিবীর মাটিতেই, সেটা তো অবিসংবাদিত: প্রথম 'স্পুৎনিক' ক্ষেপণে মূর্ত হয়ে উঠল সমাজতন্ত্রের শিল্প-পরাক্রম।

সুবিদিত মার্কিন রাজনীতিক চেস্টার বোল্‌জ্‌ পর্যন্ত বলেছিলেন: 'সোভিয়েত ''স্পুৎনিক'' অবধি একরকম কেউই আমেরিকার শিল্পগত, সামরিক আর বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন

তোলে নি। তারপরে সহসা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকল "স্পুৎনিক", তখন কোটি কোটি মানুষ বলতে থাকল, জিতে চলার পক্ষ বুঝি-বা কমিউনিজমই।'*

কিন্তু, প্রথম 'স্পুৎনিক' দেখা দেওয়াটা কি সত্যিই আকস্মিক? সোভিয়েত ইতিহাসের সূচনাকালে লেনিন নিকোলাই নেক্রাসভের

কন্স্তান্তিন সিওল্কোভস্কি

কয়েকটা পঙ্‌ক্তি অনুস্মরণ করেছিলেন, সেগুলি কবির মনোজগতের যন্ত্রণায় ভরপুর, দেশের দুর্দশা দেখে তিনি বেদনাহত, আবার তার নিহিত ক্ষমতা সম্বন্ধেও কবির আবেগমুখর আস্থা। উনিশ শতকের এই কবি রাশিয়ামাতাকে 'হতভাগিনী আর অবলা' বলে বর্ণনা করেছিলেন, আর লেনিন মনে করেছিলেন,

নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই সমাবেশে বিভিন্ন বিবরণে আর বক্তৃতায় সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছিল চল্লিশ বছরে ঘটানো সামাজিক-আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ফল। ইতিহাসের নিরিখে চল্লিশ বছর তো নগণ্য কালপর্যায়ই, কিন্তু মনে রাখা দরকার এই চল্লিশের মধ্যেও আঠারোটা ছিল যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পুনঃসংস্থাপনের সময়, তাতে সোভিয়েত জনগণের সাধনসাফল্যের পরিসরটা ফুটে ওঠে বরং আরও প্রাঞ্জলভাবেই। এই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলি দেশকে এমনভাবে রূপান্তরিত করল যে, তাকে যেন আর চেনাই যায় না, দেশকে তারা করে তুলল একটা প্রধান শিল্প-কৃষি-সমৃদ্ধ শক্তি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্ণাঙ্গ পরিসরে কমিউনিজম গড়ার কালপর্যায় ১৯৫৯

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির আরও সংহতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ পরিসরে কমিউনিজম গড়তে নামার সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা পরিগণ্য শক্তি হয়ে উঠেছিল। কিউবায় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবের বিজয় হল ১৯৫৯ সালের একটা বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। পশ্চিম গোলার্ধে একটি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে পা বাড়াল সেই প্রথম।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার আর্থনীতিক আর রাজনীতিক অগ্রগতি চলতে থাকল ক্ষিপ্রগতিতেই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখা গেল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকশিত হয় নিম্নলিখিত বুনিয়াদী ধারায়: সমানুপাতিক আর্থনীতিক উন্নয়ন; জনগণের মধ্যে সৃজনশীল উদ্যোগের প্রবলতাবৃদ্ধি; আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কর্মবিভাগের নিরন্তর সৌকর্যবৃদ্ধি; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিবারের সমস্ত দেশের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার সুফলপ্রসূ বিচার-বিশ্লেষণ; প্রত্যেকটি দেশের বিভিন্ন বিশেষ-নির্দিষ্ট অবস্থা আর জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সযত্ন বিবেচনা; সহযোগিতা আর সৌভ্রাত্রের পারস্পরিক সহায়তার সংহতিসাধন।

এই সময় নাগাত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন উপাদানগুলি ছিল — উৎপাদনে

সহযোগ, আর্থনীতিক পরিকল্পনাগুলির সমন্বয়, নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি দেশের স্বার্থ ঠিকমতো বিবেচনায় রেখে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ আর খাপ খাওয়ানো। জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের তথ্য অনুসারে, পা. আ. স. প'র দেশগুলির মধ্যে সহযোগের ফলে তারা নিজেদেরই উৎপাদন আর পারস্পরিক বিনিময়ের উপর নির্ভর ক'রে যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম যা প্রয়োজন তার ৯৫ শতাংশই মেটাতে পেরেছিল। পা.আ.স.প'র দেশগুলি ইতোমধ্যেই স্থির করেছিল যে, ইঞ্জিনিয়রিং শিল্পের দু'হাজারটার বেশি আর রাসায়নিক দু'হাজারটার বেশি জিনিস হবে বিভিন্ন নির্দিষ্ট দেশের বিশেষিত ক্ষেত্র। বিশেষীকরণ সাফল্যের সঙ্গে সংসাধিত হচ্ছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এই সবকিছু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক উন্নয়ন ত্বরায়িত করার সহায়ক। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞেরা হিসেব কষে দেখেছে, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জাতীয় আয়বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে মোটামুটি ৮০ শতাংশ বেশি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্প আর কৃষি উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধির হার ছিল ঐ পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে যথাক্রমে ৮০ আর ১৩০ শতাংশ বেশি, এই দুই রকমের দেশসমষ্টির নির্মাণকাজের পরিমাণের মধ্যে ব্যবধান ১১০ শতাংশ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক ক্ষমতাবৃদ্ধিটা হল ইউরোপে আর পৃথিবীর অন্যত্রও শান্তি সংহত হবার একটা নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা। সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উত্তেজনাপূর্ণ — তাই, উপরোক্ত উপাদানটা ছিল আরও বিশেষভাবে তাৎপর্যসম্পন্ন। আন্তর্জাতিক আইনকানুনে যা অতি গর্হিত, এমনসব হীনতম উপায় অবলম্বন করতেও প্রস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫১ সালের মে মাসে

সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্রের আকাশে একখানা গোয়েন্দা বিমান পাঠিয়েছিল। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় একটা সামরিক আক্রমণ-হস্তক্ষেপ সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল — তার অবশ্য কলঙ্ককর ব্যর্থ পরিণতি ঘটেছিল। ১৯৬২ সালের বসন্তকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার পৃথিবীর আবহমণ্ডলে অ্যাটমবোমার পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেছিল। ঐ বছরই শরৎকালে প্রতিক্রিয়াপন্থী মার্কিন মহলগুলো কিউবায় দ্বিতীয় আক্রমণ-অভিযানের পরিকল্পনা রচনা করতে লেগেছিল — কিউবাকে তারা যুদ্ধজাহাজ দিয়ে অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল। কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু নমনীয় কর্মনীতির কল্যাণেই শেষপর্যন্ত এই সংঘাতের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সময়ে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে কার্যক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বন করাবার জন্যে অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন একতরফাভাবেই সশস্ত্র শক্তি হ্রাসের সিদ্ধান্ত ক'রে পশ্চিমী শক্তিগুলিকেও তাই করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি এবং তাদের মিত্ররা তার জবাবে ইউরোপে উত্তেজনা চাঙ্গা করে তুলল, পশ্চিম বার্লিন থেকে সংগঠিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ তীব্রতর করল, নতুন যুদ্ধ বাধাবে বলে প্রকাশ্য হুমকি দিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৬ সালের জন্যে ধার্য সশস্ত্র শক্তি হ্রাসের সিদ্ধান্ত বন্ধ রেখে প্রতিরক্ষাব্যয় বাড়াতে বাধ্য হল। ১৯৫৬ সালে, ওয়ারস সন্ধিচুক্তি আর ন্যাটোর সদস্য-দেশগুলির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্যে পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে প্রস্তাব তুলেছিল ওয়ারস সন্ধিচুক্তির দেশগুলি। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬০ সালে ২৩এ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৫শ অধিবেশনে বিবেচনার জন্যে 'ঔপনিবেশিক দেশ এবং জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দেবার বিষয়ে ঘোষণাপত্র' পেশ করেছিল। এই বিষয়ে আফ্রিকা আর এশিয়ার ৪৩টা দেশের প্রস্তাবে সোভিয়েত প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রের প্রধান দফাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল — এই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় খসড়া প্রস্তাবাদি পেশ করেই ক্ষান্ত দেয় নি — যারা লড়ছিল স্বাধীনতা আর অধিকারের জন্যে সেসব জাতিকে সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি সহায়তাও দিচ্ছিল বরাবর। পশ্চিম ইরিয়ানকে ইন্দোনেশিয়ার মধ্যভাগের সঙ্গে মিলিত করার জন্যে ঐ দেশের মানুষের প্রচেষ্টা সমর্থন করেছিল এবং পোর্তুগালের উপনিবেশ গোয়া, দমন আর দিউ মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভারতের অবলম্বিত ব্যবস্থার সপক্ষে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কঙ্গোয় ভয়ানক সংগ্রামের দিনগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময়েই ছিল কঙ্গোর জনগণের পক্ষে; কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা ১৯৬০ সালে বলেছিলেন: 'দেখা গেল, বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্য থেকে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই একেবারে শুরু থেকেই কঙ্গোর জনগণকে তাদের সংগ্রামে সমর্থন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী আর ঔপনিবেশিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নবীন কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে আপনাদের দেশ এই যে-সময়োচিত এবং গুরুত্বসম্পন্ন নৈতিক সমর্থন দিয়েছে, সেজন্যে আমি সোভিয়েত জনগণকে কঙ্গোর জনগণের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইছি।'

ভিয়েৎনামে মার্কিন আক্রমণ বন্ধ করার জন্যে প্রচেষ্টা সপ্তম দশকে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিতে একটা গুরুত্বসম্পন্ন স্থানে এসে গেল। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় বড় সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে এবং গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের

শহর আর গ্রামগুলিতে বোমাবর্ষণ করতে শুরু ক'রে ভিয়েৎনামে আক্রমণ-অভিযান তীব্রভাবে সম্প্রসারিত করল। কিন্তু, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব বর্বরতা ভিয়েৎনামী জনগণের দৃঢ়সংকল্প খর্ব করতে পারে নি। পৃথিবীর সর্বত্র প্রগতিশীল মানুষ ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের উপর ক্রুদ্ধ ধিক্কার হানল। এই 'নোংরা যুদ্ধের' বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠল খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগ্রামে ভ্রাতৃপ্রতিম ভিয়েৎনামী জনগণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই সর্বাঙ্গীণ সহায়তা দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছে। ভিয়েৎনামী জনগণ তাদের গণ-পরিসরে বীরত্বের দৌলতে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং পৃথিবীর সমস্ত বিবেকবান লোকের সমর্থন পেয়ে বড়রকমের জয় লাভ করেছে — যুদ্ধ বন্ধ আর নিজেদের ভূমিতে শান্তি স্থাপনের চুক্তি ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত হয়।

বিভিন্ন জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে বাস্তবতাসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই সোভিয়েত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে, মহাকাশে এবং জলের তলে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের জন্যে ১৯৫৬ সালে মস্কোয় স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি তার একটা বিশেষ লক্ষণীয় নিদর্শন। এই সন্ধিচুক্তিতে গোড়ায় সই দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বৃটেন, কিন্তু অচিরেই তাতে সই পড়েছিল আরও শতাধিক রাষ্ট্রের। পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ভূগর্ভস্থ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে চুক্তি সম্পাদনের জন্যেও সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সপ্তম দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ক্রিয়াকলাপ চলেছিল যখন ইতিহাস-ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঠেলে দেবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের অতি প্রতিক্রিয়াপন্থী মহলগুলো আবার

চেষ্টা করছিল। ঐ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামে যুদ্ধ সমানে সম্প্রসারিত করে সেটাকে বাদবাকি ইন্দোচীনেও ছড়িয়ে দেয়। প্রতিক্রিয়াপন্থী কু ঘটল ঘানায় (১৯৫৬) আর গ্রীসে (১৯৫৬)। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে ইস্রায়েল আগ্রাসী যুদ্ধ আরম্ভ করল আরব জাতিগুলির বিরুদ্ধে, সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন ডাকল। কিন্তু, দখল-করা এলাকাগুলো থেকে ইস্রায়েলী ফৌজ নিঃশর্তে অপসারণ করা এবং ক্ষয়-ক্ষতি বাবত খেসারত দেবার ব্যবস্থাসংবলিত প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদে গৃহীত হবার পথরোধ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তার সামরিক সহযোগীরা। সোভিয়েত সরকার এবং পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির পরবর্তী প্রচেষ্টার কল্যাণে ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে দখল-করা সমস্ত আরব রাজ্যক্ষেত্র থেকে ফৌজ সরিয়ে নিতে বলা হল ইস্রায়েলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ইস্রায়েল কিন্তু পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই ইচ্ছা অনুসারে কাজ করল না।

১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলো তাদের কার্যকলাপ তীব্রতর করে তুলতে থাকল, তাতে নগ্ন সমর্থন দিল প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। এটা হল সমাজতন্ত্রের আদর্শক্ষেত্রে দারুণ বিপদ। ওয়ারস সন্ধিচুক্তির প্রত্যেকটি সদস্য-দেশে যুক্তভাবে সমাজতন্ত্র রক্ষা করা হবে ব'লে এই সন্ধিচুক্তিতে শরিক ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এর বহুকাল আগেই, আর তখন এল তদনুসারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার সময়। ১৯৫৬ সালের অগস্ট মাসে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্য ঢুকল চেকোস্লোভাকিয়ায়। চেকোস্লোভাকিয়ায়

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিবারের পরাক্রম ক্ষুণ্ণ করার জন্যে আভ্যন্তরিক প্রতিবিপ্লব আর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলোর অপচেষ্টা এইভাবে খতম হল।

১৯৫৬ সালের জুন মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ৭৫টা কমিউনিস্ট আর শ্রমিক পার্টির প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে এই সম্মেলনের কাজে। একালের মূল সমস্যা — সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ছিল এই সম্মেলনে কেন্দ্রী আলোচ্য বিষয়। এই সম্মেলনে ভাব-ধারণাবিনিময়ের ফলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব আরও সমৃদ্ধ হল, মুক্তির জন্যে এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতির জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের বিদ্যমান পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে আরও বিশদ করে তুলতে এই সম্মেলনের কাজ সহায়ক হল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তির অভিন্ন সংগ্রামে সো.ই.ক.পা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগামী ভূমিকার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করল এই সম্মেলন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে লক্ষিত সমস্ত সুবিধাবাদী আর জাতীয়তাবাদী মতধারাকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত-প্রত্যাখ্যান করা হল। বিশেষ জোর দেওয়া হল চীনা নেতাদের উপদলীয় চক্রী ক্রিয়াকলাপের হানিকর প্রভাবের উপর। এই সম্মেলন স্পষ্ট করে তুলল যে, সামনে নানা কষ্ট-কাঠিন্য থাকা সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট আন্দোলনই সমসাময়িক পৃথিবীতে সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাজনীতিক শক্তি, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির সংগ্রামী আগুয়ান বাহিনী।

সোভিয়েত কমিউনিস্টরা এই সম্মেলনের ফলাফলের প্রতি সর্বসম্মত অনুমোদন জানিয়েছিল। সমগ্র সোভিয়েত জনগণ

নিজেরাই দেখতে পেল, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী আর সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তিই নির্ধারণ করছে মানবজাতির অগ্রগতির প্রধান পথটাকে।

সাতসালা পরিকল্পনা

মস্কোয় সো. ই. ক. পা'র ২১শ কংগ্রেস বসেছিল ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ আর চূড়ান্ত জয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছিল এই কংগ্রেসেই। তার আগেকার চার দশকে সোভিয়েত জনগণ পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থাটাকে বদলে দিচ্ছিল এবং কাজ চালাচ্ছিল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে। ষষ্ঠ দশকের শেষ নাগাত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কায়েম হয়েছিল অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখা দেবার ফলে বৈরকার পুঁজিতান্ত্রিক বেষ্টনী আর ছিল না। ততদিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবনে যে-পর্ব এসে গিয়েছিল, তাতে ভিতর কিংবা বাইরে থেকে উঠে যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুঁজিতান্ত্রিক অতীতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারে, এমন কোন শক্তি আর ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শিবির যখন বর্তমান, বুর্জোয়া দুনিয়ার শাসকেরা কোন চূড়ান্ত ঝুঁকিদার হঠকারিতায় মেতে উঠবে না, এমন কোন ষোল-আনা নিশ্চয়তা নেই, তা ঠিক, কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজি আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাজ আবার কায়েম করতে পারে, এমন কিছুই ততদিনে আর ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে চিরকালের মতো।

২১শ পার্টি কংগ্রেসের কিছুকাল আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় আদমশুমার হয়েছিল কুড়ি বছর পরে, তার আগের

আদমশ্মার হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। এই আদমশ্মারে পাওয়া মালমশলা থেকে নির্ধারণ করা গেল জনসংখ্যার গড়নে সংঘটিত পরিবর্তনগ্লির প্রকৃতি কী, আর দেশের শ্রম-বল সম্পদের বিশ্লেষণ করা গেল। আগেকার আদমশ্মারের পরবর্তী কুড়ি বছরে জনসংখ্যা বেড়েছিল ১৭,০৬,০০,০০০ থেকে ২০,৮৮,০০,০০০। এই বৃদ্ধির অর্ধেকের সামান্য বেশি হল লাতভিয়া, লিথ্য়ানিয়া, মোলদাভিয়া, এস্তোনিয়া এবং বেলোর্শিয়া আর ইউক্রেনের পশ্চিমাংশদ্টির মান্ষ, এইসব অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যুদ্ধের অল্পকাল আগে। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঢের বেশিই হত, যদি নিদারুণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অমন বিপ্ল ক্ষয়-ক্ষতি না-হত।

১৯৫৭ সালে শহরবাসীরা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ জন। জনসংখ্যার বিশেষ বড়রকমের বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল দেশের প্র্বাঞ্চলগ্লিতে। সামগ্রিক জনসংখ্যাবৃদ্ধি ছিল ৯·৫ শতাংশ, আর পৃথক পৃথক করে ধরলে সেটা ছিল, উরাল অঞ্চলে ৩২ শতাংশ, প্র্ব সাইবেরিয়ায় ৩৪ শতাংশ, পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ২৪ শতাংশ, সোভিয়েত দ্র প্রাচ্যের অঞ্চলে ৭০ শতাংশ, মধ্য এশিয়া আর কাজাখস্তানে ৩৮ শতাংশ।

যেমন আগেকারটায় তেমনি ১৯৫৯ সালের আদমশ্মারের সময়েও সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন বেকারি ছিল না। কাজ করার অধিকার খাটাবার কার্যক্ষেত্রের স্যোগ-স্বিধা ছিল প্রত্যেকেরই, সর্বসাধারণের উ'চু মাত্রায় শ্রম ক্রিয়াকলাপের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হল এই আদমশ্মারে। কর্মক্ষম লোক-বলের প্রতি ১০০ নাগরিকের মধ্যে গড়ে ৮৩ জন বৈষয়িক আর আত্মিক ম্ল্যবস্তু সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করছিল।

এই আদমশ্মার থেকে আর-একটা লক্ষণীয় জিনিস হল

শিক্ষার উঁচু মান। জনসংখ্যার প্রায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ জনের ছিল উচ্চশিক্ষা কিংবা সাত-বছর আর দশ-বছরের ইস্কুল শেষ করা শিক্ষা, ঐ পর্যায়ে ছিল শ্রমিকদের শতকরা ৩২ জন।

১৯৫৯ সাল নাগাত জনসংখ্যার বারো-আনি ভাগের জন্ম হয়েছিল বিপ্লবের পরে, অর্থাৎ কিনা, শ্রমজীবী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটারই গড়ে ওঠার সময়টা আর গোটা প্রাপ্তবয়স্ক জীবন কেটেছিল সমাজতন্ত্রের আমলে। ঐ সময় নাগাত সো.ই.ক.পা'র সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট ৯০ লক্ষ, কমসোমলের সদস্যসংখ্যা মোটামুটি দুই কোটি, আর ট্রেড ইউনিয়নে ছিল প্রায় ছয় কোটি।

লেনিন একবার বলেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিকাশের অপরিমেয় সমৃদ্ধিশালী পরিপ্রেক্ষিত নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আর শ্রম-বল এবং সৃজনশীল ক্ষমতা আছে। বিপ্লবের প্রথম চল্লিশ বছরে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের সাফল্যমণ্ডিত অগ্রগতির ফলে সোভিয়েত জনগণের বৈষয়িক সমৃদ্ধি আর মনোবলের বিপুল বৃদ্ধি ঘটে এবং পরে আরও জমকালো অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালেই পৃথিবীর মোট শিল্পোৎপাদনের পঞ্চমাংশ হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে, — এই অঙ্কটা ১৯১৩ আর ১৯৩৭ সালে ছিল যথাক্রমে ৩ শতাংশের একটু বেশি এবং মোটামুটি ১০ শতাংশ।

দেশের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থান বিশ্লেষণ করে সো.ই.ক.পা'র ২১শ কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবেশ করেছে বিকাশের এক নতুন পর্বে — সেটা হল পূর্ণাঙ্গ পরিসরে কমিউনিজম গড়ার পর্ব। কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল ভিত্তি গড়ার অভিযান চালানো এবং সোভিয়েত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট

নীতিগুলিকে মজবুত করাকেই দেশের প্রধান কর্তব্য হিসেবে ধরা হয়। ঐতিহাসিক বিকাশের এই নতুন পর্বে জনগণের সামনে পড়ল বিপুল সৃজনশীল কর্মকান্ড, তাতে একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করার দরকার হল, এই পরিকল্পনায় ছিল পূর্ণাঙ্গ পরিসরে কমিউনিজম গড়ার পটভূমিতে দেশের আর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান ধারা আর লক্ষ্যগুলি। এদিকে প্রথম ধাপ হল ১৯৫৯—১৯৫৬ সালের সাতসালা পরিকল্পনা, সেটা নিয়ে গোড়ায় কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালেই। ঐ সময়ে চালু করা হয়েছিল আর্থনীতিক পরিচালনব্যবস্থার পুনর্গঠন, তার ফলে পৃথক পৃথক ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র এবং আর্থনীতিক প্রশাসনিক অঞ্চলের পরিকল্পন আরও বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। আগের পরিকল্পনা রচিত হবার পরে দেশের পূর্বাঞ্চলে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মণিকের আকর আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেগুলিকে ঐ পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হয় নি; গৃহনির্মাণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা আর রাসায়নিক এবং আরও কয়েকটা শিল্পের উন্নয়ন ত্বরায়িত করার জন্যে ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের সিদ্ধান্তগুলিকেও ঐ পরিকল্পনায় বিবেচনা করা হয় নি। এর ফলে স্থির হয় যে, ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ হবার আগেই ১৯৫৯—১৯৫৬ সালের পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণ-অঙ্কগুলি স্থির করা হবে (অর্থাৎ, ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনার বাদবাকিটা এবং গোটা পরবর্তী পরিকল্পনার জন্যে হিসাবাদি করা)।

নিয়ন্ত্রণ-অঙ্কগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনায় যেসব সিদ্ধান্ত হয় সো.ই.ক.পা'র ২১শ কংগ্রেস তার পর্যালোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এই নতুন আর্থনীতিক কর্মসূচির জমকালো লক্ষ্যমাত্রাগুলি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেও অভিনব। আর্থনীতিক উন্নয়নের খাতে পরবর্তী সাত বছরের জন্যে

অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৯১৭ সালের পর থেকে সমগ্র কালপর্যায়ে ঐ খাতে যা বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার সমান। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, তৈল আর গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো, রাসায়নিক শিল্পের উন্নয়ন এবং অর্থনীতির সমস্ত শাখার বিদ্যুৎসজ্জার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কৃষি উৎপাদন বেশকিছু পরিমাণে বাড়াবার ব্যবস্থাও ছিল এই পরিকল্পনায়। পরিকল্পনা ছিল কাজের সপ্তাহ ছোট করা হবে, গৃহনির্মাণের বিরাট কর্মসূচি চালু করা হবে, মজুরি বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য পূর্ণতম মাত্রায় সোভিয়েত নাগরিকদের বৈষয়িক আর আত্মিক প্রয়োজন মেটাবার আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

সাতসালা পরিকল্পনার প্রেরণাদায়ক লক্ষ্যগুলি এবং পার্টি থেকে নির্ধারিত নতুন নতুন ক্ষেত্র জয় করার কর্মসূচি সোভিয়েত জনগণকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলেছিল। কংগ্রেস আরম্ভ হবার আগেই হাজার হাজার কর্মিসমষ্টি তাদের শ্রমতৎপরতা আরও বাড়াবার সংকল্প করেছিল।

কংগ্রেস যে গণ-উৎসাহ-উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল তার একটা বৈশিষ্ট্য আগেকার বিভিন্ন কালপর্যায়ের অনুরূপ ব্যাপার থেকে পৃথক ছিল: এই সর্বসাম্প্রতিক সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা শুরু হল দেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন অনেক উঁচু মাত্রায় পেঁছিবার পরে। ১৯৩৫ সালে স্তাখানভ আন্দোলন শুরু হলে তার প্রতিষ্ঠাতাদের ১০২ টন কয়লা কাটতে লাগত ছ'ঘণ্টা, সেটা তখন ছিল অবাককান্ড। তার কুড়ি বছর পরে 'দন্‌বাস্‌-২' কয়লা-কাটারী দিয়ে সেই পরিমাণ কয়লা কাটা যেত এক ঘণ্টার কম সময়ে। ১৯৩৫ সালে ইঞ্জিনচালক ক্রিভোনস্‌ মালগাড়ি চালাতে পেরেছিলেন ঘণ্টায় ২০-২১ মাইল, তখন প্রচলিত মান ছিল ঘণ্টায় ১৫ মাইল, ২০-২১ মাইল ছিল রেকর্ড; ইতোমধ্যে ১৯৫৯ সাল নাগাত সোভিয়েত মালগাড়ির গড় বেগ দাঁড়িয়েছিল ঘণ্টায়

২৫ মাইল। ১৯৩৫ সালে 'প্রাভ্দা ভস্তোকা' ('পূর্বের সত্য') পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল দু'হাত দিয়েই তুলো তোলার একটা পরীক্ষামূলক প্রণালী সম্বন্ধে; তার পঁচিশ বছর পরে উজবেকিস্তানের প্রথম নারী তুলো-হার্ভেস্টারচালিকা তুর্সুনোই আহুনোভা লিখেছিলেন: 'আজও আমরা তুলো ফসল তুলি একই সঙ্গে দু'হাত ব্যবহার ক'রে, কিন্তু আমাদের হাত দু'খানা চালায় একটা বাধ্য যন্ত্রকে। আমার যন্ত্রটা একাই গড় মাত্রায় দক্ষতাসম্পন্ন প্রায় এক-শ' জন তুলো-তোলা শ্রমিকের জায়গায় কাজ করে।'

ততদিনে অর্থনীতির সমস্ত শাখায় যেসব লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছিল তার অল্প কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করা হল। চতুর্থ দশকের রেকর্ডগুলো ১৯৫৯ সাল নাগাত মামুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার অনেক রেকর্ড ছাড়িয়েও কাজ হচ্ছিল। বদলে গিয়েছিল শুধু যন্ত্রপাতি নয়, — সাতসালা পরিকল্পনা নাগাত লোকের শিক্ষার মান ছিল একেবারে পৃথক। চতুর্থ দশকের আগুয়ান নবপ্রবর্তকদের বেশির ভাগেরই ছিল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা, অর্থাৎ, ইস্কুলে চার-বছরের পড়া। ষষ্ঠ দশকের শেষে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলনে আগুয়ান শ্রমিকেরা ছিল বেশির ভাগই দশ-বছরের ইস্কুল শেষ করা কিংবা সাত-বছরের ইস্কুল শেষ করা আর তার উপর টেকনিকাল স্কুলে চার-বছরের পাঠ্যধারা শেষ করা নারী-পুরুষ। ১৯৩৯ সালের আদমশুমার অনুসারে প্রতি হাজার শ্রমিকের মধ্যে গড়ে ৮২ জনের অন্তত সাত-বছরের ইস্কুলে পড়া ছিল, আর ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাস নাগাত ঐ অংকটা হয়েছিল ৩৮৬, আর টার্নার, ইঞ্জিনচালক এবং মিলিং-মেশিন অপারেটরদের মধ্যে অংকটা ছিল যথাক্রমে ৬৬৭, ৬০২ এবং ৬৮৩।

শ্রমজীবীদের শিক্ষাগত আর টেকনিকাল যোগ্যতার মান ঢের বেশি উঁচু হয়েছিল শুধু তাই নয়, তাদের রাজনীতিক

চেতনাবোধও ঐ সময় নাগাত ছিল অনেক বেশি প্রখর, দেশের শিল্পগত আর জন জীবনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ ছিল অনেক বেশি প্রবল। ঐ সময়ে বিদ্যমান মেজাজ অনুসারে চালিত হয়ে মস্ক্‌ভা-সোর্তিরোভচ্‌নায়া রেল-স্টেশনের তরুণ শ্রমিকেরা প্রস্তাব তুলেছিল যে, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে হবে আরও বিস্তৃত ভিত্তিতে, — কোটা ছাপিয়ে কাজ করার রেওয়াজী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগ করতে হবে নিয়মিত পাঠ্যধারা নেওয়া এবং এমন জীবনযাত্রা সংগঠিত করা যা হবে একেবারে নিখুঁত। তারা আরও প্রস্তাব তুলেছিল যে, আগুয়ান ব্রিগেডগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালাবে, আর য়ারা ঐ তিনটে কড়ারই পালন করতে পারবে তারা 'কমিউনিস্ট শ্রমের ব্রিগেড' খেতাব পাবে। 'কমসোমল্‌স্কায়া প্রাভ্‌দা' পত্রিকা তরুণ শ্রমিকদের এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিল, এই নতুন সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলন চালু করাতে পত্র-পত্রিকাগুলি, রেডিও এবং পার্টি, ট্রেড-ইউনিয়ন আর কমসোমল সংগঠনের পরিচালিত সাংগঠনিক কাজ একটা গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা পালন করেছিল। তরুণ রেল-শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাজার হাজার ব্রিগেড, কর্মশালা, কারখানা আর নির্মাণকর্মিদল নতুন নতুন দায়-দায়িত্ব নিয়েছিল। এই নতুন প্রতিযোগিতা অভিযান শ্রমজীবীদের পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে কাজ করতে প্রণোদিত করেছিল অভূতপূর্ব পরিসরে, বহুসংখ্যক শ্রমিক উৎসাহিত হয়ে নৈশ বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল, বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আর টেকনিকাল স্কুলে বহিঃস্থ পাঠ্যধারা নিয়েছিল, বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়ে ভরতি হয়েছিল। বহু শহরে আর গ্রামে বসানো হয়েছিল যাকে বলা হয় জন-সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে শ্রমজীবীরা বিজ্ঞান, টেকনিক, সাহিত্য আর আর্টের বহু বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতামালা শুনত। বসতমহল্লাগুলিতে গাছ আর ঝোপ-ঝাড় লাগানো, বাচ্চাদের

খেলার জায়গা তৈরি করা এবং সমষ্টিগত জীবনযাত্রার নিয়মাবলির প্রতিপালন নিশ্চিত করার অভিযান সংগঠিত করার জন্যে সর্বত্র গড়া হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের কমিটি।

ভিশনি ভলোচকের ভালেন্তিনা গাগানভার একটা পরিকল্প অচিরেই সারা দেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। প্রখর সামাজিক চেতনাবোধসম্পন্না এই তাঁতিনী একটা আগুয়ান কর্মিদল স্বেচ্ছায় ছেড়ে একটা পিছিয়ে-পড়া কর্মিদলে যোগ দিয়েছিলেন। নতুন সহকর্মীদের নিজের মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে সাহায্য করে গাগানভা তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোকে আরও ভালভাবে আয়ত্ত করিয়েছিলেন, তারা হয়ে উঠেছিল তাঁর টেক্সটাইল কারখানায় সবচেয়ে সেরা একটা কর্মিসমষ্টি। গাগানভার মজুরির পরিমাণ গোড়ায় অনেকটা কমে গেলেও তিনি তাতে আদৌ নিবৃত্ত হন নি। গাগানভার নিঃস্বার্থ কর্তব্যপালনে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের সর্বত্র আরও অনেকে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল।

কমিউনিস্ট শ্রমের ব্রিগেড কিংবা তড়িৎকর্মা খেতাব পাবার যোগ্যতা পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না, — এই খেতাব পেত শুধু যথার্থই সুযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর কর্মীরা। এই খেতাবের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যা সমস্ত প্রজাতন্ত্রে দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৫৬ সালের শেষাশেষি নাগাত এই নতুন ধরনের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শহর আর গ্রামগুলির দুই কোটি মানুষ। তাদের নিবিড় শ্রম-দান হয়েছিল সোভিয়েত আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান। এইসব নর-নারীর কাজে আর আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছিল সোভিয়েত সমাজের বিকাশের একটা নতুন পর্ব।

ততদিনে জনগণের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবং সামাজিক বিকাশের নিয়মাবলির বিশ্লেষণের জোরে কমিউনিস্ট পার্টি স্থির করল, কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ

গড়ার একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব এবং, প্রকৃতপক্ষে, অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কমিউনিস্ট গঠনকাজে আত্মনিয়োগ-করা সোভিয়েত জনগণের তখন একটা ধারণা পাওয়া দরকার ছিল যে, এই যুগান্তকারী লক্ষ্য সাধন করা যেতে পারে কত সময়ের মধ্যে এবং কী উপায়ে, আর সে-লক্ষ্যে পৌছবার পথে বড় বড় দিকচিহ্নগুলি কী হতে পারে। সে-লক্ষ্যে পৌছবার পথ দেখাল সো.ই.ক.পা'র নতুন তৃতীয় কর্মসূচি: দেশের সর্বত্র সমস্ত পর্যায়ে আলোচনার পরে এই কর্মসূচি শেষে গৃহীত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে সো.ই.ক.পা'র ২২শ কংগ্রেসে।

সো.ই.ক.পা'র নতুন কর্মসূচি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কর্মসূচি সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবার জন্যে তার আগেকার দুটি কর্মসূচির কোন কোন উপাদান স্মরণ করা ভাল।

১৯০৩ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ২৬টা সংগঠনের ৪৩ জন প্রতিনিধি ঐ পার্টির প্রথম কর্মসূচির খসড়া নিয়ে আলোচনা করেছিল। ঐ সময়ে পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির অনুরূপ দলিলের সঙ্গে এই কর্মসূচির মিল ছিল সামান্যই। এই কর্মসূচি ছিল একখানা অস্ত্র, যা ব্যবহার করা হবে প্রথমে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক এবং পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ঘটাবার সংগ্রামে, আর এটা ছিল ঐ সময়কার একমাত্র রাজনীতিক কর্মসূচি, যাতে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের ধারণাটাকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা হয়েছিল। ঐ কংগ্রেসে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এসেছিল 'বলশেভিক' শব্দটা: এর গোড়ার অর্থটা ছিল খুবই সহজ-সরল, এটা ছিল লেনিনের

সমর্থক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা তাঁর পেশ-করা কর্মসূচি গ্রহণ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিল তাদের নাম। 'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই' স্লোগানটার মতোই ঐ নামটা তখনও বাদবাকি পৃথিবীতে অজানাই ছিল। ঐ পর্বে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না যে, রাশিয়ায় বিপ্লবী মার্কসবাদীদের ঐ ছোট গ্রুপটা শিগগিরই একটা পরাক্রমশালী সংগঠন হয়ে উঠবে এবং কোটি কোটি মানুষকে পরিচালিত করবে বৈপ্লবিক ভবিষ্যতের মাঝে — যা বাদবাকি মানবজাতির ঐতিহাসিক অগ্রগতির পথ আলোকিত করবে।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত হয় পার্টির দ্বিতীয় কর্মসূচি, — প্রথমটা ইতোমধ্যে কার্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে গিয়েছিল, পার্টি নতুন প্রজাতন্ত্রের অর্জিত বৈপ্লবিক সাফল্যগুলি রক্ষা করছিল এবং সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে জনগণকে পরিচালিত করছিল। ৩,১৩,০০০ জন কমিউনিস্টের ৪০৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল এই কংগ্রেসে। তারা নতুন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেছিল; পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমগ্র কালপর্যায়ে পার্টির কর্তব্যগুলি এই কর্মসূচিতে বিবৃত হয়েছিল। এই কংগ্রেসের পরে প্রতিনিধিরা ফিরে গিয়েছিল দেশের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে, যা তখন ছিল অবরুদ্ধ কেল্লার মতো। নতুন কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত করার আগে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলো আর বৈদেশিক আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র রক্ষা করার জন্যে লড়তে হয়েছিল বহু ভয়ানক লড়াই।

সো.ই.ক.পা'র ২২শ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে — নতুন তৈরি-করা ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে। এই কংগ্রেসে ছিল প্রায় এক কোটি পার্টি সদস্যের ৪,৮১৩ জন

প্রতিনিধি। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের কর্মসূচি গৃহীত হয় এই কংগ্রেসে। সমস্ত স্তরে পার্টি আর জন সংগঠনগুলিতে আলোচনার জন্যে এই কর্মসূচির খসড়া প্রকাশ করা হয়েছিল কংগ্রেস বসার আড়াই মাস আগে। খসড়া কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় নব্বই লক্ষর বেশি লোক অংশগ্রহণ করেছিল। সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিভিন্ন স্থানীয় পার্টি সংস্থায় পাঠানো তিন হাজার চিঠিতে নানা রকমের প্রস্তাবাদি ছিল।

এই কর্মসূচি রচনার কাজটা হল বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের তত্ত্ব আর চলিতকর্ম ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কমিউনিস্ট সমাজের সবচেয়ে মূলগত দিকগুলি এবং তার বিকাশের দুটো পর্ব গোড়ায় সংজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলস। তার এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে, সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের বুনিয়াদী নিয়মগুলি পরে বিবৃত করেছিলেন লেনিন: 'পুঁজিতন্ত্র থেকে মানবজাতি সরাসরি যেতে পারে শুধু সমাজতন্ত্রে, অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির করা কাজের পরিমাণ অনুসারে জাতদ্রব্যাদির বণ্টনে। আমাদের পার্টি আরও সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করে: সমাজতন্ত্র অনিবার্যভাবেই ক্রমে বিবর্ধিত হয়ে কমিউনিজমে পরিণত হবে, তার পতাকায় লেখা থাকবে এই মূলমন্ত্র: ''প্রত্যেকে দেবে সামর্থ্য অনুসারে, আর পাবে প্রয়োজন অনুসারে''।'*

লেনিন জোর দিয়ে বলে গেছেন, 'কমিউনিজম হল উচ্চতর রূপের সমাজ, সেটা গড়ে উঠতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে'।** তিনি বলেছিলেন: '...সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের মধ্যে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পার্থক্য হল এই যে,

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৪তম খণ্ড, ৮৪—৮৫ পৃঃ

** ঐ, ৩০তম খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ

প্রথম কথাটার অর্থ হল পংজিতন্ত্রের ভিতর থেকে উদ্ভূত নতুন সমাজের প্রথম পর্ব, আর দ্বিতীয় কথাটার অর্থ হল পরবর্তী এবং উচ্চতর পর্ব।'* সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, একটা থেকে পরবর্তী পর্বে উত্তরণ একটা অব্যাহত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। অক্টোবর মহাবিপ্লবের পরে প্রথম চার দশকে গড়ে উঠল অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ। ঐ বছরগংলিতে সমাজতন্ত্র গড়বার মধ্যে সোভিয়েত জনগণ ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজের বিভিন্ন উপাদানও সৃষ্টি করছিল, এইভাবে তারা প্রস্তুত করছিল ক্রমে কমিউনিজমে উত্তরণের পথ। ষষ্ঠ দশকের শেষে আর সপ্তম দশকের গোড়ায় অবিলম্বে কমিউনিজম গড়াই হয়ে উঠল সোভিয়েত জনগণের প্রধান সৃজনশীল কর্তব্য।

কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার মূর্ত-নির্দিষ্ট বিভিন্ন পর্যায় এবং কাজগংলিকে কীভাবে ধরে এগোতে হবে, তা সো.ই.ক.পা'র কর্মসূচিতে বিবৃত আছে। এই নির্মাণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরস্পরসংশ্লিষ্ট তিনটে ঐতিহাসিক কর্ম সংসাধিত করতে হবে: গড়ে তুলতে হবে কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ; কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্ক অভিব্যক্ত হওয়া চাই; শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন মানুষ। প্রথমেই চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন কাজ হল কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল ভিত্তি গড়া, সেটা সমস্ত নাগরিকের বৈষয়িক আর আত্মিক সম্পদের পরম প্রাচুর্য সৃষ্টি করবে। এই ভিত্তি পাবার জন্যে দরকার দেশের পূর্ণাঙ্গ বিদ্যুৎসজ্জা, তারপরে দেশের বিদ্যুৎসজ্জিত শিল্প আর কৃষির সৌকর্যসাধন, অর্থাৎ, অর্থনীতির সমস্ত শাখায় যন্ত্রপাতি, টেকনিক এবং সামাজিক উৎপাদন সংগঠনের সুসাধ্যতার ব্যবস্থা। তার জন্যে আরও দরকার হবে উৎপাদনের সর্বাঙ্গীণ যন্ত্রসজ্জা

* ঐ, ২৯তম খণ্ড, ৪২০ পৃঃ

আর স্বয়ংক্রিয়তা, বিভিন্ন রাসায়নিক টেকনিকের ব্যাপক প্রয়োগ এবং নতুন নতুন শক্তি আর মালমশলা সৃষ্টি করায় নিবিড় তৎপরতা, এই সবকিছুতে জড়িত থাকবে প্রাকৃতিক, বৈষয়িক আর শ্রম সম্পদের বহুমুখী আর যুক্তিযুক্ত সদ্ব্যবহার, বিজ্ঞান আর উৎপাদনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দ্রুত বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মোটারকমের বৃদ্ধি।

দেশে ইতোমধ্যে যেসব উৎপাদন-শক্তি গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলির সমানে অগ্রগতি দেখে বলা যায়, ঐ কর্তব্য সাধনসাধ্য, সেটা সাধিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন হবে আর্থনীতিক বিচারে পৃথিবীর সরচেয়ে পরাক্রমশালী দেশ। এই কর্মসূচিতে বিবৃত লক্ষ্যগুলি সংসাধিত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শহরে আর গ্রামে শ্রমজীবীদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকবে, সেটা হবে প্রধানত নিয়মিতভাবে মজুরিবৃদ্ধি আর তার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম কমানো এবং ক্রমে কর তুলে দেবার ফলে। সামাজিক ভোগ তহবিল সাধারণ নাগরিকদের জীবনে ক্রমাগত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসে যাবে, এই তহবিল বাড়বে মজুরির চেয়ে বেশি হারে। এই তহবিলের সাহায্যে কিণ্ডারগার্টেনে আর বোর্ডিং স্কুলে শিশুদের ভরণপোষণ হবে নিখরচ, নিখরচ হবে ফ্ল্যাট, জনকৃত্যক পরিবহন, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পরিবার পাবে সুব্যবস্থাযুক্ত বাসস্থান; সোভিয়েত কর্মসপ্তাহ আর কর্মদিন হবে পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট। এইসব ব্যবস্থা আবার আরও দ্রুত সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহায়ক হবে এবং ব্যক্তির ক্ষমতার সর্বতোমুখী বিকাশের জন্যে সামাজিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তার সৃজনশীল অংশগ্রহণের জন্যে প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করবে।

উৎপাদন-শক্তিগুলির এই বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থনীতিক কাঠামে পরিবর্তনগুলি কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্ক মজবুত করার সহায়ক হবে। ঐসব সম্পর্কের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীগত

পার্থক্য দূর হবে, শহর আর গ্রামের জীবনযাত্রা আর কাজের অবস্থার মধ্যে এবং যারা মাথার কাজ করে আর যারা হাতে কাজ করে তাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য দূর হবে। এইসব জটিল প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল সেই ১৯১৭ সালেই, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অবলম্বিত প্রথম প্রথম ব্যবস্থাগুলিতে, উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাবার গোড়ার দিককার ব্যবস্থাগুলিতে। লেনিন বলেছিলেন: 'বিভিন্ন শ্রেণী লোপ করার অর্থ হল, সমগ্র সমাজের মালিকানায় **উৎপাদনের উপকরণ** সম্পর্কে **সমস্ত** নাগরিককে **সমান** অবস্থানে স্থাপন করা।'* ১৯১৭ সালের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা দিয়েছিল দুই রকমের মালিকানা — রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং যৌথ-সমবায়ের মালিকানা — এই দুইয়ের যুগপৎ বিকাশের ফলে এই দুটো শেষপর্যন্ত মিলেমিশে গিয়ে হবে সমগ্র জনগণের একই অভিন্ন কমিউনিস্ট সম্পত্তি। এই ব্যাপারটাই হল শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষকের মধ্যেকার পার্থক্য দূর করে দেবার আর্থনীতিক পূর্বশর্ত।

এই প্রক্রিয়াটার পাশাপাশি, শহর আর গ্রামের মধ্যেকার সামাজিক-আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক পার্থক্য দূর হয়ে যাবে জীবনযাত্রার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য দূর হবার সঙ্গে একত্রে। কৃষিক্ষেত্রের শ্রম শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়াবে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমের একটা রকমফের। যারা হাতে কাজ করে তাদের শিক্ষার আর টেকনিকাল যোগ্যতা যারা মাথার কাজ করে তাদেরই সমান মাত্রায় উন্নীত হবে। শ্রমজীবীদের ভিতরে মাথার কাজ আর হাতে কাজ-করা লোকেদের মধ্যে বাস্তব বিভাগটা হয়ে যাবে বাতিল, সেকেলে। তারপরে, শ্রমিক, যৌথখামারী আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহযোগিতার জায়গায় আসবে শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজের শ্রমজীবী সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা।

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২০তম খণ্ড, ১৪৬ পৃঃ

বিভিন্ন নৃকুলের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিকাশেরও একটা নতুন পর্যায় আসবে শিগগিরই। জাতিসংক্রান্ত প্রশ্নে সমাজতন্ত্র দুটো পরস্পর-সম্পর্কিত ধারা সৃষ্টি করেছে: প্রত্যেকটি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন জাতির ক্রমাগত বেশি মাত্রায় পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া এবং পরস্পরের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব। দেশের আর্থনীতিক ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং সামাজিক পার্থক্যগুলো দূর হবার প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র আর স্বায়ত্তশাসিত বিভাগগুলির মধ্যে বৈষয়িক আর আত্মিক সম্পদের বিনিময় প্রবলতর হয়ে উঠছে। একই সমাজতান্ত্রিক, আন্তর্জাতিকতাবাদী মর্মবস্তু নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির সংস্কৃতি জাতীয় রূপে ক্রমাগত আরও কম পৃথক হয়ে উঠছে। গড়ে উঠবে একটা সম্মিলিত আন্তর্জাতিক লোকসমাজ: জাতিগত পার্থক্য, বিশেষত ভাষাগত পার্থক্যগুলির দূরীকরণ হবে শ্রেণীগত পার্থক্য দূর করার চেয়ে দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তবে, এটাও একটা মূলত প্রগতিশীল বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। শেষপর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কমিউনিজম জয়যুক্ত হলে পৃথক পৃথক সত্তা হিসেবে জাতিগুলি এবং জাতিগত পার্থক্য ক্রমে মিলিয়ে যাবে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের রাষ্ট্র থেকে সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠা এবং পরে এটা স্বশাসিত কমিউনিস্ট সমাজে পরিণত হবার বিষয়ে সো.ই.ক.পা'র কর্মসূচিতে বিবৃত থিসিসটি সারা পৃথিবীরই পক্ষে যথার্থ ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন। সো.ই.ক.পা'র কর্মসূচিতে আছে: 'কমিউনিজমের প্রথম পর্ব সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ আর চূড়ান্ত বিজয় এবং পূর্ণাঙ্গ পরিসরে কমিউনিজম গড়াতে সমাজের উত্তরণ ঘটিয়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব তার ইতিহাসনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করেছে এবং, আভ্যন্তরিক কর্তব্যগুলির দিক থেকে দেখলে, সেটা সোভিয়েত

ইউনিয়নে আর অপরিহার্য নয়। যে-রাষ্ট্র দেখা দিয়েছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের রাষ্ট্র হিসেবে সেটা নতুন, সমসাময়িক পর্বে হয়ে দাঁড়িয়েছে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত মানুষের ইচ্ছাকে রূপদান করছে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে সমগ্র সোভিয়েত সমাজের সামাজিক ঐক্য। কমিউনিজমের চূড়ান্ত বিজয় অবধি এ রাষ্ট্র থাকবে, ঐ বিজয় নিষ্পন্ন করাই এর অস্তিত্বের হেতু।'

সোভিয়েতগুলির ক্রিয়াকলাপ, জনসংগঠনগুলির অধিকার আর কাজের সম্প্রসারণ এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে নিখুঁত করে তোলার জন্যে পরিচালিত সম্ভাব্য যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন বলে তুলে ধরা হয়েছে এই কর্মসূচিতে। এই প্রণালীতেই সমস্ত নাগরিককে টেনে আনা যায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে, আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের তত্ত্বাবধানে, রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজে আর তার ক্রিয়াকলাপের উপর জন-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, যেগুলি হল পার্টির কর্মসূচির কড়ার। অবশেষে, জন-প্রশাসনে আর সাধারণের বিষয়াবলিতে অংশগ্রহণ করতে থাকবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, আর তার থেকে উদ্ভূত উঁচু মাত্রার গণতন্ত্র ষোল-আনা কমিউনিস্ট স্বশাসনের পথ প্রস্তুত করবে।

কমিউনিজম গড়ায় সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্য হল নতুন মানুষের শিক্ষাদীক্ষা। আত্মিক সমৃদ্ধি, নৈতিক পবিত্রতা আর দৈহিক স্বাস্থ্য-সুস্থতা মিলিয়ে ব্যক্তি-মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার কাজ পার্টি হাতে নিয়েছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি উঁচু মাত্রায় নীতিনিষ্ঠ আত্মনিয়োগের মনোভাব, শ্রমের প্রতি আর সমগ্রভাবে অর্থনীতির প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সেটা একটা কেন্দ্রী গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্য। শ্রেণীহীন সমাজের সক্রিয় নির্মাতা এই নতুন মানুষের শিক্ষাদীক্ষা

আর গড়নপিটনের জন্যে সমস্ত সোভিয়েত নারী-পুরুষের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা চাই, তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা চাই স্বদেশের জীবন এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ব বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে প্রগাঢ় উপলব্ধি। সো.ই.ক.পা'র কর্মসূচির মধ্যে আছে 'কমিউনিজম-নির্মাতাদের নৈতিক আচরণবিধি', — তার মূলনীতিগুলি দৃঢ়মূল হয়ে আছে সোভিয়েত জনগণের অভিজ্ঞতার মধ্যে, সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে। এই নীতিগুলিতে রূপায়িত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক নৈতিকতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ আর জনস্বার্থের একত্ব, যার বনিয়াদ হল এই মূলমন্ত্রটি:. 'সবারই জন্যে প্রত্যেকে, আর সবাই প্রত্যেকের জন্যে'।

সমগ্র মানবজাতি বিকাশের যে বর্তমান পর্বে পেঁছেছে সেটার এবং তার কমিউনিস্ট ভবিষ্যতের পর্যালোচনা করে সো.ই.ক.পা'র ২২শ কংগ্রেস যুদ্ধ আর শান্তি সম্বন্ধে নিজ মতাবস্থান স্পষ্ট করে তুলে ধরল বিশেষ-নির্দিষ্টভাবে। এটাই যে এযুগের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়, তা বড় একটা কেউ অস্বীকার করবে না। তাপ-নিউক্লীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদ রয়েছে আমাদের এই পৃথিবীর, সে-যুদ্ধ বাধলে ধ্বংস-বিলুপ্ত হয়ে যাবে গোটা গোটা দেশ আর জাতি। এই কারণেই বলা হল, সাম্রাজ্যবাদীরা যাতে অতি মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ বাধাতে না-পারে সেজন্যে তাদের যথাসময়ে শায়েস্তা করে রাখাই — **তাপ-নিউক্লীয় যুদ্ধ রোধ করা** — শ্রমজীবী জনগণের প্রধান কর্তব্য।

এই কংগ্রেস দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করল যে, সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের আগেও, অর্থাৎ, পৃথিবীর একাংশে পুঁজিতন্ত্রের রাজত্ব থাকার অবস্থায়ও, আমাদের এই গ্রহের জীবন থেকে বিশ্বযুদ্ধের বিপদ একেবারে দূর করে দেবার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ যতকাল রয়েছে, আগ্রাসী যুদ্ধের সম্ভাবনাও

থাকবে ততকাল; কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র আর শান্তির শক্তিগুলির খুবই লক্ষণীয় বৃদ্ধিই বর্তমান আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদ আর নয় — পৃথিবীর বিকাশের প্রধান ধারাটাকে এখন নির্ধারণ করছে সমাজতন্ত্র।

আরও একবার পার্টি স্পষ্ট করে দিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণকাজ সোভিয়েত জনগণের বিরাট আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য, সেটা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার স্বার্থের আর আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত এবং সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের পরিপূরক।

সাতসালা পরিকল্পনা সংসাধন

পার্টির ২২শ কংগ্রেসে গৃহীত সো.ই.ক.পা'র কর্মসূচিটিকে সোভিয়েত জনগণ গ্রহণ করল সমগ্র জনগণেরই কর্মসূচি হিসেবে। সাতসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে তারা কমিউনিজম গড়ার প্রচেষ্টায় প্রথম প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই ধরল, ঐসব লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবার জন্যে আরও কঠিন পরিশ্রম করতে তাদের অনুপ্রাণিত করল এই কর্মসূচি।

১৯৫৬ সালে মাগনিতোগর্স্কের শ্রমিকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগুয়ান ধাতুশিল্প কারখানাগুলির শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি ধরে ফেলল। এক-মাসে ৮০,০০০ টনের বেশি কয়লা উৎপন্ন করে একটা বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করল দনেৎস্ অববাহিকার খনি-শ্রমিকেরা। ঐ বছরই তাতার প্রজাতন্ত্রের আগুয়ান শ্রমিকেরা ১৯৫৬ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনেকটা ছাড়িয়ে কাজ করেছিল।

যুদ্ধের আগেকার পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির সময়ে প্রথম প্রথম শিল্প প্রকল্পগুলি দেখা দিলে সেটা হত সারা দেশে উদ্‌যাপনের ব্যাপার। সপ্তম দশকে ঢের বেশি ক্ষমতার কল-কারখানা,

বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইত্যাদি নির্মিত এবং চালু হয়েছিল, এমনসব সাধনসাফল্য অচিরেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধরা কথা। পত্র-পত্রিকায় এমনসব ঘটনার বিবরণের জন্যে জায়গা হত অপেক্ষাকৃত কম; এই সময়ে সংবাদপত্রগুলিতে সম্পাদকীয় এবং মূল প্রবন্ধ লেখা হত কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের ভীমকায় সৃষ্টিগুলি সম্বন্ধে — যেমন, সাইবেরিয়ায় নির্মীয়মাণ বিশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি, ভলগার পাড় থেকে পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আর হাঙ্গেরিতে প্রসারিত 'দ্রুজ্বা' ('মৈত্রী') তৈলবাহী নলপথ। বোখারা থেকে উরাল অঞ্চল অবধি প্রসারিত কয়েক হাজার মাইল লম্বা গ্যাসবাহী নলপথ পাতা হয়েছিল এবং মস্কো থেকে বৈকাল হ্রদ অবধি গোটা রেলপথটাকে বিদ্যুৎসজ্জিত করা হয়েছিল, সেও সপ্তম দশকে। ১৯৫৬ সাল নাগাত ব্রাৎস্ক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় — সেটা তৈরি করতে সময় লেগেছিল মাত্র তিন বছর।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্রে দেখা দিতে থাকল নতুন নতুন শহর। তার একটা হল দিভ্‌নোগর্স্ক — সাতসালা পরিকল্পনা শুরুর আগে কেউ শোনে নি তার কথা। সেখানে একজন তরুণ নির্মাণ শ্রমিকের পরিবার তার সঙ্গে থাকতে গেলে — শহরটির ইতিহাসে সেই প্রথম পরিবার — তাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল কমসোমল কমিটির আপিসে। তবে, ১৯৫৬ সালের আরম্ভ নাগাত এই শহরে বিয়ে হয়েছিল এক-হাজারের বেশি, আর প্রায় ১,৮০০টি শিশুর জন্ম রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়েছিল — এরা হল দিভ্‌নোগর্স্কের খাঁটি আদিবাসিন্দা। ১৯৫৬ সালে ২৫এ মার্চ মস্কোয় পৌঁছেছিল এই তারবার্তাটা: 'ক্রাস্নয়ার্স্কের সময় ১৭:৩০ ইয়েনিসেই বাঁধ তৈরি শেষ, নদী জোতা গেল কমিউনিজমের জন্যে!' তার একটু পরেই, ব্রাৎস্কের বিদ্যুৎ-দৈত্যের চেয়ে বেশি ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল।
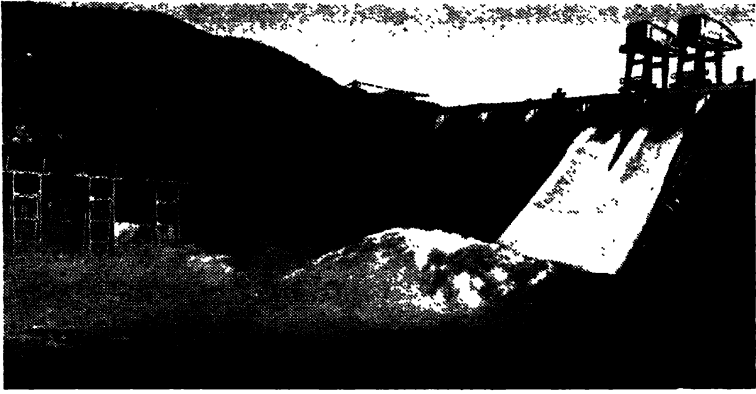
ইয়েনিসেই নদীতে নির্মীয়মাণ ক্রাস্নয়ার্স্ক বিদ্যুৎকেন্দ্র

সাতসালা পরিকল্পনা মোটের উপর সংসাধিত হচ্ছিল সন্তোষজনকভাবে। দ্রুত এগিয়ে চলছিল রাসায়নিক শিল্প। দেশের শক্তি-অনুপাতে নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকায় এসে গিয়েছিল গ্যাস আর তৈল। রেলপথগুলিতে কাজের প্রধান অংশটা চলছিল বৈদ্যুতিক আর ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে। রীইনফোর্স্ড কনক্রিট দিয়ে আগে-তৈরি গৃহাংশ নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল যথার্থই বিপুল পরিসরে। গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির কাজ চলছিল দ্রুত, কর্মসূচিটাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছিল। ১৯৫৬ সালে সেই প্রথম, দেশের শহরের জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যাকে ধরে ফেলল।

শিল্পক্ষেত্রে এই অগ্রগতির জোরে পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে বাড়াবার উদ্দেশ্যে পুনর্বিবেচনা করার জন্যে ১৯৫৬ সালে একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী অভিজ্ঞতার দরুন পরিকল্পনারচয়িতাদের নজর ফেরাতে হয়েছিল অন্যান্য দিকে: পুঁজি-বিনিয়োগ বিক্ষিপ্ত হবার কারণ কী, কৃষি কেন শিল্পের সঙ্গে তাল রেখে চলছে না, উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন এবং

ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের মধ্যে অসামঞ্জস্য কেন, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি কেন ধীরি।

আরও নিবিড় আর্থনীতিক বিশ্লেষণের জন্যে এবং আর্থনীতিক পরিকল্পনার বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপাদনের দিকে আরও ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দেবার জন্যে সো.ই.ক.পা'র কর্মসূচিতে দাবি ছিল। উৎপাদনের আরও ফলপ্রদ প্রণালী এবং পরিকল্পন আর দামবাঁধার আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখিয়ে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল পত্র-পত্রিকাগুলিতে। বিভিন্ন বিশেষ-নির্দিষ্ট কারখানা, নির্মাণকর্মিদল, বিভাগ এবং আর্থনীতিক পরিষদের (সোভ্নার্খোজ) কাজে সুযোগের অবহেলা সম্বন্ধে লিখেছিল বিভিন্ন বিজ্ঞানী, নির্বাহী কর্মকর্তা আর পার্টি কর্মীরা। ১৯৫৭ সালে গৃহীত আর্থনীতিক পরিচালনব্যবস্থাটায় বেশ কতকগুলো অসুবিধা দেখা যেতে থাকল। গোড়ায় আর্থনীতিক পরিষদগুলি তাদের তত্ত্বাবধানভুক্ত বিশেষ-নির্দিষ্ট এলাকাগুলোর প্রতিষ্ঠানগুলিতে সুফলপ্রসূ উদ্যম সৃষ্টি করতে বিস্তর কাজ করেছিল, কিন্তু পরে এই নতুন ব্যবস্থাটা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার মনোভাব সৃষ্টি করতে থাকল। অর্থনীতির পৃথক পৃথক শাখা অনুসারে পরিচালনব্যবস্থা বর্জিত হবার ফলে অর্থনীতির তত্ত্বাবধানের কাজ অপ্রয়োজনীয়রূপে জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, — কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট শাখার উন্নয়নের জন্যে সরাসরি দায়িত্বশীল নয়, এমন বিপুলসংখ্যক আর্থনীতিক সংস্থা দেখা দিয়েছিল।

দেশের আর্থনীতিক পরিচালনব্যবস্থার ঘন ঘন পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল না সেই পরিস্থিতিতে, তা স্পষ্ট। কিন্তু, এমন একটা অবস্থা দেখা দিয়েছিল, যাতে পরিচালনযন্ত্রের পুনঃসংগঠনকেই শিল্প আর কৃষি ব্যবস্থাপন উন্নততর করার উপায় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর্থনীতিক পরিষদগুলোকে আরও বড় করার এবং নতুন নতুন বিভাগের একটা বন্দোবস্ত দাঁড় করাবার চেষ্টা

হয়েছিল, কিন্তু তাতে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় নি। অচিরেই সৃষ্টি হয়েছিল একটা অচল অবস্থা: উৎপাদন আর বুনিয়াদী নির্মাণের পরিকল্পনার পর্যালোচনা করে এক-প্রস্থ সংস্থা, আর-এক প্রস্থ সংস্থা দেখে সরবরাহের পরিকল্পনা, আর নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন আর আয়ত্ত করার ব্যাপার দেখে অন্য এক-প্রস্থ সংস্থা। এইভাবে যা অবস্থা দাঁড়াল তাতে শিল্পের যেকোন বিশেষ শাখাকে সমগ্রভাবে ধরে পর্যালোচনা করার কোন কেন্দ্র আর রইল না। ফলে, ঐ সময়ে বহু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, টেকনিকাল অগ্রগতি হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ধীরি, আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কর্মসূচি এবং বৈজ্ঞানিক আর টেকনিকাল নবপ্রবর্তনের কর্মসূচি পুরোপুরি সংসাধিত হয় নি। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ব্যাপারে এবং স্বয়ংক্রিয়তা আর সর্বাঙ্গীণ যন্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রে ধীর অগ্রগতিতে সেটা পরিলক্ষিত হয়েছিল আরও বিশেষভাবে।

সাতসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলিতে মোটের উপর পেঁছিন গেলেও, শিল্পের কোন কোন শাখায় আরও অনেককিছু করবার ছিল। ১৯৫৩—১৯৫৮ সালে অর্জিত সাফল্যগুলির পরে কিছুটা আত্মসন্তুষ্টি দেখা দিয়েছিল কোন কোন রাষ্ট্রনেতার মনোভাবে। সাতসালা পরিকল্পনার রচয়িতারা ধরে নিয়েছিল, মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলিকে তুলে দিয়ে যন্ত্রপাতি সব খামারগুলির কাছে বিক্রি করে দেবার পরে কৃষি যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার হবে ঢের বেশি: খামারের যন্ত্রপাতির উৎপাদন কিছুটা কমাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এইসব ভুল হিসেবের কুফল সামলাবার জন্যে পরিকল্পনার প্রথম বছরগুলিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে কোন কোন পশুজাত জিনিস কেনার দামও বাড়াতে হয়েছিল, তার ফলে খুচরা দাম চড়াতে হয়েছিল মাংস আর মাখনের। ট্র্যাক্টর, শস্য-হার্ভেস্টার আর অজৈব সারের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে অতিরিক্ত অর্থ পাবার চেষ্টা হয়েছিল। কৃষি পরিচালনে

ঐ সময়ে চালু-করা পুনঃসংগঠন থেকে বড়রকমের সুফল পাবার আশা করা হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি তাতে হয় নি, বরং উলটো, বেশকিছু অভিজ্ঞ খামারের নেতাদের প্রয়োগীয় কাজ ছেড়ে নিছক পরিচালনের কাজ নিতে হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে যৌথখামার আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির অর্থনীতির গুরুতর ক্ষতি হয়েছিল আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থার দরুন। শীতকালটা ছিল দুঃসহ, আর তারপরে গ্রীষ্মে ছিল ভীষণ খরা — ফলে ফসল তোলা গিয়েছিল খুবই কম: সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজনীয় শস্যের একাংশ কিনতে হয়েছিল বিদেশে। প্রকৃতির এইসব খেয়ালীপনা নিশ্চয়ই আগেভাগে বুঝে রাখা যায় না, কিন্তু এর থেকে আবারও দেখা গেল, আবহাওয়ার খেয়ালখুশি আর দুর্যোগের সময়ের জন্যে প্রয়োজনীয় মজুদ যাতে থাকে তদুপযোগী মাত্রায় দেশের কৃষি উন্নয়ন করা কতখানি গুরুত্বসম্পন্ন। ১৯৫৫— ১৯৫৯ সালে মোট কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল বছরে গড়ে ৭·৬ শতাংশ করে, কিন্তু সাতসালা পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে ২ শতাংশও বাড়ে নি, বিভিন্ন ফসলের ফলন বেড়েছিল যৎসামান্য।

কৃষি আর শিল্প দুইয়েরই জাতদ্রব্যের দামবাঁধার নির্ভুল কর্মনীতি ধরে চলা এবং আর্থনীতিক উন্নয়ন এগিয়ে নেবার সমস্ত ব্যবস্থার পুঙখানুপুঙখ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করা যে কী চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন, সেটা দেখিয়ে দিল বাস্তব জীবনই। চলার এমন ধারা থেকে যেকোন বিচ্যুতি কমিউনিস্ট নির্মাণকাজে অগ্রগতি রুখে দেয়ই।

তার একটা জোরালো প্রমাণ দেখা গেল ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে সমস্ত পার্টি, সোভিয়েত, ট্রেড-ইউনিয়ন আর কমসোমল সংগঠনকে কৃষি আর শিল্পের জন্যে একটা করে দুটো বিভাগে ভাগ করে ফেলার মধ্যে। এই পরিবর্তনের উদ্যোক্তারা ধরে নিয়েছিল, কেন্দ্র আর প্রদেশগুলি উভয় ক্ষেত্রে আর্থনীতিক

পরিচালন হবে আরও ফলপ্রসূ, অভীষ্টানুযায়ী, সুযোগ্য। কিন্তু, তাদের ভুল হয়েছিল: এই বিভাগটা শিল্প আর কৃষির মধ্যে যোগসূত্রটাকে কিছু পরিমাণে নষ্ট করেছিল, সেটা শহর আর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে যোগাযোগ মজবুত করতে কিংবা শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষককুলের মধ্যে সহযোগ বাড়াতে সহায়ক হয় নি কোনক্রমেই।

এই ব্যাপারটা স্পষ্টতই দেশের আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কিছুই করে নি, আর সো.ই.ক.পা'র ২০শ, ২১শ আর ২২শ কংগ্রেসে নির্ধারিত পার্টির সাধারণ কর্মধারার সঙ্গেও সেটাকে খাপ খাওয়ানো যায় না। সেটা বাস্তবিকপক্ষে সোভিয়েত জনগণের কাজ ব্যাহত করেছিল। আর্থনীতিক পরিচালন সম্বন্ধে, জনগণের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করার বিষয়ে সো.ই.ক.পা'র নতুন কর্মসূচিতে দেওয়া ধরনধারন অন্য রকম। এই কারণেই, ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে সারা দেশ অমন সোৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিল। পার্টি জীবনের লেনিনীয় মানগুলি আর নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতিগুলিকে পরিপুষ্ট করে তোলা এবং সেগুলির যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্যে পার্টির দৃঢ়সংকল্প প্রতিফলিত হয়েছিল ঐ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিতে। আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনে সমস্ত রকমের আত্মমুখীতার কঠোর সমালোচনা ক'রে পার্টি এই প্রসঙ্গে যত ভুল করা হয়েছিল সেগুলিকে সংশোধন করার প্রয়োজন বোধ করেছিল। সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদকের কর্তব্য থেকে নিকিতা খ্রুশ্চভকে অব্যাহতি দিয়েছিল এই প্লেনারী বৈঠক। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি-পদ তিনি ত্যাগ করেছিলেন। লেওনিদ ব্রেজনেভ সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, আর সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত

ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করেছিল আলেক্সেই কসিগিনকে।

ঐ সময়ে লেওনিদ ব্রেজনেভের বয়স ছিল ৫৮ বছর। তাঁর জন্ম হয় একটি শ্রমিক পরিবারে, তিনি একটা টেকনিকাল স্কুলে ভূমিরায়তিস্বত্ব অধ্যয়ন করার পরে স্নাতক হন একটা ধাতুবিদ্যা ইনস্টিটিউট থেকে। সো.ই.ক.পা'তে তিনি যোগ দেন ১৯৩১ সালে। তিনি কৃষিক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন, তাঁর শিল্পক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁকে দ্নেপ্রপেত্রভ্স্কে পার্টি সংগঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল, যুদ্ধের সময়ে তিনি ফ্রণ্টে রাজনীতিক কাজ করতেন। তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৫২ সালে।

আলেক্সেই কসিগিনেরও জন্ম শ্রমিক পরিবারে, ১৯০৪ সালে, তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ২২ বছর বয়সে। তাঁরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আছে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় একটা টেক্সটাইল কারখানায়, সেখানে তাঁতী হিসেবে কাজ শুরু করে পরে হন কর্মশালার ফোরম্যান, তারপরে ডিরেক্টর, সেখান থেকে তিনি যান টেক্সটাইল শিল্পের জনকমিসার পদে। পরে তাঁর উপর ভার পড়ে গস্প্লানের, অর্থ-মন্ত্রকের, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সহসভাপতি ছিলেন।

লেওনিদ ব্রেজনেভ এবং আলেক্সেই কসিগিন কয়েক বার সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্য হিসেবেও তাঁরা কাজ করেছেন। রাষ্ট্রে কয়েক বারই তাঁদের সেবাকার্যের প্রতি যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়েছে; দু'জনেই সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বীর।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অচিরেই সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাববিস্তার

করেছিল। পার্টি সংগঠনগুলির কৃষি আর শিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে কৃত্রিম বিভাগ শেষ করে দেওয়া হয়েছিল ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে। যুক্ত পার্টি সংস্থাগুলি আবার চালু হলে পার্টি সংগঠনগুলির ভূমিকা আরও বাড়ল, সেগুলির কাজ হয়ে উঠল ঢের বেশি ফলপ্রদ। অনুরূপ পরিবর্তন ঘটানো হল কমসোমল সংগঠনগুলিতেও।

১৯৫৯ সালের বসন্তকালে শ্রমজীবী জন-প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েতগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি আর শিল্পের মধ্যে সোভিয়েতগুলির বিভাগও তুলে দেওয়া হয়। সোভিয়েতগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপে নির্ভর করতে পারত বিস্তৃত জন-সহায়তার উপর। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েতগুলির স্বেচ্ছামদতদার ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষর বেশি (১৯৫৯ সালে ছিল দুই কোটি)। দেশের দৈনন্দিন সাধারণের বিষয়াবলিতে, রাষ্ট্রযন্ত্র আর অর্থনীতির সমস্ত শাখার কাজে শ্রমজীবী জনগণের ক্রমাগত বিস্তৃততর অংশকে সংশ্লিষ্ট করাবার চেষ্টায় পার্টি আর সরকার পার্টি আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলিকে (যেগুলি ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রে আর প্রদেশগুলিতেও স্থাপিত হয়েছিল স্থায়ী কমিটি হিসেবে) পুনঃসংগঠিত করল জন-নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে। তাদের নামেই আরও স্পষ্টভাবে এবং আরও পুরোপুরি প্রকাশ পেল তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি; রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজে জনগণের বিস্তৃত অংশকে জড়ানো এবং সরকারীভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি প্রতিপালনের উপর নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ খাটানোই ছিল এইসব সংস্থার ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য।

জনগণের বিবেকী সমর্থন এবং সাধারণের বিষয়াবলিতে শহর আর গ্রামাঞ্চল উভয়েরই বাসিন্দাদের ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর ক'রে সো. ই. ক. পা'র কেন্দ্রীয় কমিটি আর সোভিয়েত সরকার আর্থনীতিক সম্পর্ক নিখুঁত করে তোলা,

আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন আর পরিকল্পনের ব্যবস্থা উন্নততর করা এবং উৎপাদন বাড়াবার উপর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করল। এর ফলে ১৯৫৯ সালেই প্রাপ্তিসাধ্য আর সংরক্ষিত শ্রম-বল বেশ বড়রকম পরিসরে পুনর্বিন্যস্ত করা, কৃষি উৎপাদন আর শিল্পোৎপাদন দুইই বাড়ানো এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা সম্ভব হয়েছিল।

সোভিয়েত অর্থনীতি সংগঠিত করার কাজে সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক নিয়মগুলির পূর্ণতর মাত্রায় সদ্ব্যবহার করার প্রচেষ্টার চূড়ান্ত একপেশে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যাকিছু ঘটে সে-সম্বন্ধে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি বরাবর অনেকটা জায়গা দেয়। তবে, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার ব্যাপারটার নির্বিকার পক্ষপাতহীন বিবরণ তারা দেবে, এমনটা আশা করা হবে অতি-সরলতার ব্যাপার। ১৯৫৯ সালে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো এই মর্মে বলতে আরম্ভ করেছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 'এখন একটা সত্যিকারের চাঞ্চল্যকর আর্থনীতিক পুনঃসংগঠনের দ্বারদেশে'। বহু পত্র-পত্রিকা পাঠকদের বিহ্বল করার জন্যে ঐ ধাঁচের নানা প্রবন্ধ বের করত — যদিও, আসলে কারও পক্ষে চাঞ্চল্যকর বিস্ময়কর কিছু হতে যাচ্ছিল না। পুঁজিতান্ত্রিক সংবাদপত্রজগৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবন সম্বন্ধে যথার্থ বিবরণ দিতে চাইলে সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা, রেডিও আর টেলিভিশন থেকে মালমশলা ব্যবহার করতে পারত অনায়াসেই।

পরিকল্পন, দামবাঁধা আর আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের গোটা ব্যবস্থাটার উন্নতির মূর্ত-নির্দিষ্ট বিভিন্ন উপায় নিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী আর আর্থনীতিক নির্বাহী কর্মকর্তারা আলোচনা চালাচ্ছিল কয়েক বছর ধরে। পরিকল্পন সম্বন্ধে যেকোন সংকীর্ণ বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির, অনমনীয় পরিকল্পনের ঘোর বিরোধী ছিল

জনসাধারণ। টেকনিকাল অগ্রগতির জন্যে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা, প্রত্যেকটা নতুন উদ্ভাবন কাজে লাগাবার ব্যাপারে যথার্থ রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ছিল বিচার্য বিষয়টা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এবং সমগ্রভাবে আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে অযোগ্য পরিচালকদের হস্তক্ষেপের ঘটনাগুলোর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল।

বিশেষ প্রবল বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী বৈঠকের পরে। দেশের আর্থনীতিক জীবন সংগঠিত করার নতুন ধরনধারন স্থির করতে, সমসাময়িক চাহিদা অনুসারে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সবচেয়ে উপযোগী আর্থনীতিক নীতিগুলি স্থির করতে পার্টির সহায়ক হয়েছিল ঐ আলোচনা।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা আর বাজেট নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। আর্থনীতিক পরিষদ ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি এবং আগেকার কয়েক বছরে কৃষি কর্মনীতিক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তিগুলির নানা প্রত্যয়জনক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল প্রতিনিধিরা। ঐ অধিবেশনের প্রস্তাব রচনার সময়ে ঐসব সমালোচনা বিবেচনায় রাখা হয়েছিল।

১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী বৈঠকে সোভিয়েত কৃষির পরবর্তী উন্নয়ন-সংক্রান্ত জরুরী ব্যবস্থাবলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা সমষ্টিগতভাবে রচনা করেছিল যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদনবৃদ্ধির হার বাড়াবার বিস্তৃত কর্মসূচি। গ্রামাঞ্চলে কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ বাড়ানো এবং কয়েক বছরের জন্যে (একেবারে ১৯৫৯ সাল অবধি) কৃষিজাত দ্রব্য যোগানের বাঁধা পরিকল্পনা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এইসব নতুন ব্যবস্থার সুফল পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৫ সালের মধ্যেই। ঐ বছরের খরা সত্ত্বেও মোট কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল — পরিমাণটা হয়েছিল আগেকার যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি। ফলে, যৌথখামারগুলির মোট আয় এবং যৌথখামারীদের রোজগার বেড়েছিল ১৬ শতাংশ।

বিভিন্ন মূলগত রদবদল চালু করা হয়েছিল শিল্পক্ষেত্রেও। তখনকার পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পন এবং পৃথক পৃথক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজের উপর নিয়মনের জন্যে কোন্ কোন্ সূচককে ধরা হবে বনিয়াদ হিসেবে, এটা ছিল একটা আলোচ্য বিষয়। কল-কারখানাগুলোর যাতে কাঁচামাল, জ্বালানি আর আধা-তৈরি জিনিসের ঘাটতি না-পড়ে, তেমনি, সেসব উদ্বৃত্তও না-হয়, তাছাড়া, যেসব জিনিসের আর চাহিদা নেই সেগুলির উৎপাদন যাতে বন্ধ করা হয়, এসব ব্যবস্থা করা ছিল অবশ্যপ্রয়োজনীয়। দেশের শ্রম-বলের প্রত্যেকটি সদস্য এবং প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ যাতে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে এক-অভিন্ন হয়ে ওঠে, সেটা নিশ্চিত করার উপায়াদি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এমনসব কুড়ি কুড়ি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চালিয়েছিল বিজ্ঞানী, আর্থনীতিক নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্টি কর্মী আর ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীরা। কেউ কেউ মনে করল, হিসাবরক্ষণের চিরাচরিত উপকরণ এবং সেকেলে ধরনের গণনযন্ত্রের সাহায্যে চালানো পরিকল্পন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অর্থনীতি। তারা বলল, নতুন টেকনিক দরকার, তাহলে প্রত্যেকটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যে কেন্দ্রে পরিকল্পনা রচনা করা বেশ চলবে, — এমন পরিকল্পনায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত কর্তব্য বেঁধে দেওয়া হয়, প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ সীমিত হয়।

এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কেউ কেউ মতপ্রকাশ করল যে, দেশের উন্নয়নের আগেকার পর্বগুলিতে যে-ধরনের

পরিচালনগত নিয়মন অপরিহার্য ছিল সেটা কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আশু কর্তব্যগুলির সঙ্গে আর খাপ খায় না। যে-বিদ্যমান অবস্থায় পণ্য-অর্থ সম্পর্ক সক্রিয় এবং দেশের অর্থনীতি পেঁছেছে উন্নয়নের খুবই উঁচু মাত্রায়, তাতে কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনে নির্দেশ করা চাই কেবল সামগ্রিক (অর্থাৎ, সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন) ধারা আর সূচকগুলিকে। অযুত অযুত রকমের জিনিসের বণ্টন কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে করার প্রয়োজন আর নেই। পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানকে আরও স্বাধীনতা, অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া দরকার, সমস্ত বন্দোবস্ত এমনভাবে করা দরকার যাতে লাভজনকভাবে কাজ চালানোতে, জিনিসের গুণে, পরিমাণে আর রকম-বিভিন্নতায় প্রতিষ্ঠানগুলির আরও বেশি কায়েমী স্বার্থ গোছের কিছু থাকে।

এইসব প্রশ্নের উত্তর বের করার চেষ্টায় সরকার ১৯৫৯ সালে কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনপ্রণালী আর আর্থনীতিক প্রবর্তনা চালু করেছিল। এর আগে এইসব কারখানার কাজের মূল্যায়ন করা হত সর্বোপরি তাদের মোট উৎপাদ অনুসারে — অর্থাৎ, মনোযোগ দেওয়া হত সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি তাদের উৎপন্ন জিনিসের মোট মূল্যের উপর। মোট উৎপাদ ছাড়াও নতুন নতুন নির্দেশক চালু করা হল: বিক্রি আর লাভের লক্ষ্যমাত্রায়ও পেঁছন চাই। এইসব পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে, মস্কো আর গোর্কির কতকগুলি পোশাক-পরিচ্ছদের কারখানাকে নির্দিষ্ট কোন কোন দোকানের ফরমাশ অনুসারে পোশাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করতে দেওয়া হল। স্যুটে কী-কী প্যাটার্ন আর বর্ণবিন্যাস ব্যবহার করা হবে, সেগুলি কখন্ আর কী পরিমাণে খদ্দেরদের কাছে বিক্রি করা হবে, এসব স্থির করতে দেওয়া হল সংশ্লিষ্ট কারখানা আর দোকানগুলির

কর্মীদেরই। এই পরীক্ষার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়েছিল, কারখানাগুলির লাভ বেড়েছিল। তার উপর চালু করা হয়েছিল বিশেষ বিশেষ বোনাস, তার ফলে শ্রমিক আর কর্মচারীদের নিয়মিত উপরি-প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিল তাদের মাসিক মজুরির ৪০-৫০ শতাংশ অবধি। অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছিল মস্কোয় আর লেনিনগ্রাদে মোটর পরিবহন সার্ভিসে এবং ইউক্রেনের বিভিন্ন খনিতে। এর ফলে যন্ত্রপাতি আর নিষ্কর্মা হয়ে থাকত না; পরিকল্পনা ছাড়িয়ে বেশকিছু পরিমাণ লাভও হতে থাকল শিগগিরই। মজুরিবৃদ্ধিও হল লক্ষণীয়, তার উপর, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অনুরোধে লাভের একাংশ খরচ করা হল উৎপাদনের সুসাধ্যতা আর আধুনিকীকরণের জন্যে এবং সামাজিক আর সাংস্কৃতিক কাজকর্ম আর সেবাকাজের বাবত।

১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে এইসব পরীক্ষা, এবং পরিকল্পনব্যবস্থা আর আর্থনীতিক সংগঠন উন্নততর করার জন্যে পার্টির সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলোকে অমন চঞ্চল করে তুলেছিল।

সোভিয়েত জনগণের কাছে কিন্তু এইসব ব্যবস্থায় রহস্যপূর্ণ কিংবা চাঞ্চল্যকর কিছুই ছিল না। সো. ই. ক. পা'র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত সরকারের সুস্থির সুদৃঢ় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তারা দেখেছিল শুধু শ্রেণীহীন সমাজ গড়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলোকে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগাবার দৃঢ়সংকল্প। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নতুন আর্থনীতিক সংস্কার চালু হল, — দেশ সেজন্যে বেশ প্রস্তুত ছিল, পরিবর্তনগুলোকে দেশ নিয়েছিল সহজেই। আর্থনীতিক পরিষদগুলোকে তুলে দিয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার জন্যে পৃথক পৃথক মন্ত্রক স্থাপন করা হল; এক-এক শাখায় একই অভিন্ন কর্মনীতি খাটাবার ব্যবস্থা হল — এটার উপকারিতা দেখা গিয়েছিল

কার্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই। যারা ভেবেছিল, ১৯৫৭ সালের আগেকার ধাঁচের পরিচালনব্যবস্থা বুঝি আবার চালু হল, তারা ভুল করেছিল —১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তের মর্মটাকে তারা বুঝতে পারে নি।

১৯৫৯ সালের শরৎকালে চালু-করা এই আর্থনীতিক সংস্কারে ব্যবস্থা ছিল যে, আর্থনীতিক পরিচালনব্যবস্থার শাখাগত আর অঞ্চলগত নীতি পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাবে, পরস্পরের পরিপূরক হবে এবং সামগ্রিক আর্থনীতিক উন্নয়নের আন্তঃশাখা লক্ষ্যগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রযুক্ত হবে। কিন্তু, এটা ছিল ব্যাপারটার শুধু একটা দিক। এই সংস্কারের সমানই গুরুত্বসম্পন্ন আর-একটা দিক হল, এর ফলে পরিকল্পনব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটল, আর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যমের জন্যে এবং আরও বেশি বৈষয়িক প্রবর্তনা চালু করার বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি হল।

লাভজনক কারবার হয়ে ওঠার জন্যে পুরাদমে এগিয়ে চলতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করল এই নতুন ব্যবস্থা। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো, শিল্পের কোন শাখা যাতে লোকসানে না-চলে তার ব্যবস্থা করা, আরও বেশি লাভ এবং আরও বড় সামাজিক ভোগ্য তহবিলের জন্যে ম্যানেজার আর শ্রমিকেরা অভিযান চালাত এই সংস্কারের আগেও, কিন্তু পরিব্যয়-হিসাবরক্ষণ পুরাপুরি চালু করা সম্ভব হয় নি। সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের সঙ্গে যা মানানসই এমনভাবে, এবং সোভিয়েত অর্থনীতিতে যেমনটা তখন চলতে পারত তত ব্যাপক পরিসরে বৈষয়িক প্রবর্তনা আগে ব্যবহৃত হয় নি। যেমন, ১৯৫৯ সালে শিল্পে মাথাপিছু লাভ বেড়েছিল ৪৪ শতাংশ, প্রতিষ্ঠানের তহবিল বেড়েছিল মাত্র ১০ শতাংশ, আর ঐ তহবিল থেকে প্রবর্তনা

হিসেবে দেওয়া বোনাস এবং অন্যান্য উপরি-দেওন বেড়েছিল মাত্র ২ শতাংশ।

শিল্পবৃদ্ধির হার যে ১৯৫৯ সালের ১১·৪ শতাংশ থেকে কমে ১৯৭০ সালে দাঁড়িয়েছিল ৭·৩ শতাংশ, তার একটা কারণ ছিল এই অসামঞ্জস্য। শিল্পে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিও বেড়েছিল পরিকল্পিত মাত্রার চেয়ে কম হারে: সালের কালপর্যায়ে ঐ বৃদ্ধিটা ছিল গড়ে ৪·৬ শতাংশ, আর তার আগের পাঁচ বছরে অংকটা ছিল ৬·৫ শতাংশ।

এবার শিল্পের উপর দায়িত্ব পড়ল যে, উৎপাদন তহবিল এবং বিনিয়োজিত অর্থের আরও বেশি ফলপ্রদ সদ্ব্যবহার করতে হবে, আর উৎপাদ হওয়া চাই খুবই সরেস। আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের গণতান্ত্রিক বনিয়াদটাকে সম্প্রসারিত না-করে সেটা করা ছিল অসম্ভব। উৎপাদন সংগঠনের ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের ভূমিকা অনেকটা বাড়াবার আরও বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টি করল এই নতুন আর্থনীতিক সংস্কার।

শিল্পক্ষেত্রে কর্মিবাহিনীর অর্থবিদ্যার জ্ঞান উন্নততর করা এবং অর্থনীতিবিদদের গড়ে তোলাটা হয়ে উঠল সর্বপ্রথম কর্তব্য। ১৯৭০ সালের গোড়ায় সমস্ত স্নাতকের মধ্যে স্নাতক অর্থনীতিবিদ ছিল শতকরা মাত্র ৬ জন, এটা ১৯৭০ সালের চেয়েও কম। প্রধান প্রধান সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যে আরও বেশি সুযোগ্য অর্থনীতিবিদ গড়ে তোলার জন্যে সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হল।

এই যে আর্থনীতিক সংস্কারটাকে পুরোপুরি চালু করতে লেগেছিল কয়েক বছর, এটা শুরু করার সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্ষেত্রে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল, বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ আর সহযোগিতাও প্রাপ্তিসাধ্য ছিল। ১৯৭০ সালে শিল্পক্ষেত্রে বিশেষিত উচ্চ আর মধ্য শিক্ষা পাওয়া কর্মী

ছিল কুড়ি লক্ষর বেশি, আর শিল্পে কর্মরত কমিউনিস্টের সংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষর বেশি। ১৯২৮ সালে — সমাজতান্ত্রিক শিল্পযোজন সবে শুরু হবার সময়ে — শিল্পক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিশিয়ন ছিল শতকরা মাত্র চার জন, আর ঐ চার জনের মধ্যে মাত্র একজনের ছিল উচ্চশিক্ষা। সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাত কর্মীদের শতকরা মোটামুটি ১৪ জন ছিল ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিশিয়ন, তাদের মধ্যে ৮ জনের ছিল উচ্চশিক্ষা।

১৯৪০ সালে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল দুই কোটি কুড়ি লক্ষর বেশি — অর্থাৎ, সাতসালা পরিকল্পনার শুরুতে ১৯৫৯ সালে যা ছিল তার চেয়ে পঞ্চাশ লক্ষ বেশি। শতাব্দীর গোড়ার দিকে যাদের জন্ম এমন বহুসংখ্যক প্রবীণ দক্ষ শ্রমিক ঐ সময়ের মধ্যে অবসর নিয়েছিল, আর তাদের জায়গায় এসেছিল যুদ্ধের পরে গড়ে-বেড়ে ওঠা পুরুষ-পর্যায়। এই নওজোয়ান শ্রমিকদের শিল্পক্ষেত্রে পাকা অভিজ্ঞতা তখনও হয় নি, কিন্তু এদের খুব বেশির ভাগেরই বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল বেশ ভাল, আর এরা জন-জীবনে অংশগ্রহণ করত। যেমন, ইঞ্জিনিয়রিং শিল্পে ২৮ বছর অবধি বয়সের শ্রমিকদের অর্ধেক দশ-বছরের বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করেছিল; তাদের শতকরা ৭০ জন ছিল কমসোমল সদস্য, পার্টি সদস্য ছিল শতকরা ১০ জন, আর তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই শিল্পক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল তিন থেকে পাঁচ বছরের। এককথায়, পরবর্তী বছরগুলিতে যথেষ্ট উৎকর্ষলাভের পূর্বলক্ষণ ছিল এইসব নওজোয়ান শ্রমিকের মধ্যে।

শিল্প আর কৃষি উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদনে নিযুক্ত সবারই জন্যে বর্ধিত আর্থনীতিক প্রবর্তনার ব্যবস্থা ছিল ১৯৪০ সালে রচিত আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন পদ্ধতিতে, সেটা কেবল প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজারদের নয়, শ্রমজীবী জনগণের বিস্তৃত অংশকেও উৎসাহিত

করল সমস্ত উৎপাদ অতি সরেস করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমাগত বেশি মাত্রায় লাভজনক কারবার করে তোলার জন্যে কর্মপ্রচেষ্টা প্রবলতর করতে। সাতসালা পরিকল্পনার শেষ বছরে দেখা গিয়েছিল কত সময়োচিত ছিল এইসব ব্যবস্থা।
সালের সামগ্রিক আর্থনীতিক সূচকগুলি ছিল ১৯৪০ আর
সালের সূচকগুলির চেয়ে বেশকিছুটা বেশি।

১৯৪০ সালের শেষ এবং সালের গোড়ার দিকে মস্কোর আগুয়ান কারখানাগুলি সমস্ত রকমের উৎপন্ন জিনিস থেকেই যাতে লাভ ওঠে সেটা নিশ্চিত করতে মনস্থ করেছিল। তার একটু পরেই, স্থানীয় বিজ্ঞানীদের সহযোগে মস্কো আর লেনিনগ্রাদের আগুয়ান শ্রমিকসমষ্টি স্থির করেছিল যে, তিন-চার বছরের মধ্যেই প্রধান প্রধান শিল্পোৎপন্নকে তারা সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষ করে তুলবে। পৃথক পৃথক নবপ্রবর্তক কিংবা ব্রিগেড নয়, গোটা গোটা কারখানা আর গোটা গোটা প্রতিষ্ঠান-জোটই তুলেছিল এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব, এটা কিছু আপতিক ব্যাপার ছিল না। সমষ্টিগত ভিত্তিতে রচিত এবং সম্যক-পরীক্ষিত এইসব প্রস্তাব বিস্তৃত পরিসরে কার্যকর হয়েছিল, — এইসব কারখানা, আগুয়ান ব্রিগেড এবং কর্মশালাগুলির কাজে যাকিছু ছিল সবার সেরা সেইসবই সেগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এইসব আগুয়ান শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকসমষ্টিগুলি তাদের উৎপাদন পরিকল্পনাগুলিকে পর্যালোচনা করে আরও উন্নত করে তুলেছিল এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে জুড়েছিল বিভিন্ন সাংগঠনিক আর টেকনিকাল ব্যবস্থা, যাতে কর্মসূচি সংসাধন করা সহজতর হয়। আর ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষও নিশ্চিত করেছিল তাদের চিরাচরিত সহযোগিতা এবং নৈতিক সমর্থনই শুধু নয়, তার উপর, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিগ্রেডগুলির চাহিদা অনুযায়ী

অতিরিক্ত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের সময়োচিত যোগানের ব্যবস্থাও।

১৯৭০ সাল নাগাত সর্বোচ্চ রূপের এই প্রতিযোগিতা অভিযানে — কমিউনিস্ট শ্রমের আন্দোলনে — অংশগ্রহণকারী শ্রমিক এবং কর্মচারীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন কোটি। আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের নতুন ধরনধারনের সঙ্গে জনগণের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ মিলে সোভিয়েত অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরিত করেছিল। শিল্পগত বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮·৬ শতাংশ — এটা ১৯৭০ সালের সূচকের চেয়ে বেশকিছুটা বেশি। ঐ বছরকার খরা সত্ত্বেও, যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির মোট উৎপাদনও হয়েছিল দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি (সর্বোপরি পশুপালকদের সাধনসাফল্যগুলির কল্যাণে)।

১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালে সংবাদপত্র, রেডিও আর টেলিভিশন জানাতে থাকল যে, সাতসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলিতে পেঁছন যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রায় যারা পেঁছেছিল সবার আগে তাদের মধ্যে ছিল লেনিনগ্রাদের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকেরা, দ্নেপ্রপেত্রভ্স্ক বিভাগের ধাতুশিল্প শ্রমিকেরা এবং তাতারিয়া আর বাশ্কিরিয়ার তৈল শ্রমিকেরা। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের বিংশ বার্ষিকী উদ্যাপিত হচ্ছিল ঐ বছর। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, ভলগোগ্রাদ, সেভাস্তপোল আর ওদেসা 'বীর নগরীগুলিকে' এবং 'বীর দুর্গ' ব্রেস্ত্কে দেওয়া হয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানচিহ্ন — 'লেনিন অর্ডার' আর 'সুবর্ণ তারকা'। অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ লড়াইগুলি যেসব জায়গায় হয়েছিল সেখানে কিশোর পাইওনিয়র আর কমসোমল সদস্যরা গিয়েছিল দলে-দলে। এই উপলক্ষের সম্মানার্থে নানা শহরে আর গ্রামে খোলা হয়েছিল

বহু নতুন মিউজিয়ম; নতুন নতুন স্মরণিক উন্মোচিত হয়েছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালে নাৎসী আক্রমণ-অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত স্বদেশভূমির মুক্তি আর স্বাধীনতা যাঁরা রক্ষা করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করেছিল সারা দেশের মানুষ। অতীতের এইসব স্মৃতি সোভিয়েত দেশের মানুষকে নতুন নতুন সাধনসাফল্য অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সোভিয়েত জনগণ দেখতে পেয়েছিল, তাদের বীর-কৃতিত্বের শান্তিপূর্ণ শ্রম এবং আর্থনীতিক পরিকল্পনা সংসাধনে সাফল্য হল তাদের দেশের আরও অগ্রগতি, দেশের প্রতিরক্ষাক্ষমতা সংহত করা এবং সারা পৃথিবীতে শান্তি সুরক্ষিত করার একটা নিশ্চয়তা।

১৯৪০ সালের অগস্ট মাসে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে সাতসালা পরিকল্পনার সামগ্রিক শিল্পোৎপাদন কর্মসূচি সর্বপ্রথমে সংসাধিত করেছিল মস্কোর শ্রমজীবী জনগণ। এর ঠিক পরেই অনুরূপ সাধনসাফল্য হয়েছিল লেনিনগ্রাদের আর স্ভের্দলভ্স্ক বিভাগের শ্রমিক-কর্মচারীদের এবং তারপরে দেশের আরও বহু জায়গায়। অর্থনীতির গোটা গোটা শাখায়, গোটা গোটা ইউনিয়ন আর স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে সাতসালা পরিকল্পনা শেষ হল ঐ একই আশাবাদের মধ্যে। এইভাবে, বিভিন্ন বৃদ্ধিজনিত কষ্ট-কাঠিন্য এবং (বিশেষত ক্যারিবীয় সংকটের সময়ে এবং ভিয়েৎনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধাবার ফলে) সোভিয়েত দেশরক্ষা সংহত করতে সামরিক ব্যয়ের অপরিহার্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বড়রকমের অগ্রগতি ঘটল।

১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারিতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেঁছিল সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণের কাছে। প্রথম সংবাদটা হল, ঐদিন থেকে গ্রামাঞ্চলে চিনি, মিঠাই, সুতী কাপড়, বোনা কাপড়-জামা এবং আরও নানা জিনিসের দাম কমিয়ে শহরে চালু দামের সমান করা হল। (ঐ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে জনসংখ্যার

প্রায় অর্ধেক ছিল গ্রামাঞ্চলে, এই কথাটা মনে রাখলে এই ব্যবস্থাটার তাৎপর্য ফুটে উঠে আরও বিশেষ স্পষ্টভাবে।) দ্বিতীয় ঘটনাটা: মালমশলার মিতব্যয় আর সাশ্রয়ী ব্যবহারের প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্যে কতকগুলি কারখানা যে-প্রস্তাব তুলেছিল সেটাকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি।

যে-দেশে অর্থনীতি পরিকল্পিত, উৎপাদনের উপকরণের মালিক সমগ্র সমাজ, সেখানে গড়ে-বেড়ে ওঠা সোভিয়েত নর-নারীরা বেশ ভালভাবেই অবগত ছিল মালমশলার মিতব্যয়ের ফলে কত বড় সাশ্রয় হতে পারে। কড়াকড়ি মিতব্যয়িতার কর্মনীতি অনুসারে চ'লে বাঁচানো অতিরিক্ত ধাতু, জালানি কিংবা কাঁচামাল পরবর্তী আর্থনীতিক উন্নয়নের বনিয়াদের একটা অংশ যুগিয়েছিল এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের আরও বিপুল প্রসার সহজতর করেছিল। একথা মনে রেখেই শ্রমজীবী জনগণ ১৯৪০ সালের নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল। স্বভাবতই, নতুন নিয়ন্ত্রণ-অঙ্কগুলি নির্ধারণ করার সময়ে আগেকার সাত বছরে পাওয়া অভিজ্ঞতা এবং ফলাফল বিশ্লেষণের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল বিস্তর। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তী কংগ্রেসে এইসব প্রশ্নও ছিল আলোচনার কেন্দ্রী বিষয়বস্তু।

১৯৪০ সালে ২৯এ মার্চ মস্কোর ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে শুরু হয়েছিল সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেস। প্রায় এক-কোটি পঁচিশ লক্ষ পার্টি সদস্যের প্রতিনিধিরা ছিল এই কংগ্রেসে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জায়গা থেকে মস্কোয় সমবেত হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিনিধি। পার্টির সেরা সদস্যরা, যাদের সম্বন্ধে দেশ গর্ববোধ করতে পারে, তারাই এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানীতে — সামনেকার কর্তব্যগুলো একত্রে পর্যালোচনা করার জন্যে, সো.ই.ক.পা আর সমগ্র সোভিয়েত সমাজ যেসব রাজনীতিক আর আর্থনীতিক কাজ করবে তার প্রধান

ধারাগুলি নির্ধারণ করার জন্যে। লেওনিদ ব্রেজনেভ পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান বিবরণ, আর সালের কালপর্যায়ে সোভিয়েত আর্থনীতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া নির্দেশাবলি তুলেছিলেন আলেক্সেই কসিগিন।

সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রিয়াকলাপ প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত অনুমোদন পেল। দু'বছর আগে কেন্দ্রীয় কমিটির অক্টোবর প্লেনারী বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বুনিয়াদী তাৎপর্যটার উপর তারা গুরুত্ব দিল সমগ্র পার্টির তরফে। সোভিয়েত সমাজ-জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধিত রাজনীতিক আর সাংগঠনিক ভূমিকাটির দিকে তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নেতৃত্বের ধরন আর প্রণালীতে আত্মমুখীনতাজনিত ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার জন্যে উত্থাপিত প্রস্তাবও অনুমোদিত হল সর্বসম্মতিক্রমে। ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্লেনারী বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কংগ্রেস সমর্থন করল সর্বান্তঃকরণে, — সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৃদ্ধি ব্যাহত করছিল যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি সেগুলিকে প্রকাশ করেছিল এবং আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনের নতুন ধরনধারন নির্দিষ্ট করেছিল ঐসব সিদ্ধান্ত।

১৯৪০ সালে ২৯এ মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল অবধি অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে সমস্ত কাজই চলেছিল তৎপর-কার্যকর এবং নীতিনিষ্ঠ আবহাওয়ায়। আগেকার সাত বছরে সোভিয়েত অর্থনীতির সামগ্রিক সাধনসাফল্য প্রতিনিধিদের উচ্চপ্রশংসা পেয়েছিল, — ঐ সময়ে প্রধান তহবিল বেড়েছিল সমগ্র অর্থনীতিতে ৯০ শতাংশ, আর শিল্পে ১০০ শতাংশ। শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছিল পরিকল্পিত ৮০ শতাংশের জায়গায় ৮৪ শতাংশ। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদন সূচকগুলি কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও, এক্ষেত্রেও সামগ্রিক অগ্রগতি হয়েছিল জমকালো। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ধরে দেখলে, ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত

ইউনিয়নের আর্থনীতিক আর প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যা ছিল সেটা গড়ে তুলতে সময় লেগেছিল ৪০ বছরের বেশি, যুদ্ধের বছরগুলি না-ধরলে তবু ৩২ বছরের কঠোর প্রচেষ্টা দরকার হয়েছিল, কিন্তু ১৯৫৯ থেকে সালের সাত বছরে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণ সেটাকে দ্বিগুণ করে ফেলতে পেরেছিল। যেজন্যে এক সময়ে লেগেছিল ৩২ বছর, সেটা এখন হল মাত্র সাত বছরে: কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের পর্বে সোভিয়েত আর্থনীতিক উন্নয়নের এমন অগ্রগতিই পরিলক্ষিত হল।

ঐ একই সময়ে অর্থনীতিতে পরিমাণগত বৃদ্ধির চেয়ে গুণগত অগ্রগতি হয়েছিল আরও বেশি লক্ষণীয়। যেমন, দেশের জালানি-অনুপাতে তৈল আর গ্যাসই হয়ে উঠল প্রধান উপাদান (গোটা সাতসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ে গ্যাস শিল্পে যত অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণ আয় হতে থাকল ঐ শিল্পে)। দেশে সমস্ত রেলপথে কাজের ৮৫ শতাংশ ঐ সময়ে চলছিল ডিজেল আর বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দিয়ে, অঙ্কটা ১৯৫৯ সালে ছিল মাত্র ২৬·৪ শতাংশ। কৃত্রিম মালমশলা দিয়ে প্রস্তুত-করা জিনিসের উৎপাদন বাড়ছিল অভূতপূর্ব হারে, — সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাত ইঞ্জিনিয়রিং শিল্পে প্রধান হয়ে উঠেছিল রেডিও ইঞ্জিনিয়রিং আর ইলেকট্রনিক্স। বৈদ্যুতিক আর তাপীয় শক্তি উৎপাদন, রাসায়নিক শিল্প আর ইঞ্জিনিয়রিং শিল্প — শিল্পের সবচেয়ে সাশ্রয়ী এই তিনটে শাখায় ১৯৫৯ সালে উৎপাদন হয়েছিল মোট শিল্পোৎপাদনের ৩৫ শতাংশ, অঙ্কটা ১৯৫৮ সালে ছিল ২৭ শতাংশ। মহাকাশে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক সাধনসাফল্যে যার টিপিকাল প্রকাশ, সেই বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার সব সাফল্য অর্জিত হল সোভিয়েত জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই।

কৃষি আর শিল্প থেকে কায়িক শ্রম উৎখাত করা হতে থাকল, অর্থনীতিক্ষেত্রে চাল্ম হতে থাকল স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন আর অনুক্রমায়িত যন্ত্রপাতি, বেসামরিক বিমান চলাচলে বিপ্লব ঘটল জেট যাত্রীবিমান দিয়ে, সাগরে-মহাসাগরে মহাবেগে ধাবিত হল সোভিয়েত যাত্রীজাহাজগুলি — সে যে কী পরিসরে, সেটা দেখাবার জন্যে শত শত অঙ্ক তুলে ধরা যেত। সাতসালা পরিকল্পনার শুরুতেও সোভিয়েত বাণিজ্য নৌবহর টনেজের দিক থেকে ছিল পৃথিবীতে মাত্র দ্বাদশ স্থানে, ঐ পর্বেও যুদ্ধের সময় জাহাজগুলোর অর্ধেক খোয়া যাবার পরিণতিটা অনুভূত হত। কিন্তু, ১৯৫৯ সাল নাগাত সোভিয়েত বাণিজ্য নৌবহর উঠে দাঁড়িয়েছিল ষষ্ঠ স্থানে: ঐ সময়ে যত জাহাজ ছিল তার প্রতি দশখানার মধ্যে আটখানা নির্মিত হয়েছিল সপ্তম দশকে। ৯৮টা দেশের বন্দরে-বন্দরে তখন দেখা যেত সোভিয়েত ঝাণ্ডা উড়ানো জাহাজগুলিকে।

বাসগৃহ আর শিল্পক্ষেত্রে নির্মাণকাজও ঐ সময়ে বেড়ে চলছিল অভূতপূর্ব বেগে। গোর্কি, নভোসিবির্স্ক, তাশখন্দ, বাকু আর খারকভের জনসংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল সাতসালা পরিকল্পনার শুরুতেই — এইসব শহর এখন মস্কো, লেনিনগ্রাদ আর কিয়েভের মতো দেশের প্রধান প্রধান প্রশাসনিক আর শিল্প কেন্দ্রের সমকক্ষ হয়ে উঠল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্রে দেখা দিল আরও ১৭৮টা শহর, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হল — বেলোরুশিয়ায় সোলিগর্স্ক, লিথুয়ানিয়ায় নেরিঙ্গা, রস্তভের কাছে সিম্‌লিয়ান্‌স্ক, কাজাখস্তানে শাখ্‌তিন্‌স্ক, তাছাড়া আরও বহু, যেমন, উরাই, জেলেজ্‌নোগর্স্ক-ইলিম্‌স্কি, নভোচেবক্সার্স্ক, এগুলি তখনও নাম করে নি। কয়েক বছর আগেও আঙ্গার্স্ক, ব্রাৎস্ক আর দিভ্‌নোগর্স্কের কোন তাৎপর্য ছিল না, কিন্তু ১৯৬৫ সাল নাগাত এইসব শহর নতুন হলেও সোভিয়েত সাইবেরিয়ার বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আগে উল্লিখিত তিনটি শহরের

সামনেও ছিল বিরাট ভবিষ্যৎ: উরাই ছিল তিউমেন এলাকায় বিশাল বিশাল তৈলক্ষেত্রের নির্মাণকেন্দ্র; পূর্ব সাইবেরিয়ার তাইগায় ছোট নদী কোশুনিখার পাড়ে জেলেজ্‌নোগর্স্ক-ইলিম্‌স্কির কাছে পাওয়া গিয়েছিল লোহা-আকরিকের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ভাণ্ডার; এক সময়ে নিছক কৃষি এলাকা চুভাশিয়ায় রাসায়নিক শিল্পের একটা নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠছিল নভোচেবক্সার্স্ক।

আগেই বলা হয়েছে, সাতসালা পরিকল্পনার একেবারে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রাই সংসাধিত হয় নি, কিন্তু মোটের উপর ঐ সাত বছর ছিল আর্থনীতিক অগ্রগতির কালপর্যায়। কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ার প্রথম ধাপ হিসেবে রচনা করা হয়েছিল সাতসালা পরিকল্পনাটিকে, — সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে, দেশের আর্থনীতিক আর প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বেড়েছিল, সমানে বেড়ে চলছিল জীবনযাত্রার মান।

১৯৫৯ সালের কালপর্যায়ে সাপ্তাহিক কাজের সময় কমানো হয়েছিল, কল-কারখানা আর আপিস দুইয়েতেই ছয়-আর সাত-ঘণ্টার কর্মদিন চালু করা শুরু হয়েছিল, শিল্পক্ষেত্রে গড় মাসিক মজুরি বেড়ে ৭৮ থেকে ৯৫ রুবলে দাঁড়িয়েছিল। সামাজিক ভোগ্য তহবিল থেকে দেওয়া বিভিন্ন বোনাস আর ভাতাও বেশ বেড়েছিল। এইসব বৃদ্ধি হিসেবে ধরা হলে, আসল মজুরি দাঁড়িয়েছিল মাসে গড়ে ১০৪ থেকে ১২৮ রুবল। ১৯৫৯ সালে যৌথখামারীদের জন্যেও পেনশন চালু হয়েছিল, তার মানে, ৫৫ বছর বয়স থেকে নারী আর ৬০ বছর বয়স থেকে পুরুষ সমস্ত সোভিয়েত নাগরিকই তখন থেকে পেনশনভোগী (কতকগুলো বৃত্তিতে পেনশন পাবার বয়স আরও কম)। ১৯৫৯ সালে পেনশন পাচ্ছিল তিন কোটি কুড়ি লক্ষ নাগরিক — অর্থাৎ, ১৯৫৮ সালের চেয়ে এক কোটি কুড়ি লক্ষ জন বেশি।
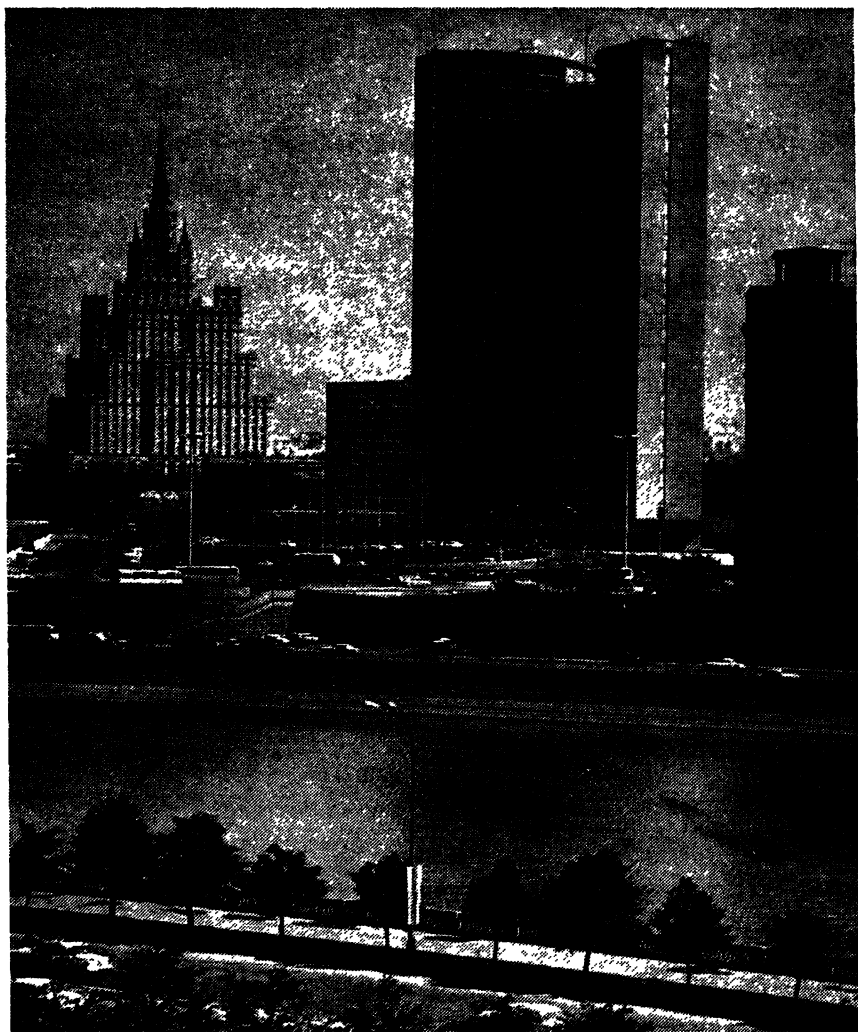
মস্কোয় পারস্পরিক আর্থনীতিক সহায়তা পরিষদের ভবন

ঐ সময়ে শহরে আর গ্রামে ফ্ল্যাট আর পৃথক পৃথক বাড়ি তৈরি হয়েছিল প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ — তার মানে দেশের বসতবাড়ি সম্পদ বাড়ল ৪০ শতাংশ। আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও হতে থাকল আরও বেশি বেশি: ১৯৫৯ সাল নাগাত মস্কোবাসীদের প্রতি ১০০ জনে ৭৩ জনের ফ্ল্যাটে ছিল স্নানঘর, ৮৮ জন পেত কেন্দ্রীয় তাপনব্যবস্থার সুযোগ, ৯৫ জনের ছিল কলের জল।

সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেসে প্রতিনিধিরা কয়েক বছরের সাধনসাফল্যগুলির তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আগেকার সাত বছরে সোভিয়েত আর্থনীতিক উন্নয়নক্ষেত্রে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি নজরে এসেছিল সেগুলি নিয়ে খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে আলোচনা করেছিল। নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার সময়ে আগেকার ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষাগ্রহণের দিকে সর্বতোভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছিল। 'আর্থনীতিক উন্নয়নের যে-**কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা** পার্টির সমস্ত সদস্যের অভিন্ন শ্রম আর অভিন্ন প্রচেষ্টা দিয়ে ভেবে দেখা এবং সযত্নে **বিশ্লেষণ করা হয়েছে** সেটাকে কংগ্রেসে হাজির করা'র* জন্যে লেনিনের যে-উপদেশ রয়েছে তদনুসারেই পরিকল্পনা নিয়ে সমস্ত কাজ করা হয়েছিল এবং খসড়াতে বিভিন্ন সংশোধনী আর সংযোজনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

আগেই যেসব সাফল্য অর্জিত হয়েছিল সেগুলির কথা মনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫৯ সালের কালপর্যায়ে শ্রেণীহীন সমাজের দিকে আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করার জন্যে সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছিল। ২৩শ কংগ্রেসে বলা হয়েছিল, নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনায় তুলে ধরা

* ভ. ই. লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলি, ৩০তম খণ্ড, ৪০৫ পৃঃ

প্রধান আর্থনীতিক কাজ হল — বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার সমস্ত সাধনসাফল্য পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়ে এবং সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের শিল্পযোজন আর ফলপ্রদতা বাড়িয়ে শিল্পের বেশকিছুটা প্রসার ঘটানো এবং কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির উঁচু আর সুস্থিত হার স্থাপন করা, আর এইভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মান বেশকিছুটা উন্নততর করা এবং সোভিয়েত দেশের সমস্ত মানুষের বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক প্রয়োজন আরও পরিপূর্ণ মাত্রায় মেটানো।

যাতে ভোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়ানো যায়, ভারি আর হালকা শিল্পের বৃদ্ধির হারের মধ্যেকার ব্যবধানটা যাতে বহুলাংশে ঘুচিয়ে দেওয়া যায়, আর জনসেবাকাজে আরও ঢের বেশি মনোযোগ দেবার জন্যে বেশকিছু পরিমাণ অর্থ পুনর্বণ্টন করার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য হয় ৩১,০০০ কোটি রুবল — অর্থাৎ, আগেকার পাঁচ বছরের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ৫০ শতাংশ আর কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বাড়াবার পরিকল্পনা হয়। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলির প্রধান উৎপাদন তহবিল দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়ে এমনসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে এক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির হার হয় শিল্পে তার বৃদ্ধির হারের দ্বিগুণ। এইসব ব্যবস্থা দিয়ে আশা করা হয় যে, শহর আর গ্রামের জীবনযাত্রা আর কাজের অবস্থার মধ্যেকার মর্মগত পার্থক্য দূর করার প্রক্রিয়া ত্বরায়িত হবে, এবং গ্রাম আর শহরের মানুষের পাওয়া বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক উপায়-উপকরণের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার দিকে অনেকটা এগোনো যাবে।

জাতীয় আয় ১৯৫৯ সালের মধ্যে ৩৮-৪১ শতাংশ বাড়ানো, মাথাপিছু আসল মজুরি ৩০ শতাংশ বাড়ানো, সর্বনিম্ন মজুরি ৬০ রুবল করা এবং কর্মসপ্তাহ কমিয়ে পাঁচ দিন করার

লক্ষ্য পার্টি গ্রহণ করল। শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কৃত্যক, জন-স্বাচ্ছন্দ্য আর সেবাকাজ, এবং খুচরা ব্যবসায়ের জালিব্যবস্থাটাকে উন্নততর করা, আর বাসগৃহ নির্মাণের কর্মসূচি আরও সম্প্রসারিত করার জন্যে প্রকাণ্ড এক-প্রস্থ ব্যবস্থারও পরিকল্পনা করা হয়।

সংক্ষেপে, কৃষি, শিল্প, পরিবহণব্যবস্থা কিংবা নির্মাণ প্রকল্প, বিজ্ঞান কিংবা পররাষ্ট্রনীতি, শ্রম-সম্পদ কিংবা সাইবেরিয়ায় আর দূর প্রাচ্যে মণিক সম্পদ আহরণ করা, এইসব ব্যাপারে ১৯৬৬—১৯৫৯ কালপর্যায়ের পাঁচসালা পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সমস্ত কর্তব্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সোভিয়েত ভূমির অব্যাহত অগ্রগতি আর সমৃদ্ধি।

অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় অনেক জায়গা পেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুরা এর তারিফ করেছিল, আর অভ্যস্ত তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিল শত্রুরা। সেই ১৯১৭ সাল থেকেই, প্রথমে বলশেভিকদের আর প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, আর পরে পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলি, যৌথখামার এবং তথাকথিত 'লৌহ যবনিকার' বিরুদ্ধে কুৎসা অভিযান যা চলে আসছে সেটা কল্পনাতীত। এখন সেটা আবার খেপে উঠল, কিন্তু এটাও খুবই লক্ষ্য করবার জিনিস যে, পরিকল্পনা সম্বন্ধে যেসব বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে 'বাস্তবতাসম্মত' আর 'তৎপর-কার্যকরে'র মতো শব্দের প্রাধান্য ছিল, আর 'সযত্নে বিবেচিত সব সূত্রের' মতো কথাও ছিল বিস্তর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ভাষ্যকার লিখেছিলেন: 'নতুন পরিকল্পনাটি পশ্চিমকে আত্মসন্তুষ্ট হবার মতো কোন হেতু দেয় নি'; আর একটা বৃটিশ সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল, 'বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং যেসব দেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা পেয়েছে তাদের জন্যে একটা আদর্শ যুগিয়েছে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনাটি।'

স্বভাবতই, সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেস অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের মূল্যায়ন করেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। 'নির্দেশাবলিতে বিবৃত কর্তব্যগুলির সংসাধন হবে সর্বজনীন শান্তি আর নিরাপত্তা সংহত করার ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনীয় নীতির আরও প্রসার ঘটাবার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান।'* কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছিল: 'পাঁচসালা পরিকল্পনাটির সংসাধন থেকে নতুন প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, সোভিয়েত জনগণ ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত এবং বিশ্ব মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালন করছে।'**

পার্টির ঐক্য আর সংগ্রামী মানসতা এবং জনগণের সঙ্গে তার গভীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের একটি সাক্ষ্য হল ২৩শ কংগ্রেস। পার্টির নিয়মাবলিতে কতকগুলি রদবদল করা হয়েছিল, সেগুলির উদ্দেশ্য হল — পার্টির সদস্য হওয়াটাকে আরও সম্মানভাজন করে তোলা, পার্টি সংগঠনগুলির আরও বেশি উদ্যোগ-উদ্যমে উৎসাহন এবং পার্টির প্রত্যেকটি সদস্যকে নিজ সংগঠনের আর সমগ্র পার্টির কাজের জন্যে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর নাম হবে পলিটব্যুরো, যা ছিল ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত ১৯শ কংগ্রেস অবধি; তাছাড়া, সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদও আবার চালু করা হল (প্রথম সম্পাদকের জায়গায়)।

কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করল পলিটব্যুরো এবং পলিটব্যুরোর প্রার্থী-সদস্যদের। এগার জন সদস্যকে নিয়ে হল পলিটব্যুরো: ল. ই. ব্রেজনেভ, গ. ই. ভরোনভ, আ. প. কিরিলেংকো, আ. ন. কসিগিন, ক. ত. মাজুরভ, আ. ইয়া. পেল্‌শে, ন. ভ. পদগোর্নি, দ. স. পলিয়ান্‌স্কি, ম. আ. সুস্‌লভ, আ. ন. শেলেপিন, প. ইয়ে. শেলেস্ত্‌। সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন ল. ই. ব্রেজনেভ।

বাস্তবিকই বলা যায়, এই কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেছিল সমগ্র জনগণই। এই কংগ্রেসের উদ্বোধন উদ্‌যাপনের জন্যে বিভিন্ন কারখানা, যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামার, নির্মাণ কর্মিদল, খনি, তৈলকূপ এবং আরও নানা প্রতিষ্ঠান ততদিনে পোক্ত হয়ে ওঠা রেওয়াজ অনুসারে আরও বাড়িয়ে লক্ষ্যমাত্রা ধরেছিল, বিশেষ বিশেষ স্বেচ্ছাকর্ম শিফ্‌টের আয়োজন করেছিল, কমিউনিস্ট শ্রম আন্দোলনে শামিল হয়েছিল সর্বান্তঃকরণে। সামনেকার কর্তব্যগুলিতে আরও বেশি প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল এই কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি।

১৯৫৯ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী কমসোমলের ১৫শ কংগ্রেস। কমসোমলের ২ কোটি ৩০ লক্ষ সদস্যের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিল ক্রেমলিনে। এই কংগ্রেসে বলবার এবং আলোচনা করার বিষয় ছিল বিস্তর। আগের কংগ্রেসের পরবর্তী চার বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ কমসোমল সদস্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যশ্রেণীতে শামিল হয়েছিল; বিভিন্ন জেলার কমসোমল কমিটি প্রায় পাঁচ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে পাঠিয়েছিল বিভিন্ন সর্বাগ্রাধিকার পাওয়া নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করার জন্যে। বিভিন্ন রেলপথ তৈরি করতে, বিদ্যুৎকেন্দ্র আর রাসায়নিক কারখানা নির্মাণে, সংস্কৃতিকেন্দ্র আর হাসপাতাল

গড়তে তারা সাহায্য করেছিল, তাছাড়া, দূর উত্তরে, সাইবেরিয়ায় আর দূর প্রাচ্যে মণিক সম্পদ আহরণের কাজে তারা বিপুল সাহস দেখিয়েছিল। কমিউনিস্ট নির্মাণকাজে সক্রিয় ভূমিকার জন্যে ব্রাৎস্ক, ভল্‌জ্‌স্কি, ক্রিভয় রোগ, নরিল্‌স্ক, জ্‌দানভ এবং রুদ্‌নির কমসোমল সংগঠনগুলি ১৯৫৯ সালে 'শ্রমের লাল পতাকা অর্ডার' পেয়েছিল।

দেশের সমস্ত জায়গা থেকে কমসোমল সদস্যরা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছিল এই কংগ্রেসে। এমন একজন প্রতিনিধি ছিলেন নিকোলাই গোর্বাচভ — তিনি কালুগার কমসোমল জেলা কমিটির একজন প্রতিনিধি হিসেবে গিয়ে আবাকান-তাইশেৎ রেলপথ নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন। আগে তিনি হরেক রকমের কাজ করেছিলেন, তিনি ছিলেন অদক্ষ শ্রমিক, মাটিকাটা মজুর, কাঠুরিয়া, কন্‌ক্রিটঢালার শ্রমিক। পরে একজন আগুয়ান শ্রমিক হিসেবে তাঁকে একটা স্থায়ী কাজ আর তার সঙ্গে শহরে একটা ফ্ল্যাট দিতে চাওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকেই একমত হয়ে বলেছিল, যেকোন অবস্থার মধ্যে কাজ করে তিনি যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তার জোরে ঐসবই তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু, এর বিরুদ্ধে ছিলেন একমাত্র গোর্বাচভই — তিনি আবার তাইগায় চলে গিয়েছিলেন মেইন লাইনের সঙ্গে উস্ত্‌-ইলিম্‌ বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে সংযুক্ত করার একটা রেলপথ নির্মাণের কাজে।

আর-একজন প্রতিনিধি ছিলেন ভিয়াচেস্‌লাভ কারাসেভ। ১৯৫৯ সালে ২৪ বছর বয়সে তাঁকে রিয়াজানের কাছে একটা অনগ্রসর যৌথখামারের ভার দেওয়া হয়েছিল, ঐ খামারে বীজ, পশুখাদ্য আর যন্ত্রপাতির ঘাটতি ছিল। কিন্তু, এই তরুণ কমসোমল সদস্যটি ঐ খামারে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করে সেটাকে ফলপ্রদ অবস্থায় দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। পরিস্থিতির উন্নতি

হয়েছিল অচিরেই, দৈনিক কাজ বাবত পাওনার হার বেড়ে গিয়েছিল বেশকিছুটা। এই তরুণ সভাপতি কাজ করে যেতেন যাকে বলে সকাল থেকে সন্ধ্যে, তাঁর যেন একটি মুহূর্তেরও ফুরসত ছিল না। কিন্তু, ১৯৫৯ সালে 'কমসোমল্‌স্কায়া প্রাভ্‌দা' পত্রিকার আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় তিনি পেয়েছিলেন প্রথম পুরস্কার।

নভোসিবির্স্কের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন পদার্থবিদ্যা আর গণিতে ডক্টরেট এবং সারা-ইউনিয়ন তরুণ বিজ্ঞানী পরিষদের সভাপতি ইউরি জুরাভ্‌লেভ। দেশের সেরা রাঁধুনি বলে স্বীকৃত এমিলিয়া বেল্‌কোভিচ এই কংগ্রেসে এসেছিলেন রিগা থেকে, আর ত্‌বিলিসি থেকে এসেছিলেন 'দাবা-সম্রাজ্ঞী' বলে পরিচিতা নারী বিশ্ব দাবাখেলার চ্যাম্পিয়ন নোনা গাপ্রিন্দাশ্‌ভিলি।

এই কংগ্রেসে মস্কোয় সমবেত হয়েছিল মোট চার হাজার প্রতিনিধি। তারা বিভিন্ন জাতির মানুষ, বিভিন্ন তাদের শিক্ষার মান আর আগ্রহের বিষয়, চরিত্র আর অভিজ্ঞতার পরিধিও তাদের বিভিন্ন, কিন্তু যাকিছু তাদের স্বতন্ত্র করে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বসম্পন্ন ছিল যা তাদের এক করে: ভাব-ধারণা আর মূলনীতিগুলি তাদের ছিল একই — তারা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী রিজার্ভ' এই কারণেই তাদের আলোচিত একটি কেন্দ্রী বিষয় ছিল নওজোয়ানের কমিউনিস্ট তালিম। কাজে, অধ্যয়নে আর কমিউনিস্ট হিসেবে তালিমে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় সুফল কী করে পাওয়া যায়, সেটা নিয়ে প্রতিনিধিরা ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিল। আর্থনীতিক গঠনকাজে এবং দেশের সাংস্কৃতিক আর রাজনীতিক জীবনে কমসোমলের ভূমিকা সবচেয়ে ভালভাবে বাড়ানো যায় কী করে, ঐ বিষয়টা নিয়ে তারা বিচার-বিশ্লেষণ করেছিল। পার্টি নিয়মাবলিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অনুচ্ছেদটাকে তারা অনুমোদন করেছিল, তাতে আছে, ২৩

বছরের-কমবয়সীরা কমিউনিস্ট পার্টিতে গৃহীত হতে পারে একমাত্র কমসোমলের সুপারিশ অনুসারে। এর অর্থ হল, যারা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে চায় তাদের আরও বেশি মাত্রায় যোগ্যতা থাকা চাই, তেমনি, কমিউনিস্ট পার্টির রিজার্ভ হিসেবে কমসোমলের ভূমিকায় নতুন গুরুত্ব সৃষ্টি হল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৯ সালে ছাব্বিশের কম বয়সের মানুষ ছিল মোট জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেক। এই পুরুষ-পর্যায় দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে জানে কেবল বই, ফিল্ম আর বড়দের বলা কাহিনী থেকে, খাদ্যে রেশনিংয়ের কথা তাদের মনে না-থাকার সম্ভাবনাই বেশি। বিচ্ছিন্ন একটিমাত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের বিশেষ-নির্দিষ্ট সমস্যা আর পরিস্থিতিগুলো এদের পক্ষে অতীত ইতিহাসের উপাদান।

তবে, নিকট ভবিষ্যতেই শিল্প প্রতিষ্ঠান আর যৌথখামারের ব্যবস্থাপন করতে, গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলিতে আর দেশকে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে একটা বড়রকমের ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেছিল এই পুরুষ-পর্যায়ই। তার অর্থ হল এই যে, এই পুরুষ-পর্যায়কে যারা দিচ্ছিল শিক্ষাদীক্ষা, যারা এদের তালিম দিচ্ছিল কমিউনিস্ট-সমাজনির্মাতার ভূমিকাপালনের জন্যে, তাদের উপর পড়েছিল বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন একটা দায়িত্ব। এই কারণেই, প্রথমে সো. ই. ক. পা'র ২৩শ কংগ্রেস, আর পরে ১৫শ কমসোমল কংগ্রেসের কাজে মতাদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। অক্টোবর মহাবিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী আসছিল শিগগিরই — সেটাও ছিল রাজনীতিক কাজে শ্রমজীবী জনগণের প্রাণবন্ত আগ্রহের আর-একটা কারণ। বিভিন্ন উপযোগী শিক্ষাগ্রহণের জন্যে, নতুন সমাজ উদ্ভবের বুনিয়াদী নিয়মগুলি সম্বন্ধে উপলব্ধি দিয়ে সজ্জিত হবার জন্যে, কমিউনিজমের সমস্ত প্রকাশ্য আর প্রচ্ছন্ন শত্রুদের —হরেক রকমের সংশোধনবাদী আর মতান্ধ যারা যেন-

তেন প্রকারে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মর্ম আর তাৎপর্যটাকে বিকৃত করে তাদের সমুচিত উপায়ে প্রতিহত করতে আরও বেশি উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্যে তারা ১৯১৭ সাল থেকে সঞ্চিত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানবার-বুঝবার চেষ্টা করবে বারবার, এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

আসন্ন বার্ষিকীর সম্মানার্থে উপযুক্ত উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিকাজে অগ্রণী হল পার্টি, কমসোমল আর ট্রেড ইউনিয়ন। আসন্ন জয়ন্তীর আয়োজনে অংশগ্রহণ করল গোটা দেশই, এ কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই একটুও।

১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নিয়মিত নির্বাচন। নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচিত করল সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী, নিকোলাই পদগোর্নি হলেন তার সভাপতি। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরিত করা এবং রাষ্ট্র আর জনসংগঠনগুলির পরিচালনা আরও সুষ্ঠু করার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেসের নির্দেশনামা হল নির্বাচনী অভিযান সংগঠিত করার সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির মূল বক্তব্যধারা। বছরের পর বছর ধরে দেখা গিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি ঘটে শ্রমজীবী জনপ্রতিনিধি সোভিয়েতগুলিতে, সেগুলি যেমন রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থা, তেমনি বৃহত্তম জনসংগঠনও বটে। পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েতগুলি জনগণকে সম্মিলিত আর সমবেত করতে এবং দেশের আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। ১৯৩৬ সালের সংবিধান গৃহীত হবার পর থেকে জনগণের নির্বাচিত মোটামুটি ১,৮০,০০,০০০ প্রতিনিধি গিয়েছিল এই লেনিনীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে নাকি আছে একটা

তথাকথিত ‘শাসক উপর-মহল’, এই মর্মে বুর্জোয়া অপপ্রচার যে কত অসার, সেটা দেখাবার জন্যে ঐ একটামাত্র অঙ্কই যথেষ্ট।

রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্যা ল. আ. সিসোয়েভা ১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন একটা যুব প্রতিনিধিদলের সদস্যা হিসেবে, তখন এই প্রতিনিধিদল আর মার্কিন সেনেটরদের মধ্যে একটা সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি মস্কোর কাছে একটা রাষ্ট্রীয় খামারে গোয়ালিনীর কাজ করেন, সেই সাক্ষাৎকার আর ঐ কথায় সেনেটরদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি পরে বলেছিলেন: ‘তাদের মুখগুলো কেমন নেমে গিয়েছিল, সেটা আমি এখনও দেখতে পাই। তা, এটা বেশ বোঝাই যায়: তাদের কংগ্রেসে তো কোন গোয়ালিনী নেই।’ পরে, রাশিয়ায় কীভাবে গরু দোয়া হয়, সেটা দেখাবার জন্যে সিসোয়েভাকে বলা হয়েছিল একটা খামারে। সে-পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ২৫-বছর বয়সের গোয়ালিনী সিসোয়েভা পরে ঐ সফর থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন: ‘আমি বিশেষ করে এই ব্যাপারটা নতুন করে উল্লেখ করছি বলে আপনারা হয়ত একটু অবাক হতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন, আমেরিকায় আমার অভিজ্ঞতাটা নিছক আপতিক নয়। পুঁজিতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রচারে লোককে এই ধারণা দেবার চেষ্টা হয় যে, আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের আছে শুধু অদক্ষ কাজ করার অধিকার, আর — তারা বলে — শাসনের কাজটা চালায় কমিউনিস্টরা। জনগণকে তারা দুটো ভাগে ভাগ করে দেখাতে চায়: শাসক শ্রেণী — পার্টি, আর জনগণ, যারা খাটে। কিন্তু, আমি যেখানে কাজ করি সেই রাষ্ট্রীয় খামারটাকেই ধরুন — সেখানে কর্মীদের প্রতি পাঁচ-জনে একজন কমিউনিস্ট। শাসক শ্রেণী আমরা নিজেরাই।’

১৯৫৯ সালে সোভিয়েতগুলিতে মোট সদস্যসংখ্যা ছিল কুড়ি লক্ষ, তার উপর বিপুলসংখ্যক — আড়াই কোটি — স্বেচ্ছাসেবক সোভিয়েতগুলির কাজে শামিল হত সময় পেলেই। তার মানে, সোভিয়েতগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা রকমের জন-কমিশনের কাজে নিয়মিতভাবে হাত লাগাচ্ছিল নির্বাচকদের প্রতি সাত-জনে একজন।

অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ের মধ্যে স্থির করা হয়েছিল, দেশের দৈনন্দিন জীবনে শ্রমজীবী জনপ্রতিনিধি সোভিয়েতগুলিকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করানো হবে। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের প্রচারিত বিবরণগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে আলোচিত হওয়া চাই, আর ঐ একই রকমের ব্যবস্থা চালু হবে ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র পর্যায়েও। স্থানীয় সোভিয়েতগুলি তাদের নিয়মিত বৈঠকগুলিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে ধরতে এবং সেগুলির আলোচ্য বিষয়সূচিতে ব্যাপকতর পরিধির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে থাকল, এইসব বিষয় নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট: সর্বস্তরে গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করার উপর নজর রাখা; আর্থিক, ভূমি ভোগদখল আর পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্যাবলির মীমাংসা; স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ; জনসাধারণের দৈনন্দিন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলি মেটানো।

সোভিয়েত রাজের পঞ্চাশতম বর্ষে ১৯৫৯ সালে আর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রীয় বাজেট গৃহীত হবার সময়ে জনগণ সম্বন্ধে প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ববোধ আরও অনেক বেশি প্রকটিত হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন শুরু হবার কয়েক সপ্তাহ আগে স্থায়ী কমিশনগুলির সদস্য-প্রতিনিধিদের

সমস্ত নিয়মিত কাজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, — ঐ অধিবেশনে যে দলিল-দু'খানা রচিত হতে যাচ্ছিল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালমশলা নিয়ে আলোচনার জন্যে তারা মস্কোয় এসেছিল। গস্‌প্লানের সভাপতি নিকোলাই বাইবাকভ এবং অর্থ-মন্ত্রী ভাসিলি গার্বুজভ সমবেত কমিশন সদস্যদের কাছে বিবরণ পেশ করার পরে ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদের হল্‌গুলি আর কামরাগুলি হয়েছিল প্রতিনিধিদের দপ্তর। আলোচনা আর তর্কবিতর্কে চারিদিক সরগরম; বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী আর শ্রমিক, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত উপদেষ্টা, উদ্ভাবক আর বিভিন্ন প্রকল্পের খসড়া রচয়িতাদের ঘন ঘন বৈঠক। প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা অংক সযত্নে বিবেচিত হল, ক্রমে দানা বেঁধে উঠল চূড়ান্ত প্রস্তাবগুলি। মধ্য এশিয়া আর দেশের মধ্য অঞ্চলের মধ্যে গ্যাসবাহী নলপথ ' সালে চালু করা হবে বলে প্রথমে স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু আলোচনার শেষের দিকে তারিখটা এগিয়ে আনা হল সালের শেষাশেষি। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রের জন্যে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হল, আরও নানা ব্যবস্থা-বন্দোবস্তও করা হল।

যেসব শিল্পায়তনে নতুন পরিকল্পনব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেগুলিতে কাজের ফলাফলের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। ১৯৫৯ সালের গোড়ায় সারা দেশে এমন কারখানা ছিল মাত্র ৪৩টা। এইসব কারখানা সংস্কারের আগেও লাভ করছিল, তাদের উৎপন্ন জিনিস খুবই সরেস বলেও সুখ্যাতি ছিল। সংস্কারের পরে প্রথম বছরের শেষ নাগাত নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ৭০৪টা কারখানায় — সেগুলিতে শ্রমিক আর কর্মচারী ছিল মোট কুড়ি লক্ষর বেশি। এইসব পরিবর্তনের সমস্ত ফলই হয়েছিল উৎসাহজনক। ঐ বছরের মধ্যে সমগ্রভাবে শিল্পের পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে সংসাধিত হয়েছিল: শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল

৮·৬ শতাংশ, যেসব কারখানায় পরিকল্পন আর আর্থনীতিক প্রবর্তনার নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেগুলিতে উৎপাদনবৃদ্ধি হয়েছিল ১০·২ শতাংশ। অর্থাৎ কিনা, তাদের বোনাস তহবিল বেড়েছিল সেই অনুপাতে, তেমনি বেড়েছিল বাড়ি তৈরি করা এবং ছুটি কাটাবার বাড়ি, কিণ্ডারগার্টেন, শিশুশালা, ইত্যাদি নির্মাণের জন্যে বরাদ্দ। আর্থনীতিক সংস্কার যে সুফল দিচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিল না; শিল্পের কতকগুলি গোটা শাখায় নতুন প্যাটার্ন অবিলম্বে চালু করার সিদ্ধান্ত হল।

আর্থনীতিক পরিকল্পনা আর বাজেটের খসড়ার সমস্ত বিভাগ শেষে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত সুপারিশ পেশ করা হল অনুমোদনের জন্যে। কমিশনগুলি তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি প্রস্তুত করল, তার পরে ১৯৫৯ সালে ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশন শুরু হল, সারা দেশ তার কাজ লক্ষ্য করতে থাকল; গস্‌প্লানের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের এবং অর্থ-মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্তদের আর সোভিয়েতগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিশনগুলির দেওয়া বিবরণগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে থাকল সারা দেশের মানুষ। এই সমস্ত মালমশলা এবং আলোচনাগুলির বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছিল (প্রথমে সংবাদপত্রে আর ছোট ছোট পুস্তিকায় এবং পরে বই আকারে)। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মজবুত বনিয়াদ আর বাস্তবতাসম্মত প্রকৃতি স্পষ্ট দেখতে পেল সবাই। প্রত্যেকটি সোভিয়েত নাগরিক বুঝল, ১৯৫৯ সাল হতে যাচ্ছিল সমাজতন্ত্রের অর্জিত সর্বমোট সাফল্য পর্যালোচনা করার বছর, আর অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে হবে শ্রমের বড় বড় সাধনসাফল্য দিয়ে। বাস্তবিক ঠিক এই রকমের একটি ঘটনা হিসেবেই ১৯৫৯ সালটি সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৯ সালে জানুয়ারি মাসে সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর মহাবিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকীর প্রস্তুতি সম্বন্ধে'। পার্টি আবার সোভিয়েত জনগণের কাছে আহ্বান জানাল যে-দিনটিতে সোভিয়েত ভূমি প্রথম অস্তিত্ব লাভ করেছিল তার পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতির উৎসব-অনুষ্ঠান হিসেবে, কমিউনিস্ট ভাব-ভাবনার মহতী বিজয় হিসেবে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে, পঞ্চাশতম বার্ষিকীর সম্মানার্থে শুরু করা হয়েছিল একটা নতুন প্রতিযোগিতা আন্দোলন। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমে বিশেষ রকমের উৎসাহ-উদ্দীপনা, জনগণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনার খুবই উঁচু মাত্রা এবং আর্থনীতিক লক্ষ্যগুলি আর রাজনীতিক-শিক্ষামূলক কাজ একত্রে সংযুক্ত করার বিস্তৃত প্রয়াস।

অভিজ্ঞ প্রাচীন শ্রমিক আর পার্টি কর্মীদের উপর তখন বিস্তর মনোযোগ পড়েছিল। যে সাড়ে-তিন লক্ষ কমিউনিস্ট বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে ছ'হাজার জন বেঁচে ছিলেন এই জয়ন্তীর সময়ে। দেশের সর্বত্র কলে-কারখানায়, আপিসে আর বিদ্যালয়ে প্রবীণ বলশেভিকদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। যাঁরা শীত প্রাসাদ দখল করেছিলেন, শ্বেতরক্ষী আর বহিরাক্রমণকারীদের পরাস্ত-পর্যুদস্ত করেছিলেন, কাজ করেছিলেন সরাসরি লেনিনের অধীনে, তাঁদের স্মৃতিকথা লোকে শুনেছিল প্রবল আগ্রহের সঙ্গে। জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতির সময়ে বিপ্লবের বীর-নায়ক, শিল্পযোজন আর যৌথকরণের সময়কার তড়িৎকর্মী এবং দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেশের সর্বত্র সসম্মানে আদর-আপ্যায়ন করা হয়েছিল। সোভিয়েত সমাজে এটা

স্বাভাবিক ঘটন, — পুরুষানুক্রমে চলে-আসা রেওয়াজ এই সমাজে প্রতিফলিত হয়, বৈপ্লবিক মর্মবাণীটিকে জাগরূক রাখা হয়। ১৯৫৯ সালে ৮ই মে তারিখে 'অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধিসৌধে' চির-অনির্বাণ শিখা জ্বালানো হল জয়ন্তী বর্ষের একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ ঘটনা। লেনিনগ্রাদে মার্স ময়দানের 'অক্টোবরের বীর-নায়কদের সমাধিসৌধ' থেকে ঐ আগুন গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের সঙ্গে মস্কোয় নিয়ে এসেছিল একটি বিশেষ রক্ষিদল। একটি মর্মরপাথরের পাশে এই শিখা জ্বলবে বরাবর, এর ফলকখানায় খোদাই করা আছে: 'নামটি তোমার অজ্ঞাত, কিন্তু কীর্তিগুলি অমর'। রাজধানীতে সমস্ত আগন্তুক দেশের সমরশায়ী বীরদের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করার জন্যে এখানে আসাটাকে একেবারে অবশ্যকর্তব্য মনে করে।

বিপ্লবের ইতিহাস আর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে নওজোয়ানের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে কমসোমল সংগঠন ছেলে-মেয়েদের বড় বড় দলে দলে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গায় — যেমন, বিভিন্ন বৈপ্লবিক লড়াই এবং দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ আর গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন লড়াইয়ের জায়গায়, চতুর্থ দশকে আর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে শিল্পযোজনের সময়ে গড়া বিভিন্ন সুবিশাল শিল্পায়তনে। এই রকমের সব দর্শন-অভিযানে তখন গিয়েছিল দু'কোটির বেশি ইস্কুলের পড়ুয়া।

সো.ই.ক.পা'র সদস্য হবার জন্যে দরখাস্তের গাদাগুলো ছিল শ্রমজীবী জনগণের ঐ সময়কার রাজনীতিক পরিপক্কতার স্পষ্ট প্রকাশ। বেশ কড়াকড়িভাবে বাছবিচার করার পরে ১৯৫৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রার্থী-সদস্য করা হয়েছিল ৬,৬৮,৬৯৭ জনকে — অর্থাৎ, আগেকার বছরের চেয়ে প্রায় ১,৫৮,০০০ জন বেশি। তাদের মধ্যে শ্রমিক ছিল অর্ধেকের বেশি, যৌথখামারী ছিল শতকরা ১৪ জন, আর বাদবাকিদের বেশির ভাগ ছিল ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন, কৃষিবিদ, শিক্ষক, ডাক্তার এবং অন্যান্য

পেশার মানুষ। ঐ সময়ে সমস্ত কমিউনিস্টের মোটামুটি অর্ধেক বৈষয়িক উৎপাদনের কাজে ছিল।

সরাসরি দেড় কোটি সদস্যের কমিউনিস্ট বাহিনীর পরিচালনায় সমগ্র জনগণ তখন প্রস্তুত হচ্ছিল সেই মহতী উৎসবের জন্যে। বৈপ্লবিক যুগের প্রারম্ভে লেনিন বলেছিলেন: 'আজ. বিপ্লবের

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রেড স্কয়্যারে শোভাযাত্রা

বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়ে, বিপ্লব যে-পথ পার হয়ে এসেছে তার উপর আমাদের একবার পিছনে নজর ফেলে দেখাটা সংগত। আমরা আমাদের বিপ্লব শুরু করেছিলাম অসাধারণ কঠিন অবস্থার মধ্যে, আর কখনও তেমনটার সম্মুখীন হতে হবে না পৃথিবীর আর কোন শ্রমিক বিপ্লবকে। তাই, সমগ্রভাবে যে-পথটা আমরা পার হয়ে এসেছি সেটার পর্যালোচনা করা, এই কালপর্যায়ে আমাদের সাধনসাফল্যগুলির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা বিশেষভাবে

গুরুত্বসম্পন্ন...'* নেতার এই পরামর্শের কথা সোভিয়েত জনগণের মনে ছিল, এর অর্থ তাদের জানা ছিল ভালভাবেই। জয়ন্তী বর্ষে অবলম্বিত প্রত্যেকটা ব্যবস্থাকে লোকে বুঝেছিল পঞ্চাশ বছরের বিকাশের ফল হিসেবেই।

১৯৫৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাৎস্ক বিদ্যুৎকেন্দ্র সরকারীভাবে উদ্বোধন করা হলে রাষ্ট্রীয় কমিশন সেটাকে 'চমৎকার' বলে প্রশংসা করেছিল। আঙ্গারা নদীর ধারে এই বিশাল শিল্পস্থাপনাটি তখন ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়, — চল্লিশ লক্ষ কিলোওয়াটের বেশি ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র হল সেই প্রথম; অনুরূপ আকারের অন্য কোন স্টেশন অমন আশ্চর্য কম সময়ে নির্মিত হয় নি আগে আর কখনও। তবে, ইতিহাসে একটি মানুষকে জানা আছে, যিনি সোভিয়েত রাজের অতি ভয়ানক সময়ে, গৃহযুদ্ধ আর আক্রমণ-হস্তক্ষেপের যুদ্ধের সময়ে, যখন ভুখা আর আর্থনীতিক ভগ্নদশা ছিল রাশছাড়া, সেই সময়ে এই অসাধারণ অগ্রগতির চিত্র আগেই দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েই বলেছিলেন, গোটা রাশিয়া একদিন বিদ্যুৎসজ্জিত হবে। ১৯২০ সালে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে বৃটিশ লেখক হারবার্ট ওয়েল্‌স লিখেছিলেন: 'আমি তো কোন যাদুই দর্পণ দিয়ে রাশিয়ার কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু ক্রেমলিনে এই ছোটখাটো মানুষটি তা দেখতে পারেন, তিনি দেখতে পাচ্ছেন ক্ষয়ে-যাওয়া রেলওয়ে-ব্যবস্থার জায়গায় আসছে নতুন বৈদ্যুতিক পরিবহণ, তিনি দেখতে পাচ্ছেন সারা দেশজোড়া নতুন সড়কের ব্যবস্থা, তিনি দেখতে পাচ্ছেন নতুন এবং আরও, সুন্দর কমিউনিস্ট শিল্পযোজনের উদ্ভব।'**

বিপ্লবের পরে দেশের বিদ্যুৎসজ্জার সাফল্য সম্বন্ধে লেনিন যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটা পরবর্তী ঘটনাবলিতে যথার্থ প্রতিপন্ন হল। ১৯৪০ সালে বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার সময়ে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ লিথুয়ানিয়ায় ছিল পুঁজিতান্ত্রিক ডেনমার্কের সঙ্গে তুলনায় ২০ ভাগের একভাগ (ডেনমার্ক আর লিথুয়ানিয়ার জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি সমান, আর এই দুই দেশে শিল্প তখন পরিচালিত হত অনুরূপ ধারায়)। লিথুয়ানিয়ার প্রাক্তন শাসকদের ধারণা ছিল, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ডেনমার্কের ১৯৩৯ সালের পরিমাণে পৌঁছতে লাগবে অন্তত পঞ্চাশ বছর, আর লিথুয়ানিয়ার গ্রামাঞ্চল বিদ্যুৎসজ্জিত করতে লাগবে বহু দশক। কিন্তু, বাস্তবে সব হল একেবারে অন্যরকম: সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে লিথুয়ানিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ডেনমার্ককে বেশ-কিছুটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর ষোল-আনা বিদ্যুৎসজ্জিত হয়ে গিয়েছিল লিথুয়ানিয়ার কৃষি। পাঠকেরা আবারও একবার লক্ষ্য করতে পারেন, এটা সম্ভব হল কেবল সমাজতন্ত্রের দৌলতেই।

ওয়েল্‌স যদি ১৯৫৯ সালটাকে দেখে যেতেন, তখন তিনি কী বলতে পারতেন, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলতে পারে। ঐ বছর নাগাত সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছিল অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক আগে রাশিয়ায় যা হত তার চেয়ে প্রায় ৩০০-গুণ বেশি, আর ১৯৫৯ সালে মোট পরিমাণটা ছিল শিল্পে-অগ্রসর বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি আর ইতালির যুক্ত পরিমাণের চেয়েও বেশি।

সোভিয়েত ধাতু শিল্পেও একটা গুরুত্বপূর্ণ জয় হয়েছিল ঐ বছর: ইস্পাত উৎপাদন পৌঁছেছিল ১০ কোটি টনে। এই অঙ্কটা মনে আরও বেশি ছাপ ফেলে যদি স্মরণে আনা হয় যে, ১৯১৭ সালে দেশের যুদ্ধে-বিধ্বস্ত শিল্পে ইস্পাত উৎপন্ন হচ্ছিল লাখ-

চারেক টন মাত্র। এই সাধনসাফল্যের জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ আর অপরিমেয় কর্মপ্রচেষ্টা: দনেৎস্ অববাহিকার পুনরুদ্ধারের কাজ, নির্মাণ করা হয়েছিল মাগনিতোগর্স্ক আর কুজনেৎস্ক, আমুর-তীরে-কমসোমল্স্ক আর এলেক্ত্রোস্তাল, ক্রিভয় রোগ আর চেরেপভেৎস; ঐ পঞ্চাশ বছরে ধাতু শিল্পে গোটা গোটা নতুন পুরুষ-পর্যায়ের কর্মীরা এই কঠিন কাজে তালিম নিয়েছিল, সুদক্ষ হয়ে উঠেছিল। নিরবচ্ছিন্ন ইস্পাত ঢালাই আর ব্ল্যাস্ট-ফার্নেসে স্বভাবজ গ্যাসের ব্যবহার প্রথমে চালু হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে, আর ৯০০-টনা ওপ্‌ন-হার্থ ফার্নেস যেসব দেশ সর্বপ্রথমে ব্যবহার করে তার একটি হল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯১৭ সালের পরে সোভিয়েত ধাতু শিল্পের উন্নয়ন যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমহারে হত, তাহলে এই সোভিয়েত শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা ১৯৫৯ সালে আসলে যা দাঁড়িয়েছিল তার ছ'ভাগের একভাগ হত।

ঐ রকমেরই সাধনসাফল্য হয়েছিল গ্যাস শিল্পে। জয়ন্তীর সম্মানার্থে এই শিল্পের কর্মীরা যে-পণ করেছিল তদনুসারে তারা মধ্য এশিয়া আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য অঞ্চলের মধ্যে আন্তর্মহাদেশীয় গ্যাসবাহী নলপথ চালু করতে পেরেছিল শরৎকালেই। বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন এই জ্বালানি তখন তুর্কমেনিয়া আর উজবেকিস্তান থেকে প্রায় দু'হাজার মাইল পথ পার করে চালান করা গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশে। জলহীন মরুভূমি, বালুময় পাহাড়, পাথর-ঠাসা মালভূমি এবং আরও নানা রকমের কঠিন জায়গার ভিতর দিয়ে পাততে হয়েছিল এই নলপথের প্রধান অংশটাকে। এই প্রকল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল যথোপযুক্ত মাত্রায় (কাজটার অন্তত ৯৯ শতাংশ ছিল যন্ত্রসজ্জিত), আর নির্মাণ শ্রমিকদের উৎসাহ-উদ্দীপনার একটা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন পূরক ছিল তাদের যোগ্যতার উঁচু

মাত্রা, যদিও গ্যাস শিল্প ছিল সোভিয়েত অর্থনীতির সবচেয়ে নবীন শাখাগুলির একটি। এক্ষেত্রে ১৯১৭ সালের সঙ্গে কোন তুলনা করা যাবে না, কেননা এই শিল্প দেখা দিয়েছিল সবে দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময়ে: যুদ্ধ শিল্পে জালানির যোগান নিশ্চিত করার জন্যে বুগুরুস্লানের কাছাকাছি জায়গা থেকে কুইবিশেভ এলাকায় গ্যাস আনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৯৪২ সালে। এই কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ আর দক্ষতার অভাব ছিল শুধু তাই নয়, বাকু আর বাতুমির মধ্যে একটি তৈলবাহী নলপথ তখন অকেজো হয়ে পড়ে ছিল, সেখান থেকে নল নিতে হয়েছিল নতুন নির্মাণ প্রকল্পটির জন্যে, আর বাদবাকি নল তৈরি করতে হয়েছিল অ্যাজবেস্টস সিমেণ্ট দিয়ে। প্রথম সোভিয়েত গ্যাসবাহী নলপথের বেশ মানানসই নামই হয়েছিল — '১০০-মাইলের অবাককাণ্ড'। তার বছর-পঁচিশেক পরে দেশে স্বভাবজ গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছিল বছরে মোট ১৮,৬০০ কোটি ঘনমিটার, আর তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে হল একই অভিন্ন গ্যাসবাহী নলপথজালি, তা দিয়ে যুক্ত হল দেশের ইউরোপীয় অংশ, মধ্য এশিয়া আর উরাল অঞ্চল। সবচেয়ে সাশ্রয়ী এই জালানির যোগান নিশ্চিত করা হল শুধু শিল্পে নয়, গৃহস্থালিতে ব্যবহারের জন্যেও, ততদিনে লক্ষ লক্ষ ফ্ল্যাটে গ্যাসের উনুন বসানো হয়ে গিয়েছিল।

জয়ন্তী বর্ষে চমৎকার অগ্রগতি ঘটেছিল সোভিয়েত কৃষিক্ষেত্রেও। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলি ততদিনে জেনেছিল রাষ্ট্রকে প্রতিবছর ঠিক কী পরিমাণ জাতদ্রব্য দিতে হবে, এ যোগানটায় তখন এল দুমুখো দায়-দায়িত্ব। খামারগুলিকে নানা রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হল: পশু, গম, রাই, বাকহুইট, জোয়ার আর সূর্যমুখীর বীজ কেনার দাম রাষ্ট্র বাড়িয়ে দিল, যৌথখামারীদের উপর আয়-কর ধার্য করার ব্যবস্থাও পুনর্বিন্যস্ত করা হল। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরুতে যৌথ

একটা রাষ্ট্রীয় পোলট্রি খামার

আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলি রাষ্ট্রের কাছ থেকে ট্র্যাক্টর, লরি আর কৃষিযন্ত্রপাতি এবং সেগুলির জন্যে অতিরিক্ত উপাংশ কিনতে লাগল আরও কম দামে (সাধারণত, কারখানার জন্যে ধার্য দামেই)। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে চালাবার জন্যে ব্যবহৃত বিদ্যুতের দামও কমানো হল।

খামারের ভূমি উন্নয়ন আর ফসলের ফলন বাড়াবার একটি বিস্তৃত কর্মসূচি নিয়ে কাজ ঐ সময়ে শুরু হয়েছিল। সোভিয়েত

ইউনিয়নে বহুবিস্তীর্ণ ভূমি থাকলেও, সবাই জানেন না যে, জনসংখ্যার মাথাপিছু আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ গড়ে আড়াই একরের বেশি নয়। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শস্যকেন্দ্রগুলিতে — দক্ষিণ ইউক্রেন, ভলগা অঞ্চল, রাশিয়া ফেডারেশন আর কাজাখস্তানের অহল্যাভূমি এবং উত্তর ককেশাসের একাংশে — বেশ ঘন ঘনই খরা হয়, এর দরুন কৃষি পরিস্থিতিতে আরও জটিলতা দেখা দেয়। আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থার দরুন কয়েক বার লক্ষ লক্ষ টন শস্যহানি ঘটেছে। সপ্তম দশকের শেষার্ধ নাগাত দেশের আবাদযোগ্য ভূমির মাত্র কুড়ি ভাগের একভাগে কৃত্রিম জলসেকব্যবস্থা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে, খরা এবং হাওয়া আর জলের ক্রিয়ায় ভূমির ক্ষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার জন্যে এবং খেত রক্ষা করার বনবলয় তৈরি করা আর সম্প্রসারিত করার জন্যে আরও বেশি অর্থ আর যন্ত্রপাতি বরাদ্দ করে সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটি আর সোভিয়েত সরকার যে-সিদ্ধান্ত করল সেটাকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ স্বাগত জানাল, এটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান।

রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মীদের মতো একই হারে যৌথখামারীদের নিশ্চিত মজুরি চালু হল — এর ফলে যৌথখামারের অগ্রগতিক্ষেত্রে সূচিত হল একটা নতুন পর্ব। এই নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে, ১৯৫৯ সালের গোড়ায়ই বেশির ভাগ যৌথখামারীই পেতে থাকল নিশ্চিত মাসিক মজুরি। প্রতিবছর গ্রীষ্মের শেষে ফসল উঠে যাবার পরে চূড়ান্ত হিসাবনিকাশ হয়ে গেলে যৌথখামারীদের উপরি পারিশ্রমিক দেওয়া হতে থাকল টাকায় কিংবা খামারের জাতদ্রব্যে। খামারের প্রত্যেকটি সদস্যের কাজের পরিমাণ আর গুণাগুণ এবং সারা বছরে খামারের আয়ের উপর নির্ভর করে ঐ উপরি পারিশ্রমিকের পরিমাণ।

তখন কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে-বিস্তৃত কর্মসূচি অনুসারে কাজ চলছিল তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হল আরও বেশি

বৈষয়িক প্রবর্তনার ব্যবস্থাটা। আরও বেশি বেশি লরি, ট্র্যাক্টর, কম্বাইন-হার্ভেস্টার আর অজৈব সারের যোগান দেওয়া হতে থাকল। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মীদের নিজ নিজ কাজে আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন করে শিক্ষালাভের পাঠ্যধারার ব্যবস্থা হল দেশের সর্বত্র ১৯৫৯ সালে। রাষ্ট্রীয় খামারের ডিরেক্টর, যৌথখামারের সভাপতি, ব্রিগেড-নেতা, খেতে-কর্মিদলপতি, কৃষিবিদ, পশুপালন বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ইত্যাদিরা যাতে তাদের যোগ্যতা বাড়াতে পারে সেজন্যে কৃষিবিদ্যা কলেজগুলিতে বিশেষ বিশেষ বিভাগ আর পাঠ্যধারা খোলা হল, সেখানে তাদের কয়েক মাস ধরে নিয়মিতভাবে তালিম নেবার ব্যবস্থা হল। এই সবকিছুর ফলে, যারা খামারে কাজ করে তারা আবহাওয়ার অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে ১৯৫৯ সালে ১৭ কোটি ১০ লক্ষ টন দানাশস্য ফসল তুলতে পেরেছিল, দেশে এই পরিমাণ দানাশস্য আগে আর কখনও উৎপন্ন হয় নি। ১৯৫৯ সালে ধুলোর ঝড় আর বাতাস এবং তার সঙ্গে গ্রীষ্মটা অত্যন্ত শুকনো হবার দরুন পরের বছরে অমন চমৎকার ফল আবার পাওয়া সম্ভব হয় নি, কিন্তু কৃষির অগ্রগতি মোটের উপর অব্যাহতই ছিল। শিল্পে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফসল, তরিতরকারি আর ফল ফলেছিল আগের বছরের চেয়ে বেশি। দানাশস্য, তুলো, চিনি-বীট এবং আরও অনেক রকমের জাতদ্রব্য কেনা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ছাপিয়ে। সমস্ত রকমের পশুজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনও বেড়েছিল।

শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক নিরাপত্তাক্ষেত্রে নতুন নতুন অগ্রগতি থেকে স্পষ্ট দেখা গেল, অর্থনীতি সমানে প্রণালীবদ্ধভাবে বেড়ে চলছিল। ১৯৫৯ সালের শেষাশেষি সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠল, কর্মচারী আর শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি বেঁধে দেওয়া হল ষাট রুবলে, ছুটি ধার্য হল বছরে অন্তত পনর কর্মদিন। দূর উত্তরে কিংবা দূর প্রাচ্যে যারা কাজ করে, রাষ্ট্র

তাদের মজুরি বাড়িয়ে দিল। যৌথখামারীদের পেনশন নেবার বয়স পাঁচ বছর কমিয়ে শহরের শ্রমিকদের সমান করে দেওয়া হল। যাকে বলা হয় অস্বাস্থ্যকর কাজ সেগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের এবং কোন-কোন রকমের পেনশনভোগী আর কাজে-অশক্তদের জন্যে কতকগুলো নতুন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হল।

ক্রিমিয়ার পূব উপকূলে ল্ভোভ রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের ছুটি কাটাবার বাড়ি

সর্বসাধারণের আসল আয় যা ধরা হয়েছিল তার চেয়ে দ্রুত বেড়ে চলল; গ্রাম আর শহর অঞ্চলের মজুরির মধ্যেকার পার্থক্য কমে আসতে থাকল। এই বৃদ্ধিটা আরও সহজ হয়েছিল সর্বোপরি টাকায়-আয় বাড়ার ফলে। সরাসরি যৌথখামার থেকে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংগঠন থেকে কৃষকদের পাওয়া আয় বাড়ছিল, বিশেষত এটাই ছিল ঐ সময়কার একটা উৎসাহজনক লক্ষণ। তার মাত্র পাঁচ বছর আগেও যৌথখামারীদের গড় আয়ের ৪০ শতাংশের বেশি আসত তাদের ব্যক্তিগত জমিখণ্ড থেকে,

কিন্তু ১৯৫৯ সালে ঐ পরিমাণটা দাঁড়িয়েছিল ১০ শতাংশেরও কম — বাদবাকি ৯০ শতাংশ আয় আসত যৌথখামারে কাজ এবং রাষ্ট্র থেকে।

১৯১৭ সালের পর থেকে পঞ্চাশ বছরে অন্যান্য দেশেও জীবনের অনেক দিক বদলে গিয়েছিল, তাও ঠিক। কতকগুলো আর্থনীতিক সূচকের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও কতকগুলি বুর্জোয়া দেশের নাগাল ধরতে পারে নি। তবু, ঐসব দেশের কোনটায়ই উন্নয়ন হয় নি এত দ্রুত হারে এবং এমন ব্যাপক পরিসরে। কাজ আর অবসরের নিশ্চিত অধিকার, বেকারি খতম, নিখরচ মাধ্যমিক আর উচ্চ শিক্ষা, নিখরচ চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পেনশন, পৃথিবীতে সবচেয়ে কম বাড়িভাড়া আর পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্তৃত বসতবাড়ি তৈরির কর্মসূচি (জনসংখ্যার প্রতি-হাজার জনের হিসেবে) — এমনসব সাধনসাফল্য সোভিয়েত জনগণের সংগত গর্বেরই জিনিস। এই সবকিছুই হল এমন একটা দেশে যা আগে ছিল বুর্জোয়া আর ভূস্বামীদের শাসনে, যে-দেশে শ্রমজীবীরা তখন উল্লিখিত কল্যাণগুলির একটাও আদায় করতে পারে নি। সমাজতন্ত্রের যুগটিকে নিয়ে এল ১৯১৭ সালের অক্টোবরের মহাজয় — তারই কল্যাণে সম্ভব হল এই সবকিছুই।

সোভিয়েত ভূমি যখন তার পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল সেই সময়ে পৃথিবীতে অনেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধনসাফল্যগুলিকে, তার আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করছিল সোৎসাহে। এখনও কোন কোন দেশের সরকার তাদের দেশে সোভিয়েত নাগরিকদের যাবার অধিকারের উপর বাধা-নিষেধ চাপায় এবং তাদের দেশের নাগরিকদের সোভিয়েত ইউনিয়নে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সোভিয়েত বই আর চলচ্চিত্র কেনা নিষিদ্ধ করে, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের যেকোন প্রসার ব্যাহত করে। তবে, এইসব বাধা-নিষেধ ব্যর্থ করার জন্যে রেডিও, টেলিভিশন এবং

ব্যাপকভাবে তথ্য পরিবেশনের অন্যান্য উপকরণ তো আছেই। শেষে, কোটি কোটি মানুষ নিজেদের চোখেই দেখল সোভিয়েত 'স্পুৎনিকের' উড্ডয়ন, আর পৃথিবীতে এমন জায়গা বড় একটা নেই যেখানে লোকে মহাকাশে প্রথম মানব ইউরি গাগারিন এবং তাঁর সাথী মহাকাশচরদের কথা শোনে নি।

মহাকাশচর ইউরি গাগারিন এবং মহাকাশচারিণী ভালেন্তিনা তেরেশ্‌কোভা

ইউরি গাগারিনের ঐতিহাসিক উড্ডয়ন ঘটেছিল ১৯৫৯ সালের ১২ই এপ্রিল। একটা শক্তিশালী বাহক রকেট কাজাখস্তানের এলাকা থেকে মহাকাশে উঠে মহাকাশযানখানিকে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে দিয়েছিল। পৃথিবী পরিক্রমা করে এই মহাকাশযান অবতরণ করেছিল ভলগা অঞ্চলে সারাতভের অদূরে। এই প্রথম মহাকাশ-উড্ডয়ন চলেছিল ১০৮ মিনিট ধরে, মহাকাশযানখানির দ্রুতি ছিল ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল।

বেলুনে করে মানুষের প্রথম আকাশে ওঠা আর প্রথম বিমান নির্মাণের মধ্যে কেটে গিয়েছিল গোটা ১৫০ বছর। আর তার পঁচাত্তর বছর পরে লোকে জানল পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ বস্তুটা কী জিনিস, তার পরে মহাশূন্যদেশে মানুষ পাঠাতে সোভিয়েত জনগণের লাগল আরও সাড়ে-তিন বছর। পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচর হলেন সোভিয়েত নাগরিক, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ইউরি গাগারিন। চার মাস পরে, ১৯৫৯ সালে ৬ই অগস্ট 'ভস্তক্-২' মহাকাশযানে করে গেরমান তিতোভের উড্ডয়ন চলেছিল চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে। (১৯৫৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম মার্কিন মহাকাশযান পৃথিবীর কক্ষ পরিক্রমা করেছিল।) এর পরে হল যুগল মহাকাশযান ক্ষেপণ — পৃথিবীর মানুষ সেই প্রথম শুনল আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ আর পাভেল পপোভিচের নাম। ভালেন্তিনা তেরেশ্কোভা হলেন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী ১৯৫৯ সালে জুন মাসে, আর সেই কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন ভালেরি বিকোভ্স্কি। কুশলী গতিবিধির 'ভস্খোদ' মহাকাশযানকে পৃথিবীর পত্র-পত্রিকাজগৎ বলল বিংশ শতাব্দীর অবাককাণ্ড, তাতে মহাকাশচর ছিলেন তিন জন — পাইলট ভ্লাদিমির কোমারভ, ইঞ্জিনিয়র কন্স্তান্তিন ফেওক্তিস্তভ এবং ডাক্তার বরিস ইয়েগোরভ। তাঁদের চালানো গবেষণার ফলে, ১৯৫৯ সালে মার্চ মাসে একখানা মহাকাশযান থেকে মহাকাশে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হল সেই প্রথম। এই অভূতপূর্ব অবাককাণ্ডও করলেন একজন সোভিয়েত নাগরিক — আলেক্সেই লেওনভ, এই মহাকাশযানের পাইলট ছিলেন ভ্লাদিমির বেলিয়ায়েভ।

সরাসরি মহাকাশযান থেকে পাঠানো পৃথিবীর প্রথম প্রথম টেলিভিশন ছবিগুলি বহু দেশের কোটি কোটি মানুষ দেখতে পেয়েছিল 'ইউরোভিশন' আর 'ইণ্টারভিশন' রীলে ব্যবস্থা মারফত।

মস্কোয় ওস্তানকিনোর টেলিভিশন বুরুজ

চাঁদ, শুক্রগ্রহ আর মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশন ক্ষেপণ হল মহাকাশ-জয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। মহাকাশে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের চালানো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাদির ক্ষেত্রে প্রধান ধারা হয়ে উঠল প্রথমত আর সর্বাগ্রে বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আর মহাকাশযানের ব্যবহার। এইসব প্রণালীর সাহায্যেই তাঁরা ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে চাঁদের যে-দিকটা পৃথিবী থেকে অদৃশ্য তার অনন্যসাধারণ সব ফোটো তুলতে পেরেছিলেন। চাঁদে প্রথম ধীর-অবতরণ ঘটানো হল ১৯৬৬ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, সেখানে পাঠানো যন্ত্রগুলি থেকে চন্দ্রভাগদৃশ্যের ছবিগুলি এল পৃথিবীতে। পরে, মার্কিন মহাকাশচরেরা চাঁদে নামার পরে ইউরি গাগারিন এবং তাঁর অনুগামীদের মহাবীরকীর্তির কথা এবং স্বয়ংক্রিয় সোভিয়েত মহাজাগতিক স্টেশনগুলির উড্ডয়নের সাহায্যে পাওয়া তথ্যাদির ব্যবহারিক তাৎপর্যের কথাও বলেছিলেন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে।

১৯৫৯ সালের বসন্তকালে, সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে, চাঁদের প্রথম কৃত্রিম 'স্পুৎনিক' দিয়ে মহাকাশ থেকে ঝঙ্কৃত হল 'আন্তর্জাতিক' সংগীতের সুর। কী প্রতীকী এই ঘটনাটা — মহাকাশে সর্বপ্রথমে ধ্বনিত সুরটি হল প্রলেতারিয়েতের, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমাবেশ-সংগীতের সুর!

আর-একটা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা হল ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে, তখন, সেই প্রথম, একটা উড়নযন্ত্র ধীরে অবতরণ করল শুক্রগ্রহপৃষ্ঠে, আর এই সাধনসাফল্যের পরে, পৃথিবীর কক্ষে সঞ্চরমান দুটো সোভিয়েত 'স্পুৎনিকের' পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং পৃথক হওয়া ঘটানো হল স্বয়ংক্রিয় উপায়ে।

মহাজাগতিক গবেষণায় এইসব সাধনসাফল্যের মধ্যে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল কী জমকালো শিখরে উন্নীত হয়েছে সোভিয়েত বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি, দেখা গেল সোভিয়েত

আর্থনীতিক পরাক্রম উঠেছে কত উঁচু মাত্রায়, আর পৃথিবীর সভ্যতার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান কী বিরাট।

মহাকাশযাত্রার পথটা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তার শুরু হয় বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চার-হল'এ, দেশের বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউট আর কেন্দ্রগুলিতে, গ্রন্থাগারে আর মিউজিয়মে, ল্যাবরেটরিতে, কলে-কারখানায়, খনিতে।

সপ্তম দশকে 'মস্কোভ্স্কায়া প্রাভ্দা' পত্রিকার একটা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল মস্কো-রিয়াজান রেলওয়ের ১নং ইস্কুলের তিরিশটি ছেলের একখানা গ্রুপ ফোটো, — ১৯৫৩ সালে এই ফোটোখানা তোলা হয়েছিল তারা বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করার ঠিক আগে। এই ছেলেরা সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ে কী করছিল, সেই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, একজন হলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চম মহাকাশচর, তাঁর সহপাঠীদের সতর জন হলেন সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়র, পাঁচ জন সোভিয়েত ফৌজে অফিসার, একজন ভূবিজ্ঞানী, আর-একজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পরে ক্যাণ্ডিডেটের ডিগ্রির জন্যে কাজ চালাচ্ছিলেন।

সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় অনুরূপ সুযোগ-সম্ভাবনা রইল প্রত্যেকেরই জন্যে। তখন আর শুনে কেউই আশ্চর্য হয় না যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদা অনগ্রসর তুর্কমেনিয়ায় ১৯৫৩ সালে জনসংখ্যার প্রতি দশ-হাজার জনে ছাত্র (উচ্চ শিক্ষায়তনের ছাত্র — অনুঃ) ছিল ১১৫ জন, যদিও প্রতিবেশী ইরানে সংখ্যাটা ছিল মাত্র দশ। এমন সময়ও ছিল, যখন ফরাসী সাংবাদিকদের একটা বিবরণে লেখা হয়েছিল যে, মধ্য এশিয়ার মানুষ মোটরগাড়ির জালানির জন্যে নিয়ে গিয়েছিল তাড়া-তাড়া খড়। তবে, সপ্তম দশক নাগাত, শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকে দেখলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাজিকিস্তান অনেক আগেই নাগাল ধরে ফেলেছিল প্রতিবেশী দেশগুলিরই শুধু নয় — বৃটেন আর ফ্রান্সেরও। ঐ সময় নাগাত
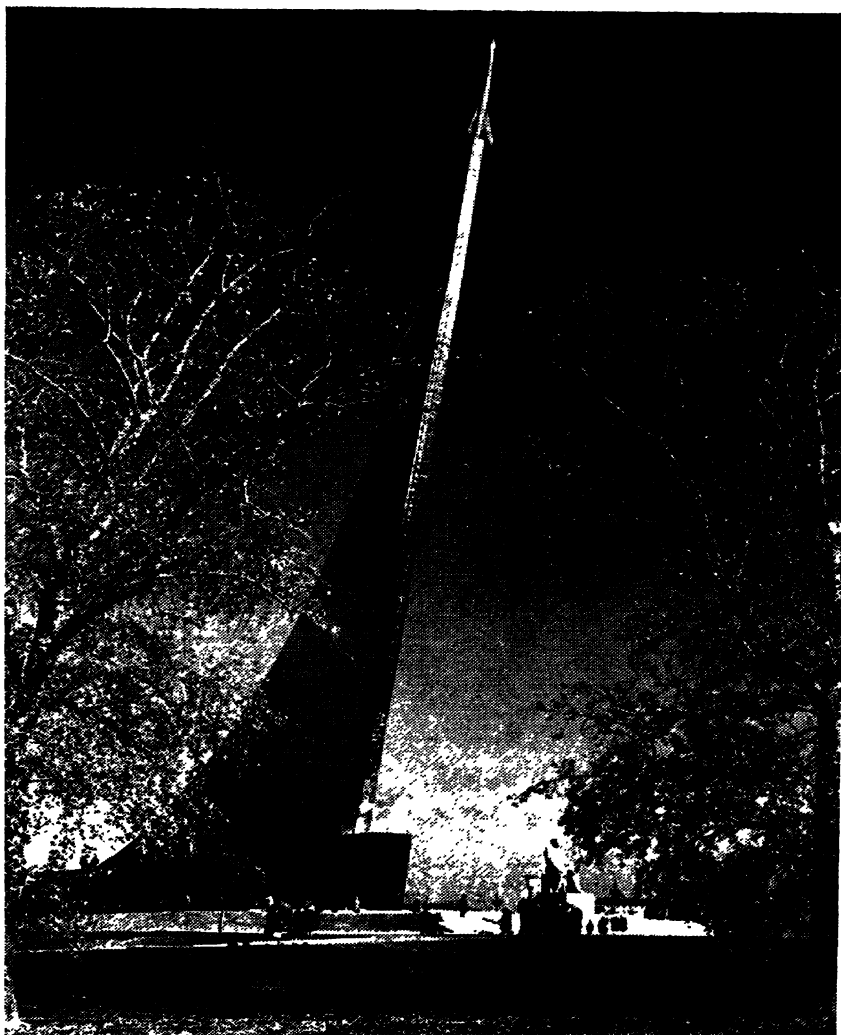
মস্কোয় মহাকাশজয়ের একটি গৌরবস্মারক স্তম্ভ

সোভিয়েত ইউনিয়ন একেবারে অবিসংবাদিতভাবেই আগুয়ান হয়ে গিয়েছিল পুস্তক প্রকাশনে (তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষা থেকে তরজমা-করা বইয়ের সংখ্যায়ও), গ্রন্থাগারগুলিতে মজুদের পরিমাণে এবং মিউজিয়ম দেখতে-যাওয়া আর গ্রন্থাগারের সদস্যের সংখ্যায়। ১৯৫৩ সালে বই তরজমা করা হয়েছিল ৮,৮৮৩ খানা, — জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, এই সংখ্যাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সংখ্যার চেয়ে চারগুণ বেশি।

সংস্কৃতি বাস্তবিকপক্ষেই হয়ে উঠল সমগ্র জনগণেরই মনোজগতের সম্পদ। বিপ্লবের আগেকার রাশিয়ায় মেহনতী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে পুশকিন আর তিউৎচেভের রচনা পড়ার কিংবা গ্লিঙ্কা আর চাইকোভ্‌স্কির সংগীত উপভোগ করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বিপ্লবের পরে তারা এইসব রচনা পড়তে থাকল, এইসব সংগীত শুনতে থাকল, শুধু তাই নয়, জনগণের মধ্যে অচিরেই বদ্ধমূল হয়ে উঠল নতুন নতুন রেওয়াজ: পুশকিন একসময়ে থাকতেন প্‌স্কভের কাছে মিখাইলভ্‌স্কয়ে গ্রামে, — পুশকিনের জন্মদিনে প্রতিবছর সেখানে প্রকাণ্ড জমায়েত হয়, তাতে স্থানীয় ব্যক্তিরা, সুপরিচিত পণ্ডিতব্যক্তি আর অভিনেতারা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র থেকে আসা অতিথিরা পুশকিনের রচনাবলি থেকে আবৃত্তি করেন, তাই শুনতে আসে লোকে। অনুরূপ জমায়েত হয় ব্রিয়ান্‌স্কের কাছে যেখানে কবি তিউৎচেভ একসময়ে থাকতেন সেই বাড়িতে, স্মোলেন্‌স্কের কাছে গ্লিঙ্কার বাড়িতে, ক্লিন-এ চাইকোভ্‌স্কির বাড়িতে, কিয়েভে শেভ্‌চেঙ্কোর সম্মানার্থে — এখানে নাম করা হল অল্প কয়েকটামাত্র। এইসব অনুষ্ঠানের অনেকগুলিতে বিদেশী অতিথিরাও শামিল হয়।

তেমনি, সোভিয়েত সংস্কৃতিক্ষেত্রের বিশিষ্ট কর্মীরা যান অন্তত এক-শ'টা দেশে। সোভিয়েত আর্টের প্রতি বিদেশে আগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই। যেমন, বিদেশে গিয়ে সোভিয়েত ব্যালে

কম্পানিগুলির অনুষ্ঠানের জন্যে স্রোতের মতো আসে যত অনুরোধ, সেই সমস্তই যদি সোভিয়েত সংস্কৃতি-মন্ত্রক রক্ষা করে, তাহলে দেশের ব্যালে থিয়েটারগুলির শতকরা ৭০ ভাগকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। বিদেশে সাদর সংবর্ধনা পায় পেশাদার কম্পানিগুলিই শুধু নয় — সোৎসাহ অভ্যর্থনা করা
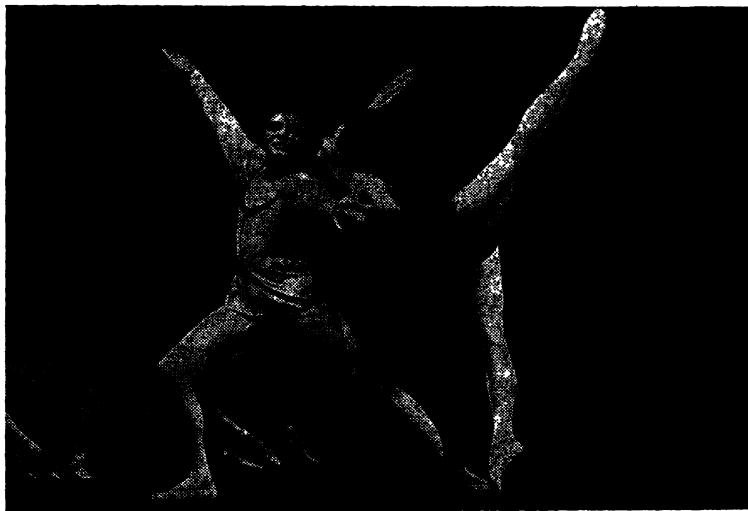
বলশোই থিয়েটারে চাইকোভ্স্কির 'মরাল সরোবর'

হয় শখের দলগুলিকেও, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, তার কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নে যথার্থই গণ-পরিসরে বিকশিত আর্টের ক্রিয়াকলাপের মান খুবই উঁচু স্তরের। ১৯৫৩ সালে অপেশাদার আর্ট গ্রুপগুলিতে সদস্যসংখ্যা ছিল এক কোটি কুড়ি লক্ষর বেশি। এমনসব আর্ট গ্রুপ রয়েছে দেশের সর্বত্র, তারা শহর আর গ্রামগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেই রয়েছে — ১,৩২,০০০ টার বেশি সংস্কৃতিকেন্দ্রে তাদের অনুষ্ঠান হয় প্রায়ই।

বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাকাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র এগারো হাজারের সামান্য বেশি — কথাটা আজকাল মনে হয় যেন অবিশ্বাস্য। ১৯৪০ সালের মধ্যে সংখ্যাটা বেড়ে গিয়েছিল প্রায় দশগুণ, আর ১৯৫৩ সালে দাঁড়িয়েছিল ৭,৭০,০০০— অর্থাৎ, পৃথিবীর মোট সংখ্যার চতুর্থাংশ। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটান নি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র নেই। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন — পদার্থবিদ্যার জন্যে তাম্, লান্দাউ, ফ্রাঙক, চেরেনকভ, বাসভ আর প্রখোরভ, এবং রসায়নের জন্যে সেমিয়নভ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং একটা প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা পাশাপাশি বিকশিত হতে থাকলে কত-যে সুযোগ-সম্ভাবনা খুলে যায় মানুষের সামনে, তার একটা খুবই লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে চিকিৎসাবিদ্যার সাধনসাফল্য এবং দেশের বহুপ্রসারিত সমগ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থাটা। তৃতীয় দশকের শুরুতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরত ম্যালেরিয়ায়, এমনকি ১৯৫২ সালেও মানুষকে নিঃশেষ করে-দেওয়া এই রোগ হয়েছিল ১,৮০,০০০ জনের। শেষে, সপ্তম দশকে, বসন্তরোগ, কলেরা, প্লেগ আর টাইফাসের মতো যেসব রোগ সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্র থেকে কার্যত দূর হয়ে গেল, সেগুলির তালিকার মধ্যে পড়ল ম্যালেরিয়াও।

ভয়ঙ্কর রোগ পোলিও থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে সোভিয়েত টীকা পাঠানো হয়েছে পৃথিবীর বহু জায়গায় — যদিও, খাস সোভিয়েত ইউনিয়নে এই রোগ বিরল। বিজ্ঞানীরা যাতে একটা কার্যকর টীকা প্রস্তুত করতে পারে সেজন্যে রাষ্ট্র থেকে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল; টীকা দেওয়া হয়েছিল আট কোটির বেশি সোভিয়েত নাগরিককে।

১৮৯৭ সালে রাশিয়ায় মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর, সেটা দাঁড়িয়েছিল ১৯৩৯ সালে ৪৭, আর ১৯৫৩ সালে ৭০

বছরের উপরে। ততদিনে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামগ্রিক মৃত্যু-হার হয়েছিল যুদ্ধের আগেকার মাত্রার চেয়ে ১৫০ শতাংশ কম এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে কম।

এই সমস্ত সাধনসাফল্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের সামগ্রিক অগ্রগতির অঙ্গ, যে-অগ্রগতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষ। এইসব সাধনসাফল্য, এবং শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক আর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্যে দেশের বিপুল সুযোগ-সুবিধা — এই দুইয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

বৈজ্ঞানিক আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতির এই পথে প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে হয়েছিল নানা রকমের। আগুয়ান হয়ে পথ করে চলার কাজের মধ্যে কোন কোন ভুল হিসাব, এমনকি মর্মান্তিক ক্ষতিও ছিল অবশ্যম্ভাবী। একটা নতুন ধরনের মহাকাশযান পরখ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় মহাকাশচর ভ্লাদিমির কোমারভের; ইউরি গাগারিন নিহত হন একটা রুটীন ট্রেনিং উড্ডয়নের সময়ে। মহাজাগতিক যুগের এই বীর-নায়কদের দেহভস্মাবশেষ সমাধিস্থ করা হয় ক্রেমলিন প্রাকারে দেশের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়কদের পাশাপাশি। প্রকৃতির রহস্যগুলি ভেদ করে সেগুলিকে শেষপর্যন্ত আয়ত্ত করে মানুষের সেবায় লাগাবার চেষ্টায় এগোবার পথটা যে কত জটিল এবং কষ্ট-কাঠিন্যময়, সেটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই সব ক্ষতি।

মহাজাগতিক গবেষণায় ইতোমধ্যে বিস্তর পরোক্ষ উপকারও পাওয়া গেছে: জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী আর চিকিৎসকেরা অনেককিছু জানতে পেরেছে; আবহাওয়ার পূর্বাভাষ আরও ঢের বেশি নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। যোগাযোগের 'স্পুৎনিকের' সাহায্যে ভ্লাদিভস্তকের মানুষ সরাসরি মাস্কো থেকে রীলে করা টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছে, মস্কো আর প্যারিসের মধ্যে রেডিও আর টেলিভিশন যোগাযোগ

স্থাপন করা গেছে। মানুষসমেত মহাকাশে উড্ডয়নের নতুন নতুন কর্মসূচি প্রস্তুত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত মাত্রায় জটিল কতকগুলি টেকনিকাল আর জীববিদ্যাগত সমস্যা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

একসময়ে লোকে প্রশ্ন তুলত: কী দরকার মোটরগাড়ি আর বিমান দিয়ে? তার উত্তর দিয়ে দিয়েছে বাস্তব জীবনই। কারও-কারও খেয়ালখুশি কিংবা নতুন রেকর্ড স্থাপন করার নেশা মেটাবার চেয়ে ঢের বেশিকিছুই করছে মহাকাশে উড্ডয়ন, সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিদিনই। বিশ্বকে আয়ত্ত করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে এত বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে মানবজাতিরই তরফে, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্যে।

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকীর জয়ন্তী উৎসব কাছিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাজগৎ কোন-না-কোন দিক থেকে এই ঘটনাটার দিকে কিছু-না-কিছু মনোযোগ না-দিয়ে পারে নি। ক্রমেই আরও বেশি বেশি বৈদেশিক সাংবাদিক আর সংবাদদাতারা আসতে লেগেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। সোভিয়েত দেশের মানুষ বিশেষ আন্তরিক সংবর্ধনা জানিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে আগত বন্ধুদের, ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট আর শ্রমিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের, বিভিন্ন জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় নারী-পুরুষদের, শ্রমিক আর জনসংগঠনগুলির প্রতিনিধিদলগুলিকে। এইসব আগন্তুকের অনেকেই বিভিন্ন বিশেষ আন্তর্জাতিক জয়ন্তী অধিবেশন আর সম্মেলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, তাছাড়া, তারা গিয়েছিল বিভিন্ন কলে-কারখানায় আর খামারে, গবেষণাকেন্দ্রে আর শিক্ষায়তনে। গোটা দেশ কী উৎসাহ-উদ্দীপনায় তৎপর হয়ে উঠেছিল, সেটা তারা দেখতে পেয়েছিল নিজেদের চোখেই।

জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে পরিচালিত প্রতিযোগিতা আন্দোলনে বিজয়ীদের নাম নির্বাচিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে অক্টোবর মাসে: ১,০০০ কারখানা আর খামার এবং কতকগুলি ফৌজী ইউনিট আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদর্শস্বরূপ বলে গণ্য হয়েছিল, তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল বিশেষ 'জয়ন্তী পতাকা'। বিশেষ পদক
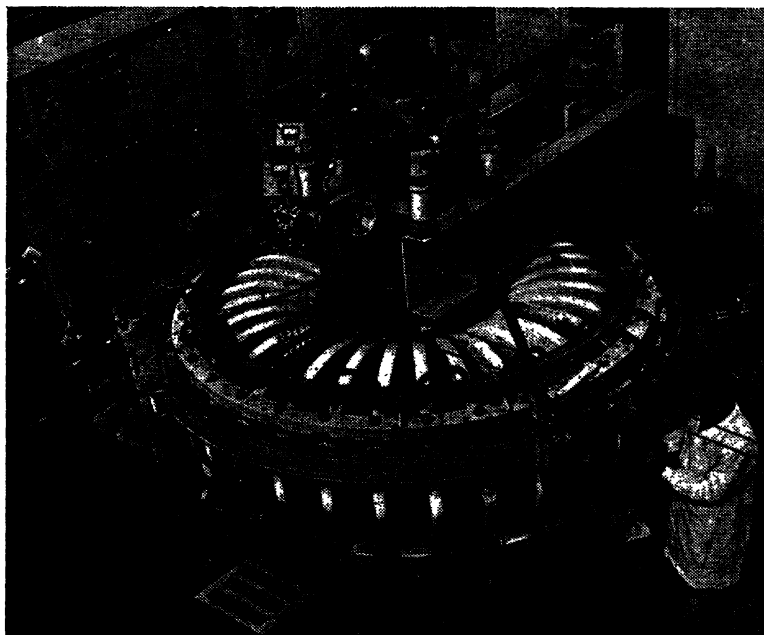
একটা গবেষণাকেন্দ্রে

দেওয়া হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধের প্রায় ১,৩০,০০০ জন বীর-নায়ককে। গৃহযুদ্ধের সময়ে যাঁরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার লড়াইয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, এমন অনেককেও অনুরূপভাবে সম্মানিত করা হয়েছিল। মস্কো আর লেনিনগ্রাদকে আলাদা করে নিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করা

হয়েছিল, — সবে চালু-করা নতুন সম্মানচিহ্ন 'অক্টোবরের অর্ডারে'র প্রথম দুটি পেয়েছিল ঐ দুটি নগরী।

১৯৫৩ সালে নভেম্বর মাসের শুরু থেকেই জয়ন্তী উৎসবের বিশেষ বিশেষ সভা-সমাবেশ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবের লালনক্ষেত্র লেনিনগ্রাদে জয়ন্তী উৎসবের সময়ে অনুষ্ঠিত সভাগুলিতে পার্টি আর রাষ্ট্রীয় নেতারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই খাস মহাদিবসের ঠিক আগে, ৩রা আর ৪ঠা নভেম্বর তারিখে ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে সমবেত হয়েছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত আর রাশিয়া ফেডারেশনের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা। আরও উপস্থিত ছিলেন পার্টির প্রবীণ সদস্যরা, বিপ্লবের বীর-নায়কেরা, শ্রমজীবী জনগণ জনসংগঠন আর ফৌজের প্রতিনিধিরা এবং ১০৭টা দেশ থেকে আগত অতিথিরা। 'সমাজতন্ত্রের বিরাট সাধনসাফল্যের পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক বিবরণ পেশ করেছিলেন লেওনিদ ব্রেজনেভ। পঞ্চাশ বছর আগে বিপ্লব সংঘটিত হবার পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পার হয়ে আসা পথটি যেসব সংগ্রাম আর বিজয় দিয়ে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে, সেগুলির কথা সমারোহ সমাবেশে সমবেত সবাই এবং সমগ্র জনগণ আবার স্মরণ করছিল লেওনিদ ব্রেজনেভের সঙ্গে একত্রে। এই পথ শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক কর্তব্যটিকে নির্দিষ্ট করতে সহায়ক হয়েছে; মানুষের ক্রিয়াকলাপের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন যে-ক্ষেত্রটি — আর্থনীতিক উন্নয়ন, সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির সম্প্রসার — তাতে পুঁজিতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের সন্দেহাতীত শ্রেষ্ঠত্ব প্রকটিত করল যে-সমাজব্যবস্থা তার অভ্যুদয়ে আর সংহতিসাধনে শ্রমিক শ্রেণীর সৃজনশীল ভূমিকাটিকে দেখিয়ে দিয়েছে এই পথ। মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে, সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার অবস্থা আর বৈষয়িক সমৃদ্ধির মূলগত উন্নতিসাধন

এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ খুলে দিতে পারল সমাজতন্ত্রই। কীভাবে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই আগেকার নিপীড়িত জাতি আর জাতিসত্তাগুলির যুগযুগান্তরের অনগ্রসরতা ঘুচিয়ে দেওয়া গেল, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতিকে সম্মিলিত করা গেল অটুট সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে।
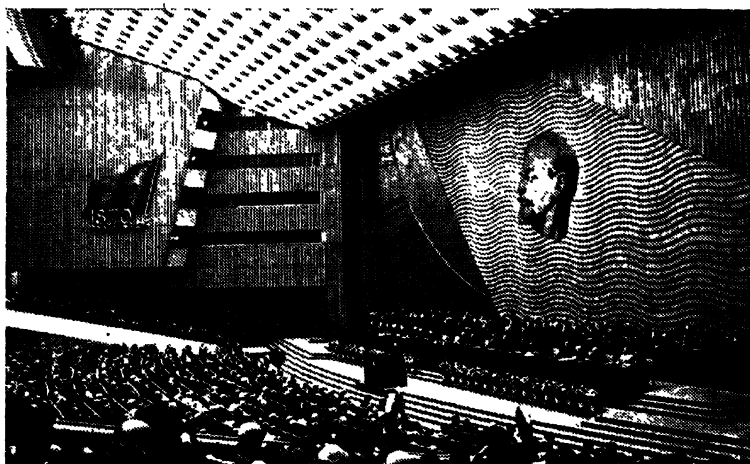
লেনিন জন্মশতবার্ষিকীর সমারোহ অনুষ্ঠান

বিপ্লবের পরবর্তী পঞ্চাশ বছর হল লেনিনবাদের জয়জয়কারের সময়; যার নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লব নিষ্পন্ন হল, সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ আর চূড়ান্ত জয় ঘটল সোভিয়েত ইউনিয়নে, শ্রেণীবিহীন সমাজে পৌঁছবার পথ প্রস্তুত হল, সেই কমিউনিস্ট পার্টির জয়জয়কারের সময়।

এই মহাগুরুত্বসম্পন্ন জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শামিল হয়েছিল অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক

শ্রমজীবী জনগণ। এটাকে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের জীবনে একটি প্রেরণাদায়ক ঘটনা বললে একটুও অতিশয়োক্তি হয় না।

নতুন নতুন লক্ষ্য

অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশতম বার্ষিকীর উদ্‌যাপন সোভিয়েত সমাজের ইতিহাসে একটা অনপনেয় ছাপ রেখে গেল। বার্ষিকীর জন্যে প্রস্তুতি চলতে থাকার সময়েই অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই বার্ষিকীর সম্মানার্থে শ্রমজীবী জনগণ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পেঁছে যাবার সংকল্প করে বেশ কঠিন কঠিন সব কর্তব্য হাতে নিয়েছিল।

সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্মানার্থে আয়োজিত সমারোহ অনুষ্ঠানের ঠিক পরেকার বছরগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আরও অনেকগুলি জয়ন্তী উৎসব। বিপ্লবের ঠিক পরেকার বছরগুলিতে দেখা দিয়েছিল কতকগুলি ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কমসোমল, লাল ফৌজ স্থাপিত হয়েছিল; সাধারণভাবে, ঐ বছরগুলিতে শুরু হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ, নতুন নতুন জনসংগঠন আর রাষ্ট্রীয় সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। সপ্তম দশকের শেষের দিকে সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তির পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল, ১৯৫৩ সালে কমসোমল, আর তারপরে ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া আর বেলোরুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বার্ষিকী এসেছিল। উদ্‌যাপিত হয়েছিল ইউক্রেন আর বেলোরুশিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বার্ষিকী। লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া আর এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপনেও

শামিল হয়েছিল সমগ্র জনগণ। এর প্রত্যেকটা ঘটনাই হয়েছিল ঐ অর্ধ-শতকে আহরণ-করা অভিজ্ঞতা এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বুনিয়াদী নিয়মগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্যে জনগণের পক্ষে নতুন প্রেরণাস্থল; প্রত্যেকটি ঘটনাই সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেমে নতুন উৎসাহ যোগাতে সহায়ক হয়েছিল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা যারা শেষ করতে যাচ্ছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করার জন্যে সমাজবিজ্ঞানীরা ১৯৫৩ সালে মস্কোয়, ক্রাস্নদারে, গোর্নি আল্তাইয়ে এবং দেশের আরও কতকগুলি জায়গায় একটা বিশেষ প্রশ্নমালা প্রচার করেছিল। ইস্কুলের পড়ুয়াদের প্রশ্ন করা হয়েছিল: 'যা চাও তাই করবার সুযোগ থাকলে তুমি কী বেছে নেবে?' যেসব উত্তর পাওয়া গিয়েছিল তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেই ফুটে উঠেছিল মানুষের জন্যে উৎকণ্ঠা, সারা পৃথিবীতে সুস্থিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, রোগ জয় করা এবং কমিউনিজম গড়ার কামনা। অন্যান্য উত্তরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল মানুষের মনোদিগন্ত সম্প্রসারিত করার কামনা (উত্তরগুলির ৩০ শতাংশে); ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল উত্তরগুলির মাত্র ১৮ শতাংশে। একটা ইন্টিরেস্টিং দিক: ১৯২৭ সালে একই এলাকাগুলিতে অনুরূপ প্রশ্নমালার যেসব উত্তর ছিল তার থেকে এগুলির পার্থক্য ছিল বিস্তর। আগেকার প্রশ্নমালার উত্তরগুলিতে দেখা গিয়েছিল, প্রধান প্রধান আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল — প্রথমত, ভ্রমণ, দ্বিতীয়ত, বৈষয়িক-মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া এবং, তৃতীয়ত, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উঠতি পুরুষ-পর্যায়ের উন্নততর সামাজিক চেতনা সমগ্রভাবে সোভিয়েত জনগণের রাজনীতিক পরিপক্বতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই দুটো গুণ সামাজিক আচরণের একটা অঙ্গাঙ্গিভাবের উপাদান হয়ে উঠেছে। সপ্তম দশকের শেষের

দিকে মার্কিন মিলিটারি যখন ভিয়েৎনামে যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে সম্প্রসারিত করে সারা ইন্দোচীনে ছড়িয়ে দিতে লেগেছিল তখনকার আন্তর্জাতিক উত্তেজনার কালপর্যায়ে এই গুণদুটো খুবই লক্ষণীয়ভাবে সামনে এসে গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ইস্রায়েলী শাসকেরা আরব জাতিগুলির বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ লাগাল। চেকোস্লোভাকিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিবার থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলো চেষ্টা করেছিল ১৯৫৩ সালে। সোভিয়েত-চীন সীমান্তে প্ররোচনাগুলোর কথা জেনে তীব্র তিক্ততায় ভরে উঠেছিল সোভিয়েত দেশের মানুষের মন। অধ্যবসায়ী চীনা জনগণের প্রতি সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণের আন্তরিক অনুভূতি বরাবরকার জিনিস, তাঁদের নতুন জীবন গড়ার প্রচেষ্টায় সোভিয়েত দেশের মানুষ বরাবর সহানুভূতিশীল। হাজার হাজার চীনা ছাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে থেকে অধ্যয়ন করে গেছে; চীনা সাথীদের নিজস্ব আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে বহু সোভিয়েত নাগরিক। এমনই পটভূমিতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেকার আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ভেঙে দেবার এবং প্রতক্ষ্যভাবে সোভিয়েতবিরোধী উন্মত্ততা সৃষ্টি করার যে-কর্মনীতি ধরলেন চীনা নেতারা, তাতে সোভিয়েত জনগণ বড়ই মর্মপীড়া বোধ করেছিল।

শ্রমিক আর কর্মচারীরা, যৌথখামারীরা তাদের জনসভাগুলি থেকে মার্কিন যুদ্ধবাজ আর ইস্রায়েলের চরমপন্থী মহলগুলোর কুকাজে সবাই মিলে ধিক্কার দিল। ভ্রাতৃপ্রতিম চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করার জন্যে সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্তে ষোল-আনা সমর্থন জানাল গোটা দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর প্রাচ্যের প্রবেশপথগুলোকে সুদক্ষভাবে রক্ষা ক'রে সীমান্তের সৈনিকেরা যে-দৃঢ়সংকল্প প্রদর্শন করল, সেটা দেশজোড়া অনুমোদন লাভ করল।

পররাষ্ট্র আর স্বরাষ্ট্র উভয় নীতিক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত জনগণের ষোল-আনা ঐক্যকে আবারও প্রকটিত করে তুলতে এইসব ঘটন সহায়ক হল। অধিকন্তু, যা আগেও বিভিন্ন ব্যাপারে ঘটেছে, উত্তেজনায় ঠাসা পরিস্থিতিগুলো সোভিয়েত জনগণকে আরও প্রবলভাবে কর্মতৎপর করেই তুলেছে।

১৯৫৩ সালে গ্রীষ্মকালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জন্মশতবার্ষিকীর জন্যে প্রস্তুতি সম্বন্ধে' সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে শতবার্ষিকীর তারিখটি সেই দিন থেকেই কেন্দ্রী উপাদান হয়ে উঠল জনগণের দৈনন্দিন জীবনে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। মহাগুরুত্বসম্পন্ন এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্কুলের পড়ুয়া আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, শহরের আর গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবীরা, সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তি — সবাই। লেনিন জয়ন্তীর উদ্দেশেই বিজ্ঞানী আর মহাকাশচরেরা উৎসর্গ করলেন তাঁদের বিভিন্ন সাধনসাফল্য: পৃথিবীর কক্ষে সঞ্চরমান বিভিন্ন মহাকাশযানকে পরস্পরের সঙ্গে ভেড়ানো, মহাকাশে ইস্পাত ওয়েল্ডিং এবং পরে একই সঙ্গে তিনখানা মহাকাশযান ক্ষেপণ — এই সবই ঘটানো হল পৃথিবীতে সেই প্রথম। 'কমিউনিস্ট শ্রম-আন্দোলনে' তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ শরিক সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের কাছে আহ্বান জানাল শ্রমক্ষেত্রে নতুন নতুন বিজয়সাফল্য দিয়ে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্যে। এই জয়ন্তীর সম্মানার্থে আগুয়ান কর্মিসমষ্টিগুলি যেসব দায়িত্ব নিল সেগুলি আর্থনীতিক সংস্কার থেকে উদ্ভূত প্রধান প্রধান কর্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, — এই আর্থনীতিক সংস্কার অনুসারে তখন কাজ চলছিল দেশজুড়ে। বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরয়িত করা, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি সমানে বাড়িয়ে চলা, এবং জাতদ্রব্যের গুণ উন্নততর করাই ছিল সংশ্লিষ্ট সবারই প্রধান লক্ষ্য। উৎপাদনে ফলপ্রদতা

বাড়াবার জন্যে কর্মকালের আরও বেশি যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহার করা দরকার ছিল। অর্থনীতিবিদেরা হিসেব কষে দেখেছিল, তখন সোভিয়েত শিল্পে প্রতি-মিনিটে উৎপন্ন হচ্ছিল মোটামুটি ২০০ টন ইস্পাত, ৬০০ টন তৈল আর ১,০০০ টন কয়লা; প্রতি দেড় মিনিটে তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছিল একটা করে নতুন ট্র্যাক্টর। কাজেই, এক-একটা মিনিট নষ্ট হবার অর্থ হল, দেশের কম পড়বে কুড়ি কুড়ি ফ্রিজ্, টেলিভিশন-সেট্, ধোলাই কল, হাজার হাজার জোড়া জুতো, আর এক-একটা সেকেন্ড বাঁচালে এবং মালমশলা খরচ কমালে অর্থনীতির উন্নতি হয় অনেকটা।

লেনিন এটা শিখিয়ে গেছেন: 'কমিউনিজমের শুরু হয় তখনই, যখন সাধারণ **শ্রমিকেরা** কঠোর মেহনতে না-দমে সোৎসাহ গরজ দেখায় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার জন্যে, **প্রতি পুদ্ দানাশস্য, কয়লা, লোহা** এবং অন্যান্য জাতদ্রব্য ব্যবহার করে হিসেবী হয়ে, যাতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত কিংবা 'নিকট' আত্মীয়স্বজনের ফয়দা হয় না, কিন্তু ফয়দা হয় তাদের 'দূরে' আত্মীয়স্বজনের, অর্থাৎ, গোটা সমাজের, কোটি কোটি, শত শত কোটি মানুষের, যারা সম্মিলিত প্রথমে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এবং পরে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নে।'*

লেনিনের এই উপদেশ অনুসারে 'কমিউনিস্ট শ্রমের' তড়িৎকর্মা শ্রমিকেরা বলল, নিজ-নিজ বৃত্তিতে সবার সেরা শ্রমিকের খেতাব পাবার জন্যে এবং হিসেবী হয়ে বাঁচানো কাঁচামাল দিয়ে উঁচু মাত্রায় সরেস জিনিস উৎপাদনের জন্যে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলুক।

১৯৫৩ সালের ২২এ এপ্রিল যথোপযুক্তভাবে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্যে দেশজুড়ে এই লক্ষ্য নির্ধারিত

হল যে, সবার সেরা শ্রমিকদের বেছে নেওয়া হবে, উৎপাদনে সাধনসাফল্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হবে, শ্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে হবে বাদবাকি শ্রমজীবীদের।

আর্থনীতিক সংস্কার অনুসারে কাজ চলছিল ক্রমাগত ব্যাপকতর পরিসরে, এরই ফলে জনগণের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ বেড়ে চলছিল। ১৯৫৩ সাল নাগাত প্রায় সমগ্র সোভিয়েত শিল্পই (যেসব প্রতিষ্ঠান দিচ্ছিল দেশের মোট উৎপাদনের ৯৩ শতাংশ এবং লাভের ৯৫ শতাংশের বেশি) পরিকল্পনের নতুন প্রণালী ধরে আর্থনীতিক প্রবর্তনার নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিল। যেসব কারখানা পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায়ের গোড়ায়ই নতুন ধাঁচ ধরেছিল তারা নতুন ব্যবস্থায় নবাগতদের অভিজ্ঞতা দিল এবং সাহায্য করল সাগ্রহে। প্রধান প্রধান কর্মশালায় পরিব্যয়-হিসাবরক্ষণ, বোনাসের কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং আর্থনীতিক ব্যবস্থাপন শেখার পাঠ্যধারা যেসব কারখানায় সবার আগে চালু হয়েছিল সেগুলির একটা ছিল মস্কোয় 'ভ্লাদিমির ইলিচ কারখানা'। নতুন প্রনিয়ম অনুসারে, কারখানার হাতে দেওয়া হয়েছিল প্রবর্তনা তহবিল (বিভিন্ন বোনাস, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক কাজকর্ম এবং বসতবাড়ি নির্মাণের তহবিল, উৎপাদন সম্প্রসারণের তহবিল)। এর ফলে কারখানার নবপ্রবর্তকদের পরিষদ এবং লাইসেন্স আর ডিজাইন দপ্তরের কাজে আরও বেশি তৎপরতা জাগল। পাঁচসালা পরিকল্পনা কালপর্যায় শেষ হবার আগেই উৎপাদনশীলতার হার উন্নততর করার জন্যে নিজস্ব কর্মসূচি তৈরি করতে আরম্ভ করল আগুয়ান শ্রমিকেরা। শ্রম-সংগঠনের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং সেই প্রণালী চালু করা একটা নিয়মিত রেওয়াজ হয়ে উঠল। এই সবকিছুর ফলে সমস্ত পরিকল্পনা পূরণ হল লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে, আর থেকে ১৯৫৩ সালে বৈষয়িক প্রবর্তনা তহবিল বেড়ে গেল প্রায় তিনগুণ। তার একাংশ খরচ

করা হল সরঞ্জামের আধুনিকীকরণের জন্যে, আর-একটা অংশ খাস বোনাসের জন্যে, এবং একটা ক্রীড়াকেন্দ্র আর একটা নতুন সংস্কৃতি ভবন নির্মাণের জন্যে গেল অন্য একটা অংশ।

বিশেষত এই কারখানাটির জীবন সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ কেউ জানতে চাইলে, তিনি ফিটার সের্গেই আন্তোনভের লেখা 'শ্রমিকের গর্ববোধ' নামে ছোট বইখানা পড়ে দেখতে পারেন। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি কাজ করেছেন এই কারখানায়, এখানে তাঁর বাবাও কাজ শুরু করেছিলেন টার্নার হিসেবে। এখানে তাঁর ভাইয়েরা টার্নার, আর বোন কাজ করেন ডিজাইন ব্যুরোয়। আন্তোনভ নিজে ২০০টার বেশি র‍্যাশানালাইজেশনের প্রস্তাব তুলেছিলেন, সেগুলি থেকে দেশের কোটি কোটি রুবল উপরি লাভ হয়েছে, তিনি পেয়েছেন 'সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বীর' খেতাব। এই কারখানায় যারা কাজ করে তাদের কথা তিনি লিখেছেন বইখানায়। সাথী শ্রমিকদের প্রবল সৃজনশীল উদ্যমের কথা লিখতে গিয়ে তিনি লেনিনের এই কথাটা উদ্ধৃত করেছেন: 'রাজনীতিগতভাবে সচেতন প্রত্যেকটি শ্রমিক উপলব্ধি করবে সে তার নিজের কারখানার কর্তা শুধু তাই নয়, সে দেশের একজন প্রতিনিধিও বটে, সে উপলব্ধি করবে নিজের দায়িত্ব — এই হল কথাটা।'*

সমগ্রভাবে কারখানাটির জন্যে, দেশের জন্যে দায়িত্ববোধ এই কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য। এরই ফলে ঘটে তাদের ধারাবাহিক সাফল্যগুলি, আসে তাদের নিজেদের ধার্য-করা ক্রমবর্ধমান উঁচু মান এবং যেকোন ত্রুটিবিচ্যুতি ঘুচাবার প্রয়াস। ১৯৫৩ সালে ২রা অক্টোবর 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত এই কারখানার একদল আগুয়ান শ্রমিকের চিঠি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল এবং

সেটা অকারণে নয়। শ্রমে-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন, গরহাজিরি এবং দক্ষতায় কমতির বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্বন্ধে কথা তোলা হয়েছিল এই চিঠিখানায়। দুঃখের কথা, ঐ রকমের মানুষ তখনও কিছু কিছু ছিল। এমনসব লোকের মনোবৃত্তি বদলানোর ব্যাপারটা, স্বভাবতই, আরও বেশি টন এবং আরও বেশি মিটার জিনিস উৎপাদনের ব্যবস্থা করার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন কাজ। এই নতুন করে শিক্ষাদীক্ষা দেবার অর্থ হল নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা — কাজের প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি।

লেনিন জন্মজয়ন্তী প্রতিযোগিতা অভিযানে নামার সময়ে এই কারখানাটি স্থির করেছিল, অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা তারা সামগ্রিক উৎপাদনের দিক দিয়ে পূরণ করবে সালের ৭ই নভেম্বরের মধ্যে, আর শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার লক্ষ্যমাত্রায় পেঁছে যাবে সালের ২২এ এপ্রিলের মধ্যেই।

আরও বহু কারখানাও এই কারখানাটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। তুলা বিভাগে শ্চেকিনো রাসায়নিক কারখানা থেকে সালে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি প্রায় দ্বিগুণ এবং উৎপাদন শতকরা ৮০ ভাগ বাড়িয়ে দেশজুড়ে সুখ্যাতি পেয়েছিল। এজন্যে কিন্তু কোন নতুন কর্মশালা তৈরি হয় নি, কোন নতুন সরঞ্জাম যোগানো হয় নি, উঁচুমাত্রায় যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র কিংবা বিশেষজ্ঞের কোন সমাগমও হয় নি: আদত ব্যাপারটা ছিল এই যে, এই কারখানাটি পেয়েছিল একটা সুস্থিত উৎপাদন পরিকল্পনা, তাতে পাঁচসালা পরিকল্পনার একেবারে শেষ অবধি বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রাগুলি যথাযথভাবে বাঁধা ছিল, আর কারখানাটিকে দেওয়া হয়েছিল স্থায়ী মজুরি তহবিল — সেটা আগের বছর সালের চেয়ে বেশি নয়। ব্যাপারটা ছিল যেন এই রকমের যে, একটা বিশেষ-নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের বাবত কারখানাটিকে একখানা চেক্ দিয়ে দেওয়া হল, তাতে

শর্ত রইল যে, ঐ পরিমাণ কাজ সমাধা করতে লোক যতই লাগুক-না-কেন এইজন্যে ব্যবহৃত টাকার মোট পরিমাণ থাকবে একই। দেখতে সহজ-সরল এই ব্যবস্থাটার পিছনে বিভিন্ন টেকনিকাল ঝঞ্ঝাট ছাড়াও ছিল বিভিন্ন জটিল আর্থনীতিক, সামাজিক এবং কখনও কখনও নিছক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও।

এই কারখানার বহু শ্রমিকের ঠাকুরদাদের, এমনকি বাপেদেরও এখনও মনে আছে, একসময়ে বরখাস্ত হওয়া আর বেকারি ছিল শ্রমিকদের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সবকিছু বদলে গেল বিপ্লবের পরে। কোন কারখানায় শ্রমিক কমাতে হলে তার বন্দোবস্তটা হয়ে গেল একেবারে অন্য রকমের। শেচকিনোতে যেকোন লোককে কাজ থেকে ছাড়ানো হলে সে তখন অন্য নানা কাজের থেকে একটা বেছে নিতে পারে: একই ধরনের অন্য কারখানায় কাজ, নির্মাণ শ্রমিকদলে শামিল হওয়া, যোগ্যতা বাড়ানো কিংবা অন্য কোন কাজের জন্যে তালিম নেওয়া, ইত্যাদি। তেমন অবস্থায়, আগেকার কাজ থেকে ছাড়ানো শ্রমিকের বয়স, পোষ্যের সংখ্যা, তার মজুরি কত ছিল, এসব বিষয় বিবেচিত হত; কারখানার ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন জনসংগঠন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকটিকে নতুন কাজ পেতে সাহায্য করত — এইভাবে শ্রম আইন সংহিতা প্রতিপালিত হত অক্ষরে-অক্ষরে।

হার-বাঁধা হতে থাকল আরও সুষ্ঠুভাবে, বিভিন্ন সর্বাধুনিক টেকনিক চালু করা হতে থাকল; শ্রমিকদের বৃত্তিগত দক্ষতা ব্যাপকতর করার জন্যে নিজেরটা ছাড়া আরও কয়েকটা কাজও শিখতে তাদের উৎসাহিত করা হতে থাকল। বছর-দুয়েকের মধ্যে ৯০০ শ্রমিক কমানো হল, বাদবাকিদের মজুরি বাড়ল গড়ে ২৫ শতাংশ, শ্রমিকদের টেকনিকাল যোগ্যতার উন্নতি হল লক্ষণীয়। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার প্রতিযোগিতায় এই কারখানাটি আরও অসংখ্য কারখানার চেয়ে আগুয়ান হয়েছিল।

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার বিষয়টা একটা প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ছিল বরাবরই, কিন্তু এখন আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া হতে থাকল আর্থনীতিক সূচকের দিকে। একসময়ে দেশে নানা রকমের জিনিসের ভীষণ ঘাটতি চলত — সেটা তখন অতীতের ব্যাপার। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ থেকে কারখানাগুলির কাছে নানা জিনিসের ফর্দ যেতে থাকল — সেইসব জিনিস পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি উৎপন্ন করা নিষিদ্ধ। যেসব জাতদ্রব্য রাষ্ট্রীয় মানের অনুযায়ী, সেগুলিকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় কমিশনের শংসাপত্র দেওয়া রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল, — সবচেয়ে সরেস জিনিসগুলিকে দেওয়া হতে থাকল 'সরেস মার্কা'। সর্বপ্রথমে এই চিহ্ন পেয়েছিল (১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে) 'ভ্লাদিমির ইলিচ কারখানা', যার নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারখানায় উৎপন্ন বৈদ্যুতিক মোটর হল আন্তর্জাতিক মানের অনুযায়ী, এই মোটরের যা কার্যকরতা, আকার আর ওজন, তাতে এটা সবচেয়ে সেরা বৈদেশিক মডেলগুলির চেয়ে স্পষ্টতই শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন হল। এই মোটর রপ্তানি হতে থাকল ডজন ডজন দেশে।

১৯৬৯ সালে 'সরেস মার্কা' পেয়েছিল বিভিন্ন গ্যাণ্ট্রি-ক্রেন্, এক্সক্যাভেটর, টারবাইন, কোন কোন রকমের ঘড়ি, টেলিভিশন আর রেডিও সেট্, বোনা জামা-কাপড় এবং আরও কতকগুলি জিনিস — দেশে-বিদেশে সুপরিচিত মোট হাজার-আড়াই জিনিস — এই অংকটা থেকেই বোঝা যায়, বাছনের নিরিখটা ছিল কড়াকড়ি। এই 'সরেস মার্কা' বিশেষ মর্যাদার চিহ্ন, এই বাহাদুরি পাবার জন্যে প্রতিযোগিতা চলে, তার ফলে রাষ্ট্র, পৃথক পৃথক কারখানা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেকটি শ্রমজীবী খুবই উপকৃত হয়।

বাস্তবিকই, উৎপাদনে নিযুক্ত প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে উৎপাদনের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে মেলানোর উপর আরও বেশি জোর

দেওয়াই সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বর্তমান পর্বের বিশেষক উপাদান। সেটা আবার পরিপুষ্ট হয় আর্থনীতিক অগ্রগতি এগিয়ে নিয়ে চলার মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রচেষ্টাগুলি দিয়ে, আর সেটা শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ যোগায়। কেবল ভাল কাজেরই জন্যে 'কমিউনিস্ট শ্রমের তড়িৎকর্মা শ্রমিক' খেতাব দেওয়াটাকে নিন্দা ক'রে ১৯৬৯ সালে ট্রেড ইউনিয়নে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়। তড়িৎকর্মা শ্রমিককে অধ্যয়নও করতে হবে, নিজের সাংস্কৃতিক মান আর টেকনিকাল যোগ্যতা বাড়াতে হবে, কারখানার বাইরে আচরণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, সক্রিয় শরিক হতে হবে জনসংগঠনগুলিতে।

লেনিনগ্রাদের মানুষের উদ্যোগ অনুসরণ করে জাতীয় অর্থনীতির বহু শাখায় সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পন বদ্ধমূল হয়ে উঠল। সামাজিক পরিকল্পনকে বলা যেতে পারে টেকনিকাল আর আর্থনীতিক পরিকল্পনের ধারাবাহিকতা এবং চূড়ান্ত পর্ব: এটা শ্রমিকদের স্বার্থ আর প্রয়োজনের সঙ্গে উৎপাদনের লক্ষ্যটাকে সংযুক্ত করে। ১৯৬৯ সালের জন্যে রচিত এমন পরিকল্পনা সাধারণত কতকগুলি ভাগে বিভক্ত থাকত: কাজের অবস্থার উন্নতি, বৃত্তি আর দক্ষতার কাঠামটাকে নিখুঁত করে তোলা, পরিচালনের ধরনধারন আরও বিকশিত করা, শিক্ষার মান আর টেকনিকাল যোগ্যতা বাড়ানো, ইত্যাদি। পরিচালন কর্তৃপক্ষ আর সাধারণ শ্রমিকেরা যুক্তভাবে পরিকল্পনা রচনা করছিল: পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হত এবং ইতোমধ্যে সমাধা-করা কাজের বিভিন্ন পর্ব আর ফলাফল বিশ্লেষণ করা হত। এমনসব কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত করার ভিতর দেখা গেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'মানুষ উপাদান'টির প্রতি সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটি, তেমনি সেটা উন্নয়নের সাধারণ লক্ষ্যগুলিকে যুক্ত করল সংশ্লিষ্ট কর্মিসমষ্টির নির্দিষ্ট

কর্তব্যগুলি আর সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে। সামাজিক পরিকল্পন দেখা দিল আগুয়ান শিল্পায়তনগুলিতে, আর কমিউনিস্ট শ্রম আন্দোলনে আগুয়ান শ্রমিকেরা এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে গরজ দেখাল সবচেয়ে বেশি, সেটা অকারণে নয়।

কমিউনিস্ট নির্মাণকাজের বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ সব পরিবর্তন দেখা গেল গ্রামাঞ্চলেও। যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মীদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন বড়রকমের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ, বোনাস বাড়ল, কৃষিকর্মীদের প্রয়োজন মেটাবার দিকে মনোযোগ দেওয়া হল আরও বেশি। বেলোরুশিয়ার 'নোভি বিৎ' ('জীবনযাত্রার নতুন প্রণালী') নামে কৃষি আর্টেলটিকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। ১৯৬৯ সালে এর কর্মিসংখ্যা ছিল ৭১৯ — অর্থাৎ, ১৯৫৯ সাল থেকে এক-শ' জনের বেশি কম, কিন্তু ফসল উঠল ডবল, আর দুধ উৎপন্ন হতে থাকল দ্বিগুণের বেশি। আবাদী জমির পরিমাণ একই থাকলেও, ১৯৬৯ সালে তাতে কাজ চলছিল খুবই ভিন্ন উপায়ে: আগে যৌথখামারীদের খেতের কাজের অর্ধেকের বেশিটা করতে হত হাত দিয়ে, কিন্তু ১৯৬৯ সালে কাজের শতকরা ৯৫ ভাগই যন্ত্রসজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, আর সার ব্যবহৃত হচ্ছিল ডবল পরিমাণে। ১৯৫৯ সাল নাগাত খামারটির কর্মীদের মধ্যে ছিল একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়র, লোক-বল সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়র একজন, একজন অর্থনীতিবিদ, একজন স্থপতি, আর স্নাতক কর্মীর মোট সংখ্যা ছিল ১৯৫৯ সালের সংখ্যাটার প্রায় তিনগুণ বেশি। যৌথখামারীদের মধ্যে খেলাধুলা আগে থেকেই চলে আসছিল ব্যাপক পরিসরে, এখন তাদের হল একজন পেশাদার ক্রীড়াগুরু; তাদের স্থানীয় ক্লাব ছিল, তার উপর তৈরি করা হল একটা সংস্কৃতি ভবন। ঐ দশ বছরের মধ্যে খামারটিতে মজুরি বেড়েছিল গড়ে ১৫০ শতাংশ, পশুপালকদের আয় দাঁড়িয়েছিল মাসে ১৪০-১৬০

রুবল, আর ট্র্যাক্টরচালকদের আয় দাঁড়িয়েছিল মাসে ২৫০ রুবল অবধি।

মাটি আর আবহাওয়ার অবস্থা ঢের বেশি অনুকূল ক্রাস্নদার প্রদেশে — সেখানে খামারগুলি হল আরও বেশি পয়মন্ত। ১৯৫৯ সাল নাগাত সেখানে যৌথখামারের আয় ১০০ কোটি রুবল ছাড়িয়ে গিয়েছিল (তার মানে, দশ বছরে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি)। ব্যয়ের একটা প্রধান দফা ছিল ডেয়ারি ব্যবস্থাদি, বিদ্যালয়, ক্রেশ্, ক্লাব আর অপ্রধান রাস্তা নির্মাণে (প্রধান প্রধান রাস্তা আর বিদ্যুৎবাহী লাইন নির্মাণের খরচ সরকারের)। টাকা যাতে বড় বেশি ছড়িয়ে না-পড়ে সেজন্যে এবং শিল্পক্ষেত্রের মতো শ্রম-প্রণালী কাজে লাগাবার জন্যে স্থানীয় খামারগুলি মিলে টাকা লাগিয়ে একটা আন্তঃখামার নির্মাণ সংগঠন তৈরি করল, — ১৯৫৯ সালের শুরু নাগাত তাতে ছিল নিজস্ব সিমেণ্ট কারখানা এবং রীইন্‌ফোর্স্‌ড কনক্রিট, ইঁট, কাঠের মিস্ত্রির কাজে প্রয়োজনীয় মালমশলা এবং অন্যান্য জিনিস উৎপাদনের কারখানা।

অনুরূপ সব সংগঠন চালু করা হয়েছিল দেশের সমস্ত অংশেই। এটা হল সমবায় আর রাষ্ট্রীয় রূপের সম্পত্তিকে একত্রিত করে ফেলার প্রক্রিয়ার অঙ্গ। দেশের সর্বত্রই যৌথখামারগুলি হয়ে উঠছিল আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত বৃহদায়তনের কৃষি প্রতিষ্ঠান, তাতে ছিল সুযোগ্য কর্মিদল। ১৯৫৯ সালে এক-একটা যৌথখামারে ছিল গড়ে ৭,৪০০ একর আবাদ-করা জমি, হাজারটার বেশি গবাদি পশু, প্রায় ৬০০ শুয়োর আর ১,৫০০ ভেড়া; প্রতি যৌথখামারে ছিল গড়ে ৫০টার বেশি ট্র্যাক্টর, ডজন ডজন হার্ভেস্টার, লরি এবং বৈদ্যুতিক মোটর, ইত্যাদি। ১৯৫৯ সালে প্রতি রাষ্ট্রীয় খামারে ছিল গড়ে ১৭,০০০ একর আবাদ-করা জমি, ২ হাজারটার বেশি গবাদি পশু, প্রায় ১,০০০ শুয়োর আর ৪,০০০ ভেড়া। গোটা সোভিয়েত কৃষিক্ষেত্রে (অর্থাৎ, যৌথ আর রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে)

ট্র্যাক্টর ছিল ১৮,০০,০০০টার বেশি, কম্বাইন-হার্ভেস্টার ৫,৮০,০০০টা, আর দশ লক্ষর বেশি লরি।

গ্রামাঞ্চলের মানুষের এবং সমগ্র সোভিয়েত জনগণেরই জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৫৯ সালে নভেম্বর মাসের শেষে মস্কোয় অনুষ্ঠিত যৌথখামারীদের তৃতীয় সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল 'যৌথখামারের আদর্শ নিয়মাবলি'. এর খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল কংগ্রেসের অনেক আগেই, সেটা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আর সভা-সমাবেশে ব্যাপক আলোচনা চলেছিল। যৌথখামারগুলির প্রধান প্রধান কাজ এবং যৌথখামারীদের অধিকার আর কর্তব্যকর্ম স্পষ্ট-নির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল এই নিয়মাবলিতে। সপ্তম দশকের শেষাশেষি যৌথখামারীদের জীবনে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলিকে সাধারণভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ ক'রে তাতে কৃষি উৎপাদন-শক্তিগুলির আরও বৃদ্ধির পথ খুলে ধরা হয়েছিল। এই কংগ্রেসে কাজের এবং গৃহীত দলিলপত্রের প্রধান দিক ছিল তিনটে। প্রথমটা ছিল রাজনীতিক দিক, কেননা যৌথখামারের গণতন্ত্র আরও কার্যকর করে তোলার জন্যে কাজ চলছিল: সিদ্ধান্ত হল যে, সমস্ত জেলায়, বিভাগে আর প্রজাতন্ত্রে যৌথখামারের নির্বাচিত পরিষদ বসানো হবে, আর সারা-ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত হবে সরাসরি কংগ্রেস থেকেই — তাতে সদস্য থাকবে ১২৫ জন। উল্লিখিত তিন রকমের পরিষদগুলিকে বলা হল, তারা যৌথখামারগুলির কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নগুলি নিয়ে সমষ্টিগত ভিত্তিতে আলোচনা করবে, উৎপাদন সংগঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন খামারের পাওয়া অভিজ্ঞতা একত্রিত করবে, উৎপাদনবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্যে সংরক্ষিত ক্ষমতার পূর্ণতর সদ্ব্যবহারের বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করবে। কর্মিদলপতি, ডেয়ারি তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি স্পষ্ট-নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল এই নতুন

নিয়মাবলিতে (আগে যৌথখামারের বোর্ড তাদের নিযুক্ত করত)। যেকোন খামারী তার উপর স্থাপিত আস্থার যোগ্য প্রতিপন্ন না-হলে তাকে নির্বাচিত সংস্থাগুলি কিংবা পদ থেকে বরখাস্ত করে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হল যৌথখামারীদের। যৌথখামারীদের সাধারণ সভা ইচ্ছা করলে যৌথখামার বোর্ডের সভাপতি এবং সমস্ত সদস্যকে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত করতে পারবে।

এই কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিকটা ছিল আর্থনীতিক। নতুন চালু-করা বন্দোবস্ত অনুসারে যৌথখামারগুলি তাদের ফসলের পরিকল্পনা করছিল, লক্ষ্যমাত্রা এবং অন্যান্য কর্তব্য স্থির করছিল (এসব আগে ছিল রাষ্ট্রের হাতে), এই বন্দোবস্তটাকে আইনগত অনুসমর্থন দেওয়া হল। খামারের জাতদ্রব্যের জন্যে রাষ্ট্রের ফরমাশ দেওয়া হতে থাকল কয়েক বছরের জন্যে। আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান আর শিল্প বাড়াবার জন্যে এবং আন্তঃখামার আর রাষ্ট্রের সঙ্গে খামারের যুক্ত সমিতি আর অংশীদারি স্থাপন করার জন্যে যৌথখামারগুলির অধিকার স্পষ্ট-নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হল নতুন নিয়মাবলিতে। তাছাড়া, নিশ্চিত নিয়মিত দেওনের ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে প্রত্যেকটি খামারের মোট উৎপাদ আর আয় বণ্টনের নতুন ব্যবস্থাও স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল।

কংগ্রেসে কাজের তৃতীয়, সামাজিক দিকটা ছিল যৌথখামারীদের সামাজিক ভরণপোষণ নিয়মনের প্রচেষ্টা নিয়ে। (আগেকার নিয়মাবলিতে এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না।) ১৯৫৯ সালে পেনশন, ভাতা, ইত্যাদি দেবার যে-ব্যবস্থা দানা বেঁধে উঠেছিল সেটাকে কংগ্রেস অনুমোদন করল, তেমনি, যেসব যৌথখামার মনে করত, তাদের অভিজ্ঞ প্রবীণ কর্মীদের রাষ্ট্রীয় পেনশনের উপর অতিরিক্ত ভাতাও দেওয়া দরকার এবং তাদের জন্যে বৃদ্ধ-ভবন তৈরি করা দরকার, তাদের ব্যবস্থাও নিয়মাবলিতে অনুমোদিত হল।

যৌথখামার বরাবরই ছিল কৃষকদের জন্যে কমিউনিজমের পাঠশালা, — নতুন নিয়মাবলির প্রত্যেকটা ধারায় সেটা ফুটে উঠল। যৌথখামারগুলির উৎপাদনকর্মই শুধু নয়, কমিউনিস্ট শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও বেশ বিস্তারিতভাবে নির্দিষ্ট করে তোলা হল এই নিয়মাবলিতে। যৌথখামারীদের তৃতীয় সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত সরকারকে আশ্বাস দিল যে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, বাদবাকি সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে হাতধরাধরি করে এগোচ্ছে সোভিয়েত কৃষককুল, তারা সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে সমবেত হল, লেনিনবাদের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে তারা কমিউনিস্ট নির্মাণকাজে নতুন নতুন জয়ের পথে এগিয়ে চলবে।

লেনিন জন্মশতবার্ষিকী কাছিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশজোড়া উৎসাহ-উদ্দীপনার স্রোত প্রবলতর হয়ে উঠল, তার বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রকাশ হল — পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন লক্ষ্যমাত্রাগুলি ছাড়িয়ে কাজ, শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মানের বেশকিছুটা উন্নতি, জনসাধারণের সমস্ত অংশেই আরও বেশি রাজনীতিক চেতনা। ১৯৫৯ সালে এপ্রিল মাসে জয়ন্তী উৎসব হল দেশের সর্বত্র শহরে আর গ্রামে। আগুয়ান কর্মিসমষ্টিগুলিকে দেওয়া হল 'যোগ্যতার জয়ন্তী শংসাপত্র', লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রকাশিত হল পত্র-পত্রিকাগুলিতে। ঐ মাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা হল ১৯৫৯ সালে ১১ই এপ্রিলের সারা-ইউনিয়ন 'সুবোৎনিক' (যে-শনিবারে লোকে পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করে), ৫১ বছর আগে ঠিক ঐদিনই পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট 'সুবোৎনিক' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মস্ক্‌ভা-সোর্তিরোভচ্‌নায়া রেল-স্টেশনে রেল-শ্রমিকদের উদ্যোগকে লেনিন ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন বলে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ছোট

একদল শ্রমিক কাজ শেষ হবার পরে কোন পারিশ্রমিক না-নিয়ে কয়েকখানা ইঞ্জিন মেরামত করেছিল, এতে করে তারা দেখিয়েছিল সোৎসাহ নিষ্ঠা ছাড়াও আরও কিছু: গৃহযুদ্ধ আর বহিরাক্রমণের নিদারুণ অবস্থার মধ্যে এবং আর্থনীতিক ভগ্নদশা সত্ত্বেও, কাজের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাব তখনই দানা বেঁধে উঠছিল, কেননা শোষকদের খেদিয়ে দেবার পরে লোকে এই প্রথম কাজ করল নিজেদের স্বার্থে নয়, সমাজের স্বার্থে, তারা যে-সমাজের মানুষ। তার ৫০ বছর পরে, ১৯৫৯ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে সোভিয়েত দেশের কোটি কোটি মানুষ কমিউনিস্ট 'সুবোৎনিকে' কাজ করেছিল। দেশের অর্থনীতি ক্রমাগত আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠার সময়ে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ 'সুবোৎনিক'টি হল যে-জনগণ মুক্ত শ্রমের আনন্দ পেয়েছে তাদের নৈতিক কর্তব্যবোধের একটা অভিব্যক্তি। সেদিন যে-অর্থ আয় হয়েছিল তার সবটাই দেওয়া হয়েছিল 'শান্তি তহবিলে' এবং বিভিন্ন হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্যে। এই 'সুবোৎনিকে'র অভিজ্ঞতা আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল লেনিন জয়ন্তী বর্ষে। ১৯৫৯ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে কাজ করেছিল গোটা দেশই।

এই 'সুবোৎনিকে'র পরের দিনগুলিতে ঘটেছিল নতুন নতুন বিজয়সাফল্য। ২২এ এপ্রিল তারিখে হাজার হাজার আগুয়ান শ্রমিক কথা রেখেছিল: কেউ কেউ পাঁচ-বছরের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পেঁছে গিয়েছিল, আরও কেউ কেউ জয়ন্তী উৎসব নাগাত উৎপাদনশীলতার যে-মাত্রায় পেঁছবে বলে পণ করেছিল তাতে পেঁছেছিল, আবার কেউ কেউ সেদিন কাজ করেছিল খরচবাঁচানো মালমশলা দিয়ে। খাস সেই মহাদিবসে এবং সেই দিনটি অবধি সময়ে সবারই আদর্শবাণী ছিল: 'আমরা কাজ করব, অধ্যয়ন করব এবং জীবনযাত্রা চালাব যেমনটা লেনিন আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন!'

সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী জনগণ ১৯৫৯ সালের জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সংসাধিত করেছিল। ঐ বছর সমাধা-করা কাজের তাৎপর্য সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবার জন্যে নিম্নলিখিত তুলনাটা লক্ষণীয়: শিল্পোৎপাদন যুদ্ধের আগেকার সমস্ত পাঁচসালা পরিকল্পনা মিলিয়ে — অর্থাৎ, ১৯২৯—১৯৪১ সালের কালপর্যায়ে যে-পরিমাণ হয়েছিল, সেই একই মাত্রায় পেঁছেছিল ১৯৫৯ সালে। এটা হল যেন, ১৯৪১ সালে সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেসে ১৯৫৯—১৯৪১ সালের কালপর্যায়ের জন্যে যে-নির্দেশাবলি অনুমোদিত হয়েছিল সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার অভিযানের বিজয়সাফল্যমণ্ডিত পরিণতি।

১৯৪১ সালে মার্চ মাসের শেষাশেষি থেকে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে অবধি অনুষ্ঠিত সো.ই.ক.পা'র ২৪শ কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমগ্র সোভিয়েত জনগণের পাঁচ বছরের বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের সমগ্র সাধনসাফল্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছিল। এই কংগ্রেসের প্রারম্ভিক পর্বে স্থানীয় পার্টি সম্মেলন হয়েছিল দেশের সমস্ত জেলা, শহর আর বিভাগে, এবং তারপরে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কালপর্যায়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় এবং পার্টির পত্র-পত্রিকাগুলিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ঐ কালপর্যায়টি যে বিশিষ্ট সেটা কতকগুলি গুরুত্বসম্পন্ন কাজ সমাধা করার জন্যেই কেবল নয়, ঐ সময়কার কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তনের জন্যেও বটে। ঐ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা আর্থনীতিক সংস্কার চালু করা হয়েছিল; সোভিয়েত সমাজের উন্নয়ন প্রবলতর করে তোলার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি ১৯৪১—১৯৫৯

সালের কালপর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল আগেকার পাঁচ বছরের কালপর্যায়ের চেয়ে বেশি ফলপ্রদভাবে। সঞ্চয়ন আর ভোগ-ব্যবহারের প্রধান উৎস হল জাতীয় আয় — সেটা ১৯৫৯ সালে হয়েছিল ১৯৫৯ সালের পরিমাণের চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি। জাতীয় আয়বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল
সালের কালপর্যায়ের চেয়ে বেশি। এর ফলে, সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেসে সোভিয়েত জনগণের বৈষয়িক কল্যাণ উন্নততর করার যে-প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাতে পেঁছনই শুধু নয়, সেগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়েছিল। মাথাপিছু আসল আয় বেড়েছিল লক্ষ্যমাত্রায় ৩০ শতাংশের জায়গায় ৩৩ শতাংশ। শ্রমিক এবং কর্মচারীদের গড় মাসিক মজুরি ঐ সময়ে বেড়েছিল ২৬ শতাংশ। অষ্টম পাঁচসালা কালপর্যায়ে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মজুরি বেড়েছিল, শ্রমিক এবং কর্মচারীদের কোন কোন অংশের আয়-কর কমানো হয়েছিল, পাঁচ-দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করা হয়েছিল, শ্রমজীবী জনগণের ছুটিও বাড়ানো হয়েছিল। যৌথখামারীদের মজুরি বাড়ানো হয়েছিল ৪২ শতাংশ।

জনগণের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ আগমস্থল সাধারণের ভোগ্য তহবিল ঐ ক'বছরে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এসে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত পরিবারই এই তহবিল থেকে উপকৃত হতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তা হয়ও। নগদ হিসেবে, সাধারণের ভোগ্য তহবিল থেকে জনসাধারণকে মাথাপিছু দেওন
সালের কালপর্যায়ে ১৮২ রুবল থেকে বেড়ে হয়েছিল ২৬২ রুবল। এইসব দেওন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হিসেবে ধরলে, সোভিয়েত অর্থনীতিক্ষেত্রে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের গড় মাসিক আয় ১৯৫৯ সালে দাঁড়িয়েছিল ১৬৪ রুবল।

এই কারণেই, খাদ্যসামগ্রী আর শিল্পজাত জিনিসপত্রের ভোগ-ব্যবহার অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল, অষ্টম পাঁচসালা কালপর্যায়ে বিক্রির পরিমাণ বেড়েছিল শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, অপেক্ষাকৃত দামী খাদ্যসামগ্রী আর টেকসই জিনিসপত্রের জন্যে চাহিদা বেড়েছিল সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ কিনা, সোভিয়েত দেশে মানুষের ভোগ-ব্যবহারের ধাঁচে একটা লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গেল।

ঐ একই সময়ে নতুন নতুন সাফল্য হয়েছিল বসতবাড়ি তৈরি করাতে। ১৯৫৯ সালের কালপর্যায়ে নতুন বাসস্থান পেয়েছিল প্রায় সাড়ে-পাঁচ কোটি মানুষ; এদের মধ্যে শতকরা ৯০টা পরিবার উঠে গিয়েছিল আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত পৃথক পৃথক ফ্ল্যাটে। অর্থাৎ কিনা, দশ লক্ষ ক'রে বাসিন্দার ৫০টা শহরের সমতুল্য বসতস্থল তৈরি হয়েছিল ঐ পাঁচ বছরে।

জনসাধারণের একেবারে প্রত্যেকেই এইসব অংক না জানতে পারে, সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা সংসাধনের ফলে যে-সাধনসাফল্য ঘটল তার বিপুল পরিসরটাকে নিজের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে বোধ করে নি, এমন কেউ সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকতে পারে, তা কল্পনা করাও অসম্ভব। একেবারে প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যায় নি, ট্রেড-ইউনিয়নের স্বাস্থ্যনিবাসে কিংবা ছুটি কাটাবার হোটেলে নিখরচায় থাকবার সুযোগ পায় নি একেবারে প্রত্যেকেই, কিন্তু ঐ ক'বছরে নিখরচার চিকিৎসাদি ব্যবস্থার বিস্তর উন্নতি থেকে আরও বেশি উপকৃত হবার ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছে প্রত্যেকটি সোভিয়েত পরিবারই। ঐ একই সময়ে যেখানে কাজের অবস্থা বেশকিছুটা উন্নততর হয় নি, এমন কোন কারখানাও ছিল না। বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম সরকার কমিয়ে দিয়েছিল কয়েক বার। কিণ্ডারগার্টেন, ইস্কুল, নতুন নতুন উচ্চ শিক্ষায়তন নির্মাণের কাজ যে-বিরাট পরিমাণে চলেছিল তেমনটা আগে আর কখনও হয়

নি। সর্বাধুনিক ক্রীড়াকেন্দ্রও নির্মাণ করা হয়েছিল কয়েক ডজন। এ তালিকার শেষ নেই। তবে, এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত জয় হাসিল হয়ে যাবার পরে, জীবনযাত্রার সোভিয়েত প্রণালীর সুবিধাগুলোকে সোভিয়েত দেশের মানুষ প্রতিবছরই উপলব্ধি করতে থাকে আরও বেশি বেশি করে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

জনগণের বৈষয়িক সমৃদ্ধিবৃদ্ধির আদর্শস্বরূপ সাধনসাফল্যগুলির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা এবং নির্দলীয়রা দেখতে পেল শিল্প, কৃষি আর বুনিয়াদী নির্মাণকাজে উন্নয়নের উঁচু হারের প্রত্যক্ষ ফলগুলি। ১৯৫৯ সালে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ হয়েছিল ১৯৫৯ সালের উপর ৫০ শতাংশ বেশি। সোভিয়েত অর্থনীতির প্রধান উৎপাদন তহবিলও বেড়েছিল ৫০ শতাংশ। ১৯৫৫—১৯৫৯ সালের কালপর্যায়ে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৯৫৫ সালে দেশে যে-মোট উৎপাদনক্ষমতা ছিল তার চেয়েও বেশি; মনে রাখা দরকার, ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক ক্ষমতা যা ছিল তাতে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছিল এবং শেষে ঐ 'স্পুৎনিক' ক্ষেপণ করা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের শেষাশেষি।

শিল্পে এবং সমগ্রভাবে অর্থনীতিতে উন্নয়নের উঁচু এবং সুস্থিত হার সোভিয়েত আর্থনীতিক বিকাশের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক একটা উপাদান। যেকোন কালপর্যায়ের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে সেটা দেখা যায়, দেখা যায় অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার বছরগুলি থেকেও — এই সময়ে শিল্পোৎপাদনবৃদ্ধির হারের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বৃটেনের মতো উঁচু মাত্রায় অগ্রসর দেশগুলির নাগাল ধরে ফেলে চলছিল নিশ্চিতভাবেই, এইভাবে

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে ফারাক সমানে কমে আসতে থাকে।

অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার বছরগুলিতে সামাজিক উৎপাদনের পরিধি আরও বাড়ল, আর্থনীতিক বন্দোবস্তটার মধ্যে সংযোগসূত্রগুলো হয়ে উঠল আরও জটিল, আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যা। এই সবকিছুর জন্যে আর্থনীতিক পরিকল্পন আর ব্যবস্থাপনের আরও উন্নতির প্রয়োজন ঘটেছিল। লেনিন নিজেই একসময়ে বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানসম্মত ধারায় সামাজিক উৎপাদন আর বণ্টনের ব্যাপক প্রসার এবং শ্রমজীবী জনগণের জীবনে স্বস্তি আনা আর যতখানি সম্ভব তাদের কল্যাণ বাড়াবার লক্ষ্য অনুসারে সেটাকে যথার্থই লাগানো'র* সুযোগ-সম্ভাবনাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব করে আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনই।

এদিক থেকে দেখলে, শ্রমজীবীদের জন্যে উপরি বৈষয়িক প্রবর্তনা সৃষ্টি করতে, আর্থনীতিক হিসাবরক্ষণ উন্নততর করতে, এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যম আর স্বাধীনতায় উৎসাহ দিতে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনও আরও মজবুত করে তুলতে তখন সবে-চালু-করা আর্থনীতিক সংস্কার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল। কমিউনিস্ট নির্মাণকাজ পরিচালনায় ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে জড়িয়ে নিতে, কেবল বৈষয়িক নয় নৈতিক প্রবর্তনাগুলির ভূমিকাকেও প্রবলতর করে তুলতে এবং এই দুই রকমের প্রবর্তনার মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল এই আর্থনীতিক সংস্কার।

আর্থনীতিক সংস্কার, আগে-না-ব্যবহৃত উপায়াদির সদ্ব্যবহার এবং নতুন প্রযুক্তি চালু করার ফলে ১৯৫৫ সালের

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৭তম খণ্ড, ৪১১ পৃঃ

কালপর্যায়ে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল ৩৭ শতাংশ।

কৃষিক্ষেত্রেও ঘটেছিল বড় বড় গুণগত পরিবর্তন। ফসলের ফলন বেড়ে গিয়েছিল, পশুপালন সম্প্রসারিত হয়েছিল বিস্তর। মোট কৃষি উৎপাদনের গড় বার্ষিক পরিমাণ বেড়েছিল ২১ শতাংশ — এই বৃদ্ধি আগেকার পাঁচসালা কালপর্যায়ে ছিল ১২ শতাংশ। ১৯৫৫ সালে পাওয়া ফল হয়েছিল আরও বিশেষভাবে উঁচু মাত্রায়: ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টনের বেশি দানাশস্য ফসল তোলা হয়েছিল, আর কাঁচা তুলো তোলা হয়েছিল ৬৯,০০,০০০ টন। সোভিয়েত কৃষির ইতিহাসে এত বেশি ফলন আগে কখনও হয় নি।

১৯৫৫ সালের কালপর্যায়ের সাধনসাফল্যগুলির সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে সোভিয়েত নর-নারীরা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল সোভিয়েত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার সাধনসাফল্যগুলির দিকে। সোভিয়েত মহাজাগতিক গবেষণার কর্মসূচিটি সমগ্র সোভিয়েত জনগণের গর্বের বস্তু, তাতে তারা সর্বক্ষণ আগ্রহান্বিত — এটাকে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষয়িক আর মনোজাগতিক অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে দেখে। বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় কলকব্জা দিয়ে চাঁদ এবং সৌরজগতের গ্রহগুলি সম্বন্ধে গবেষণা চালানোটা রয়েছে এই কর্মসূচির একটা কেন্দ্রী স্থানে। এইসব কলকব্জায় খরচ মানুষসমেত মহাকাশযানের চেয়ে কম, এগুলি আরও বেশি নির্ভরযোগ্যও বটে। যেসব এলাকায় মানুষ পাঠানো এখনও অসম্ভব কিংবা অত্যন্ত ঝুঁকিদার, সেখান থেকে এইসব যন্ত্র অমূল্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পাঠাতে পারে পৃথিবীতে। চাঁদ, শুক্রগ্রহ আর মঙ্গলগ্রহ নিয়ে গবেষণায় এইসব যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাঁদে পাঠানো একটা স্বয়ংক্রিয় স্টেশন দিয়ে সেই প্রথম চান্দ্র শিলার নমুনা

পৃথিবীতে আনানো সম্ভব হল — ষোল-আনাই ঐ স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামের সাহায্যে।

এক্ষেত্রে একটা অনন্যসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালের শেষাশেষি। সেটা হল 'লুনা-১৭' নামে স্বয়ংক্রিয় সোভিয়েত মহাজাগতিক স্টেশনের উড্ডয়ন। ১০ই নভেম্বর তারিখে এই স্টেশনটা চাঁদে 'বর্ষণসাগর' অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর প্রথম স্বয়ংপ্রচালিত মহাজাগতিক রোবট্‌ — সেখানে গবেষণা চালাবার কাজে ব্যবহার করার জন্যে। 'লুনখোদ-১' ('চাঁদ-রোভার') নামে পরিচিত এই রোবট্‌ ৩,০০,০০০ মাইল দূরে পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীদের পাঠানো নির্দেশ অনুসারে চন্দ্রপৃষ্ঠে চলে চলে চান্দ্র শিলা, মহাজাগতিক রশ্মি আর বিকিরণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে। মহাকাশজয়ের অভিযানে একটা গুরুত্বপূর্ণ নতুন পদক্ষেপ হল এই সাধনসাফল্যটি।

বর্তমান সোভিয়েত মহাজাগতিক কর্মসূচির আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা এখানে বলা দরকার — সেটা হল সোভিয়েত এবং অন্যান্য দেশের গবেষণা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগ। ১৯৫৫ সালে 'ইণ্টারকসমস-১' নামে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছিল সোভিয়েত রাজ্যক্ষেত্র থেকে। এতে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলিকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চেকোস্লোভাকিয়া যুক্তভাবে তৈরি করেছিল। ঐ 'স্পুৎনিকের' পাওয়া তথ্যাদির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কাজে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়ার বিজ্ঞানীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিনিধিরা এই ক্ষেত্রে সহযোগ চালিয়েছিল সারা ১৯৫৫ সালে, পরেও সেটা চলতে থাকে।

মহাকাশের শান্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবর সচেষ্ট। এর একটা

দৃষ্টান্ত হল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্রান্সের মধ্যেকার বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে নির্মিত কোন কোন যন্ত্রপাতি 'লুনখোদ-১' পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ সময় অবধি বছর-পাঁচেক ধরে সোভিয়েত এবং মার্কিন মহাকাশচরদের মধ্যে বিভিন্ন দেখাসাক্ষাৎ হয়।

সো.ই.ক.পা'র ২৪শ কংগ্রেসের ঠিক আগে আয়োজিত সভা-বৈঠকগুলিতে দেশের আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক আর রাজনীতিক জীবনের কত-যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলেছিল তার ইয়ত্তা নেই। আলোচনা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত সরকারের স্বরাষ্ট্রীয় আর পররাষ্ট্রীয় কর্মনীতির সমস্ত দিক নিয়েই — তার মধ্যে আবারও দেখা গেল সোভিয়েত জনগণের রাজনীতিক পরিপক্কতা, কমিউনিজমের প্রতি তাদের গভীর নিষ্ঠা এবং সারা পৃথিবীতে শান্তি সুরক্ষিত করার জন্যে তাদের ঐকান্তিক কামনা। সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত সরকারের কাজকর্মগুলিকে দেশের কমিউনিস্টরা অনুমোদন করল এবং একত্রে মিলে নির্ধারণ করল সোভিয়েত সমাজের পরবর্তী অগ্রগতির পথ।

১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্দেশাবলি ছিল এই কংগ্রেসে একটা আলোচ্য বিষয় — এই প্রসঙ্গে, আর্থনীতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনাটা হয়েছিল আরও বিশেষভাবে তাৎপর্যসম্পন্ন। অতি বিশদে বিস্তৃতভাবে রচিত হয়েছিল এই পরিকল্পনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুতির মধ্যে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৫ সালের ১৬ই মে তারিখের আহ্বানের মধ্যে এই নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান দফাগুলিকে তুলে ধরা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসের প্লেনারী বৈঠকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছিল। ১৯৫৫

সালের কালপর্যায়ের জন্যে পা.আ.স.প'র কাঠামের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক পরিকল্পনা সমন্বয়ের সময়ে বহিঃআর্থনীতিক কর্মনীতি-সংক্রান্ত অংশগুলি আগেভাগেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটা প্লেনারী বৈঠকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের একটা অধিবেশনে আর্থনীতিক উন্নয়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছর ১৯৫৫ সালের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় বাজেট পর্যালোচনা করে তা অনুমোদন করা হয়। পরিকল্পনার অন্যান্য অংশ এবং গোটা পরিকল্পনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। আর্থনীতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া নির্দেশাবলি সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুমোদিত হয়ে দেশের পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে। ঐ কালপর্যায়ে সোভিয়েত সমাজের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে তখন দেশজুড়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

সুবিশাল এই কাজটাকে সমাধা করল সো.ই.ক.পা'র ২৪শ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে অংশগ্রহণকারীরা ছিল ১,৪৪,৫৫,৩২১ জন সদস্যের পার্টির প্রতিনিধি—এই প্রতিনিধিদের শতকরা ৪০·১ জন ছিল শ্রমিক, যৌথখামারী ছিল শতকরা ১৫·১ জন, আর কর্মচারীরা ছিল শতকরা ৪৪·৮ জন (এদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ছিল ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ, শিক্ষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, লেখক এবং শিল্পী)।

সাধারণ সম্পাদক ল. ই. ব্রেজনেভের পেশ-করা কেন্দ্রীয় কমিটির বিবরণ শুনে এবং সেটা নিয়ে আলোচনা ক'রে পার্টির ২৪শ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত রাজনীতিক ধারাটিকে এবং সেই উদ্দেশ্যে চালানো কাজকর্ম পুরোপুরি অনুমোদন করল, তেমনি অনুমোদন করল বিবরণে তোলা প্রস্তাবাদি আর

সিদ্ধান্তগুলিকেও। সালের কালপর্যায়ে সোভিয়েত আর্থনীতিক উন্নয়নের নির্দেশাবলি কংগ্রেসে অনুমোদিত হল — এটাকে বিবৃত করেছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি আ. ন. কসিগিন। কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের সমস্ত কাজই সমষ্টিগত মনোভাব নিয়ে চলেছিল নীতিনিষ্ঠ এবং কর্মতৎপর আবহাওয়ায়। দেশের স্বরাষ্ট্রীয় আর পররাষ্ট্রীয় কর্মনীতি এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলিকে সর্বপ্রযত্নে ধরা হয়েছিল বিজ্ঞানসম্মত কায়দায়। ৯১টা দেশের কমিউনিস্ট আর শ্রমিক পার্টি, জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টি এবং বামপন্থী সোশ্যালিস্ট পার্টির ১০২টা প্রতিনিধিদল এই কংগ্রেসের কাজে শরিক হয়েছিল। বৈদেশিক অতিথিদের অনেকেই কংগ্রেসে বক্তৃতা করেছিল, আর তাদের বেশ একটা অংশ গিয়েছিল বিভিন্ন শিল্পায়তনে, দেখাসাক্ষাত-আলোচনাদি করেছিল শ্রমিক, কর্মচারী এবং যৌথখামারীদের সঙ্গে। সো.ই.ক.পা'র বিভিন্ন বিষয়ে কর্মনীতি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে নীতিনিষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মধারা, এই আন্দোলনের ভিতরে ঐক্য সংহত করা এবং সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তির সুসংগতি গড়ার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়াসকে বৈদেশিক প্রতিনিধিরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিল। এই সবকিছু মিলিয়ে ২৪শ কংগ্রেসটি হয়ে উঠেছিল যেন শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের সক্রিয় ধারক-বাহকদের একটা আন্তর্জাতিক জমায়েত।

কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন একবার বলেছিলেন, কালক্রমে কৃষিবিদ, ইঞ্জিনিয়র আর অর্থনীতিবিদেরা — প্রকৃতপক্ষে, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেরই বিশেষজ্ঞেরা — পার্টির কংগ্রেসগুলিতে বক্তৃতা করবে, শ্রেণীহীন সমাজের জন্যে বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ সৃষ্টির সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নাবলি নিয়ে আলোচনায় যোগ দেবে। আগেকার সমস্ত কংগ্রেসের মতো ২৪শ কংগ্রেসেও উৎপাদনকর শ্রমে সরাসরি অংশগ্রহণকারী নর-নারী এবং উঁচু মাত্রায় যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞেরা সমবেত সবার সামনে বক্তৃতা করেছিল। তারা সবাই মতপ্রকাশ করেছিল যে, উৎপাদন-শক্তিগুলিকে যে-মাত্রায় তোলা গেছে, তাতে নতুন নতুন আরও জমকালো কর্তব্য হাতে নেওয়া সোভিয়েত জনগণের পক্ষে সম্ভব। সেটা প্রকাশ পেয়েছিল 'নির্দেশাবলি'তেও, তার এক জায়গায় বলা হয়েছিল: 'সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন উন্নয়নের উঁচু হার, তার ফলপ্রদতা বাড়ানো, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধি ত্বরয়িত করার বনিয়াদে জনগণের বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক মানের বেশকিছুটা উন্নতি ঘটানোই এই পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান কর্তব্য।'

সালের কালপর্যায়ে জাতীয় আয় ৩৭-৪০ শতাংশ বাড়াবার ব্যবস্থা হল, — অর্থাৎ কিনা, মাথাপিছু আসল আয় মোটামুটি ৩০ শতাংশ বাড়ানো। এই কালপর্যায়ে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের গড় মজুরি ১৪৬-১৪৯ রুবলে পেঁছবার কথা। যৌথখামারীদের আয় শিগগিরই হবে প্রায় ১০০ রুবল। তার উপর, নিখরচ বৈষয়িক কল্যাণ আর সেবাকার্য এবং সাধারণের ভোগ্য তহবিল থেকে দেওনের পরিমাণও এই পাঁচ বছরে বাড়বে ৪০ শতাংশ। আরও ছয় কোটি মানুষ পাবে আরও ভাল বাসস্থান। গড়ে উঠবে নতুন নতুন শহর, নতুন নতুন হাসপাতাল, ইস্কুল, স্বাস্থ্যনিবাস আর গ্রন্থাগার খোলা হবে, এককথায়, যেকোন পুঁজিতান্ত্রিক দেশে যা আছে, তার চেয়ে উঁচু জীবনযাত্রার মান সোভিয়েত জনগণের জন্যে নিশ্চিত করার দিকে আর-একটা মস্ত পদক্ষেপ হবে। দেশের কল-কারখানা আর নির্মাণক্ষেত্রগুলিতে, খামার আর শিক্ষায়তনগুলিতে,

গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে — প্রকৃতপক্ষে, যেখানেই বৈষয়িক মূল্যবস্তুগুলি সৃষ্টি হয়, নতুন কর্মীদের তালিম দেওয়া হয়, সোভিয়েত দেশের মানুষের ছুটি আর অবসরবিনোদনের সুযোগ-সুবিধাদি দেওয়া হয়, এমন সর্বত্রই যারা কাজ করে তাদের বিস্তর প্রয়াস এজন্যে দরকার, তা বলা বাহুল্য। নবম পাঁচসালা কালপর্যায়ে শিল্পোৎপাদন বাড়বে ৪২-৪৬ শতাংশ। ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি দ্রুত হারে। এই নতুন পাঁচসালা কালপর্যায়ে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর গড় বার্ষিক উৎপাদন হবে আগেকার পাঁচসালা কালপর্যায়ের চেয়ে ২০-২২ শতাংশ বেশি। গ্রাম আর শহর অঞ্চল দুয়েতেই শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো, নতুন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রবর্তন এবং শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক আর টেকনিকাল মান আরও বাড়াবার ব্যবস্থা- বন্দোবস্তের একটা বিস্তৃত কর্মসূচি রচিত হয়েছে।

আগেরই মতো, কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ে তোলাকেই কমিউনিস্ট পার্টি দেখছে প্রধান কর্তব্য হিসেবে। উৎপাদনের কমিউনিস্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্যে এটাই সর্বময় গুরুত্বসম্পন্ন পূর্বশর্ত। তবে, উৎপাদন-শক্তিগুলির বৃদ্ধির ফলে আপনা থেকেই কমিউনিজম এসে যায় না। এটা যদি কেবল বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদের ব্যাপার হত, তাহলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের এই যুগে কমিউনিজমে উত্তরণের জন্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ই লাগত। নতুন সমাজের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ে তোলার অবস্থায় উৎপাদনের কমিউনিস্ট সম্পর্ক উদ্ভবের বিষয়টা অসাধারণ তাৎপর্যসম্পন্ন গুরুত্ব ধারণ করে। বাস্তব জীবনই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, উৎপাদনের কমিউনিস্ট সম্পর্ক এবং তদনুযায়ী উপর-কাঠাম গড়ে উঠতে অনেকে একসময়ে যা মনে করেছিলেন তার

চেয়ে বেশি সময় দরকার। কমিউনিস্ট নির্মাণকাজ অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। এর মধ্যে পড়ে বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্র, সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক চেতনা। নানা বাধাবিঘ্ন আর দ্বন্দ্ব-বিরোধ অতিক্রম করা চাই, প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে বাগ মানানো চাই, ক্রমাগত নতুন নতুন কর্তব্য এসে পড়ে — সেগুলি সমাধা করার কার্যকর উপায় বের করা আবশ্যক।

আটটা পাঁচসালা পরিকল্পনা সংসাধন করার ভিতর দিয়ে সোভিয়েত জনগণ অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলে কমিউনিজমের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ সৃষ্টি করার কাজ ধরল। আর নবম পাঁচসালা পরিকল্পনাটা হল এই মহিমান্বিত যাত্রাপথে পরবর্তী পদক্ষেপ। ২৪শ কংগ্রেসে ল. ই. ব্রেজনেভ বলেছিলেন: 'আমরা জানি, যাকিছুর জন্যে আমরা সচেষ্ট তা আমরা সাধন করব, যেসব কর্তব্য হাতে নেওয়া হচ্ছে সেগুলি সমাধা করতে আমরা সফলকাম হব। সোভিয়েত জনগণের সৃজনশীল প্রতিভা, তাদের নিঃস্বার্থপরতা এবং লেনিনের নির্ধারিত পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর তাদের কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরে তাদের ঐক্যই ছিল, রয়েছে, এবং থাকবে তার গ্যারাণ্টি।'

সো.ই.ক.পা'র ২৪শ কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রী সংস্থাগুলির সদস্যদের নির্বাচনও হয়েছিল। কংগ্রেসের শেষ দিনে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির একটা প্লেনারী বৈঠকে নির্বাচিত হয়েছিল পলিটব্যুরো, তার সদস্যরা হলেন: ল.ই. ব্রেজনেভ, গ.ই. ভরোনভ, ভ.ভ. গ্রিশিন্, আ.প. কিরিলেঙ্কো, আ.ন. কসিগিন, ফ.দ. কুলাকভ, দ.আ. কুনায়েভ, ক. ত. মাজুরভ, আ.ইয়া পেল্শে, ন. ভ. পদগোর্নি, দ.স. পলিয়ান্স্কি, ম.আ. সুস্লভ, আ.ন. শেলেপিন, ভ.ভ. শের্বিৎস্কি; পলিটব্যুরোর প্রার্থী-সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন: ইউ. ভ. আন্দ্রোপভ, প. ন. দেমিচেভ, প. ম. মাশেরভ, শ.র. রশিদভ

এবং দ.ফ. উস্তিনভ। সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ল.ই. ব্রেজনেভ।

'ইন্দোচীনের জাতিগুলির জন্যে মুক্তি আর স্বাধীনতা' শীর্ষক আবেদন এবং 'মধ্য প্রাচ্যে ন্যায্য আর সুস্থিত শান্তির জন্যে' শীর্ষক ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল এই কংগ্রেসে। কংগ্রেসে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এমন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে থাকবে, যাতে সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে, যাতে ঐ সংগ্রামে শরিক সবারই এবং ঐ সংগ্রামে আগুয়ান বাহিনী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগ্রামী ঐক্য আরও শক্তিশালী হয়। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী কর্মনীতির বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা হিসেবে অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন দাঁড় করায় সক্রিয়ভাবে শান্তিসংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংহত করার কর্মনীতি। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম নির্মাণের শান্তিপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত সরকার যাকিছু সম্ভব সবই করছে এবং করতে থাকবে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনীয় নীতিটিকে তারা অবিচলিতভাবে তুলে ধরেছে এবং সেটা করেই চলবে।

সো.ই.ক.পা'র ২৪শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে দেশ স্বাগত জানাল বিপুল উৎসাহের সঙ্গে। দেশের প্রগতির জন্যে অনুপ্রাণিত সৃজনশীল শ্রম অবদান রাখতে এই কংগ্রেস সমস্ত কমিউনিস্টের তরফে আহ্বান জানাল শ্রমিক, যৌথখামারী এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে। বৈপ্লবিক ঐতিহ্যগুলির প্রতি অনুরক্ত এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত জনগণ নতুন

পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করার জন্যে নেমে পড়ল নতুন উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে — তারা জানে, এই কাজ সমাধা হলে কমিউনিজমের বিজয় আরও কাছে এসে যাবে।

উপসংহারের বদলে

আমাদের কাহিনীর শেষে এসে পড়া গেল, এখন বিবরণটাকে গুটিয়ে ফেলা দরকার। ইতোমধ্যে জীবন বয়ে চলেছে, ইতিহাসও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না। দিনটা আগামী কালের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ইতিহাসের মধ্যে। এই বইখানা পাঠকের হাতে পেঁছবার আগে ঘটে যাবে বহুতর পরিবর্তন। দেশের সর্বসাম্প্রতিক সাধনসাফল্যের দিক থেকে, তখন কোন কোন অংক আর তথ্য পুরন হয়ে যাবে, কিংবা, বরং বলা ভাল, হয়ে দাঁড়াবে অতীত সাধনসাফল্যের সাক্ষ্য।

কেন্দ্রীকৃত আর্থনীতিক পরিকল্পন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বৃদ্ধির সুস্থিত হার নিশ্চিত করে। সোভিয়েত দেশের মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা রাখতে পারে: ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে তারা যে-পথে পা বাড়িয়েছিল, সেটা যে নির্ভুল তা প্রমাণ করেছে তাদের দেশের অতীত।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকীতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্মের কথা অনুস্মরণ করে লেনিন বলেছিলেন: ‘বুর্জোয়ারা অবজ্ঞা ক'রে মুখ সিট্‌কে বলেছিল, সোভিয়েত সরকার বড়জোর হপ্তা-দুই টিকে থাকতে পারে...’*

আমাদের দেশের শত্রুরা আরও অসংখ্য বার হরেক রকমের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছে, আর সেগুলিও হিসেবের ভুল বলে স্পষ্ট

* ভ. ই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলি**, ২৮তম খন্ড, ১৩৩ পৃঃ

হয়ে গেলে ঐ শত্রুরা সোভিয়েত সমাজ-জীবনে ভুলভ্রান্তির কথা আউড়ে চলেছে — সে-যে কত সুরে আর কত পর্দায়, তার ইয়ত্তা নেই। তাদের সঙ্গে আবার তর্ক জুড়বার জায়গা এটা নয়। তার বদলে আমরা বিপ্লবের নেতার একটা কথা স্মরণ করছি, তাতে তিনি বলেছিলেন, সোভিয়েত জনগণের আতঙ্কগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই, তিনি বলেছিলেন, জীবনযাত্রার নতুন প্রণালী গড়ে তোলার কাজে বিপুল সাধনসাফল্যগুলির সঙ্গে তুলনায় ভুলত্রুটি যা হয়েছে সেগুলো নগণ্য। তিনি লিখেছিলেন: 'আমাদের ভুল হয় যদি এক-শ'টা, যা নিয়ে বুর্জোয়ারা আর তাদের অনুচরেরা (আমাদের মেনশেভিকেরা আর দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সমেত) সারা পৃথিবীর কাছে গলা ফাটিয়ে বলে, মহান এবং বীরত্বপূর্ণ কীর্তি অনুষ্ঠিত হয় দশ হাজারটা...'*

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিজম ছিল শুধু একটা তত্ত্ব। মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠা-করা প্রথম আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় সংগঠনে সদস্য ছিল মাত্র ৩০০ জন।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্ট সমাজের দিকে কার্যকর পদক্ষেপ হল। আমাদের এই গ্রহের ষষ্ঠাংশে — পৃথিবীর জনসংখ্যার মোটামুটি সাত শতাংশের বাসভূমিতে, যেখানে উৎপন্ন হয় পৃথিবীর মোট শিল্পোৎপন্নের পঞ্চমাংশ — শ্রেণীহীন সমাজের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ গড়ার কাজ নিষ্পন্ন করার দিকে আরও এক-ধাপ এগিয়ে চলা হচ্ছে প্রতিদিনই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি ভবিষ্যতের পথে এখন অগ্রসর হচ্ছে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও। পৃথিবীর কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির সদস্যসংখ্যা এখন মোট পাঁচ কোটির বেশি। যেকোন সৎ ব্যক্তি প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে মানবজাতির ইতিহাস

* ঐ, ৭২ পৃঃ

বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখতে পাবেন, প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের মানুষ এবং পৃথিবীর আরও অনেক জাতির জীবনে এমনসব লক্ষণীয় পরিবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করল ১৯১৭ সালই।

অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীকে দুটো দুনিয়ায় ভাগ করে দিল — সমাজতন্ত্রের আর পুঁজিতন্ত্রের দুনিয়া। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের পথে প্রথমে পা বাড়াল সোভিয়েত জনগণ। অমুক কিংবা অমুক যন্ত্রটা কে উদ্ভাবন করেছিল, কিংবা অমুক কিংবা অমুক দ্বীপটাকে আবিষ্কার করেছিল কে, তা নিয়ে কখনও-কখনও প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে পৃথিবীতে কোন্ দেশটি এগোল প্রথমে, সেটা তো অনস্বীকার্য। সোভিয়েত জনগণের অভিজ্ঞতা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, সেটা অন্যান্য জাতির সামনে একটা অমূল্য আদর্শস্বরূপ এবং তাইই থাকবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-ঐতিহাসিক পথ চিহ্নিত করে দিয়েছে, সেটা প্রগতির অমোঘ জয়যাত্রা এবং বিজ্ঞানসম্মত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রাণশক্তির কথাই স্পষ্ট করে স্মরণ করিয়ে দেয়। পুঁজিতন্ত্র আর কমিউনিজমের মধ্যেকার ঐতিহাসিক লড়াইয়ের রূপ আর মর্মবস্তু সম্প্রতি হয়ে উঠেছে নতুন, তার ভবিষ্যৎ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতও বদলাচ্ছে। এখন লড়াইটা দুটো বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার রূপ ধারণ করেছে। এই প্রতিযোগিতার ধারায় প্রতিবছরই কমিউনিজমের যথার্থ প্রগতিশীল প্রকৃতি, পুঁজিতন্ত্রের উপর কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হচ্ছে বাদবাকি পৃথিবীর সামনে। এই সবকিছুর সবচেয়ে প্রাঞ্জল প্রমাণ হল খাস সোভিয়েত সমাজের ইতিহাসই।

ধারাবাহিক ঘটনা-বিবরণ

১৯১৭

১২ই মার্চ (২৭এ ফেব্রুয়ারি)*	রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়। স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ। শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি গঠিত।
১৫ই (২রা) মার্চ	অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার গঠিত।
১৬ই (৩রা) এপ্রিল	লেনিন রাশিয়ায় ফিরলেন।
জুন	পেত্রগ্রাদে প্রথম সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস এবং জুন মাসের সভা-মিছিল।
জুলাই	পেত্রগ্রাদে শ্রমিক আর নাবিকদের একটা মিছিলের উপর অস্থায়ী সরকারের সৈনিকদের গুলিবর্ষণ। দ্বৈতক্ষমতা শেষ।
জুলাই-অগস্ট	রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেস।

* ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস অবধি তারিখগুলো দেওয়া হল নতুন আর পুরন (বন্ধনীর মধ্যে) দুই পঞ্জি অনুসারেই।

৭ই নভেম্বর (২৫এ অক্টোবর)	সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর মহাবিপ্লব। পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জয়জয়কার। অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ।
	দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার গঠিত।
নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮	দেশের অন্যান্য অংশে সোভিয়েত রাজের জয়।
নভেম্বর	'রাশিয়ার জাতিগুলির অধিকার-সংক্রান্ত ঘোষণা'।
ডিসেম্বর	ইউক্রেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।

১৯১৮

জানুয়ারি	তৃতীয় সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস। 'মেহনতী আর শোষিত জনগণের অধিকার-সংক্রান্ত ঘোষণা'।
	রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক করা এবং বিদ্যালয়কে গির্জা থেকে স্বতন্ত্র করার ডিক্রি।
	রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্‌ঘোষণা।
৩রা মার্চ	ব্রেস্ত-লিতোভ্‌স্কের সন্ধিচুক্তি।
জুন	বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের ডিক্রি।

জুলাই	পঞ্চম সারা-রাশিয়া সোভিয়েত কংগ্রেস। রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত।
অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের গোড়া	যুব কমিউনিস্ট লীগের সারা-রাশিয়া কংগ্রেস। কমসোমল প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯১৯

জানুয়ারি	বেলোরুশিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।
মার্চ	রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর ৮ম কংগ্রেস। পার্টির দ্বিতীয় কর্মসূচি গৃহীত।
এপ্রিল-মে	প্রথম সুবোৎনিক।

১৯২০

জানুয়ারি	বহিরাক্রমণকারীরা সোভিয়েত রাশিয়ার অবরোধ তুলে নিল।
এপ্রিল	আজারবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।
নভেম্বর	আর্মেনিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।
ডিসেম্বর	দেশের বিদ্যুৎসজ্জার 'গোয়েল্রো' পরিকল্পনা গৃহীত।

১৯২১

ফেব্রুয়ারি	জর্জিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।

মার্চ	রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর ১০ম কংগ্রেস। নয়া আর্থনীতিক কর্মনীতি।

১৯২২

এপ্রিল-মে	জেনোয়া সম্মেলন।
১৬ই এপ্রিল	রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং জার্মানির মধ্যে রাপাল্লো সন্ধিচুক্তি।
অক্টোবর	দূর প্রাচ্যে জাপানী বহিরাক্রমণ এবং শ্বেতরক্ষীদের কার্যকলাপ শেষ।
৩০এ ডিসেম্বর	সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন উদ্‌ঘোষিত।

১৯২৪

২১এ জানুয়ারি	লেনিনের জীবনাবসান।
জানুয়ারি	দ্বিতীয় সারা-ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান গৃহীত।
অক্টোবর	উজবেক এবং তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।
	এই বছরের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং আরও কয়েকটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিল, কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল।

১৯২৫

ডিসেম্বর	সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ১৪শ কংগ্রেস। শিল্পযোজনের কর্মনীতি গৃহীত।

১৯২৭

ডিসেম্বর	সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ১৫শ কংগ্রেস। কৃষি যৌথকরণের কর্মনীতি গৃহীত।

১৯২৮—১৯৩২

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা।

১৯২৯

শিল্পে এবং কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার গণ-আন্দোলন শুরু।

তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।

হেমন্তকাল	কৃষকের জোতজমাগুলোর ব্যাপক যৌথকরণ।

১৯৩১

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা মাঞ্চুরিয়া দখল ক'রে দূর প্রাচ্যে যুদ্ধবিস্তারের কেন্দ্র সৃষ্টি করল।

১৯৩৩

নাৎসীরা জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করল, ইউরোপে যুদ্ধবিস্তারের কেন্দ্র সৃষ্টি হল।

নভেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত।

১৯৩৩—১৯৩৭

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা।

১৯৩৫

স্তাখানভ আন্দোলন।

১৯৩৬

৫ই ডিসেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান গৃহীত।

১৯৩৮—১৯৪২

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা।

১৯৩৮

২৯এ জুলাই-১১ই অগস্ট — খাসান হ্রদের কাছে লাল ফৌজ জাপানীদের পরাস্ত করল।

১৯৩৯

১১ই মে-৩১এ অগস্ট	জাপানী আক্রমণ-হস্তক্ষেপকারীরা খাল্‌খিন্‌-গল নদীর কাছে পরাস্ত।
সেপ্টেম্বর	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল।
নভেম্বর	পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বেলোরুশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে শামিল হল, পুনর্মিলিত হল যথাক্রমে ইউক্রেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং বেলোরুশিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে।

১৯৪০

জুলাই-অগস্ট	লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া এবং এস্তোনিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল, তাদের শামিল করা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে।
অগস্ট	মোলদাভিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত।

১৯৪১

২২এ জুন	জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ।
ডিসেম্বর	নাৎসী বাহিনী মস্কোর কাছে পরাস্ত।

১৯৪৩

নভেম্বর ১৯৪২- ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ — স্তালিনগ্রাদে জার্মান ফাশিস্তরা পরাস্ত।

জুলাই — কুর্স্ক হাঁসুলিবাঁকে নাৎসী বাহিনী পরাস্ত।

১৯৪৪

নাৎসী বাহিনীগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত। লাল ফৌজ ইউরোপের জাতিগুলিকে মুক্ত করতে শুরু করল।

জুন — মিত্ররা ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলল।

১৯৪৫

২রা মে — সোভিয়েত ফৌজের কাছে বার্লিনের পতন।

৮ই মে — জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

৯ই অগস্ট — সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু।

৩রা সেপ্টেম্বর — জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

১৯৪৬—১৯৫০

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা।

১৯৫১—১৯৫৫

পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনা।

১৯৫১

মার্চ — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে 'শান্তিরক্ষা আইন' পাস হল।

১৯৫৩

৫ই মার্চ — স্তালিনের জীবনাবসান।

১৯৫৪

পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হল সোভিয়েত ইউনিয়নে। দেশের পূব অঞ্চলে অহল্যা এবং অব্যবহৃত ভূমি উন্নয়নের কর্মসূচি নিয়ে কাজ শুরু।

১৯৫৬

ফেব্রুয়ারি — সো.ই.ক.পা'র ২০শ কংগ্রেস।

১৯৫৭

অক্টোবর — পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণ করল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

নভেম্বর	**মস্কোয় কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির প্রতিনিধি সম্মেলন।**
	১৯৫৯
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	সো.ই.ক.পা'র ২১শ কংগ্রেস। সাতসালা পরিকল্পনা গৃহীত।
নভেম্বর	মস্কোয় কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির প্রতিনিধি সম্মেলন।
১২ই এপ্রিল	সোভিয়েত মহাকাশচর ইউরি গাগারিনের মানবেতিহাসে প্রথম মহাকাশ উড্ডয়ন।
অক্টোবর	সো.ই.ক.পা'র ২২শ কংগ্রেস। পার্টির তৃতীয় কর্মসূচি গৃহীত। কমিউনিজম গড়ার সূত্রপাত।
অগস্ট	আবহমণ্ডলে, মহাকাশে এবং জলের তলে নিউক্লীয় পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের মস্কো সন্ধিচুক্তি।

অক্টোবর	সো.ই.ক.পা'র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী বৈঠক।
	নতুন আর্থনীতিক সংস্কার আইন পাস হল।
মার্চ-এপ্রিল	সো.ই.ক.পা'র ২৩শ কংগ্রেস। নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্দেশাবলি।
নভেম্বর	সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বার্ষিকী।
জুন	মস্কোয় কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন।
নভেম্বর	যৌথখামারীদের তৃতীয় সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস।

২২এ এপ্রিল	লেনিন জন্মশতবার্ষিকী।
মার্চ-এপ্রিল	সো.ই.ক.পা'র ২৪শ কংগ্রেস। সালের জন্যে আর্থনীতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্দেশাবলি অনুমোদিত।